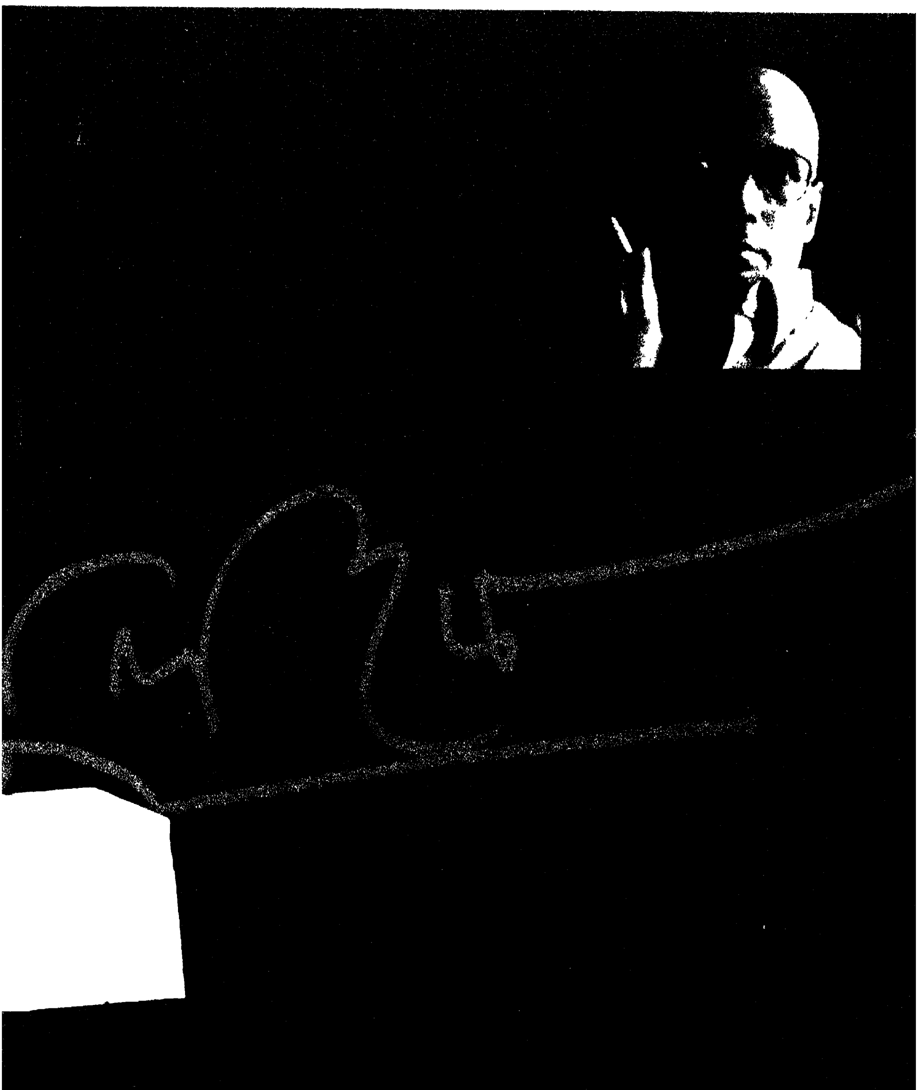
সৈয়দ শামসুল হক

উপন্যাস সমগ্র ৩



উপন্যাস সমগ্র ৩

উপন্যাস সমগ্র ৩

সৈয়দ শামসুল হক

অন্যপ্রকাশ

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

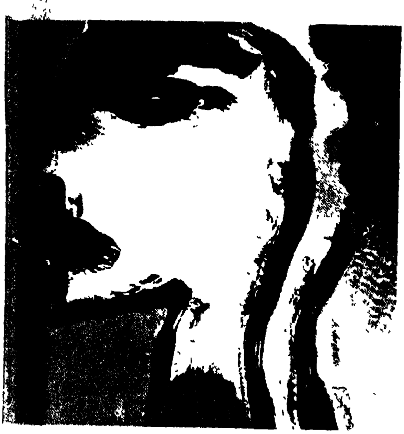
কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ২৫০ টাকা

Upanyash Samagra 3 | By Syed Shamsul Haq
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price :Tk 250 only

ISBN : 984-8160-90-6



সূচিপত্র

সবিনয় নিবেদন

এমন হয় প্রায়ই, একাধিক ব্যক্তিকে আমরা জানি যাদের নাম অভিন্ন। সাধারণত আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে— কখনো কৌতুককর, কখনো বিরক্তিকর— এটি তেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না ; কিন্তু আবার করেও, এবং কখনো ভয়াবহভাবে, কখনো বা আশাহীনভাবে। লক্ষ করছি, বর্তমান খণ্ডের তিনটি উপন্যাসে— দূরত্ব, নীল দংশন, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী— আমি এই নাম-অভিন্নতার বিষয়টি ব্যবহার করেছি। এবং আমার মনে পড়ছে, একটি ছোটগল্পেও বিষয়টি আরো একবার আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি।

নাম অভিন্নতার সংকট সবচে' তুমুল হয়ে দেখা দিচ্ছে 'নীল দংশন' রচনায় ; এবং এখানে যতই ভয়াবহ হোক না সে, আমরা দেখব এক ব্যক্তির সামান্য থেকে অসামান্যে উত্তরণের প্রক্রিয়া। আবার 'দূরত্ব' রচনায় দেখতে পাবো, হয়তো, এই নাম অভিন্নতা কীভাবে একজনকে গ্রাস করে জীবন নামক বাস্তবতার ভেতরে— যেনবা তাকে আমরা দেখবো ধীরে ও নিঃশব্দে পাঁকে ক্রমশ প্রোথিত হতে। 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' রচনাটিতে, একেবারে শেষ দিকে, আমরা আরো একজনকে দেখব নাম-অভিন্নতার কারণে এক অপরিচিতার সঙ্গে অকস্মাৎ গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে। এতক্ষণে বোধ হয় বলা যায়, একাধিক ব্যক্তির একই নাম— এই বিষয়টি নিয়ে আমি কৌতূহলী ; কী তা করে, তা কোথায় আমাদের পৌছে দেয় ; এবং এখনো যে এই কৌতূহল আমার রচনায় নিবৃত্ত হয়ে গেছে, তা মোটেই নয় ; এখনো আমি অন্তত একটি উপন্যাসের কথা ভাবছি, যা এখনো লেখা হয় নি, যেখানে এটি আরো একটি নতুন স্তরে পরীক্ষিত হবার অপেক্ষায় আছে।

'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' এ খণ্ডের উপন্যাসগুলোর ভেতরে প্রথম লেখা। মনে পড়ছে লেখার সেই দিনগুলো— লন্ডনে, আমা[illegible] এক কামরার স্টুডিও ফ্ল্যাটে— ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে উঠেছিলেন, তার মাত্র কয়েক শ' গজ দূরে ; মনে পড়ছে আমাদের দুই বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট হ্রদটির কথা, জলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে উইপিং উইলোর কচি সবুজ পাতা, পাশেই পুরনো কিছু লোহার বেঞ্চ ; কল্পনা করি, একদিন, অনেক রাতে, এরই কোনো একটি বেঞ্চে বসে, আকাশের ঝকঝকে তারার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো রচনা করেছিলেন আমার তাঁর প্রিয়তম সেই গানটি— সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত। মনে পড়ছে, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী লিখতে লিখতে কত রাতে আমি উঠে গিয়েছি, হেঁটে গিয়েছি পাহাড়ি ঢাল বেয়ে, বসেছি ওই বেঞ্চে— জীবন, মৃত্যু, বিস্ময় ও বেদনা আমার এক হয়ে গেছে।

লেখার যেমন একটি পটভূমি থাকে, লিখে যাবারও তেমনি একটি পটভূমি আছে। লেখার সঙ্গে এই লিখে যাবার কোনো মিল নেই— লিখে যাওয়াটা লেখকের ব্যক্তিগত করোটিতে থেকে যায়, লেখাটি সাধারণের হয়ে যায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, কোথাও কি মিল নেই তাদের ? কোথাও কি থেকে যায় না লিখে যাবার পটভূমিটির বুনোন কিম্বা নক্‌শা ? পেছনের দিকে তাকিয়ে এখন আমার মনে হয়, হ্রদের তীরে মধ্যরাতে বৃক্ষলতার ভেতরে জলে বিম্বিত নক্ষত্রখচিত আকাশের কিছু অনুভব রয়ে যায় নি কি দ্বিতীয় দিনের কাহিনীতে ?

প্রবাস থেকে স্থায়ীভাবে আবার ঢাকায় ফিরে আমার প্রথম লেখা 'দূরত্ব'— মণিপুরী পাড়ার ছোট্ট বাসায় ছোট্ট টেবিলে অধিকাংশই মধ্যরাত থেকে ভোর রাত অবধি লেখা এই উপন্যাসে আমার সেই বন্ধুটিকে আমি বর্ণনা করতে চেয়েছি, যে হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে হারিয়ে যায়

এবং বহু বৎসর পরে যাকে আমি অকস্মাৎ আবিষ্কার করি দূর একটি গ্রামে, কলেজের অধ্যাপক হিসেবে— এবং সেই যাকে আমি সুপুরি গাছ ঘেরা বাড়িতে ছবির মতো সাজানো টিনের বাড়িতে দেখি— সবই শান্ত ও সুখময়— কিন্তু যেন আমাকে দেখেই তার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় শ্বাস— যেন একটা জীবন ছিল অতীতে, পেছনে, সম্ভাবনাময়, এখন আর নেই— আশাহীনভাবে।

লন্ডনের পটভূমিতে যে কয়েকটি উপন্যাস লিখেছি, তাদের প্রথম এই 'তুমি সেই তরবারি'। এবং এটিই আমার একমাত্র উপন্যাস যেটি লন্ডনের পটভূমিতে লন্ডনেই বসে লেখা। সমারসেট মম একটি কথা বলেছিলেন— বিদেশের মাটিতে ইংরেজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় স্বদেশ থেকে ভিন্ন, তিনি এই ভিন্নতাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে। 'তুমি সেই তরবারি' লেখার পেছনে আমার প্রেরণা ছিলেন মম।

'স্বপ্ন সংক্রান্ত' রচনায় আমার একদার ক্ষেত্র— ঢাকার চলচ্চিত্র— ব্যবহৃত হয়েছে ; এ রচনায় হয়তো আমারই স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের সংকেত রয়ে গেছে ; এই সংকেত লক্ষ করা যাবে, আরো স্পষ্ট করে, এর কিছু পরের একটি উপন্যাসে— কিন্তু সেটি পরবর্তী কোনো খণ্ডে পাওয়া যাবে।

সৈয়দ হক



দূরত্ব

রাজারহাটে এখন বেগ এবং ধ্বনি প্রত্যেকেই অবিরাম অনুভব করে। বিছানা নিশ্চল, কিন্তু মনে হয় একটি অগস্ত্যযাত্রার জন্যে তার প্রস্তুতি এখন সম্পূর্ণ। নীরবতা অখণ্ড, অথচ তীব্র একটি ধ্বনি অবিরল ধারায় গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

শ্রী ভূধর সরখেল গানের টিউশানি করে। সপ্তাহে দু'দিন তাকে সাইকেল চালিয়ে নবগ্রাম যেতে হয়। ফিরতে ফিরতে অবেলা স্যা হয়ে যায়। ধারণা ছিল, তার হয়ত সাক্ষাৎ হয়েছে, অথবা এমন কারো কাছে সে কিছু শুনতে পেয়েছে যা রাজারহাটে এখনো অশ্রুত। কিন্তু না, সেও কিছু শোনে নি।

মঙ্গলবারের হাটে এরকম একটা কথা শোনা যায় যে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া স্বয়ং দেখেছে। লোকটির চোখ স্বভাবতই রক্তবর্ণ; যেচে কেউ তার সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলে না। অতএব তার কাছেই জানা হয় না— সত্যি সে কিছু দেখেছে কিনা। কারো কারো সন্দেহ হয়, সুখি মিয়া কিছু না হলেও কিছু জানে। কারণ তার ঠোঁটে এক প্রকার দ্যুতিময় হাসি লক্ষ করা গেছে। সুখি মিয়া দোকান বন্ধ করে ঘরে চলে যাবার পর দু'একজন বলাবলি করে, গোরা পাহাড় বেশি দূরে নয়। ব্রহ্মপুত্র পার হলেই। সেখান থেকে এসেছে কিনা কে বলবে ?

জন্তুটিকে এখন পর্যন্ত কেউ চোখে দেখে নি। তবে তার উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। এবং বেশ ভালভাবেই। বলা যায়, ভয়াবহভাবে।

গতকাল ভর সন্ধেবেলা এক কিষানের কোলের শিশুকে জন্তুটি নিয়ে যায়। আজ সকালে আধ মাইল দূরের এক বাঁশবনে শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার পেট বীভৎস রকমে চেরা। আঁত বহুদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত।

কিষান বৌ ছেলেটিকে ঘরে শুইয়ে রেখে পাশের বাড়িতে আগুন ধার করতে গিয়েছিল। গ্রামে সূর্যাস্তের পর অনেকেই আগুন ধার দেয় না। পাশের বাড়ির বৌ তাই প্রথমে আপত্তি করেছিল। অবশেষে সে সম্মত হয়েছিল একটি অভিনয় করতে। বৌটি কোনো এক ছুতোয় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন কিষান বৌ আগুন চুরি করে নিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হয়। পথে আগুন নিভে যাবার উপক্রম হওয়াতে সে খানিক দাঁড়িয়েছিল— কতটা সময় বলতে পারবে না— এবং পাটকাঠির আগুন আবার সতেজ হতেই সে চলতে শুরু করেছিল।

ভোরবেলায় সরখেল মাইল দুই হেঁটে আসে। তার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেই এটা দরকার কিংবা নির্মল বাতাসে নিজের কণ্ঠ শুনতে তার ভাল লাগে কিনা, ও ব্যাপারে এখনো সে নিশ্চিত নয়। আসলে, তর্কটি তার মনে আদৌ কখনো ওঠে নি। প্রতি ভোরেই সরখেল গেয়ে থাকে, পথ হাঁটতে হাঁটতে, প্রথমে গুনগুন করে, পরে গানের কথাগুলোকে গর্বিত পায়রার মত আকাশে উড়িয়ে দিতে দিতে। আজ সকালেও সরখেল তার কণ্ঠ নিয়ে খেলা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক ধ্বনি স্রোত তাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

সরখেলের প্রথম মনে হয়, বহুদূর থেকে তারই গানের সঙ্গে কেউ প্রতিযোগিতা করতে চাইছে। গান থামিয়ে কান খাড়া করে সে। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপারটির কোনো মীমাংসা হয় না। তারপর আকস্মিকভাবেই সে আবিষ্কার করে— বিলাপেরও সঙ্গীত ধর্মিতা আছে।

কিষান বৌ বিলাপ করে চলেছে।

সরখেলের কৌতূহল হয়, কিন্তু সে অগ্রসর হয় না। বরং যেখানে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সেখানেই সেদিনকার শেষবিন্দু ধরে নিয়ে সে ইস্টিশানের দিকে ফিরে যায়। তখন তার গলায় আর গান থাকে না।

ইস্টিশানের কাছে কলেজের পাশে বাবলা গাছের নিচে নতুন অধ্যাপক আজও হতাশ হয়। সে এই গাছের নিচে প্রতিদিন পায়চারি করে এবং সরখেলের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। বলা যায়, এ অপেক্ষা সরখেলের গানের জন্যেই। আজ কয়েকদিন থেকেই অধ্যাপকটি কৌতূহলী হয়ে আছে সরখেল যে গান গায় তার কথাগুলো শোনার জন্যে। কিন্তু প্রতিদিনই সরখেল অধ্যাপককে দেখামাত্র গলা নামিয়ে নেয়, কাছে এসে নীরব হয়ে যায় এবং নীরবেই অধ্যাপককে পাশ কাটিয়ে সে চলে যায়।

২

রাজারহাটকে শহরের মানুষ বলবে, গ্রাম। আর কয়েকটি কুটির নিয়ে মাঠ ও গাছের ভেতরে যাদের বসতি তারা বলবে, শহর।

প্রশাসনিক নথিপত্রে রাজারহাট ছোট শহর বলে বর্ণিত। রেল ইস্টিশান আছে, ডাকঘর আছে। শনি-মঙ্গল হাট বসে, দৈনিক বাজার তো আছেই। একদিকে ডোবা আর একদিকে ধান ক্ষেত নিয়ে একটি ব্যাংক আছে। ইস্কুল আছে। আর হালে একটি কলেজ হয়েছে। দিনে দু'বার ট্রেন থামে। সে ট্রেন পরের ইস্টিশান নবগ্রাম পেরিয়ে জলেশ্বরীতে যায়, আবার সেখান থেকে উলটো যাত্রা করে রাজারহাট পেরিয়ে তিস্তা ফিরে আসে।

ইস্টিশানে সবসময়ই কয়েকটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। অলস দুপুরগুলোতে প্ল্যাটফরম চঞ্চল হয়ে ওঠে কোনো কোনো দিন। মালগাড়িতে সুপুরির বস্তা তোলা হয়, পাটের গাঁট পোরা হয়। ইস্টিশানের ওপাশেই বহুদূর পর্যন্ত একটা খাল চলে গেছে। সেই খালে ভেজান আছে পাট। যতদূরেই যাওয়া যাক না কেন ভেজা পাটের গলিত গন্ধ পেছন ছাড়ে না।

জানা না থাকলে মনে হতে পারে পৃথিবীর শরীরে উৎকট কোনো ক্ষত হয়েছে, মাংস পচে গলে পড়েছে, বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। যখন হঠাৎ করে হাওয়া দেয়, শিউরে উঠতে হয়।

নতুন অধ্যাপক পাট ভেজানোর খবর রাখে না। পচা মাংসের ঘ্রাণ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার জামাকাপড়েও সেই গুরুগন্ধ সে এখন টের পাচ্ছে। মনে হয়, তার নিজের শরীরেই পচন ধরে গেছে।

৩

বাজারে একাধিক চায়ের দোকানের ভেতরে একটির জনপ্রিয়তা অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। তার একটা কারণ, এই দোকানে রেডিও আছে। সেই রেডিও ঘিরে দিনের সবটুকু এবং রাতের অনেকখানি সময় স্থানীয় যুবকেরা ব্যয় করে।

কিষান বৌয়ের শিশুটির বীভৎস পরিণতি নিয়ে ভোর থেকেই তুমুল আলোচনা চলে। আলোচনার পটভূমিতে বিশ্বসংবাদ পর্যন্ত কোনো আঁচড় কাটতে সক্ষম হয় না।

কেন সে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আগুন আনতে গেল না ?

হ্যাঁ, তা যেতে পারত।

কোলে নিয়েই যাওয়া উচিত ছিল তার।

নিয়ে গেল না কেন ?

না নিয়ে যাবার কোনো কারণ থাকতে পারে।

বৌটা বোকা।

আস্ত বোকা।

এরা এই রকম বোকাই হয়।

কোলে না নেবার কোনো কারণই নেই।

আসলে মৃত্যু টেনেছিল।

মৃত্যুর উল্লেখে মুহূর্তের জন্যে নীরবতা এসে আক্রমণ করে কোলাহলকে। লোকেরা আবার সেই বেগ এবং ধ্বনি অনুভব করতে পারে অস্তিত্বের ভেতরে।

একজন হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মনে হয়, উচ্চকণ্ঠে কিছু বলবার জন্যে সে এখন তৈরি হয়ে নিল। কিন্তু যখন সে বলে, তার গলা অস্বাভাবিক রকমে নিচু পর্দায় কাজ করে।

সে বলে, মৃত্যু এভাবেই আমাদের টানে।

ইস, বাচ্চাটার বয়স কত ছিল ?

কোলের বাচ্চা।

আমার মাথাতেই ঢোকে না, বাচ্চাটাকে তার মা কী করে একা ঘরে ভর সন্ধেবেলায় ফেলে রেখে যেতে পারল!

কেউ কেউ নীরবে নিজেদের শিশুকাল স্মরণ করে। কেউ কেউ শিউরে ওঠে, তাদেরও এই পরিণতি হতে পারত। বেঁচে থাকার বিস্ময় বোধ করে তখন কেউ কেউ। দোকানের বাইরে, পথের ধারে বুনো লতাপাতাগুলো এখন অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সবুজ বলে বোধ হয় তাদের।

বেশিক্ষণ তো যায় নি। পাশের বাড়ি। বড়জোর দু'মিনিট।

বাড়িতে আর কেউ ছিল না ?

এদের বাড়িতে আর কে থাকে ?

ভাত না থাকলে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনও থাকে না।

তবু বাচ্চাটাকে একা ফেলে যাওয়া কোনোমতেই উচিত হয় নি তার।

৪

কিছু বলবেন ?

সরখেল লজ্জিতস্বরে ছোট্ট করে প্রশ্নটি করে নতুন অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে থাকে

রোজ সকালে আপনাকে হাঁটতে দেখি।

তা হাঁটি।

সরখেল এখন তার ভেতরের ছোট্ট হতাশাটুকু গোপন করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। সে ভেবেছিল, নতুন অধ্যাপক নিহত শিশুটি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে।

আপনি গুনগুন করেন শুনি।

সরখেল আবার লজ্জিত হয়।

মনে হয় রোজ আপনি একটা গানই করেন।

সরখেল উৎসুক চোখে অধ্যাপককে দেখে।

কী গান করেন ?

এই একটা গান।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

হ্যাঁ। এ-কী এ সুন্দরশোভা। আপনি গান করেন ?

এবার লজ্জিত হয় নতুন অধ্যাপক।

না, করি না। গান আমার আসে না।

খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সে কলেজের দিকে ফিবে যায়।

সরখেলের তবু সন্দেহ যায় না। অধ্যাপকটি নিশ্চয়ই গান জানে। ঢাকা থেকে এসেছে, গান কি আর জানে না ?

৫

কিষান বৌ উঠানে বসা, পা ছড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে, দু'হাতে মাথার উকুন চুলকোতে চুলকোতে ক্ষীণ গলায় কেঁদে চলে। তার কান্নায় জোর নেই, আশাহীন খেদ নেই; আছে এক সর্বশক্তিমান ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণের উপলব্ধি।

অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে অনির্ণীত বয়সের দু'টি রমণী। তেলহীন রুক্ষ চুলের ভেতরে তারাও অনুভব করে উকুনের সন্তর্পণ চলাফেরা। এবং তারাও চুলের ভেতরে অবিরাম আঙুল চালায়। তবে তারা কিষাণ বৌটির মত অশ্রুহীন কেঁদে চলে না।

একজন জানায় শিশুটির জন্ম হয়েছিল তারই হাতে।

দ্বিতীয় জনের প্রত্যয় হয় না।

তখন প্রথমজন সবিস্তারে বিবরণ দেয়। শেষ রাতে ব্যথা উঠেছিল। কিষান এসে তাদের কুটিরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। শেষ রাতে চাঁদের আলো ছিল বলে প্রসব অনেকটা নির্বিঘ্ন হতে পারে। এই সূত্রে আগের একটি ঘটনাও এই রমণী স্মরণ করিয়ে দেয়। সেবার অমাবস্যা ছিল। আর তাদের মত গরিব ঘরে বাতি রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব অন্ধকারে শিশুর নাড়ি কাটতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য রেখে কাটা সম্ভব হয় না। কয়েক দিনের মধ্যেই খিচুনি রোগে শিশুটি যেখান থেকে ক্ষণকালের জন্যে পৃথিবীর অমাবস্যার ভেতরে এসেছিল সেখানেই ফিরে যায়।

এবং এই কাহিনী শেষ করবার পর বক্তা আর খেই খুঁজে পায় না। অতএব, সে যে সদ্যমৃত এই শিশুটির জন্মকালে উপস্থিত ছিল তার আর প্রমাণ দেয়া হয় না। উকুন তার মনোযোগ এবং শ্রম দাবি করে প্রবলভাবে। একা সে সামাল দিতে পারে না বলে মাটিতে থপ করে বসে পড়ে দ্বিতীয় রমণীকে অনুরোধ করে হাত লাগাতে। অনুরোধটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানের মত দেখিয়েছিল। কারণ, রমণীটি কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে দ্বিতীয়ার ডান হাতের কব্জি ধরে অকস্মাৎ টান দিয়েছিল।

কিন্তু কিষান বৌটি তার শিশুকে সঙ্গে না নিয়ে একাঘরে ফেলে রেখে গিয়েছিল কেন ?

এই রহস্য গ্রামের স্মৃতিকথায় পরিণত আরো অনেক রহস্যের অন্তর্ভুক্ত হবার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু অচিরেই একটি আলো দেখা যায়।

বস্তুতপক্ষে দিনের আলোয় কিষান বৌয়ের উন্মুক্ত স্তনযুগল চোখে পড়ে। শূন্যগর্ভ কাপড়ের থলের মত। ফুটবলের ফুটো ব্লাডারের মত।

তার স্তনে দুধ নেই।

খরায় পোড়া, পঙ্গপালের আক্রমণে মরা ধানের শীষের ভেতরে অবিকল যেমন ধান নেই— তার দুটো স্তন।

কিষান বৌ ঘুমের ঠিক আগের মুহূর্তে খিন্ন শিশুর মত বলে যেতে থাকে, বাচ্চাকে কোলে নিলেই সে কেবল মাই টানতে চায়। বন বেড়ালের বাচ্চার মত খামচে ধরে মাইয়ের বোঁটা। দুধ নেই বলে সুঁই ফোটানোর মত তখন তীব্র ব্যথা হয় তার। তাই সে শিশুকে কোলে নিতে ভয় পায়।

তাই সে শিশুকে শুইয়ে রেখে পাশের বাড়িতে আগুন আনতে যায়।

দ্বিতীয় রমণীটি প্রথমবার মাথা থেকে উকুন খুঁটে তোলায় এত তন্ময় হয়ে থাকে যে এই ব্যাখ্যাটি আদৌ তার কানে পশে না। বুড়ো আঙ্গুলের দুই নখের ভেতরে উকুন টিপে মারার উল্লাস তার জিভে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে নাকের ডগা ছুঁই-ছুঁই হয়ে থাকে।

৬

শিশুটির আঁত বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল।

বাঁশবনের ভেতরে ভোরবেলায় শরীর লঘু করতে গিয়েছিল রাজারহাটের সবচেয়ে পুরনো কাঠমিস্তিরি এনায়েতের জোগানদার ব্যাং মামুদ। তার জন্মের পরমুহূর্তেই বিরাট এক ব্যাং লাফিয়ে এসে থপ করে দাওয়ায় বসে পড়েছিল বলে সেই স্মৃতিটিকে শিশুর সঙ্গে গেঁথে দেয়া হয়। তার নাম হয়ে যায় ব্যাং।

বাঁশবনের ভেতরে পরিচ্ছন্ন একটি অংশ আছে। সেখানে ব্যাংয়ের নিজস্ব রাজত্ব। সে প্রতিদিন দু'হাত অন্তর অন্তর মলত্যাগ করে। এইভাবে হাত বিশেক জায়গা ব্যবহার করে ফেলবার পর আবার সে প্রথম জায়গাটিতে ফিরে আসে। আবার সে গোড়া থেকে পুরো ব্যাপারটি শুরু করে দেয়।

আজ ভোরে তার অবস্থান ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। সে বসে আগামী দিনের পরিষ্কার

ক্ষেত্রটির দিকে ভাবুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। কোষ্ঠ চমৎকারভাবে সহযোগিতা করছিল। হঠাৎ নীলাভ সরু একটি দীর্ঘ নল তার চোখে পড়ে। প্রথমে সে ঠাহর করতে পারে না বস্তুটি কী হতে পারে। সে সুখী দৃষ্টিতে নলটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক প্রকার স্বপ্নের দরুন বাস্তবকে বুঝে নেবার ক্ষমতা তখন তার প্রায় অনুপস্থিত।

অচিরে নলটি তার চোখের সমুখ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বস্তুত নলটি যথাস্থানেই থাকে কিন্তু তার চোখ আর আলাদা করে বস্তুটিকে চিহ্নিত করতে পারে না। বাঁশবনের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতা, কঞ্চি, পচে যাওয়া এক টুকরো চট, ভাঙ্গা একপাটি খড়ম ইত্যাদির সঙ্গে নলটি বেমালুম হয়ে থাকে। ব্যাং মামুদ কিছুক্ষণ একটি কাঠাল গাছের কথা চিন্তা করে এই অবসরে। গাছটি আজ ফাড়াই হবে। করাতের টানে হলুদ সুগন্ধ কাঠের গুঁড়ো এখনি যেন তার নাকে এসে লাগে, তার সমস্ত শরীরে মাখামাখি হয়ে যায়। সে বাতাসের দিকে নাক উঁচু করে নিঃশ্বাস নেয়।

তারপর গলা ঝাড়া দিয়ে, শুকনো পাতা ব্যবহার করে পরিষ্কার হয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার সেই নীলাভ নলটি তার চোখে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, এই প্রথম সে দেখল। তারপর স্মরণ হয়, বস্তুটি কিছুক্ষণ আগেও সে লক্ষ করেছিল। এবার সে সাবধানে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি বাড়িয়ে দেয়।

অত্যন্ত কোমল এবং অপ্রত্যাশিত রকমে জীবন্ত বলে বোধ হয় বস্তুটি। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায় সে। অতিকায় কৃমি কিংবা অচেনা কোনো সরীসৃপ ? পরনের গামছার ভেতরে তার মনে হয় শীতল কী একটা শিরশির করে হঠাৎ চলতে শুরু করেছে। ব্যাং মামুদ পায়ের কাছে পড়ে থাকা শুকনো একটা কঞ্চি দিয়ে ভয়ে ভয়ে বস্তুটি পরীক্ষা করে দেখে।

তখন তার ধারণা হয় এটি আসলে ছাগলের আঁত।

সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই নষ্ট ছেলেরা কারো ছাগল চুরি করে এনে গত রাতে জবাই করে খেয়েছে। তাদের সে দুষ্কর্মের সাক্ষী এই নীলাভ দীর্ঘ আঁত। পাপ কখনো লুকনো যায় না— ছোটবেলা থেকে শুনে আসা এই কথাটি তার নতুন করে মনে পড়ে যায় এবং গুরুজনদের প্রতি তার মন হঠাৎ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে।

ব্যাং নিজেও কিছু ছাগল পোষে। তার সন্দেহ হয়, হয়ত এই চুরি তারই বাড়িতে হয়ে গেছে অথচ সে এখনো জানো না। দ্রুত পায়ে সে আঁত অনুসরণ করে এগোয়।

এবং অচিরেই মৃত শিশুটিকে আবিষ্কার করে ফেলে।

পাঁজরের প্রান্ত থেকে তলপেট পর্যন্ত শিশুটির পেট চেরা। যেন ধারাল ছুরি দিয়ে কেউ এক টানে ফেড়ে ফেলেছে।

দাঁতহীন শিশুটির গোলাপি মাড়ি বেরিয়ে আছে, সেই মাড়ির ওপর লাল রঙের স্বচ্ছ ডানাওয়ালা একটা ফড়িং বসে আছে স্থির হয়ে।

চোখের পলকে ব্যাং তার শরীরের ভেতরে বিবমিষা বোধ করে। আর একটু হলে শিশুটির ওপরই হয়ে যেত, সে হড়হড় করে বমি করে দেয়। ছোট্ট একটি শিশুর আঁতও যে এত দীর্ঘ হয়, তার জানা ছিল না।

৭

আর কিছুক্ষণ পরেই কলেজের ঘণ্টা পড়বে। নতুন অধ্যাপক গোসল সেরে ঘরে আসে। যে জামা-ই তুলে নেয়, সে গলিত মাংসের প্রবল ঘ্রাণ পায়। বিশাল একটি শরীর থেকে অনবরত চাপ চাপ মাংস খুলে পড়ছে কোথাও। অসংখ্য কোটি কোটি নীল মাছি ওড়ার ভনভন শব্দে তার কান ঝালাপালা হতে থাকে।

তারপর এক সময় হঠাৎ শব্দটা থেমে যায়। গন্ধটিও যেন আর পাওয়া যায় না। বিশ্বাস হতে চায় সবকিছু নির্মল হয়ে গেছে, স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মনের ভেতরে অতিক্ষীণ যেন একটি আকাঙ্ক্ষাও জন্ম নেয়। সেই পচা গন্ধের জন্যে, উচ্চগ্রাম সেই শব্দের জন্যে। আর সে জন্যেই বুঝি সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিদায় নিশ্চিত কিনা— পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে যতটা, ঠিক ততটাই আমন্ত্রণ জানাবার জন্যেও বটে।

জানালার কাছে যেতেই উৎকট গন্ধটি হা-হা করে তেড়ে আসে আবার। অবসন্ন, পরাজিত সে হাতের কাছে যে জামা পায় পরে নেয়।

কলেজের ঘণ্টা সৌরজগৎ জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

৮

মসজিদের মোয়াজ্জিন পানিভরা মাটির পাত্র সমুখে রেখে দুলে দুলে বিড়বিড় করে সুরা পড়ে। পানিতে ফুঁ দেয়। তারপর সটান হয়ে সে ব্যাংয়ের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ সুন্দর হাসে। অভয় দ্যায়, এই পানি এখন একবার, আর ঠিক মগরেবের আজানের সময় একবার খেয়ে নিলেই সে ভাল হয়ে যাবে।

খড়ের পাটির উপর ব্যাং শক্তিরহিত শুয়ে থাকে। তার নিজের পেটের ভেতরে যে আঁত আছে তা সে স্পষ্ট দেখতে পায় কেউ টেনে টেনে রোদ্দুরে শুকোতে দিচ্ছে। কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে তাকে নিষেধ সে করতে পারে না। কেবল মাথা নাড়ে এবং আঃ আঃ করতে থাকে।

মোয়াজ্জিন জানায়, একটি মানুষের পেটের ভেতরে যা আছে ছাগলের পেটেও অবিকল তাই আছে। পশু থেকে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, মানুষ আল্লার এবাদত করে।

ব্যাং তার শরীরের ভেতরে হঠাৎ আরো ভয়ের শীতলতা অনুভব করে। সে এবার অদৃশ্য ব্যক্তিটির দু'হাত চেপে ধরতে চায়, আঁত টেনে বের না করবার জন্যে তার সঙ্গে লড়াই করতে চায় সে। এবং ব্যর্থ হয়ে কম্পিত আঙুল তুলে উপস্থিত সকলকে দেখায়— ঐ, ঐ যে।

তার সেই উচ্চারণ এবার সবাইকে ভীত করে তোলে। এরকম বোধ হয় যে সকাল দশটাতেই ঝপ করে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, জন্তুটির সঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে।

লুঙ্গি ঝাড়া দিয়ে মোয়াজ্জিন উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দাওয়া থেকে নেমে আসে। চোখ ছোট করে গনগনে সূর্যের দিকে একবার তাকায়। জোহরের নামাজ যদিও অনেক দূরে, তবু অভ্যেসবশেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময় মেপে নেয় সে হয়ত। তারপর সমবেত সবাইকে সতর্ক থাকবার সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য উচ্চারণ করে পথে নেমে যায়।

তার গলার স্বর তখনো উঠানে আছাড় খেতে থাকে।

এইসব চোখে দেখা যায় না, হুঁশিয়ার মত থাকেন সকলে

৯

একটা যখন গেছে, আরো যাবে।

এই কেবল শুরু।

আরো কোথায় কোথায় যেন এরকম হয়েছে। কাগজে খবর ছিল।

কিন্তু জিনিসটা কী ?

স্তব্ধতা।

রেডিওর অনুষ্ঠান এখন বন্ধ বলে স্তব্ধতা বিকট বোধ হয়।

কাগজে লিখেছিল— অচিন জানোয়ার।

ঘটাং করে একটি শব্দ সারা বাজার কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। মনে হয়, পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড অপার্থিব আর্তনাদ করে বন্ধ হয়ে গেল। অচিরে ভ্রম দূর হয়। ইস্টিশানে কুলিরা মালগাড়ি ঠেলে এনে আরেকটি মালগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। ওটা সেই শান্টিংয়ের শব্দ ছিল।

১০

জয়নাল আবেদিন রাজারহাট কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে মাত্র দু'সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে এসেছে। তার চুলের ছাট, হাঁটার ধরন, গায়ের জামা— সবকিছুই সবসময় ঘোষণা করতে থাকে যে সে আগন্তুক। যুবকেরা তাকে দেখে ঈর্ষা করে, ঢাকার স্বপ্ন দ্যাখে। ছাত্রীরা তাকে সিনেমার পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা একজন অভিনেতার তুল্য বলে জ্ঞান করে।

বই খুলেও বই আবার বন্ধ করে রাখে জয়নাল। ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের দিকে সে স্মিত চোখে তাকায়। আজ কয়েকদিন ধরে সে লক্ষ করেছে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্লাশ নেবার সময় সে গলিত মাংসের গন্ধটা পায় না। কখনো কখনো এই ক্লাশ ঘরটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ক্লাশ ঘরটির মত মনে হয়। কখনো কখনো সে সদ্য অতীত ঢাকার কোলাহল এখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়।

কিছুক্ষণ আগে অধ্যাপকদের ঘরে ইংরেজির আফজাল সাহেবের সঙ্গে একরকম কথা কাটাকাটি হয়ে যায় তার। জন্তুটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জয়নাল সন্দেহ প্রকাশ করায় আফজাল সাহেব বলেছিলেন রাজধানীর লোকেরা উদ্ধত হয় বটে।

ছাত্রছাত্রীদের দিকে নীরবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জয়নাল।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ ?

ক্লাশে একটা গুঞ্জন ওঠে। উত্তর অনাবশ্যক। হ্যাঁ, তারা প্রত্যেকেই শুনেছে ঐ শিশুটির মর্মান্তিক পরিণতি।

কী মনে হয় তোমাদের ?

জয়নাল যেন দাবার ছকে একটি একটি করে ঘুঁটি এগিয়ে দেয়। দিয়ে, অপেক্ষা করে, প্রতিপক্ষের মুখভাব লক্ষ করে কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে।

অপ্রতিভ দেখায় ছাত্রছাত্রীদের।

জয়নাল এবার গম্ভীর হয়ে যায়। আলোর অকস্মাৎ অপসারণের মত সে হাসিটুকু উধাও করে দিয়ে আবারো প্রশ্ন করে, তোমাদের নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে ?

কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

তখন জয়নাল নিজেই বলতে থাকে, আমরা, মানুষ, আমরা সচেতন। প্রতি মুহূর্তে আমরা কিছু না কিছু দেখছি, কিছু না কিছু শুনছি, কিছু না কিছু জানছি। প্রতি মুহূর্তেই আমরা এই দেখা জানা শোনা মিলিয়ে একটি না একটি ধারণা করে চলেছি। আমাদের চারপাশের কোনো ঘটনাই আমাদের মনের ভেতরে ঢেউ না তুলে পারে না। পারে কি ?

জয়নাল লক্ষ করে, নিশ্চল নিস্পন্দ ক্লাশের ভেতরে সমুখের সারিতে একমাত্র একজন খুব মৃদুভাবে, প্রায় দেখা-যায়-কী-যায়-না, মাথা নাড়ে। যে মাথা নাড়ে সে একজন ছাত্রী।

জয়নালের মনে হয় ক্লাশে যে আরো তিনটি মেয়ে আছে তাদের ভেতরে সে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। তার শাড়ির রঙ আর সকলের তুলনায় অনেক স্নিগ্ধ।

তুমি কিছু বলবে ?

মেয়েটি হঠাৎ ভীত হয়ে বড় বড় চোখ মেলে জয়নালের দিকে তাকায়। তারপর প্রবল বেগে মাথা নাড়ে। এবার তার মাথা নাড়া স্পষ্ট চোখে পড়ে। বরং দরকারের তুলনায় কিছুটা বেশি মাত্রায় সে মাথা নাড়ে। তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে নেয়। দ্রুত হাতে বই ওলটায়। যেন কী একটা খোঁজে।

আমাদের সবার মনেই কিছু না কিছু বলবার আছে। জয়নাল ঘোষণা করে। বলবার কিছু নেই, এমন মানুষ হতেই পারে না। মানুষ যখন বলে আমার কোনো বক্তব্য নেই, সে মিথ্যে বলে; কখনো কখনো তা একটি কূটনৈতিক মিথ্যা।

একটি ছেলে ভীরু হাত তোলে।

স্যার, কূটনৈতিক মানে কী ?

খবর কাগজ পড় না ?

ছেলেটি লজ্জিত হয়ে চোখ নামায়।

কূটনৈতিক শব্দটি আগে কখনো শোন নি ?

চারদিক থেকে একই সঙ্গে কয়েকটি ছেলে বলে ওঠে, শুনেছি, স্যার।

আসলে এইটুকু সময় কূটনৈতিকভাবেই আদায় করে নেয় জয়নাল। উত্তর দেবার জন্যে, উত্তরটা ভেবে নেবার জন্যে তার একটু সময় দরকার ছিল।

কূটনেতিক মানে হচ্ছে কোনো কাজ উদ্ধারের জন্যে কৌশল অবলম্বন করা .

স্যার।

চশমা চোখে, খুব ফর্সা, চ্যাপটা চেহারার একটি ছেলে উৎসাহের সঙ্গে জয়নালের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

স্যার হযরত মোহাম্মদ যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে যান, তাকে কূটনৈতিক বলা যায়, স্যার ?

জয়নাল ভ্রু কুঁচকে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে ফেলে বলে, আজ আমি পড়াচ্ছি না।

জয়নালের বিষয়, ইসলামের ইতিহাস।

ছেলেরা বিমর্ষ কী খুশি হয়, বোঝা যায় না।

জয়নাল জানতে চায়, এর আগেও কি এখানে এরকম হয়েছে ?

স্তব্ধতা।

তোমরা সবাই তো এখানকারই ছেলে ?

হ্যাঁ, স্যার।

আগে শুনেছ ?

আগে কখনো শুনি নি, স্যার।

জয়নাল বিশেষভাবে তাকায় সেই মেয়েটির দিকে যাকে তার সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল। মেয়েটিও তারই দিকে তাকিয়ে আছে আবার সেই বড় বড় চোখ মেলে।

তুমি কখনো শুনেছ ?

চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি মাথা নিচু করে ফেলে। আবারো সে মাথা নেড়েই উত্তর দেয়— না, সে শোনে নি। মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু জয়নাল জিজ্ঞেস করে না। পরদিন রোল ডাকবার সময় দেখে নেবে।

জয়নাল ঐ সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাছে অজ্ঞাত এক কারণে নতুন উৎসাহ বোধ করে। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের সমুখে এসে টেবিলে পেছন ঠেকিয়ে, বিবেকানন্দ-র মত বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ায়।

গোড়াতেই আমি জিগ্যেস করেছিলাম, ঘটনাটি শুনে তোমাদের কী মনে হয় ?

কেউই বুঝতে পারে না এর উত্তর কী দেয়া যেতে পারে। তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এক প্রকার অপ্রতিভ দেখায় প্রত্যেককে।

আচ্ছা তোমরা জন্তুটির ডাক শুনেছ ?

স্তব্ধতা।

কেউ শুনেছে ?

ইতস্তত করে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ায়।

স্যার, আমার মা শুনেছেন।

জন্তুটির ডাক ?

হ্যাঁ, স্যার।

কী রকম ?

কী রকম স্যার ? মা বললেন, বাচ্চা ছেলের মত হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তারপর বুড়ো মানুষের মত কিছুক্ষণ খকখক করে কাশে। তারপর সব চুপ হয়ে যায়।

বর্ণনা শুনে সুন্দরী মেয়েটির হাসি পায় হয়ত। সে মুখ নিচু করে খাতায় পেনসিল দিয়ে

দাগ কাটতে কাটতে হাসি সামলায়।

তখন তাকে আরো সুন্দর দেখায়।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্লাশের উপর এনে জয়নাল লক্ষ করে, আর সব ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে এখন গভীর আতংক খেলা করছে। অজানা জন্তুটির ডাকের বর্ণনা শুনে তারা নিঃসঙ্গ অমাবস্যার ভেতরে চলে গিয়েছে। সদ্য চুনকাম করা দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। বেঞ্চগুলো অন্ধকারে হামা দিয়ে আছে।

জয়নালের নাকে মুহূর্তের জন্যে পচা মাংসের ঘ্রাণ এসে ঝাপটা দিয়ে যায়। মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করে ওঠে তার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে।

বাইরে কী একটা সরসর শব্দ হতেই ক্লাশের সবকটি ছেলেমেয়ে চমকে সেদিকে তাকায়। ক্লাশঘরের বাইরেই ধানের ক্ষেত শুরু হয়েছে। সেই ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যেতে দেখা যায়। জয়নালের মনে পড়ে যায়— এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ? কিন্তু সে অনুভব করে, ঐ ঢেউ কোনো জন্তুতাড়িত হতে পারে। অন্তত ছেলেরা সেই সম্ভাবনাই অধিকতর বাস্তব বলে ধরে নেয়।

জয়নাল অবাক হয়ে যায়। সে নিজেইবা কী করে ঢেউয়ের সঙ্গে জন্তুটিকে যুক্ত করে ফেলল ? কেন তার মনে হলো, এক মুহূর্তের জন্যে হলেও, ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এইমাত্র দৌড়ে গেল জন্তুটি যে গত রাতে কিষান বৌয়ের শিশুটিকে ফেড়ে ফেলেছে ?

সে আরো লক্ষ করে, পচা মাংসের ঘ্রাণটির অপেক্ষাই সে করছিল, কখন তা ফিরে আসে। এখন যে ফিরে এসেছে, তার ভেতরে এক প্রকার স্বস্তি বোধ হচ্ছে।

গোটা ক্লাশঘর এখন শিশুর কান্না এবং তার পরে বুড়ো মানুষের খকখক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে যেন।

জয়নাল বলে, বাতাস। ধানের খেত দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হেসে উঠে লঘু করে দিতে চায় সে ক্লাশঘরের ভীতি। কিন্তু সফল হয় না। আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে জন্তুটি শিশুর মত কেঁদে ওঠে, আসলে হয়ত তোমার মা কোনো শিশুর কান্নাই শুনছিলেন ?

যে বলেছিল সে প্রতিবাদ করবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দেয় জয়নাল। ছেলেটির চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। আবার একই সঙ্গে এক ধরনের দৃঢ়তা লক্ষ করা যায়— যে দৃঢ়তা মায়ের সম্মান রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞায় যুগে যুগে সন্তানদের চোখে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

আর সেই শিশু কেঁদে ওঠার পরে পরেই হয়ত কোনো বুড়ো খকখক করে কেশে উঠেছিল ? এরকমটা হতে পারে নাকি ? তোমরা লক্ষ করে দেখবে, বুড়ো যারা কাশি রোগে ভোগে তারা অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেদের গলার ভেতরে হঠাৎ খুশ খুশ অনুভব করে। তখন তাদের গলা পরিষ্কার করে নিতে হয়। আমার তো মনে হয়, তোমার মা কোনো শিশুকেই কেঁদে উঠতে শুনেছিলেন, তারপরে কোনো বুড়ো কেশে উঠেছিল, কী বল ?

ছেলেটি পরাস্ত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। জয়নাল অনুভব করতে পারে, যুক্তির কাছে তার এ পরাজয় নয়। গুছিয়ে কথা বলবার প্রতিভা তার নেই— এটা অনুভব করেই ছাত্রটি এখন পরাস্ত বোধ করে।

জয়নাল লক্ষ করে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আফজাল সাহেব কিছুক্ষণের জন্যে

দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন সিগারেট ধরাবে, কিন্তু সন্দেহ করা যায় ক্লাশের কথোপকথন শোনবার জন্যেই সে দাঁড়িয়েছে।

আর কেউ কিছু বলবে ? আর কেউ জন্তুটির ডাক শুনেছে বলে জান ?

শুনে থাকলেও কেউ আর এগিয়ে আসে না। স্তব্ধতা খণ্ডিত হয় না। বারান্দা থেকে আফজাল সাহেবও চলে যায়। না, তার দেশলাইতে একটি কাঠিও অবশিষ্ট নেই। বাক্সটা সে মাঠের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়।

সুন্দরী মেয়েটি জিজ্ঞাসু এবং প্রত্যাশী চোখে জয়নালের দিকে তাকিয়ে থাকে। এবার অনেকক্ষণ সে চোখ ফেলে রাখে, এমনকি জয়নালের চোখে চোখ পড়বার পরেও।

১১

এখন এক ঘণ্টা ছুটি তার। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের বাসা থেকে ভাত এসে গেছে। ঢাকা দেয়া আছে তার টেবিলের ওপর। জয়নাল একবার ঢাকা সরিয়ে দেখে নেয়। আবার সেই পাট শাক দেখে তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। পিরীচে রাখা প্রায় স্বচ্ছ ছোট ছোট মাছের চচ্চড়ি, প্লাস্টিকের তৈরি বলে মনে হয়। চারিদিকে সে আবার পচনের গাঢ় ঘ্রাণ পায়। তাড়াতাড়ি খাবার ঢাকা দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে সে।

হাতের কাছেই রেডিও-কর্ডার। ক্যাসেট পরানোই ছিল। চালাতে গিয়ে দেখে ব্যাটারি প্রায় বসে গিয়েছে। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত গান বিকট এক ধীরতায় বেজে ওঠে।

মাসুদা, সেই মেয়েটি, তার মুখ খানখান হয়ে যায় তার স্মৃতির ভেতরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনুষ্ঠানে মাসুদাকে সে প্রথম নিঃশব্দে নিজের করে নিয়েছিল, সেখানে এই গানটি গেয়েছিল ফাহমিদা খাতুন।

গান শিখলে কেমন হয় ? গান শেখার বয়স তার আছে কি এখনো ? ঈর্ষার সঙ্গে সে ভূধর সরখেলের দিকে তাকায়। প্রতিদিনের ভোর বেলায় সরখেলের গুনগুন সে এখন অস্পষ্ট শুনতে পায় কানে।

হঠাৎ ঠুন একটা শব্দ হয় কোথাও। প্রথম উপেক্ষা করে সে। তারপর চোখ ফিরিয়ে দ্যাখে, জানালার ভেতরে হাত গলিয়ে কে তার খাবার টেনে নিচ্ছে। লাফ দিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে ইস্টিশানের ভিখিরি-যুবতীকে। কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধরা পড়েও পালিয়ে যায় না। অপ্রত্যাশিত রকমে শাদা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

১২

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব তাঁর ঘরে বসে হাপুস হুপুস করে একটা আম খাচ্ছিলেন। জয়নালকে দেখেই তিনি টাকরায় সুখ-শব্দ তুলে বলেন, খাবেন ?

জয়নাল একটু হেসে নীরবে মাথা নাড়ে। একটু আগে সব ভাত সে যুবতী-ভিখিরিকে দিয়ে দিয়েছে। খিদে যা পেয়েছিল তা উবে গিয়েছিল যুবতীর সাক্ষাতমাত্র। এখন আমের গাঢ়

হলুদ রস এবং প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কনুইয়ে বসা নীল একটা মাছি দেখে তার ভেতরটা ঘুলিয়ে ওঠে। এরকম বোধ হয়— থকথকে পচা পাঁকের ভেতরে কেউ তাকে ক্রমাগত ঠেসে ধরছে।

রক্ষে এই, বাইরে চনমনে রোদ্দুর। সেদিকে তাকিয়ে জীবনের প্রতি এক ধরনের মমতা হয়। প্রত্যয় হয়, পচনশীলতাও শেষ সত্য নয়।

বাড়ির আম। একটা ছেলে নিয়ে এসেছিল।

জয়নাল এবার দেখতে পায়, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের চেয়ারের পাশে এক ঝুড়ি আম রাখা। হাত চেটেপুটে আঁটিটা তিনি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। জয়নালের কৌতূহল হয়, কারো গায়ে পড়ল কিনা। আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে 'এহ্' জাতীয় একটা শব্দ করে ওঠেন, তারপর বেয়ারাকে হাঁক দিতে দিতে বাইরে চলে যান। বেয়ারা কলসি থেকে পানি ঢেলে দেয়, তিনি অনেকটা পানি খরচ করে হাত ধুয়ে নেন। রুমালের অভাবে শেরোয়ানির ভেতর থেকে পাঞ্জাবির খুঁট বের করে কনুই পর্যন্ত মুছে নেন। খুঁট মুখ পর্যন্ত পৌঁছোয় না বলে ঠোঁট তাঁর ভিজে থাকে।

বেয়ারাকে বলেন, চারটে করে আম সব প্রফেসর সাহেবকে বাসায় দিয়ে বাকিগুলো আমার বাসায় দিয়ে আসবি।

ঘরের ভেতরে এসে তাঁর খেয়াল হয়, চেয়ারের পিঠে তোয়ালে ছিল। তিনি এখন খপ করে তোয়ালে নিয়ে পরিষ্কার করে মুখ মুছে আয়েস করে বসেন। বলেন, রংপুরের আম খুব ভাল হয় না। এটা বেশ মিষ্টি ছিল। আঁশও নেই। দুধ দিয়ে খাবার মত। অবশ্য দুধের যা দাম আজকাল। ঢাকায় কি রাজশাহীর আম উঠেছে?

ভ্রু কুঞ্চিত করে জয়নাল।

ঠিক বলতে পারছি না।

আমার কী মনে হয় জানেন?

জয়নাল উৎসুক চোখে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে তাকায়। আম সম্পর্কে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশায় সে কৌতুক অনুভব করে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট পাঠানো দরকার। কী বলেন?

জয়নাল একটা সিগারেট বের করে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দেয়, কিন্তু তিনি নেন না। আসলে তিনি খান না।

সিগারেট ধরিয়ে জয়নাল বলে, রংপুরের আম হয়ত ভালও আছে, কিন্তু লিখবেন কী? আর লিখলেই বা কোন কাগজে ছাপবে বুঝতে পারছি না।

আরে না না। সে কথা নয়। এই যে বাচ্চাটার লাশ পাওয়া গেল, অচেনা জন্তু, সেই জন্তুটার একটা খবর পাঠানো দরকার কাগজে। পাঠালেই ওরা ছাপবে। রোজ এরকম খবর বেরুচ্ছে। দেখেন নি? অমুক জায়গায় অজানা জন্তুর আবির্ভাব? আতংকে জনসাধারণ ঘরের বার হচ্ছে না? মানে, সন্ধের পর।

জয়নাল চুপ করে থাকে।

আমি অবশ্য একটা খবর লিখে রেখেছি। দেখবেন নাকি?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ড্রয়ার খুলে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা ফুলস্কেপ কাগজ বের করে তার হাতে দেন। 'রাজারহাটে অজানা জন্তুর নির্মম শিকার'— শিরোনামটি লাল কালিতে দাগ দেয়া।

খবরটা পড়ে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে জয়নাল বলে, ভালই তো হয়েছে।

সখেদে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যোগ করেন, একটা ছবি তোলাতে পারলে খুব ভাল হতো। কী বলেন ?

জন্তুটাকেতো কেউ দেখেই নি।

না, না, জন্তুর নয়। ঐ বাচ্চাটার।

সত্যি, বাচ্চাটার ঘটনা খুব দুঃখজনক। দেখলাম, ছাত্রদের অনেকে বিশ্বাসও করে। গ্রামে থাকলে যা হয়।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

জানেন, চোখ আধো বুঁজে তিনি এবার বলে চলেন, পৃথিবীতে বহু কিছু আছে যা আমরা জানি না। আপনাদের বিজ্ঞানীরা ক'টা প্রাণীর হদিস রাখে ? বরং আমাদের সাধারণ মানুষেরা খোঁজ খবর রাখে অনেক বেশি। এসব নিয়ে রীতিমত গবেষণা হওয়া দরকার। অবশ্য সে গবেষণারও অনেক অসুবিধা। এখন, গারো পাহাড়ে আপনি যাবেন কী করে ? ইনডিয়া পারমিশন দেবে না। ইনডিয়া হয়ত মনে করে নেবে আপনি অন্য কোনো মতলব নিয়ে যেতে চাইছেন। আমার বিশ্বাস জন্তুটির আস্তানা আসলে গারো পাহাড়ে। কোনো গতিকে দল ছাড়া হয়ে এখানে এসে পড়েছে। পরিষ্কার দিনে পুব দিকে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখবেন, স্পষ্ট গারো পাহাড় দেখা যায়। বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি প্রথমে যখন এসেছিলাম, সন্ধের ঠিক আগে, মগরেবের আজানের জন্যে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ মনে হলো দূরে পাহাড়ের গায়ে কী যেন সার বেঁধে চলেছে। আমি মনে করি চোখের ভুল। পরে সরখেলবাবুর কাছে শুনলাম, হাতি। হ্যাঁ, সাহেব, হাতির পাল, পাহাড় বেয়ে নেমে যাচ্ছে। এখন অবশ্য চোখের জোর কমে গেছে, চশমা ছাড়া এই আপনি যে এত কাছে আপনাকেও ভাল দেখতে পাই না। তার জন্যে দুঃখ করি না। বয়স অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে গেলেও অনেক কিছু দিয়েও যায়। আপনার বয়স হলে স্মরণ করবেন, আমি একদিন বলেছিলাম।

কথার খেই হারিয়ে হঠাৎ বড় অপ্রতিভ হয়ে যান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। হয়ত অপেক্ষা করেন জয়নাল কিছু একটা উত্থাপন করবে, তখন তাঁর মনে পড়বে কী বলছিলেন। কিন্তু জয়নালও চুপ করে থাকে।

অচিরে মনে পড়ে যেতেই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব শুরু করেন, কী জানেন, শহরে যাঁরা আছেন, তাঁরা মনে করেন তাঁরাই সব জাননেওয়ালা। এই যে জন্তুটা, শিশুর মত কাঁদে, আবার বুড়ো মানুষের মত খকখক করে, নতুন একটা প্রাণী হতে পারে যার খবর হয়ত বৈজ্ঞানিকেরা রাখেনই না। ধরা গেলে হয়ত দেখবেন চারদিকে ভীষণ একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। তখন আপনি যে প্রথম খবরটা দিয়েছিলেন, সে কথা কেউ মনেও রাখবে না। কী বলেন ?

জয়নাল বলে, কিন্তু আপনি কোত্থেকে শুনলেন, জন্তুটা শিশুর মত কাঁদে বুড়োর মত কাশে ?

কেন ? সবাই বলছিল।

আমার ক্লাশেও একটা ছেলে বলছিল তার মা নাকি শুনেছে।

আমি শুনলাম আমার বাসার চাকরের কাছ থেকে।

সে নিজে শুনেছে ?

ভ্রু কুঞ্চিত করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকিয়ে রইলেন খানিক।

না, তাকে জিগ্যেস করি নি।

জয়নাল যোগ না করে পারে না, সে নিজে শুনে থাকলে তো বলতে হয়, জন্তুটা আপনার বাসার কাছ দিয়ে ঘুরে গেছে।

মনে হয় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব শিউরে উঠলেন একথা শুনে।

না, না, এদিকটা তো মানুষজনের খুব বাস। এদিকে আসবে না।

কেন আসবে না ?

এর কোনো সদুত্তর তাঁর মাথায় আসে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ তিনি অচিরেই তুলে আনেন।

আপনার লাগছে কেমন ?

প্রসঙ্গটা ঠিক সনাক্ত করতে পারে না জয়নাল।

ভয় পাবার মত এখনো কিছু বোধ করছি না, এই পর্যন্ত।

ভয় ?

মানে ঐ জন্তুটাকে ভয়।

আহা সে কথা নয়। এখানে আপনার লাগছে কেমন ? নতুন এসেছেন, মানিয়ে নিতে পারছেন তো ?— তাই জিগ্যেস করছি।

দৃশ্যতই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বিরক্ত দেখা যায়। তাঁকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। বারবার প্রসঙ্গ ভুল বুঝেছে জয়নাল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে সে অন্যমনস্ক অর্থাৎ এখানে তার মন বসছে না।

অপ্রস্তুত হয়ে জয়নাল উত্তর দেয়, ভালই তো লাগছে, বেশ লাগছে।

সময় লাগবে, কিছুটা সময় লাগবে। তারপর দু'দিন পরেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। এ জায়গা ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আরে সাহেব, আমিও ঢাকায় থাকতাম, ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। কোনোদিন কি ভেবেছি অজ পাড়া গাঁয়ে এসে বাস করতে হবে ? বাস তো করছি। খারাপ লাগছে না। তবে হ্যাঁ, মাঝেমাঝে মন খারাপ যে হয় না তা নয়। বিশেষ করে যখন ঢাকা যাই, তখন পুরনো বন্ধুবান্ধব যারা আছে তাদের সঙ্গে দেখা হলে মনে হয়, একশো বার মনে হয়, ওরা বেশ আছে। হ্যাঁ, তবে আপনাকে এও বলব, এখানে যে সম্মান পাবেন, আপনার ঐ ঢাকা শহরে, সভরিন ইনডিপেনডেন্ট কান্ট্রির ক্যাপিটালে তার আধলাটিও পাবেন না। অতবড় শহরে কে কার তোয়াক্কা করে বলুন ? কোথাকার কোন কলেজের প্রফেসর, তার কী দাম আছে ? কিন্তু এখানে আপনি দশজনের একজন নন, দশজনের মাথা। হ্যাঁ, লোকে আপনাকে মাথায় করে রাখবে। আচ্ছা, ঢাকায় আপনার ক্লাশে কোনো ছাত্রীটাত্রী ছিল না ?

প্রথমে একটু হকচকিয়ে যায় সে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবে প্রাঞ্জল হবার চেষ্টা করেন।

মানে ক্লাশফ্রেন্ড।

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ছিল বৈকি।

ক'জন ?

জয়নালকে কষ্ট করে মনে করতে হয় না। সংখ্যা তার জানাই আছে। হৃদয়ে যাকে বলে আঁকা হয়ে আছে।

এগারজন।

এগারজন ? বলেন কী সাহেব ? বেশ তোফা ছিলেন বলুন।

বছরের পর বছর একই ক্লাশে থেকেও কারো সঙ্গে যে তার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত হয় নি সেই বিষাদ হঠাৎ জয়নালকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার স্মরণ হয়, রেডিও-কর্ডারের ব্যাটারি কিনতে হবে। এখানে ব্যাটারি পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না তার। সেরকম কোনো দোকান এ তল্লাটে এখনো তার চোখে পড়ে নি। একবার জিগ্যেস করবে নাকি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ?

তার আগেই তিনি সমুখে ঝুঁকে গলা নিচু করে প্রশ্ন করেন, ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল নাকি ? আপনার ক্লাশফ্রেন্ডদের ভেতরে ?

না, না।

আমাদের সময়ে জানেন, ক্লাশে ছিল একটিমাত্র মেয়ে। তাও বিবাহিতা। বলে খ্যা খ্যা করে হাসতে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। তারপর যোগ করেন, মেয়েটি অবশ্য দেখতে ভাল ছিল।

তাই নাকি ?

তবে সেবার ঢাকা যাবার পথে হঠাৎ ফুলছড়ির ইসটিমারে দেখা। বুড়ি হয়ে গেছে। দেখে মনেই হয় না এক সময়ে কী ছিল।

আপনি পাশ করেছেন কবে ?

ফিফটি ফাইভ। আপনি তখন বোধহয় স্কুলে।

চুপ করে থাকে জয়নাল। জানালার ভেতর দিয়ে গলগল করে বয়ে আসা উৎকট ক্ষতের দুর্গন্ধ এখন স্বাভাবিক বলে বোধ হতে থাকে তার। সে ঈষৎ অবাক হয়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পেছন ছাড়েন না।

কোন ক্লাশে পড়েন তখন ?

ক্লাশ ওয়ানে।

জয়নালের মনের ভেতরে একটি প্রশ্ন বুড়বুড় কাটে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কি বাতাসে এই গাঢ় দুর্গন্ধ টের পান ? সে যেখানে ঠোঁট বন্ধ রেখেও বিবমিষার হাত থেকে নিস্তার পায় না, তিনি সেখানে 'ক্লাশ ওয়ানে' শুনে এতক্ষণ হাঁ করে আছেন কী করে ?

হঠাৎ প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে ওঠেন, এগারজন মেয়ে ছিল ? কী আশ্চর্য! ভাবাই যায় না। এখন শুনি ইউনিভার্সিটির অর্ধেকই মেয়ে ?

তা হবে।

শুনি ছেলেমেয়ে খুব মেলামেশা হয় ?

ঐ আর কী।

বলুন, বলুন, শুনি। শুনতেও ভাল লাগে। তবে দুঃখ কী জানেন ? শুনি, আজকাল নাকি মরালিটি বলতে কিছু নেই। যে যার সঙ্গে খুশি কথা বলছে, হাত ধরছে, ঢলাঢলি করছে। সেদিন একজন বললেন, ঢাকায় আমার এক আত্মীয়, তিনি বললেন— আর্টস বিল্ডিংয়ের ছাদে নাকি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্যাকেট পাওয়া গেছে। সত্যি নাকি ?

কই, শুনি নি তো।

সত্যি বলেই মনে হলো। আমার সে আত্মীয় মিথ্যে বলার লোক নন। তাঁর কাছে যা শুনলাম, শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। এই আমাদের তরুণ সমাজ ? এদের ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ ? তা কী বলেন, আপনার ঘনিষ্ঠ-ফনিস্ট কেউ ছিল না ?

জয়নাল হেসে মাথা নাড়ে নিঃশব্দে।

আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি চরিত্রবান লোক। আর এইরকম প্রফেসরই আমার দরকার। আমি এখানে শুধু কলেজের পড়া পড়িয়েই দায়িত্ব শেষ, বিশ্বাস করি না। ছেলেমেয়েরা কলেজে আসে জ্ঞান শিক্ষা করতে, চরিত্র গঠন করতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে। আপনাকে দিয়ে হবে। আপনার ওপর আমি অনেক আশা করে আছি। পাড়াগাঁ বলে এখন হয়ত খারাপ লাগছে, দু'দিন বাদে দেখবেন এখান থেকে সরতে মন চাইছে না।

জয়নাল উঠে দাঁড়ায়।

কোনো কথা ছিল ?

না।

ক্লাশ নেই ?

টিফিনের পর।

ঘরে যাচ্ছেন ? তাহলে দুটো আম হাতে করেই নিয়ে যান।

কলেজের শেষ প্রান্তে তার নিজের থাকবার কামরার কাছে এসে দ্যাখে যুবতী-ভিখিরি ভাত শেষ করে মাথার উকুন বাছছে। জয়নাল আম দুটো তাকে দিয়ে দেয়। আম হাতে নিয়ে যুবতী অশ্লীল একটা ভঙ্গি করতেই সে ঘরের ভেতরে গিয়ে ওয়াক করে ওঠে। পচা গন্ধটা তার গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চায় না।

১৩

এগারজন মেয়ের প্রত্যেকের মুখ আলাদা করে জয়নাল এখনো মনে করতে পারে।

এগারজনের ভেতরে দু'জন বিবাহিতা।

চারজন ক্লাশেরই চারজন সহপাঠীর সঙ্গে প্রেম করত।

একজনের প্রেম ছিল সায়েন্স বিল্ডিংয়ে।

একজন আসত বোরকা পরে, মাথার অংশ খোলা থাকত তার।

একজন ছিল অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী।

একজনের মুখে বসন্তের দাগ।

একজন ছিল সবচেয়ে সুন্দরী। অথচ সবচেয়ে শীতল। মনে হতো বরফ দিয়ে আল্লা তাকে তৈরি করেছেন। সে ক্লাশে ঢুকত সবার শেষে, বেরুত সবার আগে। কেউ তাকে কখনো কথা বলতে শোনে নি। শেষ বর্ষে মেয়েটি একদিন ক্লাশে আসে না। পরে শোনা যায়, সে আত্মহত্যা করেছে। মেয়েটির নাম ছিল মাসুদা। মাসুদার কথা মনে হলেই ফাহমিদার গান মনে পড়ে যায়। ছেলেমেয়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গান শুনছিল। আর সে, জয়নাল, ভিড়ের ভেতরে হঠাৎ মাসুদাকে আবিষ্কার করে, বহুদূর থেকে তার দিকে তাকিয়েছিল। একটা গানের ভেতরে একটি জীবন অতিবাহিত হয়েছিল।

১৪

টিফিন পিরিয়ডে বাজারের চায়ের দোকানে ছেলেরা গিয়ে ভিড় করে।

চা দেখি, দু'কাপ চা।

এই, গজা দাও এক প্লেট।

এদিকে, কলা একটা এদিকে :

স্যারকে মিথ্যে কথা বলেছিস। তোর মা মোটেই শোনে নি।

কক্ষনো না।

শুনেছে ?

হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনেছে। ঠিক সন্ধের সময়। রান্নাঘরের পেছনে। বাচ্চার কান্না। তারপর বুড়ো মানুষের মত কাশি। রান্নাঘরের পেছনে ঝোপ। বাচ্চা আর বুড়ো আসবে কোত্থেকে ?— জন্তুটা যদি না হয় ?

তোর মা তখন কী করল ?

চায়ে চিনি দেখি ভাই।

আমি বাড়ি ছিলাম না। এসে শুনলাম।

এহ্, এ কলার আধখানাই পচা।

স্যার কিন্তু তোর কথা মোটেই বিশ্বাস করেন নি।

আবার তর্ক করছিল।

ঢাকা থেকে এসেছে তো ? ঢাকার মত সব মনে করে।

মনে হয় স্যারটা ভাল।

খুব স্মার্ট।

আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলে।

সবচেয়ে শয়তান আফজাল সাহেব। একটু ইংরেজি জানে বলে ফুটানি কত। গলায় আবার টাই।

এখনো বিয়ে করে নি।

কে ? কে বিয়ে করে নি ?

জয়নাল স্যার।

প্রেম করছে বোধহয়।

কী করে বুঝলি ?

ঢাকায় সকলেই প্রেম করে, জানিস না ?

যা! হতেই পারে না।

দেখিস ঢাকায় গিয়ে।

এই ছাত্রটি কয়েকবার ঢাকায় গিয়েছিল। তাই তার কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারে না। আড্ডায় ঢাকা সম্পর্কে তার কথাই শেষ কথা।

এ কি তোর রাজারহাটের মেয়ে পেয়েছিস ? রংপুর পর্যন্ত যাদের দৌড়। ঢাকায় আজকাল সব মেয়ে ভীষণ ফরোয়ার্ড।

ছাত্রটির মুখের দিকে সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কারো কারো ঢাকা বেড়িয়ে আসবার বাসনা হয়। ইস্টিশানের এই পথ, বাঁশবন, পাটের গুদাম— কেমন অবাস্তব বলে বোধ হতে থাকে কিছুক্ষণের জন্যে।

ছাত্রটি আরো বলে, ঢাকায় মেয়েরাই ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করে। ঢাকার ছেলেগুলোই মেয়ে। রমনা পার্কে গিয়ে দেখবি কলেজের মেয়েরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা ছেলেদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এক ধরনের তৃপ্তি হয় শ্রোতাদের। না, ঢাকার চেয়ে তাহলে ভাল আছে তারা। আর যাই হোক, মেয়েলিপনা রাজারহাটের ছেলেদের নেই।

জয়নাল স্যারকে দেখলেই বোঝা যায়।

কেমন মেয়েলি, না ?

একজন ভীরু প্রতিবাদ করে ওঠে।

ওটা হয়ত স্টাইল।

রাখ তোর স্টাইল।

দেখিস না, বাম হাতের কড়ে আঙুলে নোখপালিশ ?

সকলেরই মনে পড়ে যায়, প্রথম দিনেই তারা জয়নালের নোখে রঙ দেখেছে। এরপর কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না।

১৫

মাসুদা আত্মহত্যা করেছিল কেন ? কী তার দুঃখ ছিল ? কোন পরিবারের মেয়ে ছিল সে ? ভাই ছিল ? বোন ছিল ? দুঃসহ হয়েছিল কোন দুঃখ তার ? কোন সড়কে সে থাকত ? তার বাড়ির রঙ কী ছিল ?

স্যার।

বেয়ারা চিঠি দিয়ে যায়। ঢাকা থেকে পোস্টকার্ড। পাঁচ বছর যে বাড়িতে থেকে সে পড়াশোনা করেছে তারা চিঠি দিয়েছে—

এদিকে তোমার মালামাল সমুদয় গুছাইয়া রাখিয়াছি। আশা করি এবার ঢাকা আসিলে তুমি লইয়া যাইবা। অথবা ইহার কী বন্দোবস্ত করিব সত্ত্বর জানাইবা। রেহানার হাম হইয়াছে। জিনিসপত্রের দাম দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ অবস্থায় আল্লাই জানেন কী করিয়া সংসার চলিবে। আশা করি রাজারহাটে তোমার কলেজ ভালই চলিতেছে। অন্তত সেখানে খাঁটি দুধ ঘি পাইতেছ।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় জয়নাল।

তার চোখে পড়ে ক্লাশের সেই মেয়েটি মাথা নিচু করে বুকের ওপর বই চেপে ধরে হেঁটে চলেছে। একা একা। মাঠের ভেতর দিয়ে, বাবলা গাছের নিচ দিয়ে, ধুলো ওড়া সড়কের দিকে সে চলেছে।

বাড়ি চলে যাচ্ছে ? ক্লাশ নেই ?

জয়নাল হতাশ বোধ করে।

উজ্জ্বল রোদের ভেতরে তার নীলশাড়ি অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

মাসুদা কোন দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল ?

১৬

সে একটি সংসার রচনা করে।

মাসুদার সঙ্গে সংসার। তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা আত্মহত্যার চেয়ে নিশ্চয়ই দুঃখের কিছু নয়। ধরা যাক, মাসুদার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল। সেই ভালবাসা পরিণত হয়েছে বিবাহে।

না, নীলশাড়ি নয়। মাসুদাকে নীলশাড়িতে সে দেখতে চায় না। বারবার শাদা রঙ তার চোখের ভেতরে ঘুরে ফিরে আসে। শাদায় যতখানি মানায় মাসুদাকে আর কোনো রঙে মোটেই নয়। তাও পাড়হীন শাদাশাড়ি।

অনেকদূরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মাসুদা। অনেকদূর থেকে জয়নাল তাকে অনিমেষ চোখে এখন দ্যাখে। তারপর যখন সে অনুভব করে মাসুদা তার কাছে আসবে না, তাকেই যেতে হবে, সে এগোয়। কিন্তু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। মাসুদার সঙ্গে সেই দূরত্ব অমোচ্য থেকে যায়। ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় তাকে। সন্তর্পণে, খুব একাগ্র হয়ে, মাসুদাকে ফাঁকি দিয়ে তাকে এখন এগোতে হয়। এখন একটু একটু করে সেই দূরত্ব কমে আসতে থাকে।

সে কাছে আসে।

কিন্তু মাসুদার কণ্ঠস্বর সে শুনতে পায় না, অথচ মনে হয় মাসুদা তাকে ছোট ছোট শব্দে কী একটা বলে চলেছে।

আসলে সে জানে না, মানুষের কল্পনারও সীমাবদ্ধতা আছে। যতই হোক না কেন কল্পনা বাস্তবের সুতো ছিঁড়ে ধাবমান হতে পারে না।

বোবা একটি মানুষের সঙ্গে সে এখন নিজেকে সংসার করতে দেখতে পায়। জয়নাল সে

সংসার ঢাকায় কল্পনা করে। কলেজের বাইরে বিশাল বাবলা গাছটিকে রমনা পার্কের বলে মনে হয় তার।

ঢাকা এখনো তার রক্তের ভেতর থেকে ধৌত হয়ে যায় নি। তার চোখের সমুখে জ্বলজ্বল করে ওঠে নিউমার্কেটের ভিড়, সিনেমার পোস্টার, ইউনিভার্সিটির লম্বা করিডর আর রমনার গাছপালা। সেখানে মাংসের পচন নেই। কোথাও কোনো ক্ষত নেই।

জয়নাল এখন গাছপালার ভেতর দিয়ে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা বসে আছে, চিনেবাদাম ভাঙ্গছে, ফিসফিস করে কথা বলছে।

কী কথা বলে ওরা ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে কথাটা বললেন, সত্যি ? ইউনিভার্সিটির ছাদে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্যাকেট পাওয়া গেছে। কে ব্যবহার করেছে ? কখন ? কোথায় ? ছাদেই ? তারপর তারা আবার ক্লাশে এসেছিল কি ?

জয়নালের চোখের ওপর দিয়ে ক্লাশের এগারটি মেয়ের চেহারা অতিদ্রুত পার হয়ে যায়। ক্লাশের বাইরেও অন্য ক্লাশের কোনো কোনো মেয়ের চেহারা তার মনে পড়ে যায়। বিছানায় সে উঠে বসে। দু'হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে নিজের চোখ টিপে ধরে সে।

কোন মেয়েটির সঙ্গে কোন ছেলে ?

তার বড় ইচ্ছে ছিল, পাশ করে, ইউনিভার্সিটির কাউকে বিয়ে করে ঢাকায় চাকরি করে। সাজানো একটা বাসা হয় তার। সে বাসায় নীল রঙের ময়ূরশোভিত জানালার পর্দা থাকে। ফিনফিনে রুমাল ঢাকা ট্রে করে চা আসে। টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়— 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।' নিজস্ব বাথরুম থাকে। বন্ধুরা সে বাসায় এসে ঈর্ষা করে। তার বৌয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। শোবার ঘরে বিছানার চাদর টানটান পাতা থাকে। চুলের ভিজে সুগন্ধ বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। দেশের বাড়িতে গেলে তার কৃতিত্ব এবং প্রতিষ্ঠার প্রশংসা হয়।

রাজারহাট কলেজে ছুটির ঘন্টা পড়ে যায়।

১৭

কালভার্টের ওপর আমগাছের ছায়ায় বসে আছেন করিম সাহেব। এখানকার ব্যাংকের ম্যানেজার। জয়নালকে আসতে দেখে উৎসুক চোখে তিনি তাকান। তারপর একগাল হেসে নীরবে একটু জায়গা ছেড়ে দেন।

বেশ লাগে বিকেলে এখানে বসে থাকতে।

হ্যাঁ, বেশ নিরিবিলি জায়গাটা।

সিগারেট চলে ?

সিগারেট ? দিন একটা।

দু'জনে সিগারেট ধরিয়ে, দূরে, মাঠের শেষ মাথায়, দেয়ালের মত ঘন গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ করিম সাহেব হেসে ফেলেন।

জানেন প্রফেসর সাহবে, যখন ছোট ছিলাম, ট্রেনে করে যেতাম আর মনে মনে ভাবতাম,

এ-কী ব্যাপার ? ট্রেন একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে চলেছে, চারদিকে কেবলি বন আর বন, কিছুতেই ফাঁকা জায়গা থেকে বেরোই না, বনও পেছন ছাড়ে না। বাবাকে একবার জিগ্যেস করে বেজায় ধমক খিয়েছিলাম।

জয়নাল কিছু বলে না। আসলে সে তখনো ঢাকার কথা ভাবছে। বরং ঢাকার কথা এই মুহূর্তে তার আরো বেশি করে মনে পড়ছে। স্টেডিয়ামে এখন কাদের খেলা হচ্ছে ?

গোল দেবার পর দর্শকদের সোল্লাস চিৎকার সে স্পষ্ট শুনতে পায়। পরমুর্হূতেই চারদিকের অখণ্ড নীরবতা সর সর করে তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। দিনের আলো পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করে গলিত সেই ঘ্রাণ এখন তীক্ষ্নতা হারিয়ে গোলাকার ধারণ করেছে।

করিম সাহেবকে সে জিগ্যেস করে, আচ্ছা, একটা গন্ধ কি আপনি পান ? কেমন একটা চাপ বাঁধা গন্ধ। খুব ঝাঁঝাল। আবার এখন ঠিক অতটা নয়।

করিম সাহেব অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। জয়নালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো উপলব্ধি করবার প্রাণপন চেষ্টা করেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে বলেন, চমকে দিয়েছিলেন, সাহেব। বাঘের গায়ে গন্ধ পাওয়া যায় বোঁটকা, ভাবলাম আপনি হয়ত জন্তুটার গন্ধই পাচ্ছেন। ও কিছু না। পাট পচাতে দিয়েছে চাষীরা · সেই গন্ধ।

এরা এখানে থাকে কী করে ?

অভ্যেস। আপনারও অভ্যেস হয়ে যাবে দেখবেন।

গন্ধটার যেন প্রাণ আছে। রাত নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন ঘরে ফিরে যায়, গন্ধটাও এখন সারাদিনের পর ফিরে যাচ্ছে।

করিম সাহেব হঠাৎ ঘোষণা করেন, আমার হয়ত শিগগিরই ট্রান্সফার হয়ে যাবে।

ঈর্ষা অনুভব করে জয়নাল। ছোট্ট একটা তীর তার শরীরে বিঁধে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

কোথায় ট্রান্সফার ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেন করিম সাহেব, আমি বলে দিয়েছি, হেড আপিস ছাড়া আমাকে যেন ট্রান্সফার করা না হয়। তাহলে আমি নেব না। আসলে কী জানেন, কিছু লোকের বিরাট এক ষড়যন্ত্র চলছে।

কী রকম ?

তারা চায় না এফিসিয়েন্ট লোকজন হেড আপিসে আসুক। মফস্বলে ফেলে রাখতে চায়। তাহলে তাদেরই সুবিধে, বুঝলেন না ? তাদের চড়চড় করে প্রমোশন হতে পারবে।

বলেন কী ?

যা বলছি, শুনে রাখুন। আমার তো কম দিন হয়ে গেল না ? আরে সাহেব, আমি সার্ভিসে ঢুকেছি আজ এগার বছর, সেই পাকিস্তান আমলে, তখন করাচির অফিসারদের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে কাজ পেতে হতো। বাঙালির ভেতরে খুব হাই কোয়ালিফিকেশন না থাকলে সে আমলে কাজ পাওয়া যেত না। আমি সেই তখনকার রিক্রুট। বলতে পারেন ওপরতলার ষড়যন্ত্র যদি নাই হবে, কেন আমি আজ মফস্বলে পড়ে আছি ? কারো চেয়ে কাজ আমি কম জানি ? তারপরে, প্রফেসর সাহেব, আরো এক কথা আছে।

করিম সাহেব নড়েচড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন।

সেটা আবার কী ?

খুঁটি।

খুঁটি ?

হ্যাঁ, শুনে রাখুন, খুঁটির জোর যাদের আছে তারাই ঢাকায় ভাল ভাল ফ্ল্যাট নিয়ে আছে, মোটর হাঁকাচ্ছে, ফাইভ ফিফটি ফুঁকছে। আমাদের তো খুঁটি নেই, অতএব আমরা মরে আছি। আপনিও আছেন, আমিও আছি। বুঝলেন সাহেব, দুনিয়াটা চলছেই খুঁটির জোরে।

উঠি উঠি করে জয়নাল।

আরে বসুন, বসুন। আপনিও বিদেশী, আমিও বিদেশী। এখানে তো কথা বলবার কেউ নেই। এখানে যারা আছে তারা সব কুয়োর ব্যাং। আপনি ঢাকার বলে হয় আপনাকে চৌদ্দ হাত দূরে রাখবে, আর নয়তো আপনাকে টেনে ঐ কুয়োর ভেতরে নামাবার চেষ্টা করবে। বসুন, বসুন।

অগত্যা বসতে হয় জয়নালকে। আসলে তার বসতে এখন ইচ্ছে করে না। তার কারণ এই নয় যে লোকটিকে সে অপছন্দ করে। সে বসতে চায় না কারণ তার কোনো কিছুই এই মুহূর্তে বাস্তব বলে বোধ হয় না। কেন তা বোধ হয় না, সে নিজেও জানে না। কেবলি মনে হয়, সে একটি অতল শূন্যতার ভেতর দিয়ে বায়ুতাড়িত হয়ে চলেছে।

নিন, আরেকটা সিগারেট নিন। কতদিন প্রফেসরি করছেন ?

এখানেই প্রথম।

ও হালে পাশ করেছেন ?

গত বছর।

বিয়ে তো করেন নি ?

না।

ভাবছেন ?

দেখি।

কোথাও কথা ঠিক হয়ে আছে ?

না, না।

কিন্তু যেভাবে জয়নাল না, না বলে তাতে শ্রোতার বোধ হয় বিপরীতটাই সত্যি। জয়নাল নিজেও সেটা অনুভব করে; ফেরাবার পথ দেখে না।

[redacted] প্রশ্ন করেন, ঢাকার মেয়ে ?

[redacted] কী ? কখনো কখনো এ রকম দু'টি চিহ্নের

[redacted] বেশ লাগে।

[redacted], ঢাকার মেয়ে হলে তো আপনাকে

তার কী রাজারহাটে মন বসবে ? না সে আসতে চাইবে ?

সমস্যা বৈকি।

এ ধরনের সমস্যা একটা হতে পারে; মাসুদার মুখ মনে পড়ে যায়, জয়নাল সমসার পটভূমিতে মাসুদাকে দাঁড় করিয়ে নীরবে তাকে দেখতে থাকে।

করিম সাহেব একটি সমাধান উপস্থিত করেন।

অবশ্য এখানেই যে বাকি জীবন আপনাকে থাকতে হবে তা নয়। ঢাকায় একটা চান্স পেয়েও যেতে পারেন। আপনার শ্বশুরের জোর থাকলে অনেককিছু করেও ফেলতে পারেন। তবে আমার কথা যদি শোনেন মাস্টারি ছেড়ে ভাল একটা ব্যবসা ট্যাবসা যদি ধরতে পারেন সুখে শান্তিতে রাজার হালে থাকতে পারবেন।

শুনতে মন্দ লাগে না জয়নালের। মনে মনে সে আশা করে, অবিরাম বলে যান করিম সাহেব। কিন্তু না, অচিরেই বক্তা একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে একেবারে চুপ করে যান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন কালভার্টের পাশে কাঁটাঝোপের দিকে।

শেষ পরীক্ষা পাশ করবার পর, চাকরি নয়, বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিল জয়নাল। চাকরির সন্ধান করাটাই ছিল তার কাছে বিভ্রম, আর বিবাহের স্বপ্নটাই বাস্তব।

আলো ঝলমলে তোরণ, তীব্র মদির ঘ্রাণযুক্ত পলান্ন, লালনীল কাগজের মোড়কে উপহারের স্তূপ, পথের ওপর অতিথিদের গাড়ির ভিড়, তার গায়ে শাদা শার্কস্কিনের শেরোয়ানি।

মাসুদা আত্মহত্যা করেছিল কেন ?

বাতাসে পচা মাংসের ফিকে ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগে। কবরের ভেতরে মানুষের দেহে পচন ধরে ক'দিন পরে ? এটা কি সত্যি, কোনো কোনো লাশ কখনোই পচে না ? এ সম্পর্কে করিম সাহেব কিছু জানেন কি ? না, দরকার নেই, প্রশ্ন শুনে তিনি যদি কিছু মনে করেন।

আলো মলিন হয়ে আসে।

হঠাৎ নড়েচড়ে ওঠেন করিম সাহেব।

জন্তুটার কথা সব শুনেছেন তো ?

মুহূর্তে মনে পড়ে যায় জয়নালের।

হ্যাঁ, শুনেছি।

আমার স্ত্রী তো ভয়ে অস্থির। আর ভয় হবেই বা না কেন ? দেখছেন তো চারদিকে জঙ্গল। কোথায় যে কী ঘাপটি মেরে আছে কে বলতে পারে ?

সভয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করেন করিম সাহেব।

তা ঠিক।

ভীষণ চঞ্চল দেখায় করিম সাহেবকে।

তার ওপর ঘরে আমার ছোট বাচ্চা। ফার্স্ট ইস্যু। শুনলাম, ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপরই নাকি জন্তুটার বেশি নজর।

তাই নাকি ?

ব্যাংকে আজ সেই রকমই শুনলাম। স্থানীয় লোকেরা বলছিল। করিম সাহেব প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

চললেন ?

নাহ, যাই। বাড়ির দিকে যাই। আসবেন, একদিন আসবেন আমার বাসায়। ঐ তো, ব্যাংকের পেছনেই। তাস খেলেন তো ?

না, অভ্যেস নেই।

তাহলে গল্পই করা যাবে। আসবেন।

করিম সাহেব দ্রুতপায়ে সড়ক ছেড়ে খেতের আলের ওপর দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যান। একবারও আর পেছন ফিরে তাকান না।

কালভার্টের পাশে ছোট্ট কাঁটাঝোপটি হঠাৎ জীবন্ত কিছু বলে ভ্রম হয়ে জয়নালের। মনে হয়, কী একটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে আছে। তরল অন্ধকারে পাতাগুলোকে জটবাঁধা লোমের মত দেখায়।

১৮

একটু আলো, একটু কোলাহল এখন তার কাছে হঠাৎ খুব প্রার্থিত বলে মনে হয়। কলেজের ক্লাশঘরগুলোর শেষপ্রান্তে যে কামরায় তার বাস, সন্ধ্যার এই রক্তিম অন্ধকারের ভেতরে তা এখন অচেনা এবং শত্রুকবলিত বলে বোধ হয়। স্তব্ধতা এমনই বিকট যে তেলাপোকার চলাচল পর্যন্ত করাতের তীক্ষ্ণ চিৎকার হয়ে কানে পশে। ভাল করে কান পাতলে অনুপস্থিত ছাত্রদের কলরব-শূন্যতা কল্লোলিত হয়ে ওঠে।

বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে পা রেখেও সে ওপরে ওঠে না। অচিরে সে দ্রুত পায়ে বাজারের দিকে যায়।

বাজারে চায়ের দোকানে কিছু লোক ভিড় করে আছে। দু' একটা সবজির দোকান বসেছে পথের পাশে। মাছের তীব্র আঁশটে ঘ্রাণ ভেসে আসছে মেছোপট্টি থেকে, কিন্তু এখনো সেখানে জেলেরা এসে বসে নি। ইস্টিশান লম্বা হয়ে পড়ে আছে নিম গাছের নিচে। ট্রেন আসবার বেশ খানিক দেরি বলে যাত্রীদের দেখা নেই।

জয়নালের একবার ইচ্ছে হয় চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে এক পেয়ালা চা খায়। কিন্তু তার অনুমান হয়, দোকানের ভেতরে দু' একজন ছাত্র বসে আছে। সে বরং নিমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে দূরে ইস্টিশান ঘরে বিরাট গোল লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ জামায় টান পড়ে তার। গোটা অস্তিত্ব ধরে কেউ যেন প্রবল এক টান দেয়। ঘুরে তাকিয়ে শাদা এক পাটি দাঁত ছাড়া প্রথমে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। সে শীতল হয়ে যায়। মৃত্যুকে নিঃশব্দে উৎকট অট্টহাস্য করতে সে প্রত্যক্ষ করে।

তারপর চৈতন্য হয়, এ সেই যুবতী-ভিখিরি।

তখন বাতাস আবার বয়, আলো দীপ্তিময় হয়ে যায়, গাছগুলো ঝাকড়া মাথা নিয়ে আবার সটান হয়। জয়নাল দ্রুতবেগে সেখান থেকে সরে যায়। এবং ভূধর সরখেলের সাইকেলের নিচে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে সরখেল বলে, ঘরে বাতি জ্বালাবারই পয়সা হয় না, সাইকেলে বাতি রাখব কী। লাগে নি তো ?

না, না। আমারই দোষ।

আপনারা ঢাকার লোক, সেখানে কত রকমের লাইট, পাড়াগাঁর অন্ধকারে কি আপনাদের মত লোকের চলে অভ্যেস ?

আচ্ছা এখানে ব্যাটারি কিনতে পাওয়া যায় ?

ব্যাটারি ? টর্চের ব্যাটারি ? টর্চ রাখা ভাল। বেরুলে টর্চ নিয়েই বেরুবেন।

টর্চ একটা আনা উচিত ছিল তার, এখন সখেদে সে নিজেকে তিরস্কার করে। চারদিকের অন্ধকার হঠাৎ আরো দুর্ভেদ্য বলে মনে হয় তার।

টর্চের নয়, ক্যাসেট চালাব। সরখেল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না বলে অনুমান হয়। জয়নাল তখন যোগ করে, গান শোনার জন্যে।

ও সেই ব্যাটারি দিয়ে চলে সেই মেশিন তো ? রংপুরে দেখেছিলাম। তা এখানে ব্যাটারি পাবেন, দাম বেশি নেবে। চলে যান না একদিন দুপুরের গাড়িতে রংপুর, সেখানে সস্তা পড়বে। হে হে করে হাসে সরখেল। আমি জানতাম মশাই, আপনি গানের লোক। আপনাকে দেখেই বুঝেছি। আজ তিরিশ বছর গান করছি, দেখলেই বলে দিতে পারি। এখানে আজকাল গানের কোনো কদর নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরখেল চুপ হয়ে যায়। কত আর বেশি নেবে। দোকান খোলা থাকলে চলুন না কিনে নিই। মুদির দোকানে এসে দাঁড়ায় দু'জন। বিশ্বাস হয় না, চাল ডাল তেলের দোকানে ব্যাটারি পাওয়া যাবে। কিন্তু যায়। কোন এক জাদুবলে মলিন তাকের ওপর শত রকমের জিনিসের ভেতর থেকে ঝকঝকে চারটে ব্যাটারি বেরিয়ে পড়ে।

কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে সরখেল বলে, গানের যদি শখ থাকে তো ঢাকা ছাড়া আপনার উচিত হয় নি। এখানে গান কোথায় ? বড়জোর রংপুর রেডিওতে চান্স পাবেন, তাও হাজার রকমের পলিটিক্স। তিন মাসে হয়ত একটা প্রোগ্রাম পাবেন। নিজের কোনো বক্তব্য থাকবে না। গাইতে চান আধুনিক, আপনাকে বলবে ভাওয়াইয়া গাও। এই যে আমি গত ছ'মাসে একটা প্রোগ্রাম পাই নি। অথচ আমারই কাছে একটু হারমোনিয়াম টিপতে শিখেই আমার ছাত্ররা সব বড় বড় গায়ক হয়ে গেছে। কী বলবেন একে ?

কলেজের বারান্দায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে সরখেল ইতস্তত করে বলে, আপনার মেশিনটা একবার দেখা যায়, প্রফেসর সাহেব ?

গান শুনবেন ?

জয়নাল এখন নিজের কাছেই অজ্ঞাত কারণে খুব একা বোধ করে। ভূধর সরখেলকে গান শোনাবার নাম করে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারবে, এই স্বার্থ তাকে হঠাৎ কর্মিষ্ঠ করে তোলে। ব্যাটারি পালটে সে ক্যাসেট চালিয়ে দেয়।

একই সঙ্গে জয়নাল জানতে চায়, রবীন্দ্রসংগীত আপনার ভাল লাগে তো ?

আমি নিজেই তো গাই।

প্রথমে যন্ত্রটির দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে সরখেল, তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুঁজে গান শোনে। অচিরে তার ঠোঁট গানের কথাগুলো নীরবে উচ্চারণ করে চলে। হাঁটুর ওপর

একটা আঙুল থেকে থেকে তাল দেয়।

দুটো গান হয়ে যেতেই হাত তুলে সরখেল থামাতে বলে।

নাহ, আর শুনব না। মন খারাপ হয়ে যায়। কী করতে এসেছেন এখানে ? কে আছে এ সব বুঝবে ? ভাগ্য নেহাত খারাপ বলে আমরা পড়ে আছি। জীবনটাও পার হয়ে গেল। আপনার তো অনন্ত সময় সমুখে পড়ে আছে। চলে যান ঢাকায়। সেখানে গিয়ে গানের চর্চা করুন। শান্তি পাবেন। দেখবেন গানের মত আর কিছু নেই। এই গান শিখেছিলাম বলেই এতদিন পশুর মত পড়ে থেকেও টিকে গেলাম।

সরখেল সাইকেলে উঠতে উঠতে আবার বলে, ঢাকায় ফিরে গিয়ে কিছু যদি করতে পারেন, আমার কথা মনে থাকলে একটিবার ডেকে নেবেন। আমার বড় ইচ্ছে ঢাকায় একবার কোনো আসরে একটা গান করি। ডাকবেন তো ?

ভূধর সরখেল মুহূর্তের ভেতরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। বারান্দায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে জয়নাল। জীবনে কোনোদিন সে গান করে নি, ঢাকায় বিন্দুমাত্র তার প্রতিপত্তি নেই, তবু সরখেল যে তাকে গায়ক বলে মনে করেছে, আশা করেছে তার জন্যে সে কিছু অবশ্যই করতে পারবে, এতে তার এখন আরো একা মনে হয় নিজেকে।

১৯

আচ্ছা, ক্লাশের কোন মেয়েটিকে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত তার বৌ হিসেবে ? এগারজনের প্রত্যেকের মুখ সে ভাবতে চেষ্টা করে।

চোখে আলোটা বড্ড লাগে। ঢাকা থেকে আসা পোস্টকার্ডখানা ভাঁজ করে সে লণ্ঠনের চিমনির গায়ে বসিয়ে দেয়। ঘরের একপাশ অন্ধকার, আরেকপাশ আলো হয়ে থাকে।

'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে'— কিছুক্ষণ আগে ভূধর সরখেলের সঙ্গে বসে শোনা এই গানটি মনে পড়ে যায় তার। সেই সঙ্গে মাসুদার মুখ। মাসুদাকে সে এখন তালিকা থেকে বাইরে রাখে। মৃত্যুর পবিত্রতা আছে।

তাহলে জীবিত যাদের নিয়ে সে এখন ভাবতে চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্কে ভাবা, তাদের বৌ কল্পনা করাটা কি অপবিত্র এক চিন্তা ?

শরীর শিরশির করে ওঠে। বুকের ভেতর মৃদু অথচ তীব্র বাজনা হতে থাকে। জয়নালের কেবলি মনে হতে থাকে, সে একটা কিছু অন্যায় করছে। কিন্তু সেই অন্যায়ের চেহারাটাও খুব স্পষ্ট নয়। এক ধরনের নিষিদ্ধ উত্তেজনা হচ্ছে তার। যে-কোনো মূল্যেও এই উত্তেজনার হাত থেকে সে এখন আর নিস্তার কামনা করে না।

বরং প্রায় ক্রোধের সঙ্গে সে কল্পনা করে ক্লাশের সেই মেয়েটির মুখ, প্রেম করছিল সবচেয়ে চুটিয়ে তাদের ক্লাশের সবচেয়ে তুখোড় ছেলেটির সঙ্গে।

সালমা আর এরশাদ।

আঁটো পাজামা কামিজ পরত সালমা। বুকে ওড়না থাকত না। চুল ব্যাটাছেলের মত ছাঁটা। ঠোঁটে কালো লিপস্টিক।

ক্লাশে সবার সমুখেই এরশাদ তার পিঠে হাত রেখে কথা বলত। ক্লাশ শেষ সালমার হাত

ধরে বেরিয়ে যেত। আচ্ছা, এ কি হতে পারে, ওরাই ব্যবহার করেছিল জন্মনিয়ন্ত্রণের সেই প্যাকেট, যার কথা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলছিলেন ?

দরদর করে ঘামতে থাকে জয়নাল।

এরশাদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে। এরশাদ বলে কেউ কখনো ছিল না। জয়নালই এরশাদ।

শরীরটাকে চেপে ধরবার জন্যে সে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। তাতে অস্বস্তি বেড়ে ওঠে আরো। আবার একই সঙ্গে জন্ম নেয় নতুন এক উল্লাস। সালমাকে প্রায় করতলগত বলে বোধ হয় তার। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের ভেতরে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সালমার মুখ, তার চকচকে কালো লিপস্টিক, পিঠের সতেজ আয়তক্ষেত্র।

ক্লাশে, পেছন থেকে সালমার পিঠ সে বছরের পর বছর দেখেছে। সেই পিঠের ওপর একটা বড় আর দুটো ছোট তিল তার মুখস্ত হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে ব্যয়িত হয়ে মুমূর্ষুর মত নিঃসাড় পড়ে থাকে বিছানায়। নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বহুদূর থেকে ভেসে আসে গলিত মাংসের ঘ্রাণ। উৎকট ক্ষত থেকে নিঃসৃত রস তার শরীরে সে অনুভব করতে পারে।

এরশাদ এসে সালমাকে হঠাৎ নিয়ে যায়।

ক্ষণকালের জন্যে নিজেকে আর পরাজিত মনে হয় না তার। এরশাদ যাকে নিয়ে গেছে, সে ব্যবহৃত, বিনষ্ট, বিক্ষত।

আবার আগামীকাল সালমা কুমারী হয়ে উঠবে, তার শরীর থেকে স্বেদ এবং রস ধুয়ে যাবে, পবিত্র এবং কাঙ্ক্ষনীয় হয়ে উঠবে। তখন আবার সে, জয়নাল, খিন্ন চোখে দূর থেকে তাকিয়ে দেখবে তাকে। আবার তাকে কাছে পেতে চাইবে। আবার তাকে সে তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে আয়ত্ব করে নেবে।

ঘরের ভেতর কীসের একটা শব্দ হতেই লাফ দিয়ে উঠে বসে জয়নাল। যে দিকটা আলো, সেখানে টেবিল, চেয়ার, আলনা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে দিকটা অন্ধকার, সেখানে তীব্র সবুজাভ আলোর দু'টি ছোট্ট বিন্দু দেখা যায়।

শীতল হয়ে যায় জয়নালের শরীর।

একদৃষ্টে সেদিকে সে তাকিয়ে থাকে।

সবুজাভ বিন্দু দু'টি একবার স্তিমিত হয়ে যায়, আবার প্রখর হয়, অনেকক্ষণ সেই প্রখরতা স্থির হয়ে থাকে, তারপর আবার স্তিমিত হয়ে আসে।

শরীরের ভেতর দিয়ে শীতলজল সূক্ষ্ম ধারায় নামে।

জয়নাল অপেক্ষা করে প্রথম শিশুর কান্নার, তারপর খকখক।

মিঁয়াও।

শিশুর কান্না বলেই প্রথমে মনে হয়।

তারপর বেড়ালটি লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

২০

মগরেব নামাজের আজানের সঙ্গে সঙ্গে পানিপড়াটুকু খেয়ে নেবার শক্তি থাকে না ব্যাং মামুদের। দুপুর থেকে তার শরীরের তাপ বেড়ে যায়। চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ-র বাড়িতে কাঠাল গাছ ফাড়াই হচ্ছিল, সেটা ফেলে সে বাড়িতে ফিরে আসে।

তার চোখ শিমুলের মত লাল।

বাড়িতে এসে বেহুঁশ হয়ে দাওয়ার ওপর পড়ে যায় সে। মাঝেমাঝে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। সমস্ত শরীর গুটিয়ে অদৃশ্য কোনো কিছু থেকে আত্মরক্ষার প্রাণপন চেষ্টা করতে লক্ষ করা যায় তাকে। আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

জন্তুটি তাকে তাড়া করে ফেরে।

শিশুটির আঁত তাকে ফাঁসির দড়ির মত গলায় জড়িয়ে ধরে।

২১

রোল ডাকবার সময় জয়নাল গোপনে ব্যগ্র হয়ে থাকে, ক্লাশের সেই মেয়েটি কোন নম্বরে সাড়া দিয়ে ওঠে।

একত্রিশ নম্বরে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটির নাম, সালমা।

জয়নাল কিছুক্ষণের জন্যে পরের নম্বর ডাকতে ভুলে যায়। এই মেয়েটির নামও যে সালমা, সেই আকস্মিকতা তাকে বোবা এবং উদ্যমহীন করে রাখে।

তারপরেই তার মনে হয়, এভাবে চুপ করে থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে না। হয়ত ক্লাশে গুঞ্জন উঠতে পারে। একটি মেয়ে রোল করে সাড়া দেবার পর, বিশেষ করে মেয়েটি যখন ক্লাশের ভেতরে সবচেয়ে সুন্দরী, এভাবে চুপ করে থাকাটা ছেলেদের কাছে অর্থময় বলে মনে হতে পারে।

তাড়াতাড়ি রোল ডাকা শেষ করে জয়নাল তৈরি হয় পড়াবার জন্যে।

পেছন থেকে একটি ছেলে হাত তোলে।

বল।

সেই জন্তুটা, স্যার।

সমস্ত ক্লাশ ছেলেটির দিকে ঘুরে তাকায়। শুধু সালমা তার সমুখেই দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করে। খাতার পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়ে অনবরত ছবি আঁকার যে অভ্যেস তার, এখনো তা লক্ষ করা যায়।

কী হয়েছে জন্তুটির? তুমি দেখেছ নাকি?

না স্যার। কাল রাতে আমাদের পাড়ায় এসেছিল, স্যার।

কেউ দেখেছে?

না স্যার। তার আগেই সরে গেছে। এরা স্যার খুব দ্রুতগামী হয়।

কী করে বোঝা গেল ওটা এসেছিল?

জয়নালের আশংকা হয় ছেলেটি এক্ষুণি আরো একটি শিশুর মৃত্যুসংবাদ দেবে। উত্তর দিতে ছেলেটি যে সামান্য দেরি করে, দুঃসহ মনে হয় তার।

স্যার, আমাদের পাড়ায় আটাকলের পাশে একটা কুঁড়েঘরে কামার থাকে। কামারের বৌ তার বাচ্চা মেয়েকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখে রান্না করছিল, স্যার। হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনতে পায়। দৌড়ে এসে দ্যাখে তার মেয়ে নেই।

ছেলেটি উত্তেজনায় কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারে না। তার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না। সে একদৃষ্টে জয়নালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত ক্লাশের দৃষ্টি যে তার ওপর সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপমাত্র করে না।

নিজের অজান্তেই ছেলেটির আতংক জয়নালের ভেতরেও কিছুটা সঞ্চারিত হয়ে যায়। অবিলম্বে সে তা বুঝতে পারে। এবং ভেতরে ভেতরে লড়াই করতে থাকে। তার গলাও কেঁপে ওঠে এবং খসখসে শোনায়।

তারপর কী হলো ?

মেয়েটিকে পাওয়া গেল, স্যার। শুকনো কলাপাতার বেড়ার পাশে। তখনো মেয়েটি কিন্তু বেঁচে ছিল, স্যার।

এখন ?

মরে নি, স্যার। প্রাণে বেঁচে গেছে। গায়ে আঁচড়ের দাগ, একটু রক্ত বেরিয়েছে। সকলে বলেছে বৌটা সময়মত চিৎকার করে উঠেছিল বলে জন্তুটা সাংঘাতিক কিছু করতে পারে নি।

ছেলেটি এরপরও অনাবশ্যক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধপ করে বসে পড়ে। অন্য একটি ছাত্র জানতে চায়, তুই নিজে দেখেছিস মেয়েটিকে ?

হ্যাঁ, আজ সকালে দেখেছি। লম্বা লম্বা আঁচড়ের দাগ। খুব তীক্ষ্ণ নোখ।

এরপরে আর কোনো প্রশ্ন চলে না। বিশেষ করে মেয়েরা খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা বারবার জনয়নালের দিকে তাকাতে থাকে।

কেবল সালমাই তখনো খাতার পাতায় ছবি এঁকে চলে। জয়নালের অদ্ভুত মনে হয় এই মেয়েটির প্রশান্তি। কী করে স্থির আছে সে ? আতংকের কোনো ছাপ নেই কেন ? নাকি এটা তার অভিনয় ?

জয়নাল বলে, দাওয়া থেকে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বলছ ?

হ্যাঁ, স্যার।

নাও হতে পারে তো ?

সালমা এবার একপলকের জন্যে জয়নালের মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ পড়তে আবার সে ছবি আঁকায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ক্লাশের কেউই যেন প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না জয়নাল কী বলতে চাইছে। তারা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবিশ্বাস্য বেগ এবং নিনাদিত ধ্বনি তারা অনুভব করতে থাকে অসহায় হয়ে। তাদের কাছে জয়নাল হঠাৎ অনেক দূরে বলে বোধ হয়। এমনকি তার ভাষাও ভিন্ন কোনো ভাষা বলে মনে হতে থাকে।

একরোখার মত জয়নাল বলে চলে, ধর, মেয়েটি নিজেই যদি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে থাকে ?

ছোট্ট বাচ্চা স্যার। হাঁটতে জানে না।

হামাগুড়ি দিয়ে নামতে পারে তো ?

না, স্যার।

বাচ্চারা হামাগুড়ি দেয় না নাকি ?

দেয়, স্যার। কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল যে।

হয়ত জেগে উঠেছিল। তার মা টের পায় নি।

না, স্যার।

সমস্ত ক্লাশটাই যেন প্রতিবাদ করে ওঠে। ভীষণ গুঞ্জন ওঠে। বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। জয়নাল আঙুলের গাঁট দিয়ে টেবিলের ওপর শব্দ করে ঠক-ঠক-ঠক। তখন নীরব হয়ে যায় ক্লাশ। কিন্তু প্রতিবাদ নিঃশব্দ ধারায় ক্লাশটিকে বেষ্টন করে রাখে। ইংরেজির অধ্যাপক আফজাল সাহেবকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। আজো সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। তারপর ধীরগতিতে আড়াল হয়ে যায়।

খবরটি যে দিয়েছিল সেই ছেলেটি মিয়নো গলায় এখন বলে, আমি মেয়েটির গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখেছি স্যার।

হয়ত দাওয়ার নিচে ঝোপটোপ ছিল, হয়ত বেড়ার গায়ে কিছু একটাতে গা আঁচড়ে গেছে, হয়ত কচি গা বলেই অল্পতে রক্ত বেরিয়েছে।

স্যার, আপনি বিশ্বাস করেন না, স্যার!

অন্য একটি ছেলে আহত গলায় হঠাৎ বলে ওঠে। এতক্ষণ পর্যন্ত এই ছেলেটি কোনো কথা বলে নি, এখন তার কণ্ঠস্বর সমস্ত ক্লাশটিকে গ্রাস করে ফেলে।

সেদিন একটা বাচ্চার পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলেছে, তবু আপনি বিশ্বাস করেন না, স্যার ?

২২

দুপুরে ভাত নিয়ে আসে বেয়ারা। এখানে কাজে যোগ দেবার পর প্রথম দু'দিন জয়নাল ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের বাসায় খেয়েছিল; ব্যবস্থাটা এখন মাসিক কিছু বিনিময়ের ভিত্তিতে পাকা করে নেয়া গেছে। দুপুরে বেয়ারা কলেজেই খাবার নিয়ে আসে, ভোরের নাশতা আর রাতের খাবার সে গিয়ে খেয়ে আসে।

বেয়ারার কাছে জন্তুটি সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

আকারে খুব বড় নয়। সারা গায়ে ভালুকের মত লোম। পায়ের নখ কুকুরের মত। মুখ বেড়ালের। জন্তুটির লেজ নেই। কিংবা লেজ থাকলেও বোঝার উপায় নেই। আসলে জন্তুটি এত দ্রুতগামী যে কেউ তাকে ভাল করে দেখে নি।

তাহলে দেখেছে কে ? বেয়ারা এ বর্ণনা কোথায় পেল ?— এসবের কোনো স্পষ্ট উত্তর

পাওয়া গেল না।

তুমি শুনলে কোথায় ?

ইস্টিশানে।

ইস্টিশানে কার কাছে ?

ব্যাপারির কাছে।

কোন ব্যাপারি ?

চামড়ার ব্যাপারি। সুখি মিয়া।

সে দেখেছে ? নিজের চোখে ?

বেয়ারাটি দৃশ্যতই বিরক্ত হয়ে যায়। সে আপনমনে গজগজ করতে করতে থালা-বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে দুমদাম করে চলে যায়। জয়নাল তাকে পেছন থেকে ডাকে।

যখন সে ঘরে ফিরে আসে, জয়নাল তার চোখের দিকে তাকিয়ে অতঃপর কোনো প্রশ্ন করবার উৎসাহ পায় না।

সে বলে, সোবহান সাহেবের বাসায় বলতে পারবে, তরকারিতে এত ঝাল যেন না দেয় ?

ঝাল সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকতে পারে দেখে বেয়ারা বিস্মিত হয়, তার ভ্রূ ক্ষণকালের জন্যে উঠে যায় এবং এই মুখভাব নিয়েই সে বিদায় হয়।

দুপুরে ভাত খাবার পর আজকাল তার ঘুম পায়। ঢাকায় থাকতে দিনে ঘুমোবার অভ্যেস তার আদৌ ছিল না। আসলে, দিনের বেলায় ঘুমকে সে সবসময়ই নিন্দার চোখে দেখে এসেছে। এখন সে নিজেই নিজের কাছে নিন্দিত হয়ে পড়বার লক্ষণ দেখতে পায়।

তবু তার ঘুম পায়। এবং মনে হয়, কেউ তাকে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য করে। এই তন্দ্রা তার স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। সে জানে, আর দশ মিনিট পরেই তার ক্লাশ। তবু সেই দশ মিনিটই তার কাছে একপ্রস্থ ঘুমের জন্যে যথেষ্ট সময় বলে বোধ হয়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে খেপে ওঠা পচা গন্ধ তার কাছে নিষিদ্ধ নেশার মত দেখা দেয়।

ঘুমের ভেতরে সে নিজেকে অন্ধকার একটি বাঁশবনের ভেতরে আবিষ্কার করে। সেখানে কোনো জনমানুষ নেই। পায়ের তলায় ভিজে চড়চড়ে বাঁশপাতার সিক্ত তীক্ষ্ণতা সে অনুভব করে। অদূরে সে একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পায়। জন্তুর উপস্থিতিতে সে ভীত হয় না, কিন্তু উদ্বেগ অনুভব করে। সে আক্রমণ আশা করে না, অথচ অতিক্রম করে যাবারও আশা তার হয় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। জন্তুটির মুখ বেড়ালের মত। অচিরে জন্তুটি তার সবক'টি তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত বের করে জায়গাটি আলোকিত করে ফেলে। এবং অজ্ঞাত কোনো কারণে, অতিশয় স্বাভাবিকভাবেই পশ্চাৎপটে বিবাহের রঙ্গিন তোরণ দেখা দেয়। শানাই বেজে ওঠে। জন্তুটি বহুকালের পরিচিত পোষ্যের মত জয়নালের পায়ে এসে মুখ ঘষে। তার তীক্ষ্ণ গোঁফ জয়নালের চামড়া ফুটিয়ে দেয় হঠাৎ। সে চিৎকার করতে যায়, কিন্তু স্বর বেরোয় না। কিংবা বেরোয়, বিবাহের উতরোল বাজনায় তা চাপা পড়ে যায়।

জয়নাল বিছানায় উঠে বসে।

প্রথমে তার মনে হয়, এই রোদ তার স্বপ্নের অন্তর্গত এবং আসলে এখন মধ্যরাত। কলেজের ঘন্টা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু সেটাও বিবাহ সঙ্গীতের অংশ বলে বোধ হয়।

সে হতভম্ব হয়ে বিছানায় বসে থাকে।

তারপর বস্তুজগৎ অকস্মাৎ টাল খেয়ে সুস্থির হয়। এবং তার চৈতন্য হয়, ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ ধুয়ে সে ক্লাশের দিকে রওয়ানা হয়। এখানেও একটি মেয়ের নাম সালমা, এই তথ্যটি অনেক দূর থেকে তার করোটির ভেতরে ক্ষণিকের জন্যে আলো ফেলে যায়।

২৩

চায়ের দোকানে এখন ভিড় নেই। ঝুলন্ত কলার কাঁদির নিচে ক্যাশবাক্সের ওপর মাথা রেখে চাওয়ালা ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ এক খিনখিন শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দ্যাখে, আধপাগলি এক যুবতী কোলে উলঙ্গ এক শিশু নেয়ে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে আছে। যুবতীটিকে একই সঙ্গে চেনা এবং অচেনা মনে হয় তার। বালকদের পেছনে ধাবমান তার কৈশোর থেকে এই নারী উঠে এসেছে বলে তার বোধ হয়।

দৃষ্টির ভেতরে দিনের আলো ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করে, শিশুর জন্যে যুবতীটি কলা প্রার্থনা করছে।

একটি কলার বিনিময়ে চাওয়ালাকে স্বর্গে অক্ষয় বাসের আশ্বাস দেয় সে। 'হেই দূর দূর' করে ওঠে চাওয়ালা।

যুবতী-ভিখিরি তখন নতুন এক সংবাদ দেয়। সে জানায়, তার শিশুটিকে সেই অজানা জন্তুটি আক্রমণ করেছিল। তার গায়ে আঁচড়ের দাগ আছে বলেও সে দাবি করে। দয়া করে শিশুটির জন্যে সে এখন কিছু দান করুক।

যুবতী সত্যি সত্যি শিশুর পিঠ ঘুরিয়ে দেখায়। এবং সেখানে লম্বা দু'টি আর ছোট একটি আঁচড়ের দাগ লক্ষ করা যায়। দাগ যখন সদ্য ছিল তখন রক্তপাত হয়েছিল। এখন সেই রক্ত শুকিয়ে কালো কয়েকটি রেখায় পরিণত হয়েছে।

চাওয়ালা মুহূর্তের জন্যে সম্মোহিত হয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ে সে দাগগুলো দেখতে থাকে। এবং চোখ তুলেই সে আবিষ্কার করে যুবতীর স্তনযুগল ঠাসা গোল এক জোড়া বাতাবি লেবুর মত। একটি প্রায় সম্পূর্ণ, অপরটি আধখানা দেখা যাচ্ছে।

দুপুরের উজ্জ্বল রোদ, পথের দুরন্ত ধুলো এবং জন্তুটির অস্তিত্ব চোখের পলকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সবরকম বেগ এবং ধ্বনি স্তম্ভিত হয়। বস্তুতপক্ষে একটি কালো চারদিক ঘিরে অকস্মাৎ ঝুলে পড়ে। চাওয়ালা যুবতীর মুখের দিকে তাকায়। সেখানে অচিরে সে ফিকে একটি হাসি লক্ষ করে। তার পিচুটি পড়া চোখের ভেতরে কালো দুটিকে অতল এবং গভীর বলে বোধ হয়। সমস্ত পৃথিবীটাকেই পীতাভ শাদা এবং জলসিক্ত কালো রঙে বিভক্ত বলে দেখা যায়।

শিশু হঠাৎ মায়ের স্তনে থাবা মারে। খামচে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে শিশু। যুবতীর স্তনযুগল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। অথচ নির্বিকার সে, যুবতী, চাওয়ালার দিকে প্রার্থনার অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

কলা চায়, কলা ? অনাবশ্যক এই প্রশ্ন করে চাওয়ালা তখন একটানে একটি কলা ছিঁড়ে

নিয়ে, যেন এই কলা সে মধ্যরাতে অপহরণ করছে অন্য কারো গাছ থেকে, যুবতীর হাতে দেয়। যুবতীর চোখ থেকে সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

খপ করে কেড়ে নিয়ে মুহূর্তে কলার খোসা ছাড়িয়ে ফেলে যুবতী এখন প্রায় সবটা একবারে নিজের মুখে পুরে দেয়।

বাৎসল্য নিয়ে হাঁ-হাঁ করে ওঠে চাওয়ালা। আরে শিশুকে খেতে দাও, শিশুর খিদে পেয়েছে— এই জাতীয় সুবচন সে তুলে ধরে। কিন্তু কলাটি সম্পূর্ণ খেয়ে যুবতী আবার হাত বাড়ায়।

এবার কঠিন হয় চাওয়ালা। আরে সে কলা দেবে না। বাতাবি লেবুর মত যুবতীর খোলা স্তনের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, যেন বস্তুটি হাউইবাজির মত হুউস করে কখন ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় তা প্রত্যক্ষ করবার মহামুহূর্তে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

স্থির একটি পুকুরে অকালের নিঃশব্দ শাপলার মত যুবতী দাঁড়িয়ে থাকে। চাওয়ালা অচিরেই তাকে ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানায়। ভেতরে সে তাকে আরো কলা দেবে, এরকম আশ্বাস দেয়।

যুবতী খিলখিল করে হেসে ওঠে।

তখন তাকে চাপা গলায় প্রচণ্ড অথচ ব্যাকুল ধমক দিয়ে হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যায় চাওয়ালা।

দোকানের পেছনে অত্যন্ত নিচু ছোট একটি চালা। সেখানে চাওয়ালা রাত্রিবাস করে। যুবতীকে সেই চালার ভেতরে ঠেলে দিয়ে সে ঝাঁপ টেনে দেয়, তারপর দ্রুত বেরিয়ে আসে দোকানের সমুখে। পাশে মনোহারি দোকানদার মাথার তলায় গামছা গোল করে গুঁজে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তাকে ঠেলা দিয়ে সে জাগায়। বলে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সে কিছুক্ষণের জন্যে মাঠে যাচ্ছে, দোকানটির দিকে সে যেন নজর রাখে।

দ্রুত হাতে আরো কয়েকটি কলা ছিঁড়ে নিয়ে চাওয়ালা এখন পেছনের চালার ভেতরে ঢুকে যায়। শিশুর হাতে সোনালি ফলগুলো দিয়ে সে এবার যুবতীর দিকে ফিরে তাকায় এবং অভূতপূর্ব রাজসিক কণ্ঠে একটি শব্দ উচ্চারণ করে, চুপ।

তারপর যুবতীর বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে সে লেবু দুটো দু'হাতে ঠেসে ধরে। যুবতী, শালিক পাখি পিঠে বসবার পরও গাভীর মত নির্বিকার থাকে। অবিলম্বে শিশুর হাত থেকে কলা কেড়ে নিয়ে হুপহাপ করে খেয়ে চলে।

শিশু আবার কেঁদে ওঠে।

তখন ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে চাওয়ালা। শিশুর কান্না কেউ শুনে ফেললে সমূহ বিপদ— এই আশংকা সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ওঠে। শিশুটিকে গলা টিপে মেরে ফেলবার কথাও তার একবার মনে হয়।

হত্যা করবার ইচ্ছে থেকে রেহাই পাবার জন্যেই হয়ত চাওয়ালা চাপা গলার হুংকার দিয়ে ওঠে, ওকে চুপ করা। এবং তার বক্তব্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়ে দেবার জন্যেই হয়ত সে প্রচণ্ড শক্তিতে যুবতীর স্তন মুচড়ে দেয় হঠাৎ। যুবতী আর্তনাদ করে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে পিছু হঠতেই তার বুকে চাওয়ালার নোখের আঁচড় কেটে লম্বা হয়ে বসে যায়।

ঠিক তখনই টিনের চালার ওপর একটি ঢিল পড়ে।

এক মুহূর্তের জন্যে চাওয়ালা হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর চালার পেছনে দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়। এবং পরপর আরো কয়েকটি ঢিল পড়ে।

যুবতী চালার ঝাঁপ ঠেলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বাঁশের ঝাঁপের তীক্ষ্ণ খোঁচায় তার ছেঁড়া শাড়ি আরো ফালা ফালা হয়ে যায়। পিঠেও আঁচড় পড়ে। শিশুটি তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।

২৪

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালকে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই ডাকেন।

রিপোর্টটা ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দিলাম।

জয়নাল হঠাৎ বুঝতে পারে না।

কীসের রিপোর্ট ?

সেই যে কাল আপনাকে দেখালাম। অবশ্য সঙ্গে আরো একটু যোগ করে দিয়েছি। বেশ দাঁড়িয়েছে।

কী রকম ?

একটু বর্ণনা দিয়ে দিলাম আর কি। শোনেন নি আপনি ? এখন তো জানা যাচ্ছে, জন্তুটির গায়ে ভালুকের মত লোম, পায়ের নোখ কুকুরের মত, মুখ অবিকল নাকি বেড়ালের। সে এক সাংঘাতিক চেহারা। অনেকেই দেখেছে।

হ্যাঁ, শুনেছি।

গারো পাহাড়ের কথাটা আর লিখলাম না। পলিটিক্যাল ইমপ্লিকিশেন কিছু না থাকাই ভাল, কী বলেন ? ভাল কথা, বেয়ারা বলছিল, কাল ভূধর সরখেল নাকি আপনার ঘরে এসেছিল ?

উৎকণ্ঠিত বোধ করে জয়নাল।

ও সব লোকের সঙ্গে না মেশাই ভাল, বুঝলেন। আপনি এখনো ছেলেমানুষ, সরল বিশ্বাসে মিশছেন, কী থেকে কী হয়ে যায়, বলা তো যায় না।

হঠাৎ শীতল বোধ করে জয়নাল। অকালবৃদ্ধ নিরীহ ভূধর সরখেলের ভেতর কী এমন রহস্য থাকতে পারে, সে বুঝে পায় না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, এই পিরিয়ড তো আপনার অফ। আসুন, আমার ঘরে আসুন।

চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। দু' হাতের দশ আঙুল একে অপরের সঙ্গে বুনে ফেলে সেদিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে, যেন নিজের আঙুলগুলোতে ঠিক আস্থা রাখতে পারছেন না। দু'হাত বিযুক্ত করে সোজা হয়ে বসেন তিনি।

আপনি জানেন, জয়নাল সাহেব, এই সরখেল, শেখ মুজিবর রহমান নিহত হবার পরদিন থেকে কয়েক মাস পলাতক ছিল ?

কেন ?

সে জানলে তো হয়েই যেত, সাহেব। রাজারহাটের কেউ গা ঢাকা দিল না, কেবল মাঝের থেকে এক সরখেল উধাও হয়ে গেল, সন্দেহ তো এখানেই।

কোথায় ছিল ?

ইন্ডিয়া হতে পারে, এখান থেকে তো বেশিদূরে নয়। গানের মাস্টার বলে সারাদিন কেবল গান নিয়েই থাকেন, নাও হতে পারে। কী তার মনে আছে, আদৌ কিছু আছে কি না অত কথার ভেতরে যেতে চাই না, যাবার প্রবৃত্তিও আমার নাই, পলিটিকস আমি ভাল বুঝি না, তবে এটুকু বুঝি দুই নৌকোয় যাদের পা তাদের এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষ করে আপনাদের মত সহজ সরল তরুণদের জন্যে তো ফরজ।

ভূধর সরখেল সম্পর্কে ভাবনায় পড়ে যায় জয়নাল। লোকটাকে এড়িয়ে চলবার মত প্রতিকূল কোনো ধারণা তার জন্মে না, আবার প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় তিনি যা বলেছেন সেটাই সবটুকু নয়।

জয়নালের নাকের ভেতরে সারাক্ষণের দুর্গন্ধটা হঠাৎ শিরশির করে ওঠে। সাগ্রহে সে প্রশ্ন করে, পাট আর কতদিন ওরা ভেজাবে ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রথমে বুঝতে পারেন না। জিজ্ঞাসু চঞ্চল চোখে জয়নালকে তিনি মেপে দেখেন কিছুক্ষণ। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে জানতে চান, কী বললেন ?

থাক, কিছু না। আমি ঘরে যাচ্ছি।

জয়নাল উঠে দাঁড়াতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আপনি তো কলেজে থাকেন একেবারে একা। একটু সাবধানে থাকবেন।

হঠাৎ ভয় পায় জয়নাল। ভূধর সরখেল রাতের বেলায় তাকে আক্রমণ করতে পারে নাকি ? সম্ভাবনাটি এতই আকস্মিক যে বিস্তারিত জানবার তীব্র আগ্রহ সত্ত্বেও কিছুই জিগ্যেস করতে পারে না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আবার বলেন, অবশ্য খুব ভয় করলে আপনি বেয়ারাকে আপনার ঘরে শুতে বলতে পারেন। সেটা মন্দ নয়।

জয়নালের ঠোঁট শুকিয়ে যায়। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে একটি হিংস্র সাইকেল তার দিকে ছুটে আসে তীব্রগতিতে। ভূধর সরখেলের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ ভয়াবহ একটি মুখোশ বলে মনে হতে থাকে তার।

বেয়ারা অদূরেই ছিল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের অপেক্ষা না করে তাকে ডাকেন এবং রাতে জয়নালের ঘরে শুতে আদেশ করেন। সে রাজি হয় না। তার বাড়িতে শিশু আছে। শিশুর নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখাই তার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলে সে মত প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে সে একটি নতুন তথ্য দেয়।

জন্তুটি নাকি শিশুদের কেবল আক্রমণ করে। বয়স্কদের প্রতি তার কোনোরকম আকর্ষণ এখন পর্যন্ত লক্ষ করা যায় নি।

জয়নাল এই প্রথম অনুভব করে তার নিজের সঙ্গেই নিজের একটা দূরত্ব। তার একটি অস্তিত্ব অনুভব করছে যে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকে সাবধানে থাকতে বলেছেন ঐ জন্তুটির কথা ভেবে, সরখেলের সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ; আবার আরেকটি অস্তিত্ব এখনো

এ আবিষ্কারটি করে উঠতে পারে নি, এখনো সে ভেবে চলেছে ভূধর সরখেলের কথা এবং তীরবেগে ছুটে আসা সাইকেল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যালীঢ় হয়ে আছে।

২৫

বিকেলের ট্রেনে ডাক আসে। ইস্টিশানের পাশেই ডাকঘর। এগিয়ে গেলে, চিঠি থাকলে, হাতে হাতে পাওয়া যায়। নইলে পরদিন ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ভোরে ডাক বিলি হয়ে থাকে।

ঢাকা থেকে চিঠি লেখার মত কেউ তার নেই। তবু ট্রেনে এলেই বুকের ভেতর টান অনুভব করে জয়নাল। বিশেষ করে আজ, এখন। তার ইচ্ছে হয় ডাকঘরের পাশে জামতলায় গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানে কোলভর্তি চিঠি এনে পিয়ন সর্ট করে নাম ডেকে ডেকে, পরদিন বিলির জন্যে পাড়া ভাগ করে সাজিয়ে রাখে।

ধরা যাক চিঠি লেখার মত তার যদি কেউ থাকত, কোনো বান্ধবী, যদি ভালবাসা থাকত, তাহলে নীল চিঠি আসত তার। সুবাসিত চিঠি।

কতদিন তোমাকে দেখি নি। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি নেই, ঢাকা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে দিন আর আমার কাটে না। গান শুনে তোমার কথা আরো বেশি করে মনে পড়ে। আজ সারাটা দিন একটিও গান শুনি নি। ব্যাটারি ফুরিয়ে গিয়েছিল, যতক্ষণ কিনি নি মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল। আর এখন নতুন ব্যাটারি এনেই নীরবতার ভেতরে আমি আছি।

হঠাৎ জয়নালের খেয়াল হয়, কাল্পনিক বান্ধবীর চিঠিতে আসলে সে নিজের কথাই পুরে দিয়ে বসে আছে। কারো কাছে অপ্রতিভ হবার নেই, তবু বড় অস্বস্তি বোধ হয়। বিছানা থেকে উঠে এক গেলাশ পানি খেয়ে জানালার কাছে দাঁড়ায় সে।

কলেজের গেটের পাশে বাবলা গাছের তলায় সালমা দাঁড়িয়ে আছে। নীল শাড়ি ছাড়া মেয়েটির কি আর কোনো রঙের শাড়ি নেই? লম্বা বেণি দুটো পিঠের দু'পাশে পড়ে আছে রঙিন ফিতের দুটো বড় বড় ফুল কামড়ে ধরে।

এখানে কী করছ?

ক্লাশের বাইরে এই প্রথম কোনো ছাত্রীর সঙ্গে সে কথা বলে। প্রশ্ন করবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তথ্যটি অনুদঘাটিত থাকে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তখন আর ফেরাবার উপায় থাকে না। সখেদে সে নিজেকে নীরবে লাঞ্ছিত করে— কেন সে পাশ কাটিয়ে গেল না? কোন ভূত তার জিহ্বায় ভর করল?

সালমা বিস্মিত হয়। চকিতে স্যারের দিকে মুখ তুলে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নেয়। লজ্জিত এবং অত্যন্ত সংকুচিত দেখায় তাকে। প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। স্যান্ডেল দিয়ে ঘাসে ছোট ছোট পীড়ন করে চলে সে।

কারো জন্যে অপেক্ষা করছ? নিতান্ত কথা বলে ফেলেছে বলেই কথা চালিয়ে যায় জয়নাল।

সালমা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

পেছনে কলেজের দিকে তাকিয়ে জয়নাল বলে, কলেজে তো কোনো মেয়েকে দেখলাম না। মনে হলো সবাই চলে গেছে।

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখায় সালমাকে।

থাক কতদূর ?

কাছে। বেশি দূর না।

পথে খুব ধুলো হয়েছে।

জয়নাল অনাবশ্যক একটি পর্যবেক্ষণ করে। সালমার ঘাসপীড়ন থেমে যায়। চিবুক তুলে সে জয়নালের দিকে তাকায়। মেয়েটি হঠাৎ, সেই তাকাবার ভঙ্গিতে, শিশুর মত দেখায়।

সালমা বলে, এখানে কী যে ধুলো, জানেন না স্যার।

দূরে একটি মেয়েকে লঘু পায়ে আসতে দেখা যায়।

যার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, বোধহয় এসে গেছে।

মিহি হতাশা লক্ষ করে জয়নাল, তার নিজের ভেতরে। একটু অবাকও হয় সে। সালমার সঙ্গে কথা বলতে কি সত্যি তার এতখানি ভাল লাগছিল ?

মেয়েটি কাছে এসে যায়। জয়নালকে দেখেই ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায় সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েও কেমন ছনমন করতে থাকে।

আচ্ছা যাও, তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দ্রুত পায়ে মেয়ে দু'টি ধুলোওড়া পথের ভেতরে নেমে যায়। খানিক দূরে গিয়ে ধুলো বাঁচাতে শাড়ি একটু তুলে কাঁধ ঘেঁসাঘেঁসি করে তারা হাঁটতে থাকে।

জয়নালের যেন মনে হয়, ওরা কী একটা বিষয় নিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে এখন। পাশের ঝোপঝাড় থেকে ছোট ছোট পাখি উড়ছে। বিকেলের কোমল আকাশের ভেতরে পাখিগুলো ঘাই দিয়ে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে সাঁ করে, আবার উঠে যাচ্ছে সেই সুদূরে।

২৬

প্ল্যাটফরমের ওপর কিছু একটা ঘিরে লোকদের কৌতূহলী ভিড়। ওজন-কলের চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে ব্যাংক-ম্যানেজার সাহেব ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

কীসের ভিড়, ম্যানেজার সাহেব ?

এক মুহূর্তের জন্যে তিনি যেন জয়নালকে ঠিক সনাক্ত করতে পারেন না। তারপর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মুখ। চাতাল থেকে নেমে খপ করে জয়নালের হাত ধরে তিনি বলেন, একেবারে দিনে দুপুরে, সাহেব।

তার মানে ?

সেই জন্তুটা এবার দিনের বেলাতেই। তাও একেবারে স্টেশানের কাছে, বলতে গেলে

বাজারের ভেতরে।

বলেন কী!

জয়নাল হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। করিম সাহেব আবার লাফ দিয়ে চাতালের ওপর উঠে ভিড় ঠেলে দেখতে চেষ্টা করেন। আমন্ত্রণ জানান জয়নালকেও।

আসুন, প্রফেসর সাহেব, উঠে আসুন।

জয়নাল ইতস্তত করে।

করিম সাহেব এতক্ষণে বোধহয় ভিড়ের ভেতরে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়ে যান। তিনি আর একটিও কথা না বলে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকেন।

অচিরেই ভিড়ের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শোনা যায়। সে কান্না যেমন তীব্র, তেমনি সংক্ষিপ্ত। প্রায় করুণ সে চিৎকার, অথচ আত্মনির্ভরতাও অবশিষ্ট আছে কিছু। পলকের মধ্যে ভিড় ছিঁড়ে আলুথালু বেশে যুবতী-ভিখিরিকে বেরুতে দেখা যায়। তার কোলে শিশু। শিশুটিকে সে যতটা না ধরে আছে, তার চেয়ে শিশুটিই আঁকড়ে ধরে আছে যুবতীকে।

জয়নাল চিনতে পারে। প্রথমবারের মত এবারেও যুবতীর ঝকঝকে শাদা দাঁত তাকে বিদ্ধ করে যায়।

যুবতী চিৎকার করতে করতে প্ল্যাটফরমের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়ে যায়। কিছুদূর তার পেছনে পেছনে ছুটে যায় রোঁয়া-ওঠা একটি কুকুর। সঙ্গে বেশি মালপত্র থাকলেই ট্রেনের যাত্রীদের ধাওয়া করবার জন্যে এ তল্লাটে বিখ্যাত সে। যুবতীর কোলে ধরা জিনিসটি মাল নয়, শিশু— এই বোধ হবার পরেই কুকুরটি হয়ত ক্ষান্ত হয়। যুবতী-ভিখিরি তার শিশুসহ শিমুল গাছের ঢালু বেয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

এই মেয়েটিকে আক্রমণ করেছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে করিম সাহেব জানান।

দুপুর বেলায়?

ভর দুপুর বেলায়। পিঠে বড় বড় আঁচড়ের দাগ। রক্ত ঝরছে।

চারদিকে উত্তেজিত জনতা আলোচনা করতে থাকে। তুমুল কলরবে ভরে যায় রাজারহাট ইস্টিশানের প্ল্যাটফরম। তাদের বিচ্ছিন্ন সংলাপগুলো আপনা থেকেই গ্রথিত হয়ে নিটোল এক কাহিনী রচিত হয়ে যায়। এবং সে কাহিনী লোকের মুখে কিংবদন্তিতে পর্যবসিত হবার সবরকম যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে।

দুপুরে এই আধপাগলি যুবতী-ভিখিরি তার শিশুকে নিয়ে বাজারে কিছুক্ষণ ভিক্ষে করবার পর বাজারেরই পেছনে একটি গাছের ছায়ায় বসে। প্রখর রোদের ভেতর শীতল সেই দ্বীপে মা ও শিশু ঘুমিয়ে পড়ে দু'জনেই। তারপর, গাছের পাশেরই ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে জন্তুটি। তার আকার এর আগে যতটা ছোট শোনা গিয়েছিল আদৌ তা নয়। জন্তুটি যে-কোনো স্বাস্থ্যবান বলদের সমান। তার সারা গা কালো নয় রুপালি রোমে ঢাকা। সেই রুপালি রঙ দুপুরের উজ্জ্বল রোদের ভেতরে অবলীলাক্রমে মিশে যায়। সম্ভবত ঐ রঙের দরুনই সে প্রকাশ্যে মাঠের ভেতর দিয়ে দূরের জঙ্গল থেকে বাজার পর্যন্ত চলে এলেও কারো চোখে সে পড়ে নি। জন্তুটি প্রথমে শিশুকে আক্রমণ করে। মা তখন শিশুকে বুকের ভেতরে আড়াল করে ফেলতেই জন্তুটি ভয়াবহ ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে। তখন চিৎকার করে ওঠে যুবতী। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে চাওয়ালা এবং তার প্রতিবেশী মনোহারি দোকানদার। দু'জনেই জন্তুটিকে দেখেছে বলে ঘোষণা করে। তবে, তারা খুবই সামান্য সময়ের জন্যে জন্তুটিকে দেখতে পেয়েছে। তারা একবার দেখবার জন্যে ভাল করে তাকাতেই জন্তুটিকে আর দেখা যায় না। সে রোদের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝোপের ভেতর দিয়ে তুমুল একটি ঢেউ তারা লক্ষ করে। এবং সেই ঢেউয়ের গতিধারা লক্ষ করে তারা এখন ঘোষণা করে যে জন্তুটি মাঝিপাড়ার দিকে চলে গেছে।

তখন গরিব মাঝিরা সস্তায় তাদের মাছ বেচে দিয়ে, অনুনয় করে খদ্দেরকে তাড়াতাড়ি গছিয়ে দিয়ে, দ্রুতপায়ে পাড়ার দিকে চলে যায়।

প্রকাণ্ড একটি শোল মাছ হাতে ঝুলিয়ে একগাল হেসে করিম সাহেব বলেন, প্রফেসর সাহেব, সন্ধের পর আর বাইরে থাকবেন না।

২৭

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল ? জয়নালের মনে হয় অন্ধকারের ভেতরে মাসুদার নিঃশ্বাস পড়ছে। একেবারে ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সে, জননীর পরিচিত কোলের ভেতরে যেন মুখ গুঁজে আছে এক দুহিতা যে তার অপরাধ এখন নীরবে স্বীকার করে চলেছে। জয়নালেব আরো মনে হয় সমস্ত অতীত এখন পাখির মত উড্ডীন। একদা তীরবিদ্ধ হয়েছিল একটি হাঁস। মানুষের ইতিহাসের অভ্যন্তরে, সেই হাঁস ছিল বোধিসত্ত্ব, তাই হাঁসের মাংস কোনোদিন তার মুখে রোচে নি। এবং ঢাকায় ভিড়ের ভেতরে, গরিব কেরানিকে আতংকের দিকে ক্ষণকালের জন্যে ধাওয়া করে ছুটে যায় গর্বিত ধবল হাঁস একটা শাদা ঝকঝকে গাড়ি। সেই গাড়ি কি কখনো তার হবে ?— একটা নির্মম করাত অনুভব করে জয়নাল।

একটু ঠাহর করতেই শাদা শাড়িটা চোখে পড়ে তার। জয়নাল জানে, চেয়ারের পিঠে তারই তোয়ালে ঝুলছে। তবু তোয়ালে, শুধু একটি তোয়ালে বলে বস্তুটিকে সে আর গ্রাহ্য করতে চায় না। তার প্রিয়তর মনে হয় মাসুদাব শাড়ি।

উঠে লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারত। কিন্তু ক্ষীণ এবং শীতল একটা আতংকের ধারা তার শরীরের কোষে কোষে চুইয়ে পড়তে থাকে। তার নেশা লাগে। সদ্যোজাত শিশুর মত জয়নাল চিৎ হয়ে দু'পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে তার বিছানায়।

তার ঘুম এবং বাস্তববুদ্ধি একই সঙ্গে নিঃশব্দ চিৎকার করে উড়ে যায়, যেমন জ্যোছনা রাতে কাক।

মাসুদা না হয় পরীক্ষা করেই দেখত তার, জয়নালের সঙ্গে একটি জীবন সুন্দর না হোক সহনীয় কিনা ?

কীসের দুঃখ ছিল মাসুদার ?

জয়নাল কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারে না, অমন যার রূপ তাকে কেউ কখনো ভালবাসে নি। রূপ, বহ্নি ? মানুষ, পতঙ্গ ? ধায় নি কি কোনো পতঙ্গ ? রূপ কেন বহ্নি ? মানুষ কেন পতঙ্গ ? পতঙ্গই বা কেন ধায় বহ্নির দিকে ? উপন্যাসের প্রচ্ছদে হলুদ পূর্ণ চাঁদের পটভূমিতেই বা কেন যুগল পাখি, যাদের লেজ দীর্ঘ এবং প্রান্ত ঈষৎ দ্বিখণ্ডিত ?

মাসুদা কি কখনোই স্বপ্ন দেখে নি আনোয়ারার মত রুপার আলনা আর সোনার চিরুনির ? তাও কি হয় ? অথবা হয় ?

স্মরণ হয়, শৈশবে তার একটি দীর্ঘাকাঙ্ক্ষা ছিল। এবং স্মরণ হতেই সে সাদৃশ্য লক্ষ করে আমূল বিস্মিত হয়, এই প্রথম সে সাদৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে। তার নামের শেষ অক্ষরটি বদলে 'ব' বসিয়ে দিলেই জয়নাব হয়ে যায়, যে জয়নাবের সঙ্গে জীবনে অন্তত একটিবার সাক্ষাৎ করবার প্রেরণায় কৈশোরের খোলশ সে অসহিষ্ণু হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। মহররম মাসে তার বাবার বিষাদসিন্ধু পাঠ শুনতে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে এসেছিল অনেকে, বারান্দায় বিছানো শীতল পাটির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, তারপর তার ঘুম এবং কৈশোর হরণ করে, পল্লীর ঘন আলখাল্লা একটানে ছুঁড়ে ফেলে ঝলমল করে উঠল জয়নাবের রূপ বর্ণনা। তীব্র শাদা সুবাসিত আলো ঠিকরে পড়ে জয়নাবের দেহ থেকে; দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়; একবার যে দেখেছে আবার দেখার জন্যে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু আশা মেটে না; বস্তুত দ্বিতীয়-দেখা অসম্ভব, কারণ সেই অতিরমণীর জ্যোতি চিরকালের মত অঙ্কিত হয়ে যায় অক্ষিগোলকে, মর্ত্যের মানুষ ক্ষমাহীন বাঁধা পড়ে যায় প্রথমদৃষ্ট প্রতিমার কাছে।

কৈশোর থেকে যৌবন সে, জয়নাল, অন্ধকার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা যে-কোনো উজ্জ্বল আলো দেখলেই জয়নাব এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের অসম্ভব দীর্ঘাকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ না করে পারে নি। একটি রাতের কথা মনে পড়ে, যে রাতে সে প্রবীণ কোনো এক আত্মীয়ের সঙ্গে কোথাও যাবার জন্যে মাঝরাতের ইসটিমার ধরতে শিবালয় ঘাটে এসেছিল এবং দেখেছিল ঝাঁপবন্ধ এক দোকানের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল দুধশাদা আলো জ্যোতির্ময় এক শজারু সৃষ্টি করে আছে। হ্যাজাকের আলো তার অপরিচিত নয়, যাত্রা এবং মেলা বসলে হ্যাজাক-ধরানো দেখা ছিল তার দুর্মর নেশা, তবু সে রাতে শিবালয়ের ঘাটে সে হ্যাজাকের আলো হ্যাজাকের আলো বলে গণনা করতে পারে নি। স্তম্ভিত অন্ধকার এবং গতিশীল স্তব্ধতার নাভিকেন্দ্রে সে তখন উপস্থিত বলে ধারণা করে; গড়ানো শিলার মত আকৃষ্ট হয়ে দোকানটির দিকে ছিদ্রপথে উঁকি দেয় জয়নাবের সন্ধানে। বহুদিন পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল প্রবীণ আত্মীয়টি পরমুহূর্তেই যদি তার জামা ধরে টেনে না আনতেন তাহলে সে রাতেই জয়নাবকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারত।

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল ? কীসের তাড়নায় মানুষ একটি গড়ানো শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায় ? কীসের তাড়নায় মানুষ স্বেচ্ছায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় আর কখনো ফিরতে পারবে না জেনে এবং ভালভাবেই তা জেনে ?

জয়নালের এ জীবন ভাল লাগে না, জীবন তার কাছে অসম্পূর্ণ একটি খেলনা বলে মনে হয়; তবু তো সে এই খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দেবার কথা, ফিরিয়ে দেবার কথা, ভেঙ্গে ফেলবার কথা ভাবতেও পারে না। ভাবতেও তার গায়ে হিমকাঁটা দিয়ে ওঠে, আকাশ নক্ষত্র-বমন করতে থাকে, তার ঠোঁটের ওপর মুহূর্তে স্বেদ ফুটে ওঠে, পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, রমনার সবুজ বুক দিয়ে ঠেসে ধরে রাখতে সে ছুটে যায় যেন সেই মাঠ হঠাৎ পাখা পেয়ে উড়ে না যায়।

না হয় জয়নালের মত ক্লাশের সবচেয়ে কম মেধাবী, গরিব ও নিঃসঙ্গ তাকেই সে, মাসুদা, ডাক দিত। মৃত্যুর তুলনায় অন্তত কম অতল হতো সেই আশাহীন সমর্পণ।

হঠাৎ বাতাস বুঝি।

তোয়ালেটা নড়ে ওঠে।

যেন মাসুদা চলে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়। একটি সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যায়। তখন ধড়মড় করে উঠে বসে জয়নাল।

সে নিজে কি কখনো আত্মহত্যা করতে পারবে?

ঢাকার প্রতিটি চেনামুখের জন্যে তার ঈর্ষা দুলে ওঠে। সড়কের উজ্জ্বল আলো, যে সড়ক সোয়া দু'শ মাইল দূরে, তাকে উপহাস করতে থাকে স্তিমিত তীক্ষ্ণ চোখে। ঝকঝকে গাড়িগুলো তাকে নাজেহাল করে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে যায়। ক্লাশের সবচেয়ে মোহময়ী মেয়েটি, সালমা, তার কালো লিপস্টিক ভেজানো টসটসে ঠোঁট অতি ধীরে খুলে শাদা বিদ্যুতের মত দাঁত মেলে ধরে।

তবুও তো সে আত্মহত্যা করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

মাসুদা কেন আত্মহত্যা করেছিল?

অচিরে একটি চিৎকার শোনা যায়।

প্রথমে মনে হয়, তার আত্মার ভেতর থেকে তারই অস্তিত্ব চিৎকার করে উঠেছে মহাজাগতিক ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে।

পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙ্গে তার।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের ওপর দিয়ে, উড়ন্ত পিরিচের মত অপার্থিব দ্রুতগতিতে, মানুষের জীবনপ্রেমকে তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, দূরের ঘন অন্ধকার পরিহিত জঙ্গলের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার দ্বিতীয়বার এসে তার করোটির ভেতর আছড়ে পড়ে।

সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

২৮

অপরাপর দিনের মত ভোরবেলায় সে মাঠ পেরিয়ে সোবহান সাহেবের বাসায় যায়। বাইরের ঘরের দরোজা সে আগের মত খোলা পায়। আগের মতই ভেতরে ঢুকে সে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। এবং প্রতিদিনের মতই তার উপস্থিতি জানান দেবার জন্যে সে বার দুয়েক গলা পরিষ্কার করে।

ভেতর থেকে সোবহান সাহেবের শ্লেষ্মাজড়িত সাড়া পাওয়া যায় একই বাক্যে, এসে গেছেন নাকি?

আজো সোবহান সাহেব নিজেই কাঠের ট্রে বয়ে নিয়ে আসেন। সেই এক মুড়ি, আখের গুড় আর চা তিনি নামিয়ে রেখে অপরাপর দিনের মত পাশের চৌকির ওপর পা তুলে বসেন এবং একই সংলাপ 'আ-হ, রাতে ভাল ঘুম হয় নাই' বলে এক থাবা মুড়ি তুলে নিয়ে আধবন্ধ মুঠি নাচাতে থাকেন। তারপর খপ করে খানিকটা মুড়ি মুখের গহ্বরে ছুঁড়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালায় সশব্দে চুমুক দেন।

জয়নালের হাতে তার নিজের চায়ের পেয়ালা আজ অত্যন্ত ভারি বোধ হয়। সম্ভবত সে কারণেই শূন্যে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, আবার ট্রের ওপর নামিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। আবার সে হাতে তুলে নেয় পেয়ালা এবং এবার লক্ষ করে তার হাত খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে। পাছে সোবহান সাহেবের চোখে পড়ে যায়, চায়ের তৃষ্ণা উপেক্ষা করেই সে পেয়ালাটিকে চূড়ান্তভাবে নামিয়ে রাখে এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উপস্থিত ব্যক্তির দিকে তাকায়।

জয়নাল অপেক্ষা করে হয়ত সোবহান সাহেব নিজেই প্রথমে প্রসঙ্গটা তুলবেন। কিন্তু সে হতাশ হয়। একবার সে ভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলবে কিনা, যেমন, ভূধর সরখেলের ব্যাপারটা— সত্যি সত্যি লোকটি ভারতের দালাল কি? কিন্তু অবিলম্বে সে আবিষ্কার করে যে বিষয়টি তার চেতনায় এখন প্রোথিত হয়ে আছে তা-ভিন্ন অন্য কোনো প্রসঙ্গের জন্যে উচ্চারণ-শক্তি সরবরাহ করতে তার কণ্ঠনালী নিতান্তই অনিচ্ছুক।

অতএব জয়নাল আত্মসমর্পন করে।

কাল রাতে কিছু শুনেছেন নাকি?

চমকে ওঠেন সোবহান সাহেব।

কী, কী শুনব?

কারো চিৎকার?

চিৎকার?

হ্যাঁ, চিৎকার।

সময় নেন না সোবহান সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, কই, না। শুনি নি তো। কখন?

ঠিক বলতে পারব না। অনেক রাতে।

স্তব্ধ তার একটিমাত্র মুহূর্ত বহুগুণ বর্ধিত বলে বোধ হয় জয়নালের। সোবহান সাহেবকে অকস্মাৎ অন্য কেউ বলে মনে হয়। মৃদু বিস্ময়ের সঙ্গে সে আবিষ্কার করে মানুষের ভেতরে একাধিক মানুষের বাস।

বহুদূর থেকে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠেই যেন সোবহান সাহেব প্রশ্ন করেন, কী রকম চিৎকার বলুন তো, প্রফেসর সাহেব।

এই মানুষটিকে সে এখন চিনতে পারছে না, তাই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া কর্তব্য কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে জয়নাল।

সোবহান সাহেব আবার প্রশ্ন করেন, কী শুনছেন আপনি?

জয়নাল তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং লক্ষ করে যে সোবহান সাহেবের ভেতরে আগন্তুকটি নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে, পরিচিত মুখটিই তার দিকে এখন ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে।

জয়নাল উত্তর দেয়, মনে হলো একটি মেয়ে।

বাচ্চা মেয়ে?

না। বাচ্চা নয়।

তাহলে?

কোনো বৌ-ঝি মনে হলো।

সোবহান সাহেব তখন দু'হাতের তেলো উলটে বলেন, নাহ, আমি তো কিচ্ছু শুনি নি, জয়নাল সাহেব। কোন দিক থেকে চিৎকার ?

জয়নাল খোলা দরোজা দিয়ে আঙুল তুলে মাঠের শেষ প্রান্ত দেখিয়ে দেয় নীরবে। হতভম্ব হয়ে সোবহান সাহেব সেদিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে বলেন, বলেন কী ? ওদিক থেকে কে চিৎকার করবে ? ওদিকে তো বিরান পাথার। মানুষের বসতি নেই। এ তো ভারি আশ্চর্য। ভারি চিন্তার কথা বললেন। আপনি ঠিক শুনেছেন তো ?

হ্যাঁ, মনে তো হলো তাই। মানুষের চিৎকার বলেই মনে হলো।

না, আমিও শুনি নি, আমার স্ত্রীও শোনেন নি। শুনলে উনি নিশ্চয়ই বলতেন, আমাকে জাগিয়ে দিতেন। একটু চিন্তা করে তিনি যোগ করন, আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে আরো অনেকেই শুনেছে নিশ্চয়। জিগ্যেস করে দেখতে হয়। তারপর জয়নালের দিকে সরুচোখে অনেকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকেন সোবহান সাহেব। জয়নাল অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে নগ্ন মনে হয় হঠাৎ, নিজের শরীরের দিকেই সে চঞ্চল অনুসন্ধানী দৃষ্টিপাত করে, যেন তার শরীরটা হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেছে কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। চমকে ওঠে যখন সোবহান সাহেব প্রায় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করেন, আপনি শুনলেন, আশ্চর্য, আমরা কেউ শুনলাম না।

জয়নালের এরকম মনে হয়— বিনা যুদ্ধেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। সে এখন এতটুকু বিস্মিত হবে না যদি তাকে ধারাল ছুরিতে খণ্ড খণ্ড করবার জন্যে সমুখে বসে কেউ ছুরিতে শান দিতে থাকে। সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল নিজের হাতের ওপর সোবহান সাহেবের হাত টের পেয়ে। কী শীতল হাত! তার হাতের ওপর এক মুহূর্ত হাত রেখেই সোবহান সাহেব নিজের হাত টেনে নেন। বিযুক্ত হয়ে যাবার পরও জয়নাল তার হাতের ওপর অনুভব করতে থাকে একখণ্ড বরফ, জ্বালাকর একটি শীতলতা।

খুব ভয়ের একটা কথা আপনি বললেন, জয়নাল সাহেব।

কী বলছেন ?

জয়নালের এমন বোধ হয় তার কানের ভেতরে হঠাৎ একটি মৌমাছি গুঞ্জন করতে শুরু করেছে। চারদিকে একটা দেয়াল তুলে দিচ্ছে এই ক্ষুদ্র শিঞ্জিত ধ্বনিগুলো।

সোবহান সাহেব ঈষৎ বিরক্ত হয়েই আবার বলেন, বলছিলাম, তাহলে তো খুব ভয়ের কথা হয়ে গেল।

কেন ?

কেন আবার ? জন্তুটা নিশ্চয়ই কাল রাতে হানা দিতে বেরিয়েছিল। এ তো ভারি মুশকিল হলো। ব্যাপারটা আর উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

এই শেষ বাক্যটি জয়নালকে পড়ন্ত অবস্থা থেকে খোঁচা দিয়ে খাড়া করে দেয়। সেই গুঞ্জন থেমে যায়। সোবহান সাহেবের ভেতরে সে তার নিজের একটা ক্ষণস্থায়ী প্রতিফলন দেখতে পায় যেন। বলে, আপনিও কি তাহলে জন্তুটার কথা প্রথমে অবিশ্বাস করতেন ?

তার কণ্ঠের ব্যাকুলতা সোবহান সাহেবের শ্রুতি এড়ায় না। ক্ষণকালের জন্যে তাঁর ভ্রু

উত্তোলিত হয়ে থাকে। তিনি বলেন, প্রথমে তো আমি গ্রাহ্যই করি নি। এখানে সব অশিক্ষিত মানুষের বাস। বনবেড়াল দেখলেই বাঘ বলে চিৎকার করে ওঠে। কমদিন তো এখানে আমার হলো না। তারপর, বললে বিশ্বাস করবেন না, একাত্তর সালের পর থেকে মানুষের কী হয়েছে, মানুষ আগের তুলনায় অসম্ভবে বিশ্বাস করে অনেক বেশি এখন। কেন করে তা বলতে পারব না। তবে আবছা করে আমার মনে হয়, রেঁনেসার সময় মানুষের মন যখন সত্য আবিষ্কারে উন্মুখ তখন যে-কোনো সম্ভবপরতাকেই প্রশ্রয় দেয় সে, আবার মানুষের পৃথিবী যখন চারদিক থেকে বুঁজে আসে, মানুষ যখন বাইরের শক্তিকে তার ভেতরের শক্তির চেয়ে প্রবলতর বলে অনুভব করতে থাকে, যখন সে বাইরের কিছুই আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখনও যে-কোনো সম্ভবপরতাকে সে সমান উৎসাহে প্রশ্রয় দেয়। প্রথম পরিস্থিতিতে মানুষ সেই সম্ভবপরতাকে পরীক্ষা না করে স্বস্তি পায় না, দ্বিতীয় বা বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো কিছু পরীক্ষা করে না দেখাটাই সাধারণ নিয়ম।

ক্লাশে পড়াবার মত গলায় এতখানি বলে নিয়ে সোবহান সাহেব হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলেন। শ্রোতার প্রতি ক্রুদ্ধ বলে বোধ হয় তাঁকে। জ্বলন্ত চোখে তিনি কিছুক্ষণ জয়নালের দিকে তাকিয়ে থেকে অচিরে সংবিত ফিরে পান এবং অনাবশ্যক কিছুটা হেসে অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, তারপর এও তো শোনা গেল কাল নাকি জন্তুটা এক পাগলিকে আক্রমণ করেছিল। সে না হয় পাগল বলে তার কথায় অতটা আমল দিই নি। কিন্তু এখন আপনি বলছেন আপনি শুনেছেন।

আমি জন্তুটার কথা বলি নি। মানুষের চিৎকার শুনেছি।

আহা, একটা মানুষ তো আর অমনি চিৎকার করবে না। চিৎকারটা কী রকম বলুন তো?

বুকফাটা চিৎকার।

অনেকক্ষণ ধরে?

অল্পক্ষণ। মোট দু'বার। তারপরই সব চুপ।

তার মানে ততক্ষণে শেষ। কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

সোবহান সাহেব চায়ে মুখ দিয়ে থু থু করে ফেলে দিলেন। এহ, একেবারে জুড়িয়ে গেছে। আরেক কাপ করতে বলি।

২৯

ক্লাশ বসবার আগে কলেজের বারান্দায় ছেলেরা জটলা করছিল। তখন মাঠ দিয়ে সালমাকে সেই নীল শাড়ি পরে, দু'বেণি দু'দিকে ঝুলিয়ে, বুকের কাছে বই-খাতা চেপে ধরে ধীর পায়ে হেঁটে আসতে দেখা যায়।

চেয়ারম্যান আসছে।

সালমার বাবা রাজারহাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সেই সূত্রে এই সাংকেতিক নাম।

কাল নতুন স্যারের সঙ্গে কথা বলছিল।

কোথায়, কোথায়?

গেটের কাছে গাছতলায়।

একা ?

হ্যাঁ, একা।

ঢাকার লোক তো, আপ-টু-ডেট সব কায়দা জানে।

কী মনে হলো ? কী কথা বলছিল ?

আরে, প্রথমদিনেই কি প্রেমের কথা বলবে ?

শালা, ওর মেয়েলি ঢং আমার পছন্দ হয় না।

বেছে বেছে সুন্দরীটার দিকে চোখ পড়েছে।

এই, চুপ, চুপ।

সালমা বারান্দায় উঠে আসে। ছেলেদের দেখে হাঁটা দ্রুততর হয়ে যায় তার। ফস করে মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে যায় সে।

আজ হাঁটা পর্যন্ত পালটে গেছে।

একদিনেই ?

আরে, এসব রঙের খেলা। একদিনেই গোলাপি হয়ে যায়।

৩০

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেবের কামরায় এসে সতর্ক চোখে দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে সোবহান সাহেব বেশ শব্দ করে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন।

স্যার, একটা কথা।

তার গলায় কী ছিল, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হঠাৎ ভয় পেয়ে যান। পায়ের তলা থেকে সড়াৎ করে মাটি সরে যাবার আকস্মিকতায় তাঁর গলা দিয়ে ঘরঘর একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোয় না।

সোবহান সাহেব সময় নেন না। দ্রুত বলে যান, হিস্ট্রির নতুন প্রফেসর। আমার মনে হয় উনি খুব ভয় পেয়েছেন। নতুন লোক। আমাদের উচিত একটা কিছু করা।

মাদকতাময় এক ধরনের আরাম বোধ করেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। বিপদ তাঁর নিজের নয়, এটা অনুভব করে বিলাসীকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন, ব্যাপার কী বলুন তো ?

আমার বাসাতেই তো উনি খাচ্ছেন। আজ সকালে নাশতা করতে এসে বললেন, কাল রাতে নাকি কোন মেয়ের চিৎকার শুনতে পেয়েছেন।

কলেজের ভেতরে ?

না, না, পূর্বদিকের ঐ মাঠ থেকে। আমিও তো কাছেই থাকি, আপনার বাসাও দূরে নয়, তারপর ধরুন তালুকদার সাহেব, আফজাল সাহেব, এদের বাসাও কাছাকাছি। চিৎকারটা আমরা কেউই শুনলাম না, অথচ জয়নাল সাহেব শুনলেন, এটা কেমন কথা ? ধরুন, আমি ছাত্রদেরও জিগ্যেস করেছি, তারা সব দূরদুরান্ত থেকে আসে, তারাও কিছু শোনে নি। অথচ উনি পরিষ্কার বললেন, শুনেছেন।

স্যার, এটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। আমার বাসায় উনি খান, আপনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, নতুন এসেছেন, আমাদেরই কলিগ, কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। তাই আপনাকে না বলে পারলাম না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মনোযোগ দিয়ে সব শুনে গেলেন।

দম নিয়ে সোবহান সাহেব আবার শুরু করলেন। তাছাড়া কাল রাতে সত্যি সত্যি কিছু হয়ে থাকলে বাজারেও শোনা যেত। আমি সেদিকেও খোঁজখবর নিয়েছি। আমার তো এখন চিন্তাই হচ্ছে, স্যার।

একে এই পাড়া গাঁয়ে ব্যাড কমিউনিকেশনের দরুন কোনো প্রফেসরই আসতে চায় না, ভয়-টয় পেয়ে ইনি যদি চলে যান তো লোক পাবেন কোথায় ? কলেজ চালানোই মুশকিল হয়ে যাবে স্যার।

রীতিমত চিন্তিত দেখায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে।

ভয় পেয়েছেন কি উনি নিজেই বললেন ?

না, দেখে আমার মনে হলো। আর জেনে রাখবেন, ভয় খুব বেশি মাত্রায় হলে লোকে নানা রকম জিনিস চোখে দ্যাখে, নানা রকম শব্দ কানে শোনে।

হুঁ।

আপনি লক্ষ করে দেখবেন, চোখ মুখও কেমন অ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছে স্যার। মনে হয় কী একটা ঘোরের মধ্যে আছেন।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার কিন্তু ধারণা ছিল লোকটা সাহসী না হলেও ঠিক ভয় পাবার মত নয়। জন্তুটার কথা তো বরাবরই দেখছি সে অবিশ্বাস করে আসছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে কয়েকবার কথাও হয়েছে। কাল না পরশুদিন ? আমি তো সেই রকম আইডিয়াই পেয়েছি।

মনে হয় এখন আর অবিশ্বাসটা নেই।

নিজ মুখে বলেছে কিছু ?

জন্তু নিয়ে কোনো কথা হয় নি অবশ্য। তবে ধরুন, মানুষের ভাবভঙ্গিতে তো বোঝা যায় ?

তা করতে বলেন কী ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গলায় যেন বিরক্তিরই আভাস পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে মানুষ পথ দেখতে না পেলে বিচলিত হবার বদলে ক্ষেপে গিয়ে থাকে।

টেবিলের ওপর একটা মোটা বইকে তিনি পাশের তাকে সশব্দে রেখে দিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলেন, এ তো আর ছেলেমানুষ নয়। একটা বয়স্ক লোক ভয় পেলে করবার কী আছে ?

তা ঠিক। তবু, নতুন লোক। ধরুন, আমাদের একটা কর্তব্য। চলে গেলে নতুন প্রফেসর পাওয়াটা সে আরেক মুশকিল।

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে যায়। দু'জনেই একসঙ্গে প্রসঙ্গটার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যান।

৩১

ভূধর সরখেলকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখায়।

জয়নাল বলে, টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেছে। আমার ক্লাশ আছে।

জয়নাল দ্রুত পায়ে কলেজের দিকে এগোয়। এনভেলপ কিনতে ডাকঘরে গিয়েছিল সে, পথে তাকে পাকড়াও করে ভূধর সরখেল।

এখন জয়নালের সঙ্গে সঙ্গে আসে লোকটা। বলে, আপনি বলেই কথাটা বললাম। গান শোনার মেশিনটা সাবধানে রাখবেন। এখানে চোরের উপদ্রব। আমার এই এক বস্ত্র ছাড়া কিছু নেই। দু'বার হারমোনিয়াম চুরি যাবার পর এখন আর কেনার কথা ভাবতেও পারি না।

জয়নালের অবাক লাগে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুভাশুভ নিয়ে লোকটির উৎকণ্ঠার মাত্রা দেখে। তার এরকমও সন্দেহ হয় একবার, ভূধর সরখেল নিজেই হয়ত যন্ত্রটা সরাতে চায়, কিন্তু তাই যদি হয় মালিককে সাবধান করে দেবে কেন ? নাকি, লোকটি অতিশয় ধূর্ত ?

কলেজ গেটের কাছে এসে জয়নাল ঘুরে দাঁড়ায়। তার ঘুরে দাঁড়ানোয় ভূধর সরখেল যেন হকচকিয়ে যায়।

জয়নাল বলে, আচ্ছা, আপনার সম্পর্কে যে শুনতে পাই, সত্যি ?

ফ্যালফ্যাল করে শ্রোতা তাকিয়ে থাকে।

কী শুনতে পান ?

জয়নাল বিস্তারিত আর কিছু বলে না।

তখন ভূধর সরখেল নিজেই বলে, আমার অভাব বেশি বলেই হয়ত কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভগবানের নাম করে বলছি, হারমোনিয়াম বিক্রি করে আমি খাই নি, ওটা সত্যি সত্যি চুরি হয়, বাঁয়া তবলাও চুরি হয়েছিল। ছাত্রীরা আমাকে সারাতে দিয়েছিল। দোষের মধ্যে জিনিস দুটো আমার বাড়ি থেকে চুরি হয়, আমার তেমন টাকা থাকলে ছাত্রীদের দাম দিয়ে দিতাম। তাদের বাবারা আমাকে চোর বলে, আরো অনেক কিছু বলে, আপনাকেও নিশ্চয়ই বলেছে, কিন্তু আমি চোর নই।

ভারতের দালাল ?

এক মুহূর্ত কোনো কথা সরে না ভূধর সরখেলের মুখে। জয়নাল লক্ষ করে তার ক্লাশে মেয়েরা এখন ঢুকছে। আর দেরি করা চলে না তার, তবু সে প্রশ্নের উত্তর পাবার অপেক্ষা করে এবং অনন্ত সময় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভূধর সরখেল নিস্তেজ গলায় বলে, আপনি গান ভালবাসেন বলেই আপনাকে বলা যায়, মানুষ আসলে বড় অসহায়। ভালবাসায়, ঘৃণায়, সন্দেহে, অবিশ্বাসে— মানুষের মত অসহায় আর কেউ নয়। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি ক্লাশে যান।

৩২

দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সালমা স্মিতচোখে মুখ নামিয়ে নেয়। তখন আবার তাকে শিশুর মত দেখায়। সারল্যের এই আবিষ্কার তাকে আরো একবার বিস্মিত করে।

কাল বিকেলেও সে এই বিস্ময় বোধ করেছিল।

জয়নাল আরো একবার স্মরণ করে, এই মেয়েটিরও নাম সালমা। কত আলাদা দুই সালমা। কত দূর রাজারহাট আর ঢাকা।

ওষুধের মত কাজ করে এই বিস্ময়। কাল রাতে চিৎকার সে কেবল একাই শুনেছে, এটা *উপলব্ধি করবার পর তার মাথার ভেতরে অবিরাম কয়েকটি জাঁতা ঘুরছিল। আর প্রতি ঘূর্ণনে সমস্ত কিছু গুঁড়ো হয়ে কেবলি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল। একই সঙ্গে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু বাস্তব এবং বিভ্রম বলে বোধ হচ্ছিল তার। এবং পাটের পচা গন্ধটিতে আবার তার মনে* হচ্ছিল পৃথিবীর শরীর থেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে পচে যাওয়া মাংস বিরাট একেকটা চাঙ্গার হয়ে খসে খসে পড়ছে। এখন সালমার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র আশ্চর্য দ্রুতগতিতে আরোগ্যলাভ করে সে। কাল রাতে আদৌ সে চিৎকারটি শুনেছিল কিনা, এ তর্ক তাকে আর দ্বিখণ্ডিত করে রাখে না।

উৎসাহের সঙ্গে সে পড়াতে শুরু করে। নিজের বক্তৃতায় নিজেই সে মুগ্ধ হয়ে যায়। সালমার নীল শাড়ি তার চোখের জন্যে স্নিগ্ধ একটি আশ্রয় হয়ে থাকে। অনবরত তার দৃষ্টি সালমার ওপর ফিরে ফিরে আসে, সে চায় না তবু ঘটে যায়, এবং অবিরাম আশা করে সালমার মুখে হয়ত আবার সেই শিশুর সারল্যটুকু সে আবিষ্কার করতে পারবে।

ঘণ্টা পড়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ সে বক্তৃতা চালিয়ে যায়। সুস্থির একটা উপসংহারে এসে সশব্দে বই বন্ধ করে, ছাত্রসমাজের দিকে নির্মল হাসি ছুঁড়ে সে চপল পায়ে শিক্ষকদের বসবার ঘরের দিকে চলে যায়। যেতে যেতে কোনো সূত্র ছাড়াই তার মনে পড়ে যায় ভূধর সরখেলের মুখ। লোকটিকে কটু কথা বলেছে বলে তার খেদ হয় এবং মনে হয় সে একটি নতুন অভিজ্ঞতার সমুখে— এর আগে কখনো কারো কাছে তার মার্জনা চাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। অন্য সময় হলে, অন্য সময়টা কী তা স্পষ্ট নয়, মার্জনা চাইবার সঙ্গে যে লজ্জা জড়িত তা তাকে ম্রিয়মান করত অবশ্যই, এখন সে আবিষ্কার করে— কল্পনাটি তার দেহকে লঘু এবং চিত্তকে উন্নত করেছে।

জয়নাল চলে যেতেই ছাত্রদের ভেতরে ফিসফিস শুরু হয়ে যায়।

কেমন, বলেছিলাম না ?

চোখ আর ফেরাতে চায় না।

নির্লজ্জ।

একটি ছেলে ছড়া কেটে ওঠে, চেয়ারম্যান খাইল, হায় হায় পড়িল।

সালমা পালাবার পথ পায় না।

৩৩

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব বেয়ারাকে ডাকেন।

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সালাম দাও।

সোবহান সাহেব ভীষণ ব্যগ্র হয়ে ঘরে ঢোকেন।

কী যে সব রিপোর্ট দেন।

কেন স্যার ?

জয়নাল সাহেব তো দিব্যি নর্মাল দেখলাম। অ্যাবনর্মাল কিচ্ছু নেই। এই তো একটু আগে এ ঘরে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে চমৎকার কথা বলে গেলেন। জিগ্যেস করলাম, কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বললেন, কিচ্ছু নেই।

রাতে চিৎকারটার কথা জিগ্যেস করেছিলেন ?

একটু হকচকিয়ে যান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

না, তা করি নি।

সোবহান সাহেব এবার পায়ের নিচে মাটি পাবার উল্লাসে বলেন, অনেক সময় দেখবেন, মানুষ বেশি ভয় পেলে অস্বাভাবিক রকমে স্বাভাবিক হয়ে যায়, স্যার।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে।

বাজারে একটি লোক খবর আনে, আজ দুপুরে ব্যাং মামুদ মারা গেছে। সে জ্বরে মারা গেলেও, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে প্রাণত্যাগ করলেও অচিরে রটে যায় যে, আসলে সে জন্তুটির হাতেই শেষ হয়েছে।

তার ঘরের আশেপাশে কি জন্তুটিকে দেখা গিয়েছিল ?

একজনের অভিমত, জন্তুটি ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। প্রায় সকলেই কথাটি স্বীকার করে নেয়। অকাট্য প্রমাণ এই যে, গতকাল বাজারের পেছনেই জন্তুটি এসে হাজির হয়েছিল, কিন্তু কখন কীভাবে খোলা মাঠ ভেঙ্গে হাজির হয়েছিল কেউ দেখে নি। অদৃশ্য হবার ক্ষমতা না থাকলে আদৌ এটা সম্ভব হতো না।

চাওয়ালা এবং মনোহারী দোকানদার দু'জন এই মতের পক্ষে সরবে সম্পূর্ণ সমর্থন দান করে। তারা নিজেরাই দেখেছে, মুহূর্তের ভেতরে জন্তুটি কীভাবে গতকাল বেমালুম মিলিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময়ে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া এসে চা দোকানের বেঞ্চের ওপর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসার মত দু'দিকে পা ঝুলিয়ে বসে সমবেত জনতার উদ্দেশে বলতে শুরু করে, তাহলে শোনো। আল্লার আলমে দুই কিসিমের জীব আছে। এক, মাটি দিয়ে তৈরি; আরেক, আগুন দিয়ে তৈরি। কোরানের তিরিশ পারার ভেতরে, সুখি মিয়ার বক্তব্য, বিশ পারার অধিকার আছে আগুন দিয়ে যারা তৈরি, তাদের। তারা ঐ বাকি দশ পারার জন্যে মানুষকে হিংসা করে। নানা রকম রূপ নিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। তাদের সে চেষ্টার শেষ নেই। কে জানে, জন্তুটা সেই আগুনওয়ালাদেরই কেউ কিনা।

সুখি মিয়া এভাবে সমবেত প্রত্যেকের বাকশক্তি হরণ করে নাটকীয়ভাবে উঠে দাঁড়ায়। সিলকের পানজাবিটা বুকের ওপর অনাবশ্যকভাবে মসৃণ করে নেয় সে স্বাদু আলস্যের সঙ্গে। তারপর সড়ক দিয়ে ধীর গতিতে চলে যায়। অতিরিক্ত দশ পারার অধিকার সংবলিত বলেই সে আগুনওয়ালাদের ভয়ে উদ্বিগ্ন নয়, নইলে তার এই সুস্থিরতার আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে, জনতার জানা নেই।

অনেক সময় সমবেত একদল মানুষ একক একটি দেহে পরিণত হয়ে যায় এবং অজ্ঞাত কারণে তাদের ভেতরে একসঙ্গে একই প্রতিক্রিয়া হয়।

এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই চমকে উঠে নিজের পেছন দিকে তাকায়। তাদের মনে হয়, জন্তুটি **অদূরেই সূক্ষ্ম দেহে ওঁৎ পেতে আছে।**

৩৫

বাবলা গাছের নিচে আজ সালমা নয় অন্য মেয়েটি অপেক্ষা করে। জয়নাল তার ঘরের জানালা দিয়ে এতক্ষণ বাবলা গাছের দিকেই তাকিয়েছিল। এতক্ষণ গাছতলা শূন্য ছিল। তারপর সে একটা সিগারেট ধরাতে মুখ ফিরিয়েছে, আবার তাকিয়ে দ্যাখে, মেয়েটি। প্রায় ভোজবাজির মত। এই নেই, এই আছে।

কিছুক্ষণ আগে সে ঢাকায় তার পুরনো জায়গিরদারের কাছে চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল। তার জিনিসগুলোর কী হবে, ঠিক কবে পর্যন্ত সে সরিয়ে নিতে পারবে, আদৌ পারবে কি না, অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় চিঠিটা আর শেষ হয় নি। এখন মনে হয়, মেয়েটি গাছতলায় সালমারই অপেক্ষা করছে'। তার কাছে এটা রহস্যময় মনে হয় যে, মেয়ে দু'টি কখনোই কলেজ থেকে একসঙ্গে বেরোয় না কেন ? অন্তত গতকাল এবং আজ সে দেখেছে একজনকে অপেক্ষা করতে, তারপর আরেকজন এসে যোগ দিতে। আজ এখনো সালমা এসে পৌছোয় নি, কিন্তু এসে যে যাবে তা অনিবার্য বলেই জয়নাল ধরে নেয়।

সে ঘর থেকে বেরোয়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, আজ আর বেরুবে না। এখন সে এক ধরনের টান অনুভব করে। ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে তার। যুবকেরা রোজ কেন ইস্টিশানে গিয়ে ঘোরাফেরা করে, কীসের সন্ধান করে, এতকাল সে বুঝতে পারত না; আজ তার ধারণা হয়, গূঢ় কোনো কারণ আছে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করে, মানুষের প্রত্যাশাগুলো আদৌ স্পষ্ট নয়; মানুষ অবিরাম এক কী-হয়-কী-হয়-এর ভেতরে বাস করে, বস্তুত সে জানে না কোন পথে পূরিত হবে, তাই তাকে সম্ভাব্য সকল পথ পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

মাঠের ঘাস ভেঙে, টুক করে নালাটা লাফ দিয়ে পার হয়ে সে বাজার ও ইস্টিশানের পথ নিতে পারত। কিন্তু সে রীতিসম্মত পথটাই বেছে নেয়। বারান্দা থেকে নেমে লাল সুরকির পথ ধরে সে গেটের কাছে পৌছোয়।

অপেক্ষা করছ ? ইতস্তত করে সে যোগ করে, সালমার জন্যে ?

মেয়েটি বেশ চটপটে। আজ তার মুখের উজ্জ্বলতাটুকু ঝলমল করে চোখে পড়ে জয়নালের। তার মনে হয়, অনেক মুখ আছে যা প্রথম দেখাতেই দেখা যায় না।

হ্যাঁ, স্যার। ক্ষণকাল থেমে মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করে, বেড়াতে যাচ্ছেন ?

দেখি।

অনির্দিষ্ট এই উত্তরটা দিয়ে জয়নাল পথ নিতে পারত। কিন্তু নেয় না। চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে, নাক তুলে বাতাসের ঘ্রাণ নেয় সে, তারপর ভ্রু কুঞ্চিত করে ইস্টিশানের দিকে তাকায়।

তোমার নামটা যেন কী ?

খোদেজা খাতুন, স্যার।

জয়নাল কি একবার জিগ্যেস করবে, দু'জনে একসঙ্গে কলেজ থেকে বেরোয় নি কেন ? জিগ্যেস করবে, সালমা কোথায় ? কী করছে ? গতকাল যখন সালমা এখানে অপেক্ষা করছিল তখন খোদেজাই বা কলেজের ভেতরে কী করছিল ?

জয়নাল হঠাৎ লক্ষ করে মেয়েটি তার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। সেই সঙ্গে তার ভেতরে কীসের একটা উদ্বেগও যেন অনুভব করা যায়। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর দৃষ্টিকে সেখানেও নিরাপদ মনে না করে, দূরে কলেজের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

জয়নাল নীরবে খোদেজার পাশ কাটিয়ে ইস্টিশানের দিকে নেমে যায়। যেতে যেতে পচা মাংসের ঘ্রাণ তাকে নিয়ে ছলনা করছে, সে দেখতে চায়। এই আছে, এই নেই। ডান দিক থেকে আসছে, ডান দিক থেকে মুখ ফেরাতেই বাঁ দিক থেকে অতি ধীরে এসে লতিয়ে ধরছে; আর সে যেন অবিরাম সেই বিপুল ক্ষতের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার যাবার ইচ্ছে নেই; কিন্তু ইচ্ছের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে ফেলেছে; কিন্তু আবার এটাও মনে হচ্ছে অচিরেই, এই বাঁকটা পেরুলেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সে ফিরে পাবে। ফিরে পাবে, এই বিশ্বাসটা এখনো আছে বলেই ভেতরটা নিরুদ্বেগ। নিরুদ্বেগ, কিন্তু কোথাও যেন কী একটা টিপটিপ করে চলছে, যেন একটা আঙুল বিরতিহীন মৃদু তাল দিয়ে চলেছে।

বাজারে দাঁড়িয়ে সে এক পেয়ালা চা পান করে। তারপর ইস্টিশানে গিয়ে নির্জন একটি জায়গা বেছে নিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে সে কী একটা গভীরভাবে ভাবছে, কিন্তু সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার প্রসঙ্গটি সে আর সনাক্ত করতে পারে না। তার পরিবর্তে অস্থির ভেতরে সে অতল এক শূন্যতা অনুভব করে ওঠে। কেবল শূন্যতাই নয়, সে লক্ষ করে, শূন্যতার শরীরে সূক্ষ্ম তুরপুনের মত হতাশা ছিদ্র কেটে চলেছে।

অবিলম্বে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেন আসবার আর বেশি দেরি নেই। প্ল্যাটফরমে মানুষ জমে উঠতে শুরু করেছে। ফেরিওয়ালা ছোকরাগুলো এরি মধ্যে পায়চারির মহড়া দিতে শুরু করেছে। পয়েন্টম্যান লণ্ঠন ধরিয়ে দূরের সিগন্যালের দিকে হাত দুলিয়ে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ সমস্ত কিছুই জয়নালের কাছে দূরের এবং দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। সালমা এবং খোদেজা একই সঙ্গে কলেজ থেকে বেরোয় না, কেন প্রতিদিনই একজন আগে বেরিয়ে অপেক্ষা করে-- তা ভয়াবহ রকমে জটিল মনে হয়। ভূধর সরখেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও সমীচীন কিনা তা সে স্থির করতে পারে না আর; বস্তুতপক্ষে লোকটিকে খল ও ধুরন্ধর বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায় এবং তার সঙ্গ আশু পরিতাজ্য বলে সে সিদ্ধান্ত করে। তারপর দ্রুত ইস্টিশান ছেড়ে সে কলেজের দিকে যাত্রা করে। অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে বলা যেত, পচনশীল ক্ষতের ঘ্রাণ তাকে এখন তাড়া করে চলেছে।

কিন্তু কলেজেও সে থামে না। বলা যায়, কলেজের উপস্থিতিও তার চেতনায় ধরা পড়ে না। শাদা দালানটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে লক্ষই করে না, কলেজের পাশ দিয়েই সে যাচ্ছে।

অচিরেই সে কলেজ পেরিয়ে কালভার্টের কাছে এসে পড়ে।

এই কালভার্টের ওপর ব্যাংক ম্যানেজার করিম সাহেব নিয়মিত এসে বসেন। কিন্তু আজ

তাঁকে দেখা যায় না। জয়নাল না ভেবে পারে না, করিম সাহেব তাঁর সান্ধ্য-ভ্রমণের অভ্যাসটি আপাতত মুলতুবি রেখেছেন জন্তুর ভয়ে।

তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

সে শূন্য কালভার্ট পেরিয়ে যায়। আবিষ্কারের কেমন একটা নেশা তাকে পেয়ে বসে। রাজারহাটে এসে অবধি এ দিকটায় তার সীমান্ত ছিল এই কালভার্টে স্থাপিত। আজ সে সীমান্ত পেরিয়ে যায়। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝোপ থেকে পাখিরা ফোয়ারের জলের মত সহসা উৎক্ষিপ্ত হয়। মুহূর্তের ভেতরে তারা ঝরা পাতার মত নেমে আসতে থাকে এবং পরক্ষণেই দিক পরিবর্তন করে আবার ওপরে ফিরে যায়।

পাখির চোখেও কি মানুষের অস্থির চলাচল খেলা বলে মনে হয়?

জয়নাল পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা তুলে পাখিদের গতিবিধি লক্ষ করে। নিজের অজান্তেই তার হৃদয়ের ভেতরে পাখিদের আনন্দ এবং সন্ধ্যার বিষাদ প্রবাহিত হয়ে যায়। সঙ্গমক্ষেত্রের পরও বহুদূর পর্যন্ত দুই নদীর স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ করা যায়।

তার হৃদয় এতদূর প্লাবিত হয়ে যায় যে, সে এখন ঘরে ফেরার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত মনে করে। কিন্তু ঘরের দিকে তার পা ফেরে না। একটি অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা, কেউ এই বিধান দিয়ে গেছে বলে বোধহয়। সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পা বাড়ায়। তার পা সমুখের দিকেই পড়ে, পেছনে কলেজের দিকে নয়।

৩৬

প্রফেসর সাহেব।

থমকে দাঁড়ায় সে। এবং লক্ষ করে, পথের পাশে চমৎকার একটি আঙিনা, দু'দিকে ফুলের গাছ, গাছ ঘিরে বাঁশের নিখুঁত জালি বেড়া। পথ থেকে আঙিনায় ঢোকার মুখে বাঁশের নিচু তোরণ। সেই তোরণের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় সহাস্য মুখে। মাথায় কিস্তি টুপি, গায়ে শাদা ধবধবে পাঞ্জাবি, সবুজ লুঙ্গি, পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। পা ভেজা। বোধহয় সদ্য ওজু সেরে উঠেছেন।

আমি দেওয়ান খাঁ।

রাজারহাটে নাম শুনেই কাউকে চেনার মত পুরনো হয় নি জয়নাল। প্রৌঢ়ের মুখের দিকে সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

চললেন কোথায়? এই সন্ধ্যাবেলায়?

হাঁটছি আর কী।

প্রৌঢ় সস্নেহে বলেন, বড় ধুলা।

কথাটা শুনে তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া হয়; জয়নাল চট করে পথ থেকে সরে এসে তোরণের নিচে দাঁড়ায়। এখানে খটখটে শাদা মসৃণ মাটি। পা ঝাড়তেই মিহি ধুলো আসন্ন সন্ধ্যার লাল আলোয় ওড়ে।

আপনি বোধহয় আমকে চিনতে পারেন নাই?

জয়নাল অপ্রস্তুত হয়ে প্রৌঢ়ের মুখের দিকে তাকায়।

আমি রাজারহাট ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। এ কলেজও আমিই প্রতিষ্ঠা করেছি।

জয়নাল সচকিত হয়ে ওঠে। কলেজে চাকরি করে কলেজের প্রতিষ্ঠাতাকে চেনে না, এটা তার কাছে অপরাধ বলেই মনে হয়। সে ঘাড় চুলকে বলে, কিছু মনে করবেন না, আমি নতুন এসেছি।

আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আপনার কথা শুনেছি অনেক। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব খুব তারিফ করেন আপনার। বসে যান না একটু।

দেওয়ান খাঁকে না চিনে যে অপরাধ সে করেছে, তা কিছুটা লাঘব হতে পারে ভেবে রাজি হয়।

এখনই আজান হবে। নামাজ পড়েন তো ?

জয়নাল আবার অপরাধী বোধ করে।

লজ্জা পাবার কিছু নাই। আজকাল তরুণ সমাজ আর নামাজ পড়ে কোথায় ? রক্ত গরম আপনাদের। আমরা বুড়া মানুষ, না পড়ে পারি না। ওরে, বাংলা ঘরের দরোজাটা খোলরে। আর একটা বাতি দে।

এতক্ষণ কোমল গলায় কথা বলছিলেন দেওয়ান খাঁ, এবার তাঁর উচ্চকণ্ঠের হাঁক শুনে বিস্মিত হয় জয়নাল। মুহূর্তের ভেতরে স্বর এত কর্কশ হয়ে যেতে পারে, সে কল্পনাই করতে পারে নি। লোকটিকে হঠাৎ তার কঠোর বলে বোধ হয়। আগের ঘোর কেটে যায়। সে দূরত্ব অনুভব করতে থাকে।

দেওয়ান খাঁর কণ্ঠ আবার স্নেহময় কোমলতা ফিরে পায়।

বসেন, আমি নামাজটা পড়ে আসি।

এক কিষান এসে বাংলা ঘর খুলে দিয়ে যায়। জয়নাল ভেতরে যায় না। আঙিনার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে আজান শোনা যায়। বিলাপের মত সেই ধ্বনি শুনে জন্তুটির কথা তার মনে পড়ে যায়। চারদিকের অন্ধকারের ভেতরে ক্ষণকালের জন্যে সে একটি লোমশ উপস্থিতি অনুভব করে। তারপর চারদিকের নির্জন স্তব্ধতা তাকে অবসন্ন করে যায়। চলচ্চিত্রের মত ঢাকার আলোকিত রাজপথ তার চোখের ওপর ঝলমল করে ওঠে। ঢাকা তার কাছে অন্য কোনো গ্রহের নগর বলে বোধ হয়।

জঙ্গলের মাথার ওপরে সহসা চাঁদ দেখা দেয়।

৩৭

জন্তুটির কথা মনে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম সে এক প্রকার শৈত্য অনুভব করে। এই প্রথম সে সচকিত হয়ে ওঠে। এমনকি এও তার মনে হয়, পচনশীল ক্ষতের যে দুর্গন্ধ, আসলে তা ঐ জন্তুটির রোমরাজির। কিন্তু এ ক'দিন তো এমন মনে হয় নি। এ ক'দিন তার মনে হয়েছে, পত্রিকায় বহুবার পড়া দূর কোনো মফস্বল এলাকার ঘটনা সে শুনছে— যে মফস্বল জীবনে সে চোখে দেখে নি। আজ এই পরিচ্ছন্ন সন্ধ্যাবেলায় কী এমন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় যে, সে অস্তি-র ভেতরে, ক্ষণকালের জন্যে হলেই জন্তুটির নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারে ?

তার মনে হয়, সে আর স্বাভাবিক নয়; সে কেন ?—কোনোকিছুই স্বাভাবিক বলে তার কাছে আর বোধ হয় না। বুকের ভেতরে স্পন্দন অনুভব করে, কিন্তু চেতনার ভেতরে জীবনকে সে অপসৃয়মান বলে দেখতে পায়।

পথ পেরিয়ে, মাঠের ওপরে, ঘন জঙ্গলের শরীর চেপে আসা নিরেট অন্ধকার যা চাঁদের আলোয় অতিকায় দেখায়, এখন তার কাছে সপ্রাণ বলে অনুভূত হয়। তার এমনও মনে হয়, আসলে এই অন্ধকার পাতালের একটি প্রাণী, যে দিনের বেলায় দেহ সংকুচিত করে গহ্বরে প্রবেশ করে। তারপর, সূর্য নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হয়ে স্বরূপে সে নির্গত হয় এবং বস্তুজগতকে তার তুলতুলে পেটের নিচে চেপে ধরে ক্রমশ আরো বিস্তৃত হয়।

সে বিস্ফারিত চোখে দূরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। চাঁদের আলোয় মাঠের বিচ্ছিন্ন গাছগুলোকে অন্ধকারের অগণিত তীক্ষ্ণ দাঁড়া বলে মনে হয়।

কাল রাতে যে চিৎকার সে শুনেছিল, এই যে মাঠ, মাঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, সে কি আসলে এই অন্ধকারেরই নিষ্ঠুর পেষণে মাটির আর্তনাদ ?

৩৮

দেওয়ান খাঁ চেয়ার টেনে বসে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা স্তিমিত করে বলেন, রাতে এখানেই খেয়ে যাবেন। ভেতরে বলে এসেছি। গরিবের বাড়িতে শাকভাত ভেতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নাই ?

ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে বসে থাকবেন। তাঁর ওখানেই মাসিক খাচ্ছি।

দেওয়ান খাঁ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন, কিষান পাঠাচ্ছি। বলে আসবে।

তাঁর ভঙ্গি দেখে সহজেই বোঝা যায় কী একটা বিষয়ে তিনি জরুরি ভিত্তিতে কথা বলতে চান, চলতি প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে তাঁকে বিরক্ত করেছে।

জয়নালের অনুমান ভুল হয় না।

কিষান পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেওয়ান খাঁ চেয়ারে বসবারও অপেক্ষা করেন না। চেয়ারের দিকে অগ্রসর হতে হতেই তিনি বলেন, আমাকে আপনি চিনতে পারেন নাই, দোষ আপনারও নয়। আমি নিজেই আর কলেজের দিকে যাই না।

কেন ?

সে এক লম্বা কাহিনী। আপনি নতুন এসেছেন, অন্যের কাছে শুনে ভুল ধারণা করবেন, তারচেয়ে আমার কাছেই শুনে যান। কয়েকদিন থেকেই মনে মনে ভেবেছি, আপনার সঙ্গে দেখা করব। আজ আল্লারই ইঙ্গিত, আপনি নিজেই হাজির হয়েছেন। মানুষকে কে এত্তেলা দেয়, মানুষের জানা অসাধ্য। সন্ধ্যার সময়, এক বর্ণ মিছা আপনাকে বলব না। তা ছাড়া, আমি আপনার বাপের বয়সী। এক প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমার দুঃখ কিছুটা বোঝেন, কারণ, তিনিও ভুক্তভোগী, তাঁরও অনেক দুঃখ আছে। সেই জন্যই তিনি এত বড় বন্ধু আমার, তাঁর সঙ্গেও বাজারঘাটে আর বিশেষ দেখা করি না। দেখা হলেই সরে যাই। তিনিও যান। তবে, তিনি আমার এখানে আসেন, আমিও মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে যাই।

দেওয়ান খাঁর চিন্তার প্রকাশগুলো জোনাকির মত ইতস্তত এবং বিচ্ছিন্ন। এখন পর্যন্ত কিছুই আলোকিত হয়ে ওঠে না।

জয়নাল কিছুই ঠাহর করতে পারে না। এমনকি দেওয়ান খাঁর নিচুপর্দার উচ্চারণও একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক শব্দই তার বোধগম্য হয় না। বাতাসের ফিসফিসানি বলে ভ্রম হয়। তাই সে নিজের অজান্তেই একটু ঝুঁকে পড়ে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে। তার সেই ঝুঁকে পড়াটা দেওয়ান খাঁকে উৎসাহিত করে আরো। তিনি এই ভঙ্গিটির ভেতরে জয়নালের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আবিষ্কার করেন। ফলত দেওয়ান খাঁ বহুদিনের পরিচিতের মত আন্তরিক ও উন্মুখ হয়ে ওঠেন।

চেয়ারম্যান আমি বহুদিন। আমার বাবাও ছিলেন চেয়ারম্যান। তাঁর আমলেই রাজারহাট ইউনিয়ন বোর্ড হয়, সে ইংরেজ আমলের কথা। তখন মানুষের ভেতরে এত বিভেদ, মারামারি, সন্দেহ ছিল না। আপনার হয়ত মনে হতে পারে, স্বাধীনতার আমি বিরোধী, ইংরেজের শাসন চিরকাল থাকুক সেটাই আমার মনোগত কথা। না, তা নয়, আর এ নিয়েও আমার সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমার বাবাকে নিয়ে এ সব কখনো হয় নাই। লোকে তাঁকে ভালবাসত, খোঁজ নিয়ে দেখবেন, আজকালকার কিছু কিছু যুবক ছাড়া রাজারহাটের সাধারণ মানুষ আমাকেও ভালবাসে। যুবকদের মতিগতি আমি বুঝি না; তাদের রাজনীতিতে আমি অন্তত কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না। যে রাজনীতিতে মানী লোকের অসম্মান করাই বাহাদুরির কাজ, সে রাজনীতিতে দেশের মঙ্গল নাই, প্রফেসর সাহেব। আপনি শিক্ষিত মানুষ, ঢাকার মানুষ, আপনি আমার কথা যতটুকু বুঝতে পারবেন, এখানকার কারো কাছে ততটুকু কেন, তার আধলাও বোঝার আশা আমি করি না। জীবনে অনেক দেখেছি, আল্লার হুকুম হলে এত শিগগির কবরে যাব না, আরো দেখব, আল্লা আরো দেখাবে, তবে দেশ এখন নিচের দিকেই, এটুকু অন্তত আপনি স্বীকার করবেন। কী বলেন ?

এখন পর্যন্ত আলো দেখতে পায় না জয়নাল। দেওয়ান খাঁ লম্বা এক কাহিনীর প্রতিশ্রুতি গোড়াতেই দিয়েছিলেন, সে কাহিনীর দূরতম কোনো পাড়ও তার চোখে পড়ে না।

আপনি চুপ করে আছেন ?

কই, না। শুনছি।

কয়দিন হলো কাজে যোগ দিয়েছেন ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, বোধগম্য হয় না।

এই দিন পনের।

আপনি হয়ত লক্ষ করেন নাই, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কোনো ক্লাশ নেন না।

চমকে ওঠে জয়নাল। তাই তো, দেওয়ান খাঁ না-বলা পর্যন্ত ব্যাপারটা তার চোখেই পড়ে নি। সে কৌতূহল অনুভব করে। অন্ধকার একটি দাঁড়া সন্তর্পণে তাকে যেন আলিঙ্গন করে বসে।

কী ? ঠিক বলেছি ?

দেওয়ান খাঁর কণ্ঠে উল্লাস অতি সূক্ষ্ম তারে লক্ষ করা যায়।

না, আমি ওঁকে ক্লাশ নিতে দেখি নি।

কলেজে প্রফেসর শর্ট, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অভিজ্ঞ শিক্ষক, একাই তিনি সব সাবজেক্ট পড়াতে পারেন, নতুন অবস্থায় পড়িয়েছেন, অথচ এখন তিনি ক্লাশ নেন না।

ধাঁধাটির সমাধান বের করতে জয়নাল ব্যর্থ হয়। দেওয়ান খাঁর তরফ থেকে অচিরে কোনো সূত্র উত্থাপিত হয় না। তাই সে প্রশ্ন না করে পারে না, কেন ?

তাঁকে ক্লাশ নিতে দেয়া হয় না।

চমকে ওঠে জয়নাল। জন্তুটির রোম তার শরীর স্পর্শ করে চলে যায়।

কে ক্লাশ নিতে দেয় না ?

রাজারহাটের যুবক ছাত্র সমাজ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের অপরাধ, তিনি একাত্তর সালে শান্তি কমিটির মেম্বার ছিলেন। তিনি যদি ক্লাশ নেন তাহলে আপনার ছাত্ররা ক্লাশ করবে না। আর ভাল ছাত্র যারা তাঁর ক্লাশ করতে চায়, বাপের পাট বেচা ধান বেচা টাকার দাম যারা বোঝে সেইসব ছাত্রকে তারা ভয় দেখায়, ক্লাশ করলে জান কতল করা হবে। কলেজ এখন এক আতংকের রাজত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রফেসর সাহেব।

তথ্যটা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয় জয়নালের কাছে। এরকম একটা পরিস্থিতির ভেতরে সে দু'সপ্তাহ আছে অথচ বিন্দুমাত্র কিছু টের পায় নি, ভেবে বিস্মিত হয় সে। জয়নাল জানতে চায়, তাহলে, এরপরও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তিনি আছেন কী করে ?

দেওয়ান খাঁ প্রশ্নটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কিংবা জয়নালের প্রশ্নই স্পষ্ট হয় না। দু'জনে দু'জনের দিকে পরস্পরের কাছে অবোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

জয়নাল আবার প্রশ্ন করে, ছাত্ররা তাঁর ক্লাশ করবে না, ছাত্ররা প্রাণের হুমকি দেয়, অথচ তিনি প্রিন্সিপ্যাল পদে আছেন, তাতে ছাত্রদের আপত্তি নেই, এটা কী করে হয় ?

প্রশ্নটা শুনে মাটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দেওয়ান খাঁ। এমন একটা অভিব্যক্তি তিনি সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় প্রশ্নের উত্তর এক্ষুণি তিনি দিতে পারেন, তবে দেয়া উচিত হবে কিনা সেটাই গভীরভাবে ভেবে দেখছেন। আসলে, ঘটনার ভেতরে যেটুকু কল্পনার আমদানি তিনি করেছিলেন সেটা তাঁকে এমন একটা ফাঁদে ফেলবে, তিনি আঁচ করতে পারেন নি। আনকোরা লোকের কাছে নিশ্চিন্ত মনে এতক্ষণ বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে গুম হয়ে গেলেন। তার মনের ভেতরে জয়নালের প্রতি হঠাৎ একটা ক্রোধ পাকিয়ে উঠতে চায়, সেটাকে প্রশ্রয় দেয়া কর্তব্য কিনা তা স্থির করতে না পেরে তিনি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে যান।

মাটিতে রাখা লণ্ঠনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন দেওয়ান খাঁ।

জয়নাল আবার প্রশ্ন করে, বুঝলাম না। তিনি প্রিন্সিপ্যাল আছেন কী করে ?

দেওয়ান খাঁ এবার চোখ তুলে গম্ভীর গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, তিনি আদর্শবাদী লোক; মনের জোরেই এখনো প্রিন্সিপ্যাল।

উত্তরটা সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না জয়নালের। ভাল করে ঠাহর করতে পারে না, কেবল তার অস্থি-র ভেতরে অনুভব করে আঞ্চলিক টানাপোড়েনের ভেতরে অসহায় তার অস্তিত্ব নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সে এক ধরনের অপরিচ্ছন্ন বোধ করে। তবু, শেষ পর্যন্ত ছোট্ট একটা কৌতূহল জয়ী হয়ে যায়। সে জানতে চায়, আপনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, আপনি কলেজে যান না কেন ?

চকিতে একবার জয়নালের দিকে তাকান দেওয়ান খাঁ। বলবেন কি, প্রিন্সিপ্যাল যে শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি স্বয়ং ছিলেন তার সভাপতি ?

অবলীলাক্রমে তিনি উত্তর দেন, প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই আমার কর্তব্য ছিল; তারপর দশজনের দায়িত্ব কলেজ পরিচালনা করা। তাই যাই না।

জয়নাল ভোলে নি, একটু আগেই তিনি স্থানীয় যুবক সমাজের অশিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি কোনো কোনো ছাত্র যে হত্যারও হুমকি দিয়েছে তাও বলেছেন। সেই তথ্যের সঙ্গে তাঁর বর্তমান উত্তর উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

লোকটির ওপর জয়নালের ঘৃণা হয়। এত সৌম্য চেহারার কোনো মানুষকে এতটা খল হতে সে আগে কখনো দেখে নি। এখান থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বার জন্যে সে হাঁসফাঁস করে ওঠে। তার মুখভাবে সেটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

দেওয়ান খাঁ জিগ্যেস করেন, আপনি ভাত খান কখন ?

আজ না হয় থাক।

বসেন, বসেন। গেরস্ত বাড়ি থেকে না খেয়ে যেতে নাই। শহরের মানুষ তো, এ সব মানেন না। আমরা মানি। প্রাণের টান পাবেন গ্রামে। আপনি না খেয়ে গেলে বাড়ির ভিতরে যে রাগ করবে। তাছাড়া, আপনার ছাত্রীও যে রান্না করছে।

অবাক হয় জয়নাল।

আমার ছাত্রী ?

দেওয়ান খাঁ জয়নালের হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেন। বলেন, কেন, আমার বড় মেয়ে, সালমা, সে আপনার ছাত্রী না ?

প্রথমে বিশ্বাস হতে চায় না। দেওয়ান খাঁর মেয়ে সালমা ? এক মুহূর্ত আগেও যে ক্লেদ সে সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল, এখন তা নিমেষে ধৌত হয়ে যায়।

আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে উঠে সে বলে, সালমা আপনার মেয়ে ?

উচ্চকণ্ঠে দেওয়ান খাঁ মেয়েকে ডাক দেন।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সালমা এসে দরোজার মুখে দেখা দেয়। তারার মত উজ্জ্বল মিটমিট করে তার চোখ। লণ্ঠনের আলো সত্যি সত্যি আকাশের তারা হয়ে তার চোখে ধরা দেয়।

৩৯

দেওয়ান খাঁ জয়নালকে একা ফিরে যেতে দেন না। লাঠি লণ্ঠনসহ একজন কিষানকে তিনি সঙ্গে দিয়ে দেন। সে কিষান সারাটা পথ উচ্চস্বরে কথা বলে চলে; তার একমাত্র বিষয় দেওয়ান খাঁ এবং তিনি কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে জয়নাল আজ অধ্যাপনা করছে। কলেজের কাছাকাছি এসে ভূধর সরখেলকে দেখা যায়। বলা যায়, লোকটি যেন মাটি ফুঁড়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়। জয়নালের মনে হয়, লোকটি কী যেন বলতে চায়, কিন্তু বলে না। ঠিক যেভাবে উপস্থিত হয়েছিল সেভাবেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় ভূধর সরখেল। কিষানটি তখন বিষয় পরিবর্তন করে

ভূধর সরখেলকে নিয়ে পড়ে। লোকটিকে সে পাগল বলে ঘোষণা করে।

ভূধর সরখেল সম্পর্কে এ বিশেষণটি জয়নালের কাছে নতুন।

পাগল?

কিষানটি বিস্তারিত কিছু না বলে আপন মনেই হো হো করে খানিক হাসে এবং রহস্যময়ভাবে যোগ করে, পাগল নয় তো কী? হয়ত অতঃপর সে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করত, কিন্তু ততক্ষণে কলেজ এসে গেছে; কিষানটি বিদায় নিয়ে নেয়।

জয়নাল পা ধুয়ে বিছানার ওপর বসে। ঢাকায় যে চিঠিখানা লিখতে শুরু করেছিল তা শেষ করবার সম্ভাবনা বা প্রয়োজন কতটুকু তা বিচার করতে গিয়ে অপারগ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। ঢাকাও এখন তার কাছে দূরের বলে প্রতীয়মান হয়।

সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। চাঁদের আলোয় মাঠ প্লাবিত হয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীতে একমাত্র সে আছে, আর কেউ নেই, এরকম ভ্রম হয় তার। আসলে, জন্তুটি দেখা দেবার পর সন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা ঘরে দুয়োর দিতে শুরু করেছে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আর কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ নিঃসৃত হতে দেয় না। ইস্টিশানে রাত আটটায় যে ট্রেন আসে, তা ভূতের গাড়ির মত শীতল রেলের ওপর দিয়ে গুম গুম করে চলে যায়। এরকম মনে হতে পারে যে, জন্তুটিরই চলাচল অবাধ ও নির্বিঘ্ন করে দেবার জন্যেই মানুষেরা সারারাত রুদ্ধ এবং স্তব্ধ হয়ে থাকে।

গান শুনতে ইচ্ছে করে জয়নালের। ক্যাসেটের দিকে অর্ধমনস্ক তার হাত যাত্রা করে, ঠিক তখন বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। দ্রুত ফিরে আসে হাত। জয়নাল কান খাড়া করে।

ভূধর সরখেল নয়তো?

দরোজায় করাঘাত হয়।

জয়নাল সাহেব, জেগে আছেন?

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেবের গলা।

বিস্মিত হয় জয়নাল। এত রাতে তিনি কী চান? বিদ্যুতের মত মনে পড়ে যায় তার, শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন ইনি। দেওয়ান খাঁর সঙ্গে জয়নালের আজ দেখা হয়েছে, সে খবর পেয়েই কি এত রাতে এখানে এলেন?

জয়নালের ভেতরটা কঠিন হয়ে যায়। কিছুতেই সে স্থানীয় টানাপোড়েনের ভেতরে জড়িয়ে পড়বে না— এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে দরোজা খুলে দেয়।

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রশ্ন করেন, কোথায় গিয়েছিলেন?

কোথাও না।

সে-কী? বিকেলে বেরিয়ে গেলেন, তারপর সন্ধে হয়ে গেল, আপনার ঘরে বাতি নেই, রাত দশটা বাজে তবু ঘর অন্ধকার।

কলেজ সড়কের ওপাশেই তাঁর বাসা। সেখান থেকে সরাসরি জয়নালের ঘর দেখা যায়। আমার তো ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল, সাহেব। ঘরে ছিলেন তো বাতি জ্বালেন নি কেন?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অনুসন্ধানী চোখে জয়নালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সোবহান সাহেবের কথাই সত্যি কিনা, ভয়ে জয়নাল অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে কিনা, লক্ষ করবার চেষ্টা করেন তিনি।

তাঁর সে দৃষ্টিকে ভুল বোঝে জয়নাল।

আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

এ অভিযোগ প্রিন্সিপাল সাহেব মোটেই আশা করেন নি। তিনি এখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যান যে জয়নাল স্বাভাবিক নয়।

পাগলকে ক্ষিপ্ত না করবার জন্যে মানুষ যে ধরনের সাবধানতা এবং অন্তরঙ্গ স্বাভাবিকতা অবলম্বন করে থাকে, প্রিন্সিপ্যাল সাহবে তাই করেন। সস্নেহে হেসে উঠে বলেন, না, না, অবিশ্বাস করব কেন? অবিশ্বাসের কী আছে? এটা আপনি কী বললেন? নতুন এসেছেন, মফস্বলে কখনো থাকেন নি, আমার একটা চিন্তা হয় না? তারপর এই এক জন্তু, না দেখা যায়, না টের পাওয়া যায়, ঘরে বাতি না দেখে সেও এক চিন্তা হয়ে গেল।

ঘরে একটা চেয়ার থাকলেও প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের বিছানাতেই বসে পড়েন। বেশ জুৎ করেই বসেন। একেবারে জোড়াসন হযে। বলেন, আপনি রাগ করবেন না। আপনার কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলবেন। আমি আপনার বড় ভাইয়ের মত বলে মন করবেন।

ঘণ্টাখানেক আগে দেওয়ান খাঁ নিজেকে তার, জয়নালের, বাপের বয়সী বলে উল্লেখ করেছেন; এখন ইনি আবার বড় ভাই হতে চাইছেন। জয়নালের মনে হয়, এখানকার প্রতিটি বস্তু তাকে শ্বাসরুদ্ধকর আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলবার জন্যে উদ্যত।

সে বলে, আমার কোনো প্রবলেম নেই।

প্রথমটা যেন বিশ্বাস করেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, সহাস্য অবিশ্বাসীর চোখে তাকিয়ে থাকেন জয়নালের দিকে, তারপর ছলনার আশ্রয় নেন। পরম স্বস্তি পাবার উল্লাস সৃষ্টি করতে তিনি হাতের দুই করতল আলতো করে বাজিয়ে সুরেলা গলায় বলেন, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার সত্যি খুব ভাবনা হয়েছিল. জয়নাল সাহেব। আমার স্ত্রী থেকে থেকেই বলছিলেন— দ্যাখো না কী হলো।

দেওয়ান খাঁ, তারপর ইনি, এখন এঁর স্ত্রী।

ভয়-টয় করলে না হয় আমাদের কারো সঙ্গে কয়েকদিন এসে থাকুন। রাতের বেলায় কলেজের এ দিকটা এমনিতেই বেশ নির্জন। আর নয় তো কিষান একটা ব্যবস্থা করা যায়; সে এসে আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমার ভয় করে না। একটু থেমে জয়নাল যোগ করে, ও জন্তু আমাকে কিছু করবে না।

গা শিরশির করে ওঠে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের। তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

আপনাকে কিছু করবে না, কী করে জানেন?

আমি জানি।

তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, জয়নাল প্রকৃতিস্থ নয়।

জানেন?

হ্যাঁ, ভাল করেই জানি।

ও। তাহলে তো কোনো প্রবলেমই নাই।

আছে।

কানে ঠিক শুনেছেন কিনা প্রথমে বুঝতে পারেন না প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। মূঢ়ের মত প্রতিধ্বনি করে ওঠেন তিনি, আছে ?

হ্যাঁ, আমার একটা প্রবলেম আছে। কোনো মীমাংসা করতে পারছি না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ঢোঁক গিলে বলেন, প্রবলেমটা কী ?

মানুষ আত্মহত্যা করে কেন, এর কোনো উত্তর পাই না।

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব ডান হাতের তেলো দিয়ে দু'চোখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর হাত সরিয়ে বলেন, আপনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন নাতো ?

হেসে ফেলে জয়নাল।

না। আপনি বারবার প্রবলেমের কথা বলছিলেন, ভাবলাম আপনাকেই তাহলে জিগ্যেস করে দেখি।

কেন জিগ্যেস করছেন ?

আপনি সেদিন ইউনিভার্সিটির মেয়েদের কথা বলছিলেন না ? একটা মেয়ে, তার কোনো কারণ কেউ জানে না, আত্মহত্যা করে। কীসের জন্যে করে, কার জন্যে করে, জানা যায় নি।

ভালবাসার জন্যে হবে ?

সে কাউকে ভালবাসত, শোনা যায় নি।

আপনার সঙ্গে তার আলাপ ছিল ?

না।

তাহলে আপনার তো জানার কথা না যে তার ভালবাসা ছিল কি ছিল না। তাছাড়া, চেনেন না, জানেন না, তার কথা ভেবে আপনার লাভ ?

বললে বিশ্বাস করবেন ?

বলুন।

সে বেঁচে থাকতে তার কথা কখনো ভাবি নি। মরে যাবার পর ভুলতে পারছি না।

মুশকিলের কথা।

আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। ধরুন, এই জন্তুটার কথা। যদি তাকে দেখা যেত, ছোঁয়া যেত, তাহলে মানুষ সব সময় ওটা নিয়ে এত ভাবত না, ভয় পেত না। কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না, এর জন্যেই এর থেকে নিস্তার নেই। প্রতিটি মুহূর্তের ভেতরে সে উঁকি দিচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর আড়ালে সে নিঃশব্দে বসে রয়েছে, প্রতিটি ভাবনার ওপর তার ছায়া স্থির হয়ে আছে।

মেয়েটির কথা বলছেন ?

চমকে ওঠে জয়নাল। কথাগুলো তো মাসুদার প্রসঙ্গেও সত্যি হতে পারে।

সে বলে, না, জন্তুটার কথা বলছিলাম।

৪০

পরদিন বাজারে, ইস্টিশানে. কলেজে এটাই আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে যে, গত রাতে জন্তুটির কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। রাত নির্বিঘ্নে কেটেছে। কারো কারো ভেতরে এরকম বিশ্বাস করবার প্রবণতা দেখা যায় যে, জন্তুটি এলাকা ত্যাগ করেছে। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য তাদের হবে এটা তারা নিজেরাই কল্পনা করতে পারে না, কারণ আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হওয়ায়ই এদের সর্বানুভূত অভিজ্ঞতা।

তবু যারা নিশ্চিন্ত বোধ করে— মানুষের ভেতরেও কি ব্যতিক্রম নষ্ট করে দেয়া সম্ভব ?— তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, জন্তুটি হয়ত ভাল একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং সে সুযোগটা যে-কোনো মুহূর্তে তার এসে পড়তে পারে।

পাগল যুবতী-ভিখিরি খিলখিল করে হেসে উঠলে লোকেরা চমকে উঠে তাকে ধাওয়া করে। এক দৌড়ে সে সড়কের শেষ মাথায় গিয়ে বুকের কাপড় তুলে স্তন দু'টি তুলে ধরে দেখায় এবং নির্মলকণ্ঠে আবার হেসে ওঠে।

৪১

কলেজের বারান্দায় সালমা আর খোদেজা নোটিশ বোর্ড দেখে। জয়নাল ঘর থেকে বেরুতেই তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। মেয়েরা হাত তুলে সালাম করলে সেও হাত তোলে; কিংবা তুলেছে কিনা তা সে নিজেও ভাল করে বুঝতে পারে না। ফলে দ্বিতীয়বার তাকে হাত তুলতে দেখা যায়।

তখন ফিক করে হেসে ফেলে খোদেজা। মুখ ফিরিয়ে নেয় সালমা। জয়নালের সন্দেহ থাকে না যে সালমাও হাসছে। অপ্রতিভ হয়ে জয়নাল আবিষ্কার করে, তার ডান হাতে বই বলে সালামের উত্তরে মুক্ত বাঁ হাতটাই সে তুলেছিল।

কাছে এসে বলে, বাঁ হাতে সালাম নিয়েছি বলে হাসছ ?

সালমা এবার মুখে আঁচল চাপা দেয়। পালিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করে।

খোদেজা বলে, না স্যার।

তবে ?

আপনি নোখপালিশ পরেন।

জয়নাল বাঁ হাত আবার তুলে ধরে— এবার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দেখতে, কিংবা দেখাতে। নোখটা সে লম্বা রাখে সেই কলেজে পড়বার সময় থেকে। নোখপালিশও তখন থেকেই লাগায়।

এতে হাসবার কী আছে ? মানে, হাসছ কেন ?

দূরে ছেলেদের দিকে চোখ পড়তেই জয়নাল তাড়াতাড়ি হাতটা গুটিয়ে নেয়। একেবারে ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দেয়। গম্ভীর গলায় বলে, এক্ষুণি ঘণ্টা পড়ে যাবে। ক্লাশে যাও।

কালভার্টের ওপর করিম সাহেবের সঙ্গে বসেছিল জয়নাল, হঠাৎ তার চোখে পড়ে দূরে কে যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতরে লোকটিকে বৃক্ষ বলে সহসা বোধ হয়। পচা পাটের গন্ধ আবার এসে নাকে লাগে জয়নালের। দূরে ঐ লোকটির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া গন্ধটির কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এক ধরনের উদ্বেগ তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

জয়নাল যখন উঠে দাঁড়ায় লোকটিও চলতে শুরু করে।

পেছনে থেকে করিম সাহেব বলে ওঠেন, চললেন ?

জয়নাল লোকটিকে অনুসরণ করবে কিনা, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

লোকটি দ্রুত অন্ধকারের ভেতরে মিলিয়ে যায়। তার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জয়নালের ভেতরে আবিষ্কারের আলো পড়ে। বিস্মিত হয়ে সে নামটি উচ্চারণ করে, ভূধর সরখেল।

ওখানে সে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল কেন ? সে কি দেখতে চেয়েছিল, জয়নাল এখন কোথায় ? তারপর জয়নালের ঘরে গিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারটি চুরি করবার মতলব ছিল তার ?

জয়নাল আর অপেক্ষা করে না। তাড়াতাড়ি কলেজের দিকে পা বাড়ায়।

আমাকে একা ফেলে যাচ্ছেন যে!

করিম সাহেবের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জয়নাল এগিয়ে যায়। কলেজের বারান্দাতেই দেখা পায় সে সরখেলের।

এবার সে সরে যায় না। বরং জয়নালের কাছে প্রায় ছুটে এসে ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনারা কি আমাকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন ?

কেন বলুন তো ?

জয়নাল বিস্মিত হয়ে যায় লোকটির কাতর অবস্থা দেখে। সে তাকে নিঃশব্দে আমন্ত্রণ জানায় ঘরে এসে বসবার জন্যে। কিন্তু ঘরে ঢুকেও সরখেল আসন নেয় না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে যেন লণ্ঠন জ্বালানো এর আগে কখনো সে দেখে নি।

লণ্ঠনের ফিতে সহনীয় পর্যায়ে খাটো করে জয়নাল জিগ্যেস করে, আপনাকে নিয়ে আলোচনা করছি, কেন মনে হলো আপনার ?

জয়নালকে আরো বিস্মিত করে সরখেল পাল্টা প্রশ্ন করে, চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, আপনি টের পান না ?

ষড়যন্ত্র ?

হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র। আপনার কি মনে হয় না, মানুষ আর মানুষকে বিশ্বাস করে না ? মানুষ আজকাল মানুষের কেবল ক্ষতি করতে চায় ? মানুষ কেবল তার নিজের ভাল চায় ? নিজের ভালর জন্যে মানুষ মানুষ খুন করতেও আর পেছপা নয় ?

ভূধর সরখেল যেন চেয়ারকেও ভয় করে; সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসে; বসেও যেন স্বস্তি পায় না, যে-কোনো মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার জন্যে দেহটাকে টানটান করে রাখে।

জয়নাল হেসে ফেলে।

আপনি হাসছেন ?

না, কিছু না। এমনি। মানুষকে এখনো আমি অনেক বিশ্বাস করি।

আমিও করতাম। আমিও একদিন করতাম।

এখনো করেন ?

না, করি না।

নিশ্চয়ই করেন। নইলে আমার কাছে এত কথা বলতে পারতেন না।

বোকা হয়ে তাকিয়ে থাকে ভূধর সরখেল। ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কী ভেবে আবার ধপ করে বসে পড়ে; বলে, আপনার ঐ জিনিসটা আছে না ? একটা গান শুনতাম। মানুষকে আপনি এখনো চেনেন না, প্রফেসর সাহেব। জন্তুটা যদি আমাকে ধরত, বেঁচে যেতাম।

৪৩

ইস্টিশানের পয়েন্টসম্যান পরদিন ভোরবেলায় ভিখিরির শিশুটিকে আবিষ্কার করে দূরের সিগন্যালের নিচে, ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে। শিশুর মাথা চ্যাপটা হয়ে গেছে, মুখে রক্ত জমে কালো হয়ে আছে। অনুমান করা হয়, জন্তুটি তার থাবার ভেতরে শিশুর মাথা প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরেছিল।

একই দিনে, দুপুর নাগাদ খবর পাওয়া যায়, ভূধর সরখেল গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। দু'একজন সন্দেহ করে, তার ভিটেবাড়ি কেনার জন্যে যারা চেষ্টা করছিল, তারা এতটা চাপাচাপি না করলেও পারত, হয়ত চাপেই সে আত্মহত্যা করেছে অথবা নিহত হয়েছে। শেষ সম্ভাবনাটি ছোট্ট একটি ঢিলের মত অতিক্ষীণ আলোড়ন তুলেই মিলিয়ে যায়। রাতের ট্রেনে ভূধর সরখেলের লাশ জলেশ্বরীর লাশ কাটা ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

৪৪

আপনার দাওয়াত আছে। প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান জয়নালের কাঁধে হাত রেখে বলেন। এই প্রথম তিনি এত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে জয়নালকে সম্বোধন করেন।

কোথায় ?

তার হাত না নামিয়ে, বরং আরো স্নেহের সঙ্গে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলেন, চমকে উঠলেন যে ? আপনার ভাবি আপনাকে বিকালে নাশতা করতে বলেছেন।

কলেজ শেষ হতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালকে বাসায় নিয়ে যান। ব্যাপারটা বোঝা যায় চায়ের পর।

পরশুদিন আপনি একটা কথা আমার কাছে গোপন করে গেছেন।

বড় আবদার করেই কথাটা বলেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। জয়নাল হকচকিয়ে যায়।

কোন কথা ?

আপনি সেদিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাসায় গিয়েছিলেন।

গোপন সে করেছিল, কিন্তু এখন সে অবাক হয়ে যায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখে ক্ষুণ্ন হবার কোনো চিহ্ন না দেখে। বরং মাথা দুলিয়ে তিনি হেসে চলেছেন নিঃশব্দে।

যান নি ?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। যাওয়া ঠিক বলে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি ডেকে নিলেন।

খুব সজ্জন লোক।

জয়নাল চুপ করে থাকে।

অথচ আপনাকে ঘরে না দেখে কী ভাবনাটাই না হয়েছিল। আরেক কাপ চা দিক আপনাকে ? আপনারা তো শহরের মানুষ। ঘনঘন চা খান।

না, না, থাক।

আপনাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

জয়নাল ভ্রু তুলে তাকায়।

কথা দিতে হবে, আপনি আমার কাছে গোপন করবেন না। কিছুই গোপন করবেন না। আমি একটা কথা জিগ্যেস করব।

জয়নাল অপেক্ষা করে।

সত্যি কথা বলবেন তো ?

জয়নাল সেদিনের মিথ্যেটুকুর জন্যে বিব্রত বোধ করছিল; সে এখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে। বুঝতে পারে না, আবার কীসের স্বীকারোক্তি তিনি চান।

জয়নাল জোর করে একটু হেসে বলে, কী কথা আপনি জানতে চান ? আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে যান নি, বিশ্বাস করুন।

সে কথা নয়। সেই মেয়েটির কথা।

কোন মেয়েটি ?

জয়নাল তার অন্তরশুদ্ধ চমকে ওঠে।

আহ্, সেই যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। তার সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল না, কথাটা কি সত্যি ? আপনি তো বলেছিলেন, আলাপ ছিল না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের গলায় এমন একটা কিছু ছিল, যাতে মনে না হয়ে পারে না যে এর উত্তর তিনি আন্তরিকভাবে আশা করছেন।

কেন তাঁর এ কৌতূহল ?

জয়নাল বলে, না, তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।

ভালবাসা ?

আলাপই ছিল না, ভালবাসা কী করে হবে ?

অনেক সময় তো হয়।

কথাটা স্বীকার করে জয়নাল, মাথা দুলিয়ে। তার সালমার কথা মনে পড়ে যায়। চোখের সমুখে কালো লিপস্টিক দেয়া চকচকে ঠোঁটজোড়া ভেসে ওঠে। স্পষ্ট সে দেখতে পায়

এরশাদকে। এরশাদ সালমার পিঠে হাত দিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মুখটা কানের কাছে নামিয়ে আনা; আর দু'জনের মাঝ বারবার এক ফালি করা রোদ আছাড় দিয়ে পড়ে আছে। একই সঙ্গে ছবিটা দূর এবং নিকট বলে মনে হয়। এরশাদের জায়গায় নিজেকে স্থাপিত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলে জয়নাল।

সে আবার বলে, মাসুদার সঙ্গে আমার ভালবাসা ছিল না।

মাসুদা কে?

যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। আপনাকে তার নাম বলা হয় নি।

ও।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। মনের ভেতরে কিছু একটা তোলপাড় করতে থাকে তাঁর।

জয়নাল জানতে চায়, হঠাৎ এ কথা?

বলছি।

এরপরও অনেকক্ষণ কিছু বলেন না তিনি; হয়ত বুঝে পান না ঠিক কীভাবে প্রসঙ্গটি তুলবেন। অবশেষে, নীরবতা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে দেখেই হয়ত, তিনি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেন।

প্রতিবিম্বের মত জয়নালকেও দেখা যায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, একটা প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে। আপনার মতামত কী, আমাকে জানতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সেদিন রাতে আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হয়, তাতে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। কথাগুলো স্মরণ করে আমার মনে হয়, প্রথমে আপনার মনের অবস্থা সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়াই কর্তব্য; তারপর প্রস্তাবের কথা।

কীসের প্রস্তাব?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চকিতে জয়নালের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, আপনার বিবাহের প্রস্তাব?

রোমাঞ্চিত বোধ করবার বদলে, মনের ভেতরে কীসের একটা ভীতি অনুভব করে জয়নাল।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলে চলেন, প্রস্তাবটি ভাল। আমি মনে করি খুবই ভাল। কিন্তু আপনি সত্য বলেছেন তো যে আপনার আগে কোনো ভালবাসা ছিল না?

সুযোগটি ব্যবহার করবার জন্যে জয়নালের ভীষণ লোভ হয়। যদি সে বলে, মাসুদাকে সে ভালবাসে, তাহলে প্রস্তাবটির ইতি এখানেই হয়ে যায়। কিন্তু মাসুদার চেয়েও প্রবলভাবে তার মনে পড়ে সালমাকে। সে ইতস্তত করে। কল্পনাই যখন, যে কাউকে নিয়ে মিথ্যে বলা যায়, কিন্তু কোথায় যেন সততা খোঁচা দিয়ে ওঠে। অন্যদিকে, একটা কৌতূহলও হয় তার। বিবাহের প্রস্তাবটি দিয়েছে কে? কার সঙ্গে? তার নাম করছেন না কেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব?

কিন্তু এখনো তিনি পাত্রীপক্ষ সনাক্ত করতে এগিয়ে আসেন না। বরং আগের কথাই অনুসরণ করতে থাকেন। বলেন, আপনি যদি ভালবেসে থাকেন, জয়নাল সাহেব, তাহলে আপনার মনের যে বর্তমান অবস্থা আমি দেখছি, বিবাহে আপনি সুখী হবেন না। সে ক্ষেত্রে আমি অপরাধী হব। জেনেশুনে একটি মেয়ে, যাকে আমি ভালভাবে চিনি, যার বাবা

আমার বন্ধুস্থানীয়, যার মেয়ে আমার মেয়ের মত, তাকে অসুখী করা উচিত হবে না। অন্যদিকে, আপনি যদি সত্য বলে থাকেন, যদি মেয়েটির জন্য আপনার ভালবাসা না থেকে থাকে, তাহলে, আপনার মনের যে বর্তমান অবস্থা, তা দেখে আমি বলছি, বিবাহ আপনার পক্ষে ভাল হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ করে সংসারী হওয়াই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। অন্তত আমি তাই মনে করি।

অংকের কঠিন একটা সমস্যা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে অধ্যাপকের মত সরে দাঁড়ান প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। এক্ষেত্রে জয়নালের দিকে গভীর দৃষ্টি স্থাপন করে ধৈর্যের সঙ্গে উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন।

জয়নাল বলে, আমার কোনো ভালবাসা ছিল না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দেশে আপনার আছে কে? বাবা, মা, ভাই, বোন?

মা ছোটবেলায় মারা যান। বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। আমার আপন বড় বোন, তার সংসারেই আমি মানুষ হই। আমার ছোটবেলায় বুবুর বিয়ে হয়েছিল।

বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নাই?

বাবাই সম্পর্ক রাখেন নি। আমার সৎ ভাইবোন আছে পাঁচজন।

জয়নালের কণ্ঠস্বরে হয়ত বিষণ্নতা ছিল; প্রিন্সিপ্যাল সাহেব সাগ্রহে বলে ওঠেন, এখানে কাজ সমাধা হলে আপনি বাবা মা দুইই পাবেন। তাঁরা আপনাকে নিজের ছেলের মতই গ্রহণ করবেন।

সপ্রশ্ন চোখে জয়নাল তাকায়।

প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান বলেন, চেয়ারম্যান দেওয়ান খাঁ। তাঁর বড় কোনো ছেলে নাই। বাড়ির জামাই না, আপনি হবেন বাড়ির ছেলে। আপনাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। আজ দুপুরে তিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন।

কলেজে?

না, আমার বাসায় এসে খবর পাঠিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম। আমি আপনাকে বলতে পারি জয়নাল সাহেব, এ বিবাহে আপনার ভাল হবে। আপনি তো মেয়েটিকে দেখেছেনও। আপনারই সে ছাত্রী।

জয়নাল স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।

৪৫

বিকেলের ট্রেনে ডাক আসে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি ছাপা হয়েছে।

রাজারহাটে অজানা জন্তুর আবির্ভাব।

করিম সাহেব ব্যাংকের খদ্দেরদের জন্যে একটি পত্রিকা নিয়মিত রাখেন। ডাকঘরের সমুখে জামগাছ। সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে তিনি খবরটি সকলকে ডেকে ডেকে দেখান। এক সময়ে চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়া সদলবলে আসে খবরটি শুনতে এবং 'আরো দশ

ভাইকে দেখাই' বলে এক কপি পত্রিকা কিনে নিয়ে যায়। সুখি মিয়ার জীবনে এই প্রথম পত্রিকা কেনা, তাই কীভাবে বহন করবে কিছুক্ষণ সিদ্ধান্ত করতে না পেরে, অবশেষে, নিশানের মত উঁচু করে তুলে ধরে সে তার গদির দিকে হেঁটে যায়।

৪৬

রাতে আবার আসেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?

এই সেরে এলাম।

জয়নাল চেয়ার এগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আবারো তার বিছানার ওপরেই উঠে বসেন। জোড়াসন হয়ে আজ কোলে একটা বালিশ টেনে নেন। স্মিতচোখে জয়নালের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি তখন ভালমন্দ কিছুই বলেন নাই।

বলার কিছু নেই।

তার মানে ? বালিশটা তিনি কোল থেকে নামিয়ে রাখেন।

আপনি রাজি, কি রাজি না ? না, সময় চান ?

এ হয় না।

আপনার আপত্তি কোথায় ? আবার তিনি বালিশটা কোলে টেনে নেন, দুমড়ে মুচড়ে তার ওপর দুই কনুই রেখে বলেন, বিবাহ আপনাকে করতে হবে। আজ হোক কাল হোক সংসারী আপনাকে হতে হবে। হবে কিনা ?

অতীত এবং ভবিষ্যৎ, দুটোই এখন মহাজাগতিক দূরত্বে স্থাপিত বলে জয়নালের বোধ হয়। একটি গানের জন্যে তৃষ্ণা বোধ করে সে। হঠাৎ ভূধর সরখেলের কথা মনে পড়ে যায়। তার শরীর শীতল হয়ে আসে। নিজের অঙ্গ থেকে যেন পচনের গন্ধ পায়।

জয়নালের হাতের কাছেই লণ্ঠন। তার আলো সে ক্রমাগত ছোট বড় করতে থাকে। ঘর এবার সংকুচিত হয়ে আসে, আবার দেয়ালগুলো নির্দিষ্ট দূরত্বে ফিরে যায়।

লণ্ঠনের আলো সতেজ করে দিয়ে জয়নাল বলে, বিয়ে আমি এখন করব না।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব। এরকম একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তিনি আশা করেন নি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, বিবাহ একদিন আপনাকে করতে হবে।

আবার স্তব্ধতা নেমে আসে।

প্রিন্সিপ্যাল নতুন একটা পরামর্শ দেন।

না হয় এখন কথা হয়ে থাক, বিবাহ কয়েক মাস পরে হবে। মেয়েটি খুবই ভাল না হলে আপনাকে বলতাম না। দেওয়ান খাঁ সাহেব এখানকার বিশিষ্ট ধনী। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মত শ্বশুরের জোর পেলে বাকি জীবন আপনাকে আর ভাবতে হবে না। নিজে তিনি গরজ করে বলেছেন, কথাটা এভাবে ফেলে দেবেন না, জয়নাল সাহেব। আপনার তরুণ বয়স, আগে পিছনে সবটা দেখেন না, দেখার দরকারও বোধ করেন না। সাধা সম্পর্ক ফেলে দিতে নেই।

জানালার বাইরে তাকিয়ে শিউরে ওঠে জয়নাল। বিশাল এক জন্তুর মত অন্ধকার সেখানে। চরাচরকে সে তার রোমশ পেটের তলায় চেপে ঠেসে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঝলকে ঝলকে *তার হিংস্র উষ্ণ নিঃশ্বাস টের পাওয়া যাচ্ছে। জয়নালের মনে হয়, সে এখন তাকে আজীবন কারাবন্দি করে রাখবার জন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।*

ঢাকার দিকে সে ফিরে তাকায়। ঢাকা এখন কল্লোলিত সমুদ্রের ওপারে কোনো নগর বলে বোধ হয় তার। সে হতাশ ও খিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তার এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ করে একটা সিদ্ধান্ত করে নেন এবং আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

এটা আপনার ভাগ্যের কথা যে, ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেই নিজেকে গুছিয়ে নেবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। আমাদের কথা যদি ধরেন, অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে, এখনো কোনো কিনারা দেখি না। বিধবা মাকে টাকা পাঠাতে হয়। বড় ভাই এন্তেকাল করায় তার সংসারও আমাকেই চালাতে হয়। নিজের তিনটি মেয়ে। সে তুলনায় আপনার দায়-দায়িত্ব কিছুই নাই। ভবিষ্যতেও কেউ আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে না। আপনি রাজি হয়ে যান।

জয়নাল স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেতরে কোনো প্রভেদ আর নির্ণয় করতে পারে না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আরো এগিয়ে এসে বসেন। নিজেই তিনি লণ্ঠনের আলো আরো খানিক উসকে দেন— যেন জয়নালের মুখ ভাল করে দেখতে এতক্ষণ তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি তিনি পকেট থেকে পড়বার চশমা বের করে চোখে দেন। উদ্দেশ্য অচিরে স্পষ্ট হয়। তিনি বুক পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বের করে নীরবে অনেকক্ষণ ধরে দেখেন।

তারপর কাগজটি মসৃণ করে বালিশের ওপর বিছিয়ে তিনি বলেন, দেওয়ান খাঁ সাহেবকে আমি বলেছিলাম, প্রস্তাব আমি দিতে পারি, তবে, প্রফেসর সাহেব বিদেশী লোক, এখানে তার কোনো মুরুব্বি নাই, অতএব, বিবাহে তাকে কী দেয়া থোয়া হবে তা পরিষ্কার করে নেবার দায়িত্ব আমার নিজের। আপনি হয়ত অনুভব করে থাকবেন, আপনাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত দেখি। খাঁ সাহেব আপনার ভাবির উপস্থিতিতে অঙ্গীকার করেন যে, ইস্টিশান সংলগ্ন বাজারটি তিনি আপনাকে লিখে দেবেন। ঐ সমুদয় জায়গা তাঁরই। আর, মেয়ের নামে তিনি সোবহান সাহেবের বাসার পাশে যে পাকা বাড়ি, আপনার বসতের জন্যে দিয়ে দেবেন। আপনার ভাবি চালাক মানুষ। আমি নিজেই তার বুদ্ধি ছাড়া চলি না। তিনি তখন আপত্তি উত্থাপন করেন।

জয়নালের এরকম বোধ হয়, সে একটি মনোগ্রাহী পল্লী-উপন্যাস শুনছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রীর আপত্তি অতঃপর কী হতে পারে, তাকে কৌতূহলী করে তোলে? তার ভ্রু উত্তোলিত হয়। সেটা লক্ষ করে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বিশেষ প্রীত হন।

আপনার ভাবি বলেন, না, সম্পত্তি যা দেবার ছেলের নামেই লিখে দিতে হবে। আপনারা ছেলের কাছ থেকে কাবিনের পরিমাণ বাড়িয়ে নিন, যাতে আপনার যৌতুকের সম্মান রক্ষা হয়। এছাড়াও কথা আছে। এত কথা আমার মাথায় আসে না। আপনার ভাবী নগদ জিনিসপত্রের বিষয়ে কতদূর কী অভিপ্রায় স্পষ্ট জানতে চান। স্থির হয়, আল্লা যদি এ সম্বন্ধ লিখে থাকেন, তাহলে আপনার সুট ও পাঞ্জাবির সেট, আংটি-ঘড়ি-রেডিও, তদুপরি কাচের বাসনের রুচিসম্মত সেট, এছাড়া মেয়েকে তো সাজিয়ে দেয়া হবেই। মটর

সাইকেলের কথা উঠেছিল, কিন্তু সে বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি নাই। জয়নাল সাহেব, শ্বশুর একদিনের না, কেবল বিবাহের দিনেই দেয়া-থোয়ার শেষ না। খাঁ সাহেব আপনাকে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন, মটর সাইকেলও আপনি আদায় করে নিতে পারবেন।

মটর সাইকেলের প্রসঙ্গ জয়নালকে আমোদ দেয়। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অবিলম্বে জানতে চান, তাহলে আপনার কথা আমি পেয়ে গেলাম?

কোন কথা?

যে আপনি রাজি?

জয়নাল নীরবে মাথা নাড়ে।

আপনার তাহলে আর কী দাবি আছে বলুন। আমি না হয় খাঁ সাহেবকে বলব।

আমার কোনো দাবিই নেই। বিয়ে করবারও কোনো ইচ্ছো নেই, আগেই তো বলেছি।

তাহলে আবার সেই কথাতেই ফিরে আসতে হয়, জয়নাল সাহেব। বিবাহ তো আপনাকে করতেই হবে। তবে, এত ভাল সম্পর্ক আপনি এক কথায় ফিরিয়ে দেবেন কেন?

এটা হয় না।

আপনার আপত্তির কারণ?

ধরে নিন, ব্যক্তিগত অসুবিধা আছে। তাছাড়া, এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি বাধ্য না থাকতে পারি। তাই না?

রূঢ় এই সংলাপে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব গুম হয়ে যান। অতি ধীরে কোল থেকে বালিশ নামিয়ে রাখেন। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, আমার কোনো স্বার্থ নাই। বিবাহ অবশ্যই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। আপনার হাবে ভাবে যতদূর বুঝি, মেয়েটি সম্পর্কে আপনার কোনো সমালোচনা নাই। নিজেও আপনি একাধিকবার বলেছেন, ঢাকায় আপনার কোনো টান ছিল না। এ অবস্থায় আপত্তির কারণ কিছুই অনুমান করতে পারছি না। আপনি এমন এক কথার অবতারণা করলেন, আপনাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করাটাও উচিত মনে করি না। রাত অনেক হয়ে গেছে। জন্তুটার গতিবিধিও এদিকেই আজকাল। আপনার ভাবি অহেতুক চিন্তা করতে পারেন। আমি তাহলে উঠি।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উঠলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলেন না। দরোজার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক।

খাঁ সাহেব সকালে আসবেন আমার কাছে।

আপনি তাঁকে বলবেন, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন।

৪৭

সেদিন সন্ধেবেলায় যা ঘটেছিল, এখন সে ধারাবাহিকভাবে মনে করবার চেষ্টা করে। দূর থেকে প্রধানত সে নিজেকে দেখে এবং আবিষ্কার করতে চায় কী কারণে দেওয়ান খাঁ তাকে জামাই হিসেবে পছন্দ করতে পারেন। বরং বারবারই তার স্মরণ হয়, লোকটিকে সে ধূর্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছিল, বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, নীরবে এবং দ্রুতগতিতে

সে আহার সেরেছিল। সালমার দিকে সে যদি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকত, তাহলেও না হয় একটা কারণ বোঝা যেত। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের পর সালমার দিকেই সে আর চোখ তুলে দেখে নি। আসলে, সালমাই আর সমুখে আসে নি। ভেতরের বারান্দায় সালমা হয়ত ভাত সাজিয়ে দিয়ে থাকবে, জয়নাল যখন ভেতরে যায় তখনো তাকে দেখা যায় নি। দেওয়ান খাঁ নিজেই তাকে পরিবেশন করেছেন। এখানকার রেওয়াজ অনুযায়ী অতিথির সঙ্গে তিনি খেতে বসেন নি। জয়নাল যে তাকে বারবার খেতে বসবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, একমাত্র এটাকেই সে এখন একটা সূত্র বলে সনাক্ত করতে পারে। তার সন্দেহ হয়, ঐ অনুরোধই দেওয়ান খাঁকে আশ্বস্ত করেছিল যে সে সদ্বংশজাত, অতএব সুপাত্র।

এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে দেওয়ান খাঁ অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য এবং ক্ষীণ একটি সংকেতকে সার জ্ঞান করেছেন। তাঁর মত ধূর্ত লোকের পক্ষে সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না জয়নালের। তাই সে এ অনুমান বাতিল করে দেয়। অন্য কোনো তীরও তার চোখে পড়ে না।

অকস্মাৎ সে এক প্রকার গৌরব অনুভব করে। তার শরীর নির্ভার মনে হয়। কোটি কোটি কোষের ভেতরে সে জীবনকে উপলব্ধি করে ওঠে। মাঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত রাতের স্নিগ্ধ বাতাস কোমল ও সুগোল একটি নলের মত তার জানালা দিয়ে প্রবেশ করে, যখন তার শরীরে এসে স্পৃষ্ট হয়, তখন জয়নালের মনে হয় স্বাস্থ্যবতী কোনো রমণী তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলেছে, যদিও রমণীর আলিঙ্গন তার কাছে এখন পর্যন্ত শ্রুত একটি বিষয় মাত্র।

এতকাল সে যা লক্ষ করে নি, এখন তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না সে।

সে না ভেবে পারে না— তার বিদ্যা আছে, স্বাস্থ্য আছে, চেহারা আছে, সে অবিবাহিত এবং অতএব পৃথিবীর যে-কোনো কুমারীর কাঙ্ক্ষিত।

বিশেষ একটি কুমারীর জন্যে মনোনীত।

মনোনয়নটিকে সে উপেক্ষা করতে পেরেছে, এতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। সে নিজেকে ধন্যবাদ দেয়। এবং তারপর তৃপ্ত হয়ে, সে তার প্রাক্তন সহপাঠিনী এগারজনের প্রত্যেককেই প্রত্যাখান করতে থাকে।

কখন সে ঘুমিয়ে যায় জানে না।

স্বপ্নের ভেতরে পাগল যুবতী-ভিখিরি খিলখিল করে হাসতে থাকে।

৪৮

আজ ক্লাশে ঢুকতে সে ইতস্তত করে। বিয়ের প্রস্তাবটি সালমা জানে কিনা, সে সম্পর্কে তার মনে সংশয় উপস্থিত হয়। ক্লাশে ঢুকে সালমার দিকে সে আদৌ তাকাতে চায় না, কিন্তু বারবারই সে নিজের কাছে পরাজিত হয়। তার চোখ যেন স্বাধীন একটি ইচ্ছাশক্তি পেয়ে বারবারই সালমার দিকে ধাবিত হয়। সে অবসন্ন, লজ্জিত এবং বিরক্ত বোধ করে।

অন্যান্য দিনের মতই সালমাকে মনে হয়। সেই শাড়ি, সেই খাতার দিকে চোখ, কলম নিয়ে ধীর গতিতে সেই একই প্রকার খেলা।

বোঝা যায় না, বিয়ের প্রস্তাব তার, সালমার, জ্ঞাত কিনা।

জয়নাল একটি দুঃসাহস করে ফেলে। বক্তৃতা বন্ধ করে সে বলে ওঠে, ক্লাশে অন্তত একজনের ভেতরে আমি মনোযোগের অভাব লক্ষ করছি।

সচকিত হয়ে ওঠে সারা ক্লাশ।

সালমা খাতার ওপর তাড়াতাড়ি কলম ফেলে উদ্বিগ্ন চোখে জয়নালের দিকে তাকায়। জয়নাল দীর্ঘ একটি সময় তার চোখের দিকে সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তারপর বলে, হ্যাঁ, তুমি। কী পড়াচ্ছিলাম বল।

ক্লাশে কেমন একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়; না শ্রুতিগোচর, না দৃষ্টিগোচর সেই চাঞ্চল্য। কেবল করোটির ভেতর অনুভব করা যায়।

জয়নাল চক মোছার ডাস্টার দিয়ে টেবিলের ওপর ঠক ঠক শব্দ করে।

সালমা আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়।

বল, কী পড়াচ্ছিলাম?

ইতিহাস, স্যার।

ক্ষণকাল স্তব্ধ, তারপর পেছনের ছাত্ররা হেসে ওঠে। তারপর জয়নালের কঠিন মুখ লক্ষ করে তারা থতমত খেয়ে যায়। ইতিহাসের ক্লাশে যে ইতিহাসই পড়ান হয়, অন্য কিছু নয়— এই উত্তরটি নিতান্তই সারল্যপ্রসূত, না ব্যঙ্গরঞ্জিত, মীমাংসা করতে পারে না জয়নাল।

তার আরো সন্দেহ হয়, সালমা বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত, তাই সে জয়নালের সঙ্গে এক প্রকার সমকক্ষতা অনুভব করছে এবং তা করছে বলেই এ ধরনের উত্তর দেবার সাহস পেয়েছে।

ছোট্ট এই ঘটনাটি জয়নালের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আশা করি, ক্লাশে যে বক্তৃতা হয়, মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

জয়নাল মুখে বাক্যটি উচ্চারণ করবার সময়েই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় রাজারহাট থেকে সে চলে যাবে।

৪৯

পরদিন কলেজের একাধিক দেয়ালে রাজনৈতিক ও কলেজ পরিষদ সংক্রান্ত স্লোগান ও পালটা স্লোগানের ভিড়ে নতুন একটি সাংকেতিক লেখন দেখা দেয়।

চেয়ারম্যান ইতিহাস।

৫০

চামড়ার ব্যাপারী সুখি মিয়ার জরুরি তলব পেয়ে তারা হাজির হয়। সুখি মিয়া জানতে চায়, চামড়া ছাড়াবার ছুরিগুলো তারা সঙ্গে এনেছে কিনা। কোরবানির ঈদ ছাড়া বছরের অন্য কোনো সময়ে একসঙ্গে এতজনের ডাক পড়ে না। কোরবানির ঈদ এখনো বহুদূরে।

তাছাড়া, গো-মড়কেরও কোনো খবর পাওয়া যায় নি। লোকগুলো তাই নিজেদের ভেতরে আন্দোলন করে, ব্যাপার কী?

অচিরেই সুখি মিয়া রহস্যটির ওপর আলোকপাত করে। তখন প্রাঞ্জল হয়ে যায়, কিন্তু অনেকেই দ্বিধা করতে থকে। অভাব তাদের প্রাচীন কর্কট ব্যাধি; অর্থ তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। সুখি মিয়ার মত প্রতাপশালী লোকের নেতৃত্ব যখন আছে, তখন চুরি করতে বাধা নেই, কিন্তু জীবন্ত পশুর ছাল ছাড়িয়ে নেবার প্রস্তাবে তারা বিচলিত বোধ করে।

ধমক দেয় সুখি মিয়া।

মানুষ একটা আতংকে এখন সন্ধে হতে না হতেই দোর দিচ্ছে, সন্দেহজনক কিছু শুনলেও তারা এখন ঘর ছেড়ে বেরুবে না, এই অপূর্ব সুযোগটি যদি তারা ব্যবহার করতে না চায় ভালকথা। তবে ভবিষ্যতে যেন কাজের জন্যে সুখি মিয়ার কাছে তারা আর ধরনা না দেয়। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অনাহারে মারা গেলেও সুখি মিয়া তাদের দিকে আর ফিরে তাকাবে না, এই সিদ্ধান্ত সে অগ্রিম ঘোষণা করে রাখে।

৫১

জয়নালকে নিজের কামরায় ডেকে পাঠান প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান। অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখায় তাঁকে। জয়নাল এসে দাঁড়ালে নীরবে তিনি চেয়ার দেখিয়ে দেন। কী একটা কাজে অধ্যাপক আফজাল হোসেন ঘরে আসতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব 'ব্যস্ত আছি, পরে আসবেন' বলে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

জয়নাল অনুমান করে, দেওয়ান খাঁর সঙ্গে তাঁর নির্ধারিত সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। ব্যর্থতার সংবাদ সব সময়ই দাতা এবং শ্রোতার ভেতরে তিক্ততার জন্ম দেয়। জয়নাল মনে মনে হাসে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জানেন না, সে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

আশা করি দেখেছেন?

জয়নাল হকচকিয়ে যায়।

বুঝতে পারলাম না।

আপনি দেখেন নি বলতে চান?

আপনার প্রশ্নটাই আমি বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অনাবশ্যকভাবে একটি কাগজ টেনে পড়বার অভিনয় করে। চশমা ছাড়া তিনি পড়তে পারেন না, তবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে যাচ্ছেন— জয়নাল কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ না করে পারে না।

অবিলম্বে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, কাগজের দিকে চোখ রেখেই, কিছু মনে করবেন না। আপনি কখন সত্য বলেন, সে আপনি জানেন। আমি বুঝতে পারি না। আপনার সঙ্গে কীভাবে কোনদিক থেকে কথা বললে বিষয় পরিষ্কার হয়, আমার জানা নাই।

এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি আপনাকে যা বলেছি যথাসাধ্য পরিষ্কারভাবেই বলেছি।

না, বলেন নাই।

বলি নি?

প্রথমদিন রাতে আপনার ঘরে যখন আসি, ঘরে থাকা-না-থাকা নিয়ে আপনি যা বলেছিলেন, স্মরণ করলে নিজেই বুঝতে পারবেন, আপনি পরিষ্কার নন।

জয়নালের ভীষণ ক্রোধ হয়। কিন্তু সে নিজের বাম হাতের কড়ে আঙুলে লাল নোখপালিশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। এটা তার পুরনো অভ্যেস। এতে তার চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা শমিত হয়।

সে কথা যাক। সে কথা তুলে আপনাকে আর লজ্জা দেব না। বহুদিন শিক্ষকতা করি, তরুণদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবার অভ্যেস আমার আছে। আপনি সেদিন রাতে আপনার ব্যাপার আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এরকম একটা কথা তুলেছিলেন। আমিও আর কিছু বলি নাই। আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশ্বাস করুন আমার কোনো উৎসাহ নাই। তবে, এখন এটাকে আর আপনার ব্যক্তিগত বলে মনে করতে পারছি না। এখন এটা শিক্ষকদের সুনামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

হঠাৎ সোবহান সাহেব ঘরে ঢোকেন। দু'জনের দিকে তাকিয়ে থমকে যান তিনি। মুহূর্তের ভেতরে বিদায় নেন 'আমি পরে আসব' বলে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, জয়নাল সাহেব, আপনি কি কলেজের দেয়ালে লেখা দেখেন নাই ?

কীসের লেখা ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করেই রাখেন।

আপনার বিষয়ে ?

আমার বিষয়ে ?

কেবল আপনার বিষয়ে হলে কথা ছিল না। আপনার সঙ্গে এক ছাত্রীর নামও জড়িত।

কী রকম একটা ঘোরের ভেতরে জয়নাল উচ্চারণ করে, সালমা ?

আপনি তাহলে জানেন, জয়নাল সাহেব। আপনি তাহলে জানেন যে সালমার সঙ্গে আপনার নাম জড়িত হতে পারে।

এ আপনি কী বলছেন ?

কলেজে আরো ছাত্রী আছে। তাদের কারো নাম তো আপনি করলেন না ? সালমার নামটাই প্রথমে কেন আপনার মনে এলো, এই প্রশ্ন আমি যদি করি, আমি কেন ?— কেউ যদি করে, আপনি কী উত্তর দেবেন ?

উত্তর অনেক রকম হতে পারত, কিন্তু কোনটা বলা কর্তব্য, জয়নাল বুঝে ওঠে না। যেমন সে বলতে পারত ক্লাশে সালমাকে সে শাসন করেছিল, তখন ছাত্রদের ভেতরে সে এক ধরনের চাঞ্চল্য লক্ষ করেছিল। সে বলতে পারত— দেওয়ান খাঁ, বিয়ের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা প্রচার হয়ে গিয়ে থাকবে। এবং এর জন্যে সে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কিংবা দেওয়ান খাঁ, অথবা দু'জনকেই দোষী করতে পারত। এবং সে আরো বলতে পারত, যা শ্রোতা আদৌ বিশ্বাস করবেন না— নামটি করবার সময় জয়নাল তার প্রাক্তন সহপাঠিনী সালমার কথাই ভাবছিল, রাজারহাটের সালমার কথা নয়।

এই মুহূর্তে জয়নাল আকস্মিক যোগাযোগটিও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত বলে অনুভব করে যে দু'জনের নামই সালমা। সে বর্তমান অভিযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও চমৎকৃত না

হয়ে পারে না।

সে নীরব হয়ে বসে থাকে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিঁধে রাখেন অনেকক্ষণ।

জয়নাল উঠে দাঁড়াবার জন্যে নড়েচড়ে উঠতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হাতের ইশারায় তাকে স্থির হতে ইঙ্গিত করেন।

না, আপনার কোনো উত্তর নাই, জয়নাল সাহেব। সাধারণত আমার অনুমান ভুল হয় না। গোড়াতেই আমার সন্দেহ ছিল, আপনি সত্য কথা সব সময় বলেন না। যে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল, আপনার সঙ্গে তার আলাপ ছিল না, আমি সেদিনও বিশ্বাস করি নাই, এখনো করি না। আমার ধারণা, আপনি যে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে সেদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলেন বলে দাবি করেন, সেটাও ঠিক না। চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের টানেই আপনি সেখানে যান, না হলে ছাত্ররা জানেই বা কী করে, আর এতদিন তারা যা করে নাই আজ কেন তা করে ? অন্য কথায়, এই প্রথম কলেজের একজন প্রফেসরের নামে চরিত্রহীনতার অপবাদ কোন সাহসে তারা আনে ? আপনি স্বীকার করবেন, বিনা কারণে কিছুই হয় না।

জয়নাল যুক্তি দেয়, সালমার জন্যে আমার আকর্ষণ থাকলে আমি কি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হতাম না ? বলুন ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব প্রথম দিকে উত্তর খুঁজে পান না। যুক্তিটি তার কাছে অকাট্য বলে মনে হয়। তাঁর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, জয়নাল নির্দোষ।

কিন্তু অচিরেই ধাক্কাটি সামলে নিতে সফল হন তিনি।

বলেন, ঢাকার তরুণ সমাজ সম্পর্কে আমি কিছু ধারণা রাখি। সেদিন এ ঘরেই আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা হয়েছিল, আশা করি ভুলে যান নাই।

জয়নালের মনে পড়ে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তরুণদের নৈতিক অধঃপতনের কথা বলছিলেন।

না, ভুলি নি।

আমিও ভুলি নাই যে, আপনি সে ব্যাপারে আমাকে কোনো সংবাদ দিতেও উৎসাহ বোধ করেন নাই। বরং আপনার ভেতরে আমি ঘোর সমর্থন লক্ষ করেছিলাম।

লোকটির বাকচাতুর্য দেখে জয়নাল বিস্ময়বোধ করে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলেন, আমার অনুমান, বিবাহ না করে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজারহাট ঢাকা শহর নয়, জয়নাল সাহেব। এখানে বাপ-বেটা একসঙ্গে লালপানি খায় না, মা-মেয়ে হাত ধরাধরি করে ঢাকা ক্লাবে যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করে থাকে জয়নাল।

দিনের মত কলেজ ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় বেয়ারা।

জয়নাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমি পদত্যাগ করছি।

৫২

তার কৌতূহল হয় দেয়ালের লেখাটি সম্পর্কে। বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে গতি শ্লথ করে সন্ধানী চোখে দেয়ালের বিস্তার খুঁটিয়ে দেখে।

মুজিবের রক্ত লাল।

সঠিক পথ চিনে নাও, ধানের শীষে ভোট দাও।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, রাজাকারে করল শেষ।

ইসলামের নৌকায়, আল-বদর পার পায়।

বুকের রক্ত দিয়েছি তাই— জয় বাংলা ভুলো না ভাই।

কিন্তু কোথাও সে, জয়নাল, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উল্লিখিত কুৎসাটি দেখতে পায় না।

আসলে, সে লেখা আকারে ছোট বলে তার চোখে পড়ে না।

তার ধারণা হয়, সালমার সঙ্গে তার বিয়ে ঘটিয়ে দেবার জন্যেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নতুন এই সড়যন্ত্রটি করেছেন। ভূধর সরখেলের কথা চকিতে মনে পড়ে যায়— চারিদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে, আপনি টের পান না?

জয়নাল নির্ভার বোধ করে, কারণ সে পদত্যাগ করে এসেছে এই মাত্র।

তারপর, নিজের কামরায় ঢোকার মুহূর্তে তার চোখে পড়ে, তারই দরোজার পাটে কাঠ কয়লা দিয়ে লেখা, চেয়ারম্যান + ইতিহাস।

লেখাটা ঘণ্টাখানেক আগেও দেখা যায় নি।

অস্থি-র ভেতরে সে হঠাৎ বরফ অনুভব করে।

৫৩

প্রথমে শব্দটা খুব কাছে বলে মনে হয় তার। ঘুম থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠে সে ঘরের ভেতরেই সন্ধানী চোখে উৎস সন্ধান করে। তরল অন্ধকারে সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। তখন সে জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করে। জ্যোৎস্নার নিস্তব্ধ সাম্রাজ্য দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়।

শব্দটির জন্যে সে অপেক্ষা করে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই শোনা যায় না। গাছের পাতা নড়ে না। কোনো কিছুই অগ্রসর বা পশ্চাৎপদ হয় না।

সে উঠে বসে।

জ্যোৎস্নার দুধ তাকে মাতৃস্তনের মত আকর্ষণ করে। রাতের স্বৈরাচারী নৈঃশব্দকে ক্ষুণ্ন না করবার রক্তের অন্তর্গত প্রেরণায় সে অতি সন্তর্পণে দরোজা খোলে।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

দূরে ঘন জঙ্গলের নিরেট দেহটিকে আজ রাতে আগের মত অপরিচিত বলে তার বোধ হয় না। বারান্দার শেষ মাথার খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারের রবীন্দ্রসংগীত তাকে সঙ্গ দিতে থাকে।

দেহ থেকে সূক্ষ্ম ধারায় রক্ত নির্গত হতে হতে মানুষ যেমন তার করোটির ভেতরে মাদকতা এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে রাজসিক ঔদাস্য বোধ করতে থাকে, জয়নালের আত্মার ভেতরে ক্রমশ তেমনি সুখকর একটি ক্লান্তির উদয় হতে থাকে।

ঠিক তখনই বিকট একটি আর্তনাদ শোনা যায়।

মানুষের তুলনায় পাশবিক অথচ পশুর তুলনায় অত্যন্ত মানবিক সেই আর্তনাদ তাকে চোখের পলকে উর্ধ্ব আকাশে নিক্ষেপ করে আবার ভূমিতে ছুঁড়ে দেয়। তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের প্রবল ও অবিরাম ধুপধাপ সে শুনতে পায়। অথবা, কলেজের জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠে অতিকায় কিছু একটা দাপাদাপি করে ছুটে বেড়ায়।

উন্মাদ সেই বস্তুটি মুহূর্তের ভেতরে তার অদূরে এসে স্থির হয়।

এবং সে বিস্ফারিত চোখে সদ্য চামড়া তুলে নেয়া জীবন্ত একটি ষাঁড়ের উলঙ্গ গোলাপি মেদময় দেহ প্রত্যক্ষ করে।

কিছুক্ষণ সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না। আসলে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার ধারণা হয়, জ্যোৎস্নার গর্ভ থেকে সদ্য জন্ম নিয়ে অপার্থিব একটি প্রাণী তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণীটি মৃত্যু-যন্ত্রণায় আবার চিৎকার করে ওঠে।

তার সেই মানবিক হাম্বাধ্বনি মুহূর্তের ভেতরে জয়নালকে সচেতন করে তোলে। ষাঁড়টি হঠাৎ দু'পা তুলে দেয় বারান্দায়। অন্তিম মুহূর্তে যার কাছে সে জীবন প্রার্থনা করে, সেই জয়নাল তখন নিজেই চিৎকার করে ওঠে। মাঠের ভেতর দিয়ে, জ্যোৎস্নার মায়াজাল ছিঁড়ে সে, জয়নাল চিৎকার করতে করতে কালভার্টের দিকে ছুটে যায়।

৫৪

জ্ঞান ফিরে আসে তার। কিন্তু পরিচিত পৃথিবীতে সে আর ফেরে না। জ্বরতপ্ত চোখ মেলে নিজেকে সে অচেনা একটি ঘরে দেখতে পায়। চারদিকের আলো, জ্যোৎস্নার কী সূর্যের, সে কোনো মীমাংসা করতে পারে না।

যে বিছানায় সে শুয়ে আছে তার নীল রঙটি অত্যন্ত ক্ষীণভাবে পরিচিত বলে বোধ হয়। আবার একবার মনে হয়, সমস্ত কিছুই নীল হয়ে গেছে।

দৃশ্যমান প্রতিটি বস্তু তার চোখে সর্বদা চলমান ও আকারে অনেকগুণ বর্ধিত বলে প্রতীয়মান হয়। কণ্ঠনালির ভেতরে সে দ্বিতীয় একটি নলের উপস্থিতি বোধ করে।

অনেকক্ষণ ঠাহর করে দেখার পর তার ধারণা হয়, প্রিন্সিপ্যাল আবদুর রহমান সাহেব তার বিছানার পাশে বসে আছেন।

সে তখন তাঁর হাত ধরে অনুনয় করে, আমাকে পাঠিয়ে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব জয়নালের বুকে হাত রেখে আলতো করে বার কয়েক চাপড় দেন এবং তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন।

তিনি যখন হাতখানা তার বুকের ওপর নামিয়ে আনেন, হাতটির বহুগুণ বর্ধিত আকার এবং নারকোল-রশির মত রোম দেখে সে দ্রুতগতিতে চোখ বোঁজে।

আবার যখন সে চোখ খোলে, দেওয়ান খাঁকে দেখতে পায়।

দেওয়ান খাঁর ঠোঁট নড়তে সে দেখে। যে স্বর সে শোনে, তা দৃশ্যমান ঠোঁট থেকে অত্যন্ত বিযুক্ত এবং দূরের বলে মনে হয়।

প্রফেসর সাহেব, আপনার কোনো চিন্তা নাই। আল্লার রহমতে আপনি এখন অনেক সুস্থ।

৫৫

সময়ের কোনো ধারণা নেই তার। জাগ্রত মুহূর্তগুলোকেই পরপর গ্রথিত করে অবিচ্ছিন্ন একটি সময় সে গড়ে নেয়।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে সে আবার বলে, আপনি আমাকে ট্রেনে তুলে দিন।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব কোমল ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন।

আমি যেতে চাই।

না।

না ?

যাওয়া যায় না, জয়নাল সাহেব, এভাবে যাওয়া যায় না।

কেন যাওয়া যায় না ?

আপনার কি স্মরণ হয় না ? কিছুই স্মরণ হয় না ?

জ্যোছনা মনে পড়ে।

আর কিছু ?

একটি জন্তু। কিন্তু তার লোম ভালুকের মত নয়।

আর কিছু স্মরণ হয় না ?

না।

আপনি চিৎকার করে ছুটছিলেন ?

না।

কালভার্টের কাছে পড়ে গিয়েছিলেন ?

না।

স্মরণ হয় না ?

না।

আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন ?

না।

চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ?

না।

এখন কার বাড়িতে আছেন, বুঝতে পারেন ?

চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি ?

আরো একদিন এসেছিলেন, স্মরণ হয় ?

হ্যাঁ।

স্মরণ হয়, মাঝে মাঝে আপনার জ্ঞান ফিরে আসছিল ?

হ্যাঁ।

স্মরণ হয়, প্রতিবার জ্ঞান ফিরে আসবার পর আপনি কাউকে ডাকছিলেন ?

হ্যাঁ।

চিৎকার করে ডাকছিলেন ?

আমি কাকে ডাকছিলাম ?

আপনি সালমাকে ডাকছিলেন।

কিন্তু সালমা তো আমার ক্লাশে ছিল ?

জয়নাল ঢাকায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা সহপাঠিনী সালমার দিকে প্রাণপণে আঙুল তুলে ধরে সবাইকে দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ দেখে না।

হ্যাঁ, সালমা আপনারই ক্লাশে, স্মরণ হয় জয়নাল সাহেব ?

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দেওয়ান খাঁর মেয়ে রাজারহাট কলেজের ছাত্রী সালমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সালমাকে জানেন না। তিনি এবার বলেন, তাই যাওয়া যায় না। এভাবে যাওয়া যায় না। আপনার নিজের সুনাম, কলেজের সুনাম, রাজারহাটের সুনাম, চেয়ারম্যান সাহেবের সুনাম, তারচেয়ে বড় কথা সালমার সুনাম নষ্ট করে এভাবে আপনি যেতে পারেন না, জয়নাল সাহেব। কতটুকু আপনার স্মরণ হয়, কতটুকু আপনার স্মরণ হয় না, যতটুকুই আপনার স্মরণ হয়, আপনি ততটুকুই বা বলতে চান কিনা, আপনার বর্তমান অবস্থায় সে প্রশ্ন তোলার মত সিমার আমি নই। আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, বিদেশে আপনি আমাকে বড় ভাইয়ের মত দেখে আস্থা রাখতে পেরেছেন কিনা তাও বুঝি না, তবে আমি আপনাকে আগেও বলেছি, এখন বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়ে বলার পরিস্থিতি হলেও, তা উপেক্ষা করে, আগের মতই সবকিছু বিবেচনা করে আপনাকে বলতে পারি, জয়নাল সাহেব, এ বিবাহ আপনার ভালই হবে। এখানে কলেজে যারা পুরাতন প্রফেসর আছেন, তাঁরাও আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁরাও মনে করেন, এ বিবাহ করা আপনার এখন কর্তব্য হয়ে পড়েছে। মানুষ কী আশা করে মানুষ তা জানে না, মানুষ আসলে কোনোকিছু হাতের ভেতরে পাবার পরই তুলনামূলক বিচারে বুঝতে পারে তার আশা কী ছিল ? আপনার চেয়ে অনেক বেশিদিন পৃথিবীতে বাস করবার কারণে এটুকু জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, সেই তুলনামূলক বিচারে আপনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হবেন না। চেয়ারম্যান সাহেব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন্মৃত হয়ে পড়েছেন। অতএব, আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী দশজন মিলে বিবাহের আনুমানিক একটা দিন ধার্য করে রেখেছি। তা সত্ত্বেও আপনার মুখের একটা কথা চাই। কারণ, মানুষ আমরা, আমাদের প্রধান প্রধান ভবিতব্যগুলোর সূত্রপাত উচ্চারণ ভিন্ন হয় না। আপনি রাজি ?

এতক্ষণ একদৃষ্টে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো সে শুনছিল; পবিত্র

কোনো বাণী শোনবার পর মানুষ যে অন্ধ তন্ময়তায় চোখ বোঁজে, জয়নাল এখন তা অনুসরণ করে।

আতস্থ্ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে, আমি রাজি, কিংবা করে না; তার মনে হয়, সে তার অস্তিত্বের ভেতরে অন্য কারো কণ্ঠ শুনতে পায়।



নীল দংশন

ঘরের ভেতরে বাদামি আলো সারাদিন। ঘরের ভেতরে বাদামি আলো সারারাত। জানালায় বাদামি কাগজটা সাঁটা। মাথার ওপরে ন্যাংটো বাল্ব। ঘর থেকে বাইরে কিছু দেখা যায় না। মাঝেমাঝে পায়ের শব্দ শোনা যায়। ভারি পায়ের শব্দ। একটি কী দুটি মানুষের। মাঝেমাঝে আরো দূরে, হঠাৎ কোনো গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

একাকী এই ঘরের ভেতরে কম্বল পাতা চৌকির ওপর সারাদিন সে ঠায় বসে ছিল। সারাটা রাত গেছে, ঘুম আসে নি, তখনো সে বসেই ছিল। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা ছিল, সে বসেই ছিল। তবে, শারীরিক নিয়মে ঘুম অনিবার্যভাবে আসে। সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কঠিন একটা খোঁচায় সে জেগে ওঠে।

তাকিয়ে দ্যাখে, প্রথমে শুধু দেখতে পায়, তার চোখের অতি নিকটে খাঁকি পোশাক। তারপর মুখটা স্পষ্ট হয়। এই সৈনিকটিকে গতকাল সে দেখে নি। আজ নতুন ডিউটি পড়েছে।

চলো।

সে তাকে অনুসরণ করে নিঃশব্দে।

দরোজার বাইরে এসে সৈনিকটি তাকে আগে ঠেলে দেয়। সৈনিকটিই এখন তাকে অনুসরণ করে। অনুসরণ করলেও, পেছন থেকে সে-ই তাকে চালনা করে।

শিগগিরই তারা পৌঁছোয় একসারি দরোজার সমুখে। ঠেলা খেয়ে একটা দরোজার ভেতরে সে ঢোকে। ঢুকে দ্যাখে, হাত-মুখ ধোবার জায়গা। জায়গাটি তার নিজের বাড়ির মতো নয়। পরিষ্কার, ঝকঝক করছে, মেঝেতে একটুকু পানি নেই; বাতাসে এতটুকু দুর্গন্ধ নেই।

চোখ করকর করছে তার। আয়নায় নিজের চেহারা চোখে পড়ে। মুহূর্তের জন্য অন্য কারো চেহারা বলে ভুল হয় তার। ভাল করে সে তাকায়, আয়নায়, তার নিজের চোখের দিকে। সম্মোহনে নিবদ্ধ হয়ে থাকে সে।

চেহারা সেই আগের মতোই আছে। একবার ভুল হয়, রোজকার মতোই সে বাড়িতে দাড়ি কামাতে ঢুকেছে। একদিনেই সমস্ত মুখ দাড়িতে কালো হয়ে গেছে।

নিজের জামাকাপড়ে হঠাৎ নতুন একটা ঘ্রাণ সে পায়। বারুদের ঘ্রাণ। গত দু'দিনে সমস্ত নগরী জুড়ে একতরফা একটা যুদ্ধ হয়ে যায়। গোলা ফাটে। গুলি চলে। বাতাস ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। জামা-কাপড়ে সে ঘ্রাণ এখনও তার শরীরে বিবমিষার উদ্রেক করে।

সে এখনো জানে না, কেন তাকে বন্দি করা হয়েছে।

বেরিয়ে আসবার পর সৈনিকটি আবার তাকে খোঁচা দেয়, আগে ঠেলে দেয়; সে এগোয়। সৈনিকটি তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

অন্য এক দরোজার বাইরে অন্য এক সৈনিক দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় সৈনিকটি এখন তার দায়িত্ব নেয়। প্রথম সৈনিক চলে যায়। দ্বিতীয়জন তাকে একটা ঘরের ভেতরে ঢোকায়।

ঘরের ভেতরে দুটো টেবিল পাশাপাশি জোড়া দেয়া। ওপারে বসে আছে তিনজন অফিসার। টেবিলের ওপর একখণ্ড কাগজ নেই, দপ্তর নেই, কলম নেই। গাবের আঠার মতো রঙ টেবিলের।

এমন পাট-পাট ইস্তিরি করা জামাকাপড় সে কতকাল দেখে নি। যে সওদাগরি আপিসে কেরানির চাকরি করে সে, সেখানে কাউকে সে এ ঝকঝকে ইস্তিরি করা কাপড় পড়তে দেখে নি যদিও তার মনিব, বড় সাহেব, সব সময়ই ধোপদুরস্ত কাপড় পরবার জন্যে সবাইকে বলে থাকেন।

টেবিলের ওপারে বসে আছে যে তিনজন অফিসার, তাদের জামায় এমন কড়া ইস্তিরি যে কলার, কাঁধের ওপর ওলটানো জিভ আর বুকের মাঝখানে বোতাম লাগাবার জায়গা মোমপালিশের মতো চকচক করছে। কোনো কোনো জায়গা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে।

সৈনিকটি তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, সালাম করো।

সে তাড়াতাড়ি হাত তোলে। এত তাড়াতাড়ি যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা সে পুরে দিতে চায় তার ও-কাজে।

কিন্তু সালামের জবাব সে পায় না। তিনজনের কেউই যে জবাব দেয় না, সেটা তার কাছে এক ধরনের জবাব বলেই মনে হয়। তারপর চেহারায় কর্ম-নৈপুণ্যের ছাপ দেখে সে আশ্বস্ত হয় যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

তখন সে আবার সাভারের সড়ক দিয়ে জাফরগঞ্জের দিকে রওয়ানা হবে, যেমন সে গতকালও রওয়ানা হয়েছিল।

গতকাল মীরপুর ব্রীজের কাছে অনেকের সঙ্গে সেও বাধা পেয়েছিল সৈন্যদের কাছে। সবার মোটঘাট, জামার পকেট তল্লাশ করে দেখছিল ওরা। কিন্তু আর সকলের মতো সে ছাড়া পায় নি। তাকে বন্দি করা হয়েছিল।

অবিলম্বে একজন অফিসার দেরাজ খুলে পাতলা একটা দফতর বার করে। হঠাৎ লাল রঙা একটা পেন্সিল দেখা দেয় ডান হাতে, ম্যাজিকের মতো বিনা পরম্পরায়।

একই সঙ্গে পেছনের দরোজা দিয়ে অন্য একজন ঢোকে লম্বা নোট বই আর পেন্সিল হাতে নিয়ে। ঢুকে, দূরে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসে। তার হাতের পেন্সিল তির্যকভাবে নোট বইয়ের পাতায় প্রতীক্ষমাণ হয়ে থাকে।

তারপর একজন অফিসার ভোরের সূর্যের মতো হাসিমুখে তাকায় তার দিকে। অত্যন্ত আন্তরিক গলায় জানতে চায়, রাতে ঘুম হয়েছিল?

হ্যাঁ।

অবশ্যই ঘুমিয়েছিল সে। রাতের অধিকাংশ সময় জেগে থাকলেও সেটা দেবার মতো একটা সংবাদ বলে তার মনে হয় না।

বেশ ঘুমিয়েছি।

ভাল, ভাল।

দ্বিতীয় অফিসার এবার গাম্ভীর্য ভেঙে সহাস্য হয়ে ওঠে। বলে, ছারপোকা, মশা, এদের দৌরাত্ম্য এখন আমরা বাগে আনতে পারি নি। তার জন্যে কিছু দুর্ভোগ হয়ে থাকলে, সত্যি আমরা দুঃখিত। বিশেষভাবে দুঃখিত।

সে অভিভূত হয়ে যায়। আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করে। তৃতীয় অফিসার দ্বিতীয় জনের কথার পরে বিরতি না দিয়েই বলে, ভোরে কিছু খেতে দিয়েছিল?

না, তাকে দেয়া হয় নি। কিন্তু সে কথা কি বলা ঠিক হবে? অফিসারদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা সে হঠাৎ বোধ করতে থাকে, তাতে তার মনে হয়, অধস্তনদের সামান্য দু'একটা গাফিলতি তার না ধরাই উচিত।

দেয় নি?

সঙ্গে সঙ্গে একজন অফিসার কাকে যেন তলব করে। অবিলম্বে একজন সৈনিক এসে সটান হয়ে দাঁড়ায়। তিনজনই তাকে জর্জরিত করে তোলে কথার চাবুকে।

তারপর একজন বলে, যাও, নিয়ে এসো। এখানে। আর একটা চেয়ার দাও। কেউ এলে তাকে বসতে দেয়ার কথাও তোমাদের বলে দিতে হয়?

ভোজবাজির মতো চোখের পলকে চেয়ার আসে। সে বসে। কিন্তু, যে ভঙ্গিতে বসে, তাতে সুখ হয় না। ভঙ্গিটা বদলায় সে, তবু অস্বস্তি যায় না।

তখন তার কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। তিনজনের ভেতরে কখন কে কোন প্রশ্ন করতে থাকে, ভাল করে ঠাহর হয় না।

নাম কী?

নজরুল ইসলাম?

কাজী নজরুল ইসলাম?

হ্যাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম।

এককোণে বসে থাকা, খাকিজামা পরা চতুর্থ ব্যক্তিটির পেন্সিল এখন সচল হয়ে উঠেছে।

বাবার নাম?

কাজী সাইফুল ইসলাম।

বয়স?

কার বয়স? বাবার? তিনি এন্তেকাল করেছেন।

আপনার বয়স?

বিয়াল্লিশ।

জন্মস্থান?

ইতস্তত করে ওঠে নজরুল।

জন্মস্থান বলুন।

বর্ধমান জেলায়।

ভারতে?

হ্যাঁ, ভারতে। পশ্চিম বাংলায়। ঢাকায় আসি ১৯৪৮ সালে।

কবিতা লিখতে শুরু করেন কবে থেকে?

কবিতা?

প্রশ্নটা বুঝতে পারে না নজরুল ইসলাম। তিনজনের মুখের দিকে একে একে সে তাকায়। তিনজনই তাকিয়ে আছে তার দিকে স্থির চোখে। তিনজনই অপেক্ষা করছে।

তারপর একজন হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠে। বার দুয়েক চোখের পাতা ফেলে জানতে চায়, ঠিকানা ?

আমার ঠিকানা ?

হ্যাঁ। ঢাকায় বাসা কোথায় ?

এক নম্বর গোবিন্দ দত্ত লেন। লক্ষ্মীবাজার। সদরঘাটের খুব কাছে।

গোবিন্দ দত্ত কি হিন্দুর নাম ?

জ্বি, হিন্দুর নাম ।

আপনি হিন্দু ?

না, আমি হিন্দু নই।

মুসলমান ?

হ্যাঁ, আমি মুসলমান ।

আপনার বাবা মুসলমান ?

বলেছি তো, তার নাম কাজী সাইফুল ইসলাম। তিনি মুসলমান ছিলেন।

শিয়া না সুন্নী ?

শিয়া নন, সুন্নী।

আপনার ক'টা কবিতার বই বেরিয়েছে ?

কবিতার বই ? আমার ?

আচ্ছা, সে কথা থাক। মীরপুরে আপনাকে যখন দেখা গেল, কোথায় যাচ্ছিলেন ?

জাফরগঞ্জে।

সেটা কোথায় ?

আরিচা থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে।

গ্রাম ?

ছোট একটা গ্রাম। হাট আছে। শনি মঙ্গলবার।

সেখানে কী ?

কী মানে ?

সেখানে কী আছে ? আপনি তো ভারতের।

না, ভারতের নই।

বললেন, ভারতে আপনার জন্ম। বর্ধমানে বাড়ি।

বাড়ি ছিল এক সময়ে। তারপর ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আসি।

ও হ্যাঁ, বলেছেন। আমাদেরই ভুল।

'৪৮ সালে আমরা ভারত ছেড়ে একবারেই চলে আসি।

জাফরগঞ্জে কী ?

আমার শ্বশুর বাড়ি

আপনি বিবাহিত ?

হ্যাঁ।

কতদিন ?

আট বছর ?

ছেলেমেয়ে ?

তিনজন।

আপনি ঢাকায়, তারা জাফরগঞ্জে কেন ?

ওদের পাঠিয়ে দি।

কবে ?

এ মাসেরই আট তারিখে ।

আট তারিখে ?

হ্যাঁ, বাসে করে পাঠিয়ে দি।

সাত তারিখের মিটিংয়ে গিয়েছিলেন ?

কোন মিটিং ?

রেসকোর্স ময়দানে।

ও হ্যাঁ, সাত তারিখে শেখ মুজিব মিটিং করেছিলেন।

আপনি গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

আপনার পেশা কী ? কী কাজ ? কী করেন ?

চাকরি করি।

সরকারি ?

বেসরকারি।

আর কী করেন ?

আর কিছু করি না।

কবিতা ?

কবিতা ? কার কবিতা ?

কবিতা লেখেন না ?

ঠিক এই সময়ে পেছনের দরজা দিয়ে একজন সৈনিক এসে ঢোকে। তার হাতে কাঠের ট্রে। অফিসারদের একজনের ইশারা পেয়ে সে ট্রে নামিয়ে রাখে টেবিলের উপর নজরুলের সমুখে। নজরুল চায়ের পেয়ালা হাতে নেবার জন্য হাত বাড়ায়, একজন অফিসার হাত তোলে। যেন তাকে নিষেধ করা হয়। তখন চায়ের কাপ নামিয়ে রাখে নজরুল।

আপনি কবিতা লেখেন না ?

না।

কখনোই লেখেন নি ?

না।

লিখতে চান নি ?

না।

হঠাৎ লজ্জিত বোধ করে নজরুল। মাথা নামিয়ে নেয়। বলে, কবিতা আমি ভাল বুঝতে পারি না।

আচ্ছা, আপনি চা খেয়ে নিন।

চায়ে চুমুক দেয়ার আগে নজরুল হঠাৎ প্রশ্ন করে, আমি বাড়ি যেতে পারব তো ?

নিশ্চয় পারবেন।

আশ্বস্ত হয়ে চায়ে চুমুক দেয় নজরুল। এক টুকরো বিস্কুট ভেঙে নেয়। তার অনেকটাই গুঁড়ো হয়ে কোলের উপর ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রতিভ হয়ে চারদিকে সে তাকায়। মেঝেটা নোংরো হয়ে গেল। কী ভাববে ওরা ? সে তাকিয়ে দ্যাখে, প্রত্যেকেই প্রশ্রয়-সুন্দর চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে তখন বিস্কিট ফেলে শুধু চায়ে মনোযোগ দেয়।

চা শেষ হয়। সন্তর্পণে কাপটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখে সে, যেন এতটুকু শব্দ না হয়।

বিস্কিট পড়ে রইল যে।

নজরুল একটু হাসে।

আরেক কাপ চা দেবে ?

না, না, এই যথেষ্ট।

তাহলে আপনি কাজী নজরুল ইসলাম ?

জ্বি।

বরাবর ঢাকাতেই ছিলেন ?

জ্বি।

আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের আপনি দেশে পাঠিয়ে দেন ?

জ্বি।

মার্চের আট তারিখে ?

জ্বি।

বাসায় রান্না করছে কে ?

কেউ না। ওরা চলে যাবার পর হোটেলেই খেয়ে নিচ্ছি। রান্না আমার আসে না। ওরা না থাকলে বাইরেই খেয়ে নেই।

বাইরে সময় কাটছিল আপনার ?

একরকম তা-ই।

সিগারেট ?

জ্বি ?

সিগারেট খান।

দামি বিলিতি সিগারেটের আনকোরা প্যাকেট নজরুলের সমুখে বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে সঙ্গে নতুন দেশলাই।

খান।

সিগারেটের প্যাকেট খুলতে গিয়ে নজরুল টের পায় তার হাত ভীষণ রকমে কাঁপছে। আর সেটা লক্ষ করছে ঘরের প্রতিটি লোক।

কোনো রকমে একটা সিগারেট ধরায় সে, কিন্তু ভাল করে টান দিতে পারে না। গলার ভেতরে শক্ত কী একটা স্থির হয়ে আছে, চলে গেছে সোজা পাকস্থলী পর্যন্ত। সিগারেট তার আঙুলের ফাঁকেই পুড়তে থাকে।

হঠাৎ প্রশ্ন শুরু হয় আবার।

আপনি জাফরগঞ্জে যেতে চান ?

হ্যাঁ চাই। আজ গেলে খুব ভাল হয়।

কেন, ভালটা কীসের ?

ওরা খুব চিন্তা করছে যে।

কী চিন্তা করছে ?

এই আমি ভাল আছি কি-না।

অর্থাৎ, আপনি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন ?

না, তা কেন ? মরে যাবো কেন ?

নজরুল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ওঠে। কী জানি, পাছে তারা কোনো অপরাধ নেয়— মৃত্যুর কথা সে ভেবেছে বলে।

নজরুল মুখে একটা স্থির বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে বলে, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

কেন ?

একদিন না একদিন মরতে তো হবেই।

কথাটা বলেই সে টের পায়, কোথায় কী বদলে গেল চোখের পলকে। যেন একটা সুর কেটে গেল। যেন একটা বিচ্ছিরি স্তব্ধতা দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে।

আড়চোখে অফিসারদের সমুখে রাখা দপ্তরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয় নজরুল। হঠাৎ তার কপালে দেখা দেয় ঘাম। কিন্তু সে ঘাম মুছে ফেলার জন্যে হাত ওঠে না তার।

শিগগিরই একজন বলে, চেয়ার একটু পেছনে ঠেলে, তাতে ক্যাঁচ করে শব্দ তোলে, আমরা জানি, মৃত্যুকে আপনি ভয় পান না। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, একেবারে বন্ধু হিসেবে জিগ্যেস করছি, বলবেন ?

নজরুল অপেক্ষা করে। কপাল থেকে ঘামেব ফোঁটা চুঁইয়ে এখন তার ভ্রু পর্যন্ত নেমেছে।

পঁচিশে মার্চ সকাল বেলা আপনি কী করছিলেন ?

পঁচিশে মার্চ ?

হ্যাঁ মনে করে দেখুন। সকাল বেলা।

ঘুম থেকে ওঠে চা বানাই।

তারপর ?

চা খেয়ে নিচের তলায় বশীর সাহেবের কাছে যাই।

বশীর সাহেব কে ?

নিচের তলার ভাড়াটে।

কী করেন তিনি ?

কোনো একটা আপিসে কী যেন করেন।

এত বছর এক সঙ্গে আছেন, জানেন না কোন অফিসে কী কাজ তিনি করেন ?

জানি না। এত বছর কই ? মাত্র দুই মাস আগে নিচের তলা ভাড়া নেন তিনি। প্রথম দিন থেকেই তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর বনিবনা হয় নাই। ওপর থেকে ময়লা ফেলা নিয়ে কী একটা গণ্ডগোল হয়, কথা কাটাকাটি হয়— সেই থেকে সদ্ভাব নেই।

অথচ সেই বশীর সাহেবের কাছেই আপনি যান ?

হ্যাঁ। যাই। উনি খবরের কাগজ রাখেন। কাগজ দেখতে গিয়েছিলাম।

তারপর ?

তারপর কাগজ পড়ে, বশীর সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে আবার ওপরে আসি।

কী কথা হলো ?

ভালো মনে নেই।

চেষ্টা করে দেখুন।

হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে নজরুল। উদগ্রীব গলায় সে জানতে চায় বশীর সাহেবকে নিয়ে কোনো গোলমাল হয়েছে কি-না।

বশীর সাহেবকে নিয়ে গোলমাল হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

কী জানি। বুঝতে পারছি না।

নজরুলের বিশ্বাস হয়ে যায় যে বশীর সাহেব ধরা পড়েছেন। আর তাকে মীরপুর ব্রীজ থেকে পাকড়াও করা হয় সেটাও ঐ বশীর সাহেবের জন্যে। আলবত তাঁরই জন্যে। লোকটা রাজনীতি-পাগল। মানুষ ধরে ধরে রাজনীতি আলোচনা করেন বলেই নজরুলের আজ এ দুর্গতি।

তারপর ?

হঠাৎ মাথা গুলিয়ে যায় নজরুলের।

আবার প্রশ্ন হয়।

তারপর ? বশীর সাহেবের সঙ্গে কী কথা হলো ?

এইবার মনে পড়েছে নজরুলের। তার প্রত্যয় হয়, বশীর সাহেবের সঙ্গে সেদিন সকালের আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেই মুক্তি পেয়ে যাবে সে এক্ষুণি।

বশীর সাহেব বললেন, শেখ মুজিব এমন টাইট দিয়েছে যে, ইয়াহিয়া আজকেই ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি ফিরে যাবে। জীবনে আর এ মুখো হবে না।

আর কী কথা হলো ?

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বশীর সাহেব বললেন, জয় বাংলার নিশানটা ভাল হয় নি। সূর্যের ভেতরে বাংলাদেশের ম্যাপটা না থাকলেই ভাল ছিল। তিনি নাকি দুনিয়ার কোনো নিশানে দেশের ম্যাপ দেখেন নি।

আর কী কথা হলো ?

এরই মধ্যে তার বড় ছেলেটা বাইরে যাচ্ছিল। তিনি তাকে পেছনে থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিস ? ছেলে বলল, কী একটা মিছিল আছে, সেখানে যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট হাউসের কাছে। তখন বশীর সাহেব সেই রকম চেঁচিয়ে বলল যে, সাবধান থাকিস। ছেলেটা ততক্ষণে শোনার বাইরে চলে গিয়েছিল। বশীর সাহেব তখন আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, দেশ যদি কেউ স্বাধীন করে থাকে তো এই ছেলেরাই করছে, আমরা বুড়োরা তো আপোষ করে করেই এতকাল দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলাম।

এক নিঃশ্বাসে গড়গড় করে কথাগুলো বলে এখন দম নেবার জন্য থামে নজরুল। তারপর, বশীর সাহেব যে মারাত্মক এক ব্যক্তি সেটাই সন্দেহাতীত রকমে প্রমাণ করবার জন্যে সে যোগ করে নতুন এক তথ্য।

বশীর সাহেব আমাকেও মিছিলে যোগ দেবার জন্যে অনেক বারই বলেছিলেন।

আপনি গিয়েছিলেন ? মিছিলে ?

না।

কথাটা মিথ্যে; আর মিথ্যেটা যে তার বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, সেটা টের পেয়ে যায় নজরুল নিজেই। বেশ কয়েকটা মিছিলে সে গিয়েছিল। চিৎকার করে শ্লোগান দিয়েছিল— স্বাধীন করো, স্বাধীন করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

যান নি ?

আবার প্রশ্নে চুপ করে থাকে নজরুল।

অনেক কবিই তো মিছিলে গিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

আপনি যান নি ?

না।

এবারে, দ্বিতীয় বারে, মিথ্যেটা সত্যের মতই জোরাল শোনায় নজরুলের নিজের কাছে।

আমি যাই নি। বশীর সাহেব গিয়েছিলেন।

তারপর ?

তারপর বশীর সাহেব আর কী করেছেন, আমি জানি না। জানলে বলতাম।

বশীর সাহেবের কথা নয়। তারপর আপনি কী করলেন ?

ও, আমি ? আমি তারপর ওপরে উঠে এলাম। বিছানা-টিছানা ঠিক করলাম। বোধহয় আবার একটু শুয়ে পড়েছিলাম।

আপিস ? আপিসে গেলেন না ?

আপিস হচ্ছিল না।

কেন ?

অসহযোগিতার নির্দেশ জারি হবার পরপরই আমাদের মালিক অফিস এক মাসের জন্যে বন্ধ করে দেন। তিনি করাচি চলে যান ব্যবসারই কী একটা কাজে।

তারপর ?

এখনো তিনি করাচিতেই আছেন।

তার কথা নয়, আপনি কী করলেন ?

দুপুরের দিকে সদরঘাটে গিয়েছিলাম মনে আছে। সেখানে জয়বাংলার নিশান বিক্রি হচ্ছিল পথের ওপর গাদি করে। আমি খানিকক্ষণ দাম-টাম জিগ্যেস করলাম।

কেন ?

কোন সাইজের নিশান কী দামে বিক্রি হচ্ছে জানবার জন্যে। কিনবার জন্যে নয়। এমনিতেই জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

নিশান কিনলেন ?

না।

কেন কিনলেন না ?

আমরা যে বাড়িতে থাকি সেটা তেতলা। তেতলায় থাকেন বাড়িওয়ালা। তিনি একটা নিশান ছাদ থেকে উঠান। তাতেই কাজ চলে যায়।

তারপর ?

তারপর সদরঘাটে গেলাম কোথাও ভাত খেয়ে নিতে। সেখানে সস্তায় খাবার মতো কিছু হোটেল আছে, নৌকায়। হিন্দু হোটেল।

হিন্দু হোটেল ?

মানে, মাছ-ভাত খাবার হোটেল। লোকে হিন্দু হোটেল বলে।

আপনি মুসলমান ?

জ্বি, আমি মুসলমান।

হিন্দু হোটেলে আপনি খান ?

আসলে হিন্দু হোটেল নয়। লোকে বলে। বাঙালি হোটেল আর কী।

বাঙালি হোটেল ?

না, তাও নয়। মাছ-ভাত পাওয়া যায়, মাছ-ভাত ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, সেইসব হোটেলে।

অর্থাৎ, লোকে যেগুলোকে হিন্দু হোটেল বলে ?

নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয় নজরুলের। শুধু হোটেল বললেই হত; কেন সেই সঙ্গে হিন্দু কথাটা যোগ করতে গেল সে ? তাও না হয় একরকম ছিল, আবার বেমওকা বাঙালি হোটেল কথাটা বেরিয়ে গেল। হয়ত আর কখনোই সে মুক্তি পাবে না এখান থেকে।

আতংকে সারা মুখের ঘাম শুকিয়ে যায় তার। ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকায় সে। দ্যাখে, চতুর্থ ব্যক্তির হাতে পেন্সিলটা নোট বই ছুঁয়ে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে।

মনে হয়, দীর্ঘ একটা প্রহর পার হয়ে যায়। অবশেষে আবার প্রশ্ন শুরু হয়।

নজরুলের স্পষ্ট মনে পড়ে যায় সেই মুহূর্তের ছবিটা। নৌকার ওপরে এক হোটেল থেকে দুটি ছোকরা তারস্বরে চিৎকার করে ডাকছিল—। আসেন, আসেন, জয় বাংলা মাছ ভাত, হাফ দামে বাঙালি খাওন, স্বাধীনতা আইয়া পড়ছে, বড় বড় কই মাছ লাফাইয়া উঠছে, জয় বাংলা কইমাছের ঝোল, হাফ দামে চইলা যায়। আসেন, আসেন।

ছোকরা দু'টির পালা করে গানের মতো সেই আহ্বান এখনো তার কানে লেগে থাকলেও, নজরুল ভাল করেই বুঝতে পারে যে এর উল্লেখ মাত্র করা যাবে না। তাছাড়া, এ ঘরে কথা হচ্ছে প্রধানত উর্দুতে। প্রশ্ন হচ্ছে উর্দুতে, আর সে উত্তর দিচ্ছে প্রচুর ইংরেজি শব্দ আর আল্‌টঁপকা দু'একটা বাংলা শব্দ মিশিয়ে বিচিত্র এক উর্দুতে। কাজেই সদরঘাটে শোনা সেই ভাত খাবার ডাক অনুবাদ করাটা সব দিক থেকেই অনুচিত এবং অসম্ভব মনে হয় তার।

ভাত খেলেন কোথায় ? কোন হিন্দু হোটেলে ?

খেলাম না। পকেটে পয়সা কম ছিল। তাই দু'আনার চীনে বাদাম কিনেছিলাম।

সারাদিন কিছু খেলেন না ?

না, না, তা নয়। খেয়েছি। ভাত খেয়েছি আমাদেরই দেশের পরিচিত একজনের বাসায়।

ভারতের লোক ?

কার কথা বলছেন ?

যার ওখানে ভাত খেলেন ?

না, না ভারতের লোক হতে যাবে কেন ? ওরাও আমাদেরই মতো ৪৮ সালে ঢাকা চলে এসেছিল বাড়িঘর সব বেচে দিয়ে। আর কোনোদিন বর্ধমানে যায় নি।

আসলে নজরুল ভাত খেয়েছিল সদরঘাটেই, ঐ জয় বাংলা কই মাছ দিয়েই। ভারি স্বাদ ছিল ঝোলটার। এই তো মাত্র দু'দিন আগের কথা। তারপর ২৬ গেছে, ২৭ সে ধরা পড়ে। ২৬শে খেতে পায় নি, কারণ বাইরে ছিল কারফিউ আর ভেতরে ছিল না খাবার। ২৭শে সামান্য সময়ের জন্যে কারফিউ ওঠে যেতেই সে রওনা হয়েছিল জাফরগঞ্জের দিকে; পথে ধরা পড়ে এখানে আসে এবং গতকাল ধরা পড়বার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত এখন চা ছাড়া আর কিছুই তাকে খেতে দেয়া হয় নি।

তার নাম কী ?

যার ওখানে ভাত খেতে গিয়েছিলাম ?

এক মুহূর্তে ভেবে নেয় নজরুল। কার কথা বলবে ? হঠাৎ সালেহার কথা মনে পড়ে যায়।

সালেহার স্বামীর নাম করে নজরুল।

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান।

কী করেন তিনি ?

সাইকেলের দোকান আছে তাঁর।

কোথায় ?

বংশালে।

বংশালে তো জয় বাংলার একটা ঘাঁটি।

চুপ করে থাকে নজরুল। বংশালেও সে জয় বাংলার নিশান দেখেছে সমস্ত বাড়ি আর দোকান ঘরের মাথায়, যেমন দেখা গেছে সারা ঢাকায় আর গোটা বাংলাদেশে। বংশালকে বিশেষ করে দেখবার মতো কোনো কারণ তার মাথায় আসে না। সে চুপ করে থাকে।

বংশালে জয় বাংলার ঘাঁটি নেই ?

থাকতে পারে। আমি জানি না। সত্যি, আমি জানি না।

এক প্রকার অনুনয় ফুটে বেরোয় নজরুলের কণ্ঠে।

আচ্ছা, সে থাক। আপনি বংশালে গেলেন, সেখানে ভাত খেলেন, বেলা তখন ক'টা হবে ?

এই দেড়টা কী দুটো।

তারপর ?

তারপর আনিস সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে বলেই, নজরুল এখন কল্পনায় নিজেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনিসুর রহমানের বাসা থেকে বের করে আনে এবং দাঁড় করায় নবাবপুরে— যে নবাবপুরে সে এসেছিল সদরঘাট থেকে ভাত খেয়ে।

বংশাল থেকে গেলেন কোথায় ?

জিন্নাহ এভেন্যুতে।

জিন্নাহর পুরো নাম কী ?

হকচকিয়ে যায় নজরুল। এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না সে।

পুরো নাম বলুন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

তার নামের আগে কায়েদে আজম নেই ?

আছে। হ্যাঁ আছে । বলতে ভুলে গিয়েছিলাম । কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

আপনি কখনো কায়েদে আজমকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন ?

না।

ইসলামি আদর্শ নিয়ে কোনো কবিতা ?

পাকিস্তান সম্পর্কে ?

না।

ইসলামি আদর্শ নিয়ে কবিতা লেখা যায় ?

হ্যাঁ, যায়।

তাহলে লেখেন নি কেন ?

আমার কখনো ইচ্ছে হয় নি।

অর্থাৎ, ইসলামি আদর্শ নিয়ে কবিতা লেখার কোনো ইচ্ছাই আপনার কখনো হয় নি ?

না, তা নয়। কবিতা লেখারই কোনো ইচ্ছা আমার কখনো হয় নি।

তাহলে, আমরা কি ধরে নেব যে নিজের অনিচ্ছায় আপনি কাজী নজরুল ইসলাম এতকাল কবিতা লিখছেন ?

আপনারা ভুল করছেন। আমি কোনো কবিতাই লিখি নি।

আমাদের ভুল তাহলে ?

২

নজরুল টের পায় যে শেষ প্রশ্নটির জবাব হ্যাঁ দিলেও বিপদ, না দিলেও নিস্তার নেই। সে বুঝেই পায় না, এই অদ্ভুত প্রশ্নগুলি তিনটি লোক এক নাগাড়ে তাকেই কেন করে যাচ্ছে।

যাক, আপনি কবিতা লেখেন নি, কখনোই কবিতা লেখেন না— আপনারই কথা। এবার বলুন জিন্নাহ এভেন্যুতে কী করলেন ?

ইতস্তত করে সে উত্তর দেয়, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

সত্যিই নজরুলের মনে পড়ছে না। তার একটা কারণ, সে এখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। সে এখন আর এখানে নেই। সে শুধু বুঝতে চেষ্টা করছে, তাকেই কেন এ প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে ? সে বুঝে দেখতে চাইছে, এখানে সে কী করছে ? কেন এসে পৌঁছেছে ? তার মতো একজন মানুষের তো এখানে এভাবে এখন এদের মুখোমুখি থাকবার কথা নয়। এমনকি, এটা এক অদ্ভুত সৃষ্টি ছাড়া স্বপ্নও হতে পারে।

চেষ্টা দেখুন মনে পড়ে কি-না।

চেষ্টা করছি।

এতক্ষণ তো বেশ বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কী হলো ? নিন, একটা সিগারেট নিন।

হ্যাঁ, সিগারেট।

নজরুল আরেকটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু আগের মতোই ভীষণ হাত কাঁপতে থাকে তার। আগের মতোই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়তে থাকে। তখন সে এক গেলাশ পানি চায়।

অবিলম্বে পানি আসে। একটু চুমুকে সমস্ত গেলাশ নিঃশেষ করে দেয় সে।

মনে পড়ছে, কাজী সাহেব ?

আমি জিন্নাহ এভেন্যুতে যাই।

ওটা আগেই বলেছেন।

বলেছি বুঝি? হ্যাঁ, বলেছি। সেখানে আমি অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়াই। পুরনো একজন বন্ধুর সঙ্গে তারপর দেখা হয়ে যায়।

কোথায়?

স্টেডিয়ামের মোড়ে।

বন্ধুটি কে?

এক বইয়ের দোকানে কাজ করে।

বইয়ের দোকান?

হ্যাঁ, বাংলাবাজারে স্কুলপাঠ্য বইয়ের দোকান। মাঝেমাঝে আমি সেখানে গিয়ে গল্পটল্প করি।

কবিতার বই বিক্রি হয় সে দোকানে?

হয়ত হয়। কিছু কিছু বাইরের বইও ওদের দোকানে দেখেছি।

আপনার কবিতার বই সেখানে বিক্রি হয়?

আমার বই নেই। বিক্রি হবে কোত্থেকে?

প্রশ্নের উত্তর দিন। প্রশ্ন করবেন না।

নিজেকে সামলে নেয় নজরুল। নির্দেশটি তাকে যেন এক নিমিষে ভয়াবহ এক শূন্যতার ভেতরে স্থাপিত করে দেয়। মনে হয়, তার পেছন থেকে একটানে কে যেন চেয়ারটা সরিয়ে নিয়েছে, আর সে বসে আছে চেয়ারের আদলে গড়া একখণ্ড শূন্যতার ওপর।

সেই বন্ধুর নাম কী?

ওসমান।

আপনাকে ওসমান কী বলল?

সে বলল, বাঙালিরা খুব ভুল করছে। শেষ মুজিব বাঙালিদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, শেখ মুজিব বাঙালিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এই ধরনের আরো অনেক কিছু সে বলল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আপনি তার ওপরে চটে গেলেন?

আমি?

আপনি তার কথা শুনে চটে গেলেন?

নজরুল বুঝতে পারে কথা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। তাই হিসেব করে সতর্ক গলায় সে জবাব দেয়, না।

তাহলে?

তার কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করলাম।

কী চিন্তা করলেন?

ভেবে দেখতে চাইলাম, ওসমানের কথা ঠিক কি-না। ঠিক বলেছে কি-না।

কী মনে হলো ?

মনে হলো, তার কথা ঠিক হলেও হতে পারে। ওসমান অনেক খবর রাখে। অনেক রকম লোক ওর দোকানে আসে, গল্প করে।

আসলে, নজরুলকে এখন যারই উল্লেখ করতে হচ্ছে, তার কাঁধেই দোষ দিতে সে উদগ্রীব। আজকেই যদি ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে আজই সে জাফরগঞ্জ চলে যায়।

আমি ওসমানকে এরপর বিদায় দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

কোনদিকে ?

রমনার দিকে। ভাবলাম, যাই, পার্কে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। চনমনে রোদ্দুরে বেশ গরম লাগছিল।

তারপর ?

পার্কে গিয়ে বসলাম। সেখানেই সন্ধে হয়ে গেল। মনে হলো, বাড়ি ফেরা দরকার। বাড়ি ফিরে গেলাম।

তারপর ?

ঘরে খানিক চিঁড়ে ছিল, ধুয়ে চিনি দিয়ে খাই। খেয়ে শুয়ে পড়ি।

তখন ক'টা বাজে ?

কী জানি। হাত ঘড়িটা খারাপ ছিল। হয়ত ন'টা কী সাড়ে ন'টা হবে। তার বেশি নয়।

শুয়ে পড়লেন, ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করলেন না ?

কীসের ঘোষণা ?

কেন ?—সকালেই বশীর সাহেব আপনাকে বলেন যে প্রেসিডেন্ট আজই ঘোষণা করে ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। খোঁজ নেবার জন্যে আপনার কৌতূহল হলো না ? একবার রেডিও খুললেন না।

আমার রেডিও নেই।

বশীর সাহেবের কাছ একবার শুনতে যেতে পারতেন।

তিনি বাসায় ছিলেন না।

তাহলে তার কাছে গিয়েছিলেন বলুন ?

না। বাড়িতে ঢোকার সময় দেখেছিলাম তিনি রাস্তায় নেমে যাচ্ছেন।

তারপর ?

তারপর আমার বোধহয় ঘুম আসে।

আপনি তাড়াতাড়ি ঘুমোন ?

সাধারণত আমার বেশ তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। সকালে আপিস যেতে হয়। আপিসে যাবার আগে বাজারে যেতে হয়। তাই।

তারপর ?

তারপর আর কী ? গতকাল কারফিউ উঠলে শ্বশুড় বাড়ির দিকে বেরোই। মীরপুর ব্রীজে—

সে কথায় পরে আসব আমরা। ঘুমোতে যাবার পর কী হলো ? উঠলেন কখন ? পরদিন সকালে ?

না।

তাহলে ?

রাতেই উঠে পড়ি।

কেন, রাতে উঠে পড়লেন কেন ?

নজরুল প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে উত্তর দিল এই প্রশ্নের।

গুলির শব্দে।

গুলির শব্দে ?

হ্যাঁ।

আগে কখনো গুলির শব্দ শুনেছেন ?

হ্যাঁ শুনেছি।

কোথায় ?

সিনেমায়।

আপনি ঘুমের মধ্যে শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন গুলির শব্দ ?

প্রথমে বুঝতে পারি নি।

কখন বুঝতে পারলেন ?

কিছুক্ষণ পরেই।

রাত তখন ক'টা ?

এগারটা দশ।

কী করে ঠিক ঠিক সময় আন্দাজ করলেন ?

আমার ঘড়িতে।

কিন্তু একটু আগেই বললেন ঘড়িটা খারাপ ছিল।

সেটা আমার হাত ঘড়ি। ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা টেবিল ঘড়ি আছে। এগারটা দশ বেজেছিল তাতে।

অথচ কখন শুতে গেছেন সেটা টেবিল ঘড়িতে দেখে রাখার দরকার বোধ করেন নি।

টেবিল ঘড়িটা পাশের ঘরে রাখা থাকে।

তাহলে গুলির শব্দে আপনি পাশের ঘরে যান ?

হ্যাঁ।

কেন ? বাড়িতে তো কেউ নেই। পাশের ঘরে কেন গিয়েছিলেন ?

পাশের ঘর থেকে সড়ক দেখা যায়। আমি দেখতে গিয়েছিলাম গুলিটা কোথায় হচ্ছে।

দেখতে পেলেন ?

না।

তখন কী করলেন ?

সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে চৌকির ওপর বসে রইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ?

হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে।

সিগারেট নিন।

হ্যাঁ সিগারেট।

আরেকটা সিগারেট নেয় নজরুল। কিন্তু ধরাতে যাবার আগেই নতুন প্রশ্নের মুখে পড়ে যায় সে। ধরান আর হয় না।

একটা কথা বলুন, গুলির শব্দ যখন শুনলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনার কী মনে হলো ?

মনে হলো খুব জোর গুলি চলছে।

তা নয়। ভাল করে শুনুন, ভাল করে ভেবে দেখুন, তারপর উত্তর দিন। গুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কী মনে হলো ? কারা গুলি ছুঁড়ছে ?

নজরুল ভেবে পায় না কী উত্তর সে দিতে পারে। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয়েছিল, ছাত্রদের নিশ্চয়ই কোনো মিছিল বেরিয়েছে আর তার উপর গুলি ছুঁড়ছে মিলিটারি। যারা বলত যে মিলিটারি ক্যান্টমেন্টের ভেতরে সেঁদিয়ে পড়েছে ভয়ে, তাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতো না নজরুলের। তার সহজ কারণ এই যে, সে হচ্ছে চিরকালের ভীতু। তার মনে সবচেয়ে প্রবল অনুভূতি— ভয়ের। আর সবচেয়ে বেশি ভয় করে সে অস্ত্রকে। সেই মরণাস্ত্র যাদের হাতে তাদের কখনও পরাজয় হতে পারে এটা তার বিশ্বাসযোগ্যতার একেবারেই বাইরে।

অন্যদিকে, সে যদি এখন বলে যে বাঙালি গুলি ছুঁড়ছে বলে তখন তার মনে হয়েছিল, তাহলে দুটো বেকাদায় পড়তে পারে সে। এক, সে নিশ্চিত হলো কী করে যে বাঙালিদের হাতে আক্রমণ করবার মতো অস্ত্র আছে ? দুই, বাঙালিদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই যদি তার জানা, তাহলে সে এখন দেখিয়ে দিক কোথায় কার কাছে অস্ত্র আছে, কোথায় তাদের ঘাঁটি রয়েছে।

কী মনে হল তখন আপনার ?

আবার সেই প্রশ্ন। একটু ইতস্তত করল নজরুল। ভেবে দেখল, সত্যি কথাটাই বলে ফেলা সবচেয়ে ভাল।

আমি ভেবেছিলাম, ছাত্ররা হঠাৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, তাই আপনারা গুলি ছাঁড়তে বাধ্য হয়েছেন।

আর কী মনে হয়েছিল ?

আমার খুব ভয় করছিল ?

কীসের জন্য ভয় করছিল ? আপনার উপর গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল না। আপনার মহল্লাতেও কিছু হচ্ছিল না ।

ভয় করছিল আমার বৌয়ের জন্য আর ছেলেমেয়ের জন্যে।

তারা তো ঢাকায় নেই।

তবু ভয় করছিল।

বাঙালিরা হেরে যেতে পারে বলে ভয় করছিল ?

না।

আমরা হেরে যেতে পারি বলে ভয় করছিল ?

সে কথা আমার মনেই হয় নি।

তাহলে আপনার ভয় করছিল কেন ?

বললাম ছেলেমেয়ের জন্যে।

বৌয়ের জন্যে!

হ্যাঁ, তার জন্যেও।

ভয়টা পরদিনও ছিল ?

হ্যাঁ, ছিল।

পরদিন আপনি প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শুনেছিলেন ?

হ্যাঁ, শুনেছি।

আপনার তো রেডিও নেই। শুনলেন কী করে ?

বশীর সাহেবের রেডিও আছে।

তার বাসায় তার সঙ্গে বসে শুনেছেন ?

হ্যাঁ, তার বাসায় তার সঙ্গে।

মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানেন ?

হ্যাঁ, জানি।

সে কথা শুনে আপনার ভয় কমলো ? না, বাড়লো ? জবাব দিন। বলুন। সে কথা শুনে আপনার কী মনে হলো ?

আমার ভয় করতে লাগল।

তবু ভয় ?

আমার ছেলেমেয়ের জন্য বৌয়ের জন্যে।

কেন ?

ওরা কাছে থাকলে ভয় করত না। বিশ্বাস করুন, আমার ভয় শুধু ওদের নিয়ে। আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতির কিছু বুঝি না, ভোটের সময় আমার খুব জ্বর হয়েছিল, ভোট দিতেও যাইনি। আমি আমার ছেলেমেয়ে ছাড়া, তাদের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। আমি মিছিল চাই না, ধর্মঘট চাই না, গুলি খেয়ে মরতে চাই না; আমি রক্ত দেখলে ফিট হয়ে যাই, এই জন্যে আইএসসি পাশ করেও ডাক্তারি পড়তে যাই নি। আমি আমার ছেলেমেয়েদের ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। তাই আমার ভয় করছিল। আর কোনো কিছুর জন্যে নয়।

বলতে বলতে টপটপ করে চোখের পানি পড়ে নজরুলের। হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে যায় সে। এভাবে, অপরিচিত লোকের সামনে সে কাঁদতে পারে, কোনো দিন কল্পনাও করে নি। আবার একটু স্বস্তিও আসে। হয়ত এ চোখের পানিতেই এ বিপদ পার হয়ে যাবে, সে মুক্তি পাবে, জাফরগঞ্জে ছেলেমেয়ের কাছে যেতে পারবে, হয়ত এখুনি, আর একটু পরেই।

অথচ এই আপনিই আপনার কবিতায় কী সাহসী!

বিদ্রূপের জ্বলজ্বলে চোখে তিনজন অফিসার তাকিয়ে থাকে নজরুলের দিকে।

৩

কিছু বুঝতে না পেরে শূন্য দৃষ্টিতে নজরুল তাকায়। তখনও চোখে পানি তার। ভাল করে মুখগুলো তাই সে দেখতে পায় না।

শিগগিরই একজন অফিসার এক টুকরো ছাপা কাগজ ঠেলে দেয় নজরুলের সমুখে। খবর কাগজ থেকে কাটা। নজরুলই কেটে ছিল দিন কয়েক আগে।

চোখের পাতা বার কয়েক ফেলতেই পানি কেটে যায়, দৃষ্টি সহজ হয়ে আসে।

খবরের কাগজের কাটা অংশটুকুতে বাংলাদেশের পতাকা— ওপরে লেখা জয় বাংলা, নিচে ইংরেজি অনুবাদ লেখা, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়—আরো কতগুলো লাইনের পরে, বড় হাতের হরফে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম।

মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে যায় নজরুলের কাছে। এরা তাকে সেই বিখ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম ঠাউরেছে। বর্ধমানের সেই বিখ্যাত সন্তানের নামে বাবা তার নাম রেখেছিলেন। গোলমালের শুরু সেখান থেকেই। কিন্তু সে তো কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, তার সঙ্গে ঐ বিদ্রোহী কবিকে কেউ গুলিয়ে ফেলতে পারে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হতেই মনটা ভারি হালকা হয়ে যায়। এ ভুল তো এক্ষুনি ভাঙিয়ে দেয়া যাবে; আর সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তি পাবে।

হা হা করে হেসে উঠে নজরুল। হাসতে হাসতেই বলে, আপনারা খুব ভুল করছেন দেখছি। বিদ্রোহী কবি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। মাথাটাও খারাপ তাঁর। থাকেনও কলকাতায়। আমি সে লোক নই, কবি নই। সিপাইরা মস্ত বড় ভুল করেছে। বুঝলেন?

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে। মনে হয়, জ্বলন্ত একটা মশাল কেউ তার মুখের ওপর চেপে ধরেছে। উত্তপ্ত অশ্রু ঠেলে ওঠে তার চোখে।

ডাইনে বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে দু'গালে চড় পড়তে থাকে তার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখের কোথাও আর কোনো বোধশক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এখন কেবল মনে হতে থাকে, অন্য কোথাও বারবার কিছু একটা আছড়ে পড়বার ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার মুখমণ্ডল।

বাঁ পাশের অফিসার, যে উঠে এসে চড় মারছে, সে একেকবার হাত নামিয়ে আনছে আর বলছে, আমরা ভুল করি না। আমরা ভুল করি না। বুঝেছ কবি, আমরা ভুল করি না। কবি বলেই এতক্ষণ সম্মান করে কথা বলছিলাম। এতবড় মিথ্যেবাদী, এত বড়

দেশদ্রোহী। ভেবেছ, তোমার আগাগোড়া মিথ্যে কথা আমরা ধরতে পারি নি ? তাই ভেবেছ ? তাই ভেবেছ ? চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে কবি ?

জ্ঞান হারিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যায় নজরুল। তখন তার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে অফিসারটি হুকুম করে সরিয়ে নেবার জন্যে। জ্ঞান হারালেও, লাথি খেয়ে শরীরটা একবার ধণুকের মতো বেঁকে উঠে স্থির হয়ে যায়।

৪

চোখ মেলে দ্যাখে আবার সেই ঘরে শুয়ে আছে সে। কিন্তু আলো এখন অত উজ্জ্বল বোধ হয় যে পরমুহূর্তেই চোখ বোঁজে সে। ঘরটা যেন চোখের পলকে একবার বিশাল হয়ে যায়; আবার সংকুচিত হয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়।

তীব্র আলোকিত একটা বিন্দু। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে আবার চোখ মেলে সে। এবারে তার চোখে পড়ে লম্বা তেপায়া একটা স্ট্যান্ডের ওপর সূর্যের মতো উজ্জ্বল একটি বাতি জ্বলছে তার চোখ বরাবর।

আলোটা এখানে আজ সকালেও ছিল না।

উঠে বসতে যাবে, তার হাত পায়ে টান পড়ে। দু'পা চৌকির পায়ার সঙ্গে বাঁধা। হাতে হাতকড়া।

সমস্ত শরীর ঘামে জবজব করছে তার। মুখ বিস্বাদ। থু থু ফেলতে গিয়ে খানিক বাসি রক্ত মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

তখন ধপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সে আবার।

বিভৎস এক কৌতুকে বিদীর্ণ এই বিশ্ব।

নইলে কী করে মিলাবে সে পঁচিশ তারিখ রাত থেকে শুরু এই ঘটনাগুলো ? কী করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত, সংগঠিত এক সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ঘুমন্ত নাগরিকদের ওপর ? কী করে তারা জ্বালিয়ে দিতে পারে নগরীর সমস্ত বাজার ? কামান দেগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে বসতি ?

গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারে না নজরুল। টের পায় তার ঠোঁট কান ফুলে গেছে, কান দিয়ে রক্ত পড়েছিল, চিবুকের একটা পাশ চটচটে হয়ে আছে।

সমস্ত নগরীতে বারুদের তীব্র একটা গন্ধ।

তার মনে পড়ে যায়, পথে যখন সে বেরিয়েছিল তখন দেখছিল হাজার হাজার লোক। বাসাভাঙ্গা আরশোলার মতো ছুটাছুটি করছে এবং নিঃশব্দে। কোথাও কোনো চিৎকার নেই, অথচ মনে হচ্ছিল বুকফাটা একটা চিৎকার থেকে থেকেই নগরীকে চিরে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের মতো বয়ে যাচ্ছে।

কে যেন বলেছিল, আরিচা যেতে হলে বাস এখন একমাত্র যদি পাওয়া যায় মীরপুর ব্রীজের ওপার থেকে। এপারে সব বন্ধ। তখন সে মীরপুরের দিকেই রওয়ানা দিয়েছিল।

তারপর বাধা পায় মীরপুরের কাছে। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে ব্রীজ বরাবর পথ জুড়ে। তারা

লোক ধরে ধরে বলছে, শহরে ফিরে যাও, ভয়ের কিছু নেই, কিছু হয় নি, শহর ছেড়ে যেও না।

তবু তারা যেতে ইচ্ছুক তাদের তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তার হাতে ছিল ছোট একটা সুটকেশ— সেটা এখন কোথায় ?— সেটা তারা দেখেছিল। তারপর তার পকেট।

পকেটে ছিল খবরের কাগজ থেকে কাটা পতাকা সমেত কবিতার অংশ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর'।

সৈনিকটি কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে জিগ্যেস করেছিল তার নাম। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করেছিল কাগজের সেই টুকরোতে কবিতার নিচে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম।

তখুনি সে বন্দি হয়।

তখন সে বুঝতে পারে নি, কেন তাকে বন্দি করা হয়। এখন সে বুঝতে পারে। কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারে না যে এমন ভুলও কেউ কখনো করতে পারে।

আসলে এখন সমস্ত কিছুই সম্ভবপরতার অন্তর্গত। রাতের অন্ধকারে তার এই চেনা নগরী এমন এক বিশ্বে পরিণত হয়েছে যেখানে কোনো কিছুই আর অসম্ভব নয়।

দরোজা খুলে যায়।

নতুন একজন অফিসার ঢোকে।

একে আগে দ্যাখে নি নজরুল। সে উঠে বসতে চায়, কিন্তু নীরবে, হাতের ইশারায় তাকে শুয়ে থাকতে বলে অফিসারটি।

একজন সৈনিক এসে একটি চেয়ার রেখে যায়। অফিসারটি চেয়ার টেনে তার চৌকির একেবারে কাছে এসে বসে। মুখে তার স্মিত হাসি। যেন পুরেনো বন্ধু আড্ডা দিতে এসেছে। ভয়ার্ত চোখে নজরুল তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর বলে, বিশ্বাস করুন, আমি কবি নজরুল ইসলাম নই। আপনারা খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন যে এ হতেই পারে না। এ একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে কোথাও। আমি তো ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আসল নজরুলের বয়স এখন আমার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি থাকেনও কোলকাতায়। আর অনেকদিন থেকেই তাঁর মাথাটা খারাপ। আমি সে নজরুল ইসলাম নই।

অফিসারটি এই কথার ধারকাছ দিয়েও যায় না।

এ-কী! আপনাকে ওরা মেরেছে দেখছি।

চুপ করে থাকে নজরুল। তাকে মারা হয়েছে, এ কথা নিজে উচ্চারণ করলে নতুন কোনো অনর্থ হয় যদি।

ভীষণ মেরেছে দেখছি। কান দিয়ে রক্ত পড়েছে। অন্যায়। খুব অন্যায়। আপনার মতো একজন মানুষকে— ছি-ছি-ছি।

অবিলম্বে অফিসারটি একজন সৈনিককে ডাকে।

এর হাত কড়া খুলে দাও।

হাত মুক্ত হয় তার।

আর এক বালতি পানি নিয়ে এসো।

মুহূর্তে পানি এসে যায়।

নিন, মুখটা ধুয়ে নিন।

মুখ ধোবার কোনো তাগিদ নজরুল বোধ করে না। তবে তার ভরসা হয়, ওরা হয়ত ভুলটা বুঝতে পেরেছে। হয়ত এবার সে মুক্তি পাবে।

সে জানতে চায়, আমার ছেলেমেয়েদের দেখতে পাব তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আমি জাফরগঞ্জে যেতে চাই।

আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে।

কখন?

যখন আপনি যেতে চান।

নিজের সৌভাগ্যে ক্ষণকালের অবিশ্বাস হয় তার। এত সহজে এরা তাকে চলে যেতে দেবে, এও কি সম্ভব?

আমি— আমি এখন যেতে পারি?

হ্যাঁ পারেন।

তাহলে— তাহলে—

ঘরের চারিদিকে তাকায় নজরুল। সে কি উঠে দাঁড়াবে? দাঁড়িয়ে, হেঁটে দরোজা পর্যন্ত গিয়ে, দরোজা খুলে বেরিয়ে যাবে?

বুঝতে না পেরে বসেই থাকে নজরুল। অফিসারটি কোনো ইঙ্গিত বা কোনো উচ্চারণ দিয়ে তাকে সাহায্য করে না।

অফিসারটি জানতে চায়, তার শরীর খুব ব্যথা করছে কি-না।

নজরুল মিথ্যে করে বলে, না, একটুখানি কেমন করছিল, এখন সেরে গেছে।

কোনো ওষুধ দেয় নি?

না।

ওষুধ দেয়া উচিত ছিল।

অফিসারটি দুঃখিত স্বরে বলে। নজরুল তার দিকে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে থাকে, অপেক্ষা করে কখন তাকে সে যেতে বলে। কিন্তু অফিসারটি তাকে কিছুই আর বলে না। কেন তাকে সে কিছুই বলে না?

বাইরে হঠাৎ এক আর্ত চিৎকার শোনা যায়। যেন কারো গলায় কে একটি ভোঁতা ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। চিৎকারটা থেমেও যায় হঠাৎ।

খুব উদ্বিগ্ন চোখে নজরুল তাকায় দরোজার দিকে। নিজের শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করে একবার।

অফিসারটি তখন শান্ত ধীর কণ্ঠে ব্যাখ্যা দেয়।

ও কিছু না। একটা লোক হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

কী করেছিল?

ওয়ারলেসে সীমান্তের ওপারে খবর পাঠাচ্ছিল। এইসব লোকেরাই হচ্ছে দেশের আসল শত্রু। এদের ক্ষমা করা যায় না। কী বলেন ? অফিসারটি তার মতামত জানতে চায় বলে নজরুল অস্বস্তি বোধ করে। আবার এ কথাটাও তার মনে হয় যে তাকে অন্তত দেশের শত্রু বলে মনে করা হচ্ছে না।

তাহলে আমি যাব ?

হ্যাঁ, যাবেন বৈকি। তবে, যাবার আগে ছোট্ট একটা দরকার আছে।

কী ?

একটা কাগজে সই করতে হবে আপনাকে। ব্যাস, তাহলেই সব চুকে গেল। আপনি যদি চান, আপনাকে আমরা পৌঁছেও দিতে পারি। কিংবা আপনার পরিবারকে আনিয়ে দিতে পারি ঢাকায়।

আমি যেতেই চাই।

কোথায় ?

জাফরগঞ্জে।

জাফরগঞ্জ কোথায় ?

আরিচা। আরিচা থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে।

কেন, ঢাকায় ওদের আনিয়ে দিতে পারি।

অনেকদিন জাফরগঞ্জে যাই নি। তাই একবার যেতে চাই।

অফিসারটি স্মিত মুখে, কোমল কণ্ঠে তখন বলে, আসলে আপনি আর ঢাকায় থাকতে চাইছেন না। তাই নয় ?

না, তা নয়। দেখুন, ঢাকায় আমি সেই '৪৮ সাল থেকেই আছি। ঢাকাকে আমি খুব পছন্দ করি। ঢাকা থেকে বাইরে গিয়ে কোথাও আমি শান্তি পাই না। আপনি বিশ্বাস করুন।

আপনি ঢাকায় থাকতে চাইছেন না।

চাই, আমি চাই ঢাকায় থাকতে।

তাহলে যেতে চাইছেন কেন ?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এদের দেখি নি, তাই।

ওরা তো একমাসও হয় নি গিয়েছে।

তা ঠিক।

আপনি চাইলে ওদের এখানে এনে দিতে পারি।

পারেন।

তাহলে ঢাকা ছেড়ে যাবার দরকার কী ?

না তেমন দরকার আর কী ?

নাকি, আপনার ধারণা, সেনাবাহিনী ঢাকার সবাইকে মেরে ফেলবে ?

না, তা নয় । আমি তা ভাবছি না।

কী ভাবছেন তাহলে ?

চট করে কোনো উত্তর দিতে পারলো না নজরুল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যখন টের পায় যে অফিসারটি সরু নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে তখন সে চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

কী ভাবছেন, আমাকে বলতে চান না ?

তা নয়।

কী ভাবছেন, আমাকে বলা যায় না ?

তা নয়।

আমাকে বলা যায় না নয় কি ?

না, মোটেই না।

আসলে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ, আপনি যাতে মুক্তি পান সে চেষ্টাই আমি করছি। কেন করছি ? এই জন্যই আমি করছি যে কবিদের আমি শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু আমি তো কবি নই।

আমরা জানি, আপনি কবি। আচ্ছা, আপনি যে কবি এটা অস্বীকার করা উচিত হচ্ছে আপনার ? আপনাকে কে না চেনে ? আপনার কবিতা কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। হয় না ?

আমি সে লোক নই।

আপনিই সেই লোক। সত্যকে গোপন করা কবির পক্ষে শোভা পায় না।

সত্য আমি গোপন করছি না।

করছেন না ?

না।

ভেবেছিলাম, আপনার কবিতার মতো আপনিও সাহসী।

ও কবিতা আমার নয়।

ভেবেছিলাম, অন্তত একজন বাঙালি আছে যে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

ঠিক এই সময়ে একজন সৈনিক এসে একটা দফতর দিয়ে যায় অফিসারটির হাতে। তার ভেতর থেকে একটি লম্বা কাগজ বেরিয়ে আসে অবিলম্বে। পকেট থেকে বেরোয় কলম।

নিন, এখানে একটা দস্তখত করুন।

কী এটা ?

বিবৃতি। আপনার জবানিতে একটা বিবৃতি। দস্তখত করুন।

তার হাতে কলম গুঁজে দেয় অফিসারটি।

বলে দস্তখত করলেই মুক্তি। আপনি জাফরগঞ্জ যেতে চাইলেও আমরা আপত্তি করব না। আমরাই বরং আপনাকে পৌঁছে দেব।

নজরুল দেখতে পায় কাগজের মাথাতেই লেখা রয়েছে—

আমি, কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে বাঙালির দেশদ্রোহীতায় আমি ক্ষুব্ধ এবং মর্মাহত।

হঠাৎ আরেকটা লাইন চোখে পড়ে নজরুলের—

বাঙালি অস্ত্র সংবরণ করো। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করো সর্বশক্তি দিয়ে। চাঁদ-তারা খচিত পতাকা তুলে ধরো এবং বুক দিয়ে তা রক্ষা করো।

নজরুল হঠাৎ চোখ তুলে আন্তরিকভাবেই জানতে চায়, আমার কথা ওরা শুনবে না ?

কেন শুনবে না ? আপনার মত একজন কবির কথা ওরা শুনবে না ?

আমি তো নজরুল ইসলাম নই। মানে, আমি সেই কবি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি তাহলে দস্তখত দিতে চান না ?

কবি নজরুল ইসলাম হলে দিতাম।

বেশ, ভাল কথা।

মুহূর্তে তার হাত থেকে কাগজ কলম ছিনিয়ে নেয় অফিসারটি। কোনো কথা না বলে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় সে, অথচ তার চোখে-মুখে ক্রোধের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

অফিসারটি স্মিত মুখেই ঘর থেকে চলে যায়। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যায় দরজা। আবার সেই বাদামি আলোর অস্বাভাবিকতার ভেতর ডুবে যায় সারাটা ঘর।

৫

কতক্ষণ কেটে যায় সে বলতে পারবে না। এক ঘণ্টা ? দু' ঘণ্টা ? একটা রাত ? তারপর আরো একটা দিন ?

অথবা একটি সপ্তাহ ?

সময়ের কোনো বোধ আর তার নেই।

ঘুমিয়ে পড়েছিল,অথবা মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণায়, দেহের ভেতরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় সে হয়ত অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল— হঠাৎ কেমন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যন্ত্রণা বোধ হয় না, ক্ষুধা বোধ হয় না, হঠাৎ তার শরীর খুব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

চোখ মেলে সে ঘরের ছাদ দেখতে পায়। ছাদে সরু একটা ফাটলের দাগ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায় সে। তখন টের পায় তীব্র সেই বাতিটা ঘরের ভেতর এখনো জ্বলছে।

হাতে এখন হাতকড়া নেই। ওরা আর পরিয়ে দিয়ে যায় নি। সহজেই উঠে বসতে পারে সে। কিন্তু ওঠে না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন তার মনে উদিত হয়, যেমন করে পাখি হঠাৎ বাসা ছেড়ে আকাশে ওঠে।

কবি নজরুল ইসলাম কি সত্যি সত্যি তখন ঐ কাগজে দস্তখত দিতে পারতেন ? বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ?— যার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রেখেছিলেন তার বাবা কাজী সাইফুল ইসলাম ?

কবি নজরুলের লীলায়িত স্বাক্ষর, যেটা সে বহুবার বহু বইয়ে দেখেছে, জ্বলজ্বল করে ওঠে তার চোখের সম্মুখে।

ঐ স্বাক্ষর কি সে কল্পনা করতে পারে ইংরেজিতে টাইপ করা ঐ বিবৃতির তলায় ?

উঠে বসে নজরুল।

তখন হঠাৎ পাক দিয়ে ওঠে মাথাটা, টনটন করে ওঠে পিঠ। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে পড়ে যায় বিছানার ওপর।

নজরুল।

নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহী নজরুল।

নজরুল।

শুধু 'নজরুল' এই অক্ষরগুলো বিশাল হয়ে, আলোয় উৎকীর্ণ হয়ে তার চোখের পাতার সমস্ত অন্ধকার উদ্ভাসিত করে থাকে।

আচ্ছা, কবিতা লেখে কী করে ?

নতুন একটা প্রশ্ন ভোরের আলোর মতো ধীরে ধীরে তার চেতনার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে।

ক—বি—তা।

কী করে কেউ কবিতা লেখে ?

তার বাবা যখন নাম মিলিয়ে নাম রাখেন, তখন কি তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলেও কবি হোক ? কবিতা লিখুক ?

কী করে কবিতা লেখে কেউ ?

অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে, কথার সঙ্গে কথার মিল দিয়ে, ছন্দে গাঁথা পংক্তির পর পংক্তি বসিয়ে ?

নজরুলের মাথার ভেতরে ফেটে পড়ে খবর কাগজ থেকে কেটে রাখা সেই পংক্তিগুলো।

তো—রা—স—ব—জ—য়—ধ্ব—নি—ক—র।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

এবারে সম্পূর্ণ উঠে বসে নজরুল।

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।

ক— বি—তা।

অক্ষরের পর অক্ষর।

কথার পিঠে কথা।

পংক্তির পাশে পংক্তি।

দড়াম্ম করে দরোজাটা খুলে যায়।

অতর্কিত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাকি পোশাক পরা দুটি লোক। কিল, ঘুষি এবং লাথি শুরু হয়ে যায় দমকা ঝড়ের মতো। কতক্ষণ চলে, সে বলতে পারবে না। সব কিছুর মতোই এ ঘটনাও শেষ হয়ে যায় এক সময়ে। লোক দুটো তাকে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। সে সংজ্ঞা হারায় না।

তার উঠে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয় না।

বদলে, সে লক্ষ করে, সে নিজেই অচেনা হয়ে উঠেছে তার নিজের কাছে। তার এক ধরনের হাসি পাচ্ছে। ওরা যে কী মারাত্মক একটা ভুল করেছে তাঁকে নিয়ে, তার পিতৃদত্ত নামটা নিয়ে, ভেবে তার হাসি পাচ্ছে।

মগজের প্রতিটি কোষের ভেতরে অট্টহাসি চলতে থাকে তার।

সেই অট্টহাসি তার চেতনা লুপ্ত করে দিয়ে যায় এখন।

যখন জেগে ওঠে, সালেহার কথা তার মনে পড়ে।

৬

স্পষ্ট সে সালেহার মুখ দেখতে পায়। দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা যেন সে মুখ, সেই শ্যামল রঙ, সেই কালো চোখ, চিবুকের সেই টোল— সব মিলিয়ে সেই সালেহা।

সালেহার জন্যে অনেকদিন তার মন কেমন করেছে।

সালেহার বাবা ছিলেন গানের মাস্টার। বর্ধমান থেকে আসবার পর, ঢাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি গান শেখাতেন।

নজরুলের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। সে শিখত গান। তার বাড়িতে রোজ বিকেলে আসতেন সালেহার বাবা। হাতের ছাতা বন্ধ করে, অতি সন্তর্পণে সেটাকে তিনি দাঁড় করিয়ে রাখতেন ঘরের কোণে। তারপর, প্রায় হাস্যকর একটা ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে চৌকির ওপর বসতেন তিনি। বসতেন হারমোনিয়ামের উল্টো দিকে।

আলাউদ্দিন ছিল তাঁর নাম। হাঁটতেন ধীরে ধীরে, যে কোনো কাজ করতেন সন্তর্পণে— যেন কাচের ঠুনকো বাসন নাড়াচাড়া করছেন, কিন্তু হারমোনিয়ামের পাশে বসলেই রাজ্যের দ্রুততা তাঁকে ভর করত।

কী হলো সামাদ মিয়া? এসো দিকিনি। এসো, এসো, চটপট ধরো।

চোখ বুজে ঘাড় কাত করে তিনি সরগম দেখিয়ে দিতেন। একটু ভুল হলেই তিনি তেড়ে উঠতেন। তখন বিশ্বাসই হতো না যে অন্য সময়ে এই মানুষটি কী শান্ত।

তারপর রোজ বিদায় নেবার আগে, শখ করে একটা দুটো গান নিজেই গাইতেন আলাউদ্দিন সাহেব। একটা গান নজরুল অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে পানিয়া ভরণে চল লো গোরি।' ঐ শেষ শব্দটি গাইবার সময় আলাউদ্দিন সাহেবের কণ্ঠে যে গভীর অনুনয় ঝরে পড়ত, তা একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করে যেত।

একদিন সামাদ বলেছিল নজরুলকে, চল, স্যারকে দেখে আসি। খুব অসুখ।

সেই প্রথম দেখা সালেহার সঙ্গে। সে তখন কিশোরী। দেখেই নজরুলের মনে হয়েছিল, এই সেই গোরি সখিরা যাকে অনুরোধ করে পানি আনতে নদীতে যাবার জন্যে।

নজরুল সামাদকে লুকিয়ে, পরে, আলাউদ্দিন সাহেবের বাসায় যেতে শুরু করে। একমাত্র আকর্ষণ ছিল সালেহা। এমনকি, নজরুল গানও শিখতে চায়। গান শেখার সূত্র ধরেই বেশ কয়েক বছর সে যাতায়াত করে আলাউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে।

এখনো মনে আছে, একদিন নজরুল গিয়ে বসেছিল, আলাউদ্দিন সাহেব তখনো ফেরেন নি।

সালেহা বলেছিল নজরুলকে, আপনার গলায় তো গান আসে না,তবু শেখেন কেন? বাবার না হয় টাকার দরকার, তাই মুখ ফুটে আপনাকে বলেন না। কিন্তু আপনার নিজের কি এক্‌জোড়া কানও খোদাতালা আপনাকে দেন নি?

সেই থেকে, সেই দিন থেকে গান ছেড়ে দিয়েছিল নজরুল।

সালেহার বিয়ের সময় কার্ড দিতে এসেছিলেন আলাউদ্দিন সাহেব। কার্ডখানা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল তার। আর সেদিনই সে বুঝেছিল, সালেহাকে সে ভালবাসত।

নজরুলের সেই প্রথম। বলতে গেলে একমাত্র।

সে এখন উঠে বসে।

তার চারিদিকে প্রস্রাবের গন্ধ থমথম করছে। ঘরের কোণে বালতিটা প্রায় ভরে গেছে। তবু ওরা সরিয়ে নেয় নি।

বমি করবার জন্যে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে তার সারা শরীর। পাকস্থলীর ভেতর তীব্র একটা আক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বমি হয় না। কপালে ঘাম ফুটে ওঠে মুহূর্তে। পিপাসায় সে নিজের ঘামে আঙুল ভিজিয়ে চুষতে থাকে।

তবু সে পিপাসা যায় না।

তখন মাতালের মতো টলতে টলতে বন্ধ দরোজার কাছে গিয়ে আঘাতের পর আঘাত সে করতে থাকে। তার নিজের স্বরই তাকে চমকে দেয়। এ কার কণ্ঠস্বর?

এই ক্ষীণ, শুষ্ক কিন্তু বিভৎস স্বর?—যেন একটা পাতলা কাপড় ফালি ফালি হয়ে যাচ্ছে নির্মম টানে।

দরোজা কেউ খোলে না। সে দরোজা ধরে বসে পড়ে। একবার ভাববার চেষ্টা করে। কতদিন কত ঘণ্টা সে এই কামরার ভেতরে বন্দি হয়ে আছে; কিন্তু কোনো হদিশ পায় না। মাথার ভেতরে তীব্র এক যন্ত্রণা শুধু ফেটে পড়ে।

মানুষ ক—বি—তা লেখে কী করে?

সালেহাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়? যে সালেহাকে কোনোদিন সে বলতে পারে নি তার ভালোবাসার কথা। যখন বলা যেত; তখন সে অন্য কারো ঘর করতে যাচ্ছে।

এই বেদনাকে একটি কবিতায় রূপ দেবার মতো শক্তি আছে কি সওদাগরি আপিসের সাধারণ একজন কর্মচারী, বর্ধমানের রিফিউজি কাজী নজরুল ইসলামের ?

দারুণ প্রস্রাব বোধ হয় তার। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও এক ফোঁটা বেরোয় না।

দরোজা খুলে যায়।

দু'জন খাকি এসে ঘরে ঢোকে। দু'জন দু'দিক থেকে তাকে ধরে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর তাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় তারা। নতুন একটা ঘরে এনে ঢোকায়। ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে বসে এবং জানতে চায় নজরুলের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি-না।

সে শুধু উচ্চারণ করতে পারে, পানি, পানি।

ইশারা পেয়ে ঝকঝকে গেলাশ নিয়ে আসে কেউ। কাচের ভেতর টলটল করছে পরিষ্কার পানি। কাচের গায়ে ছোট ছোট বুদবুদ স্থির হয়ে আছে। নজরুলের মুখের সামনে গেলাশটা ধরতেই সে চুমুক দেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পেছন থেকে কেউ তাকে ধরে রাখে শক্ত হাতে। সে এক ঢোঁক খাবার পরই গেলাশটা বিদ্যুতের বেগে সরিয়ে নেয়া হয়।

নতুন খাকি প্রশ্ন করে, মত পাল্টেছেন ? দস্তখত দেবেন ?

দস্তখত ?

হ্যাঁ, দস্তখত। এই বিবৃতিতে।

বিবৃতি ?

তার চোখের সমুখে কাগজটা ধরতেই সব মনে পড়ে যায় নজরুলের।

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি মিথ্যেবাদী।

আপনাদের ভুল। আমি সে লোক নই।

মিথ্যেবাদী।

সত্যি । আমি নই।

বুকের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ে তার।

এখনো আপনি বলছেন, নজরুল ইসলাম আপনি নন ?

না আমি নই।

নজরুল জানে না কী করে এদের সে বোঝাবে। কিন্তু ওদের কথাতে সায় দিয়ে, বিবৃতিতে নিজেকে কবি নজরুল ইসলাম পরিচয় দিয়ে দস্তখত করে মুক্তি সে সহজেই পেতে পারে। তবু সে কেন দস্তখত করছে না ? ভেতর থেকে কে তাকে নিষেধ করছে ? কে তাকে এই অত্যাচার সহ্য করবার ভয়াবহ শক্তি যোগাচ্ছে ?

হঠাৎ সমস্ত কিছু স্বাভাবিক বলে মনে হতে থাকে নজরুলের। সে যে অনাহারে রয়েছে কতদিন, বলতে পারবে না; মনে হয় কোনো ক্ষুধাই তার নেই। সে যে মারের পর মার খেয়ে চলেছে, মনে হয় শরীর তার সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ রয়েছে।

প্রশ্নকর্তা সিগারেট ধরায়। নজরুলের মুখের ওপর গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে সে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নজরুলও লোকটার চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। যেন দুজনেই নীরব একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হঠাৎ বাঁধা পড়ে গেছে।

বহুদূর থেকে শোনা মেঘ গর্জনের মতো সড়কের ওপর দিয়ে একটা সারিবদ্ধ শব্দ গড়িয়ে যায়। ঘরের সার্সি থরথর করে ওঠে।

হঠাৎ প্রশ্ন শুরু হয়।

বাঙালিকে বিদ্রোহের প্ররোচনা আপনি দেন নি?

কোনো উত্তর দেয় না নজরুল।

স্বাধীন হবার জন্যে বাঙালিকে অস্ত্র ধরতে বলেন নি?

নজরুল নির্বিকার তাকিয়ে থাকে। নিজেই সে অবাক হয়ে যায় নিজের এ নীরবতা দেখে। তার ভেতরে বসে দ্বিতীয় কোনো নজরুল যেন তার প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রিত করছে। তার দায়িত্ব শুধু ভেতরের সেই দুর্জয় মানুষটির নির্দেশ পালন করে যাওয়া।

বাঙালির জন্য যুদ্ধের গান আপনি লেখেন নি?

সম্মোহিতের মতো বসে থাকে নজরুল। কোনো উত্তর দেয় না।

আপনি নজরুল ইসলাম নন?

না।

না?

মাংস পোড়ার তীব্র দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যায়। নজরুলের হাত ঠেসে ধরে তার ওপর জ্বলন্ত সিগারেট নেভায় প্রশ্নকর্তা। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসে। চোখে কী ইশারা করে সে দু'জনকে, সেই দু'জন নজরুলের চুল মুঠো করে ধরে সমূলে তুলে আনে মুহূর্তেই। আবার এবং আবার এবং আবার।

কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সমুখে সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায় নজরুলের। আবার যখন আলো ফিরে আসে, তখন প্রশ্নকর্তার মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ বড় দেখায়। নজরুল টের পায়, প্রশ্নকর্তা তার মুখের কাছে মুখ এনে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুখে কৌতুকের আলো খেলা করে।

আপনি যখন স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবেন, সে আপনাকে চিনতে পারবে তো?

ছেঁড়া কয়েকটা চুল নজরুলের মুখের ওপর সর সর করে ওঠে।

হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা না হওয়াই ভাল। কী বলেন?

চমকে ওঠে নজরুল। স্ত্রীর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সে।

প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি এড়ায় না তার এই বিচলিত ভাবটি।

আর আপনার ছেলেমেয়ে? এ চেহারা দেখিয়ে তাদের কচি মনে চিরকালের একটা কালো দাগ কেটে দিতে চান? তার চেয়ে এই তো ভাল যে আপনি মরে গেলেন, ওদের আর দেখাতে হল না এ মুখ।

এতক্ষণে টনটন করে ওঠে নজরুলের সমস্ত বাঁ হাত, যে হাতে সিগারেটের আগুনে পোড়া জায়গাটা ছাই ঢেকে রয়েছে।

বেশতো, মরতেই যখন চান, মরতেই আপনাকে দেয়া হবে। তবে বীরের মৃত্যু সেটা হবে না। বাঙালি আপনাকে বীর বলবে না। বলবে, কবি নজরুল ইসলাম দেশকে বিপথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বলবে, মানুষকে মিথ্যে আশা দিয়ে সে ঠকিয়েছিল। বলবে, কবি নজরুল ঘৃণ্য, জঘন্য এক বিশ্বাসঘাতক, কবি নজরুল একজন দেশদ্রোহী।

না। তারা বলবে, তিনি বিদ্রোহী।

প্রশ্নকর্তা যে অবাক হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আপনি তবে নিজেই স্বীকার করছেন, আপনি বিদ্রোহী ?

আমি নই। নজরুল।

আপনি নজরুল নন ?

না, না, না। কতবার বলব, আমি কবি নজরুল নই।

চিৎকার করে উঠেছিল নজরুল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরে ওরা। তারপর কতক্ষণ পর্যন্ত যে ঘুসি এবং লাথি অবিশ্রান্ত পড়তে থাকে সে বলতে পারবে না।

জ্ঞান যখন ফিরে আসে প্রশ্নকর্তা আবার তাকে সেই একই প্রশ্ন করে।

আপনি কবি নজরুল নন ?

না।

আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। আবার সে সংজ্ঞা হারায়। আবার তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। আবার তাকে একই প্রশ্ন করা হয়। আবার সে একই উত্তর দেয়। আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

৭

বাইরে এখন রাত না দিন ?— সংজ্ঞা হারাতে হারাতে একবার এই নির্দোষ প্রশ্নটি তার মনে উদিত হয়। আসলে, তার দেহ এবং আত্মার ভেতরে এমন এক দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে যে, এখন তারা স্বতন্ত্র এবং সম্পর্ক বিহীন।

আবার সে জেগে ওঠে।

নিজেকে সে দেখতে পায় চেয়ারের উপর আসীন। যেন সেলুনে দাড়ি কামাতে বসেছে।

আপনি যা বলছেন, সত্যি বলছেন ?

হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি।

তার নিজের কাছেই মনে হয়, সে যেন একটা বালতির ভেতর মুখ রেখে কথা বলছে।

আপনি মিথ্যে বলেন না ?

আমি বলি নি।

প্রশ্নকর্তাকে সে ভাল করে দেখতে পায় না। দেখার কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না। আগের যে কেউ হতে পারে, যে এখন তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখ বুঁজে জবাব দিয়ে যায়।

নজরুল ইসলাম কে ?

আমি।

আপনি কবিতা লেখেন ?

না।

পঁচিশে মার্চ খবরের কাগজে প্রথম পাতায় যে কবিতা বেরোয়, সে কার কবিতা ?

নজরুল ইসলামের।

আপনার ?

না আমার নয়।

পঁচিশে মার্চ খবর কাগজ পেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

কবিতাটি কেটে রেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কেটে রাখার কারণ ?

জানি না।

আপনার নিজের লেখা বলে নয় কি ?

আমার লেখা নয়।

কবিতার লাইনগুলো মনে আছে ?

সবগুলো নেই।

কটা লাইন মনে আছে ?

বলতে পারছি না।

চেষ্টা করুন।

তোরা সব জয়ধ্বনি কর— ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়— তারপর— পানিয়া ভরনে চল লো গোরি— না, এটা একটা গানের কথা— না, কবিতার লাইন আর মনে নাই।

আচ্ছা, মনে না থাক, পঁচিশে মার্চ দিনটার কথা মনে আছে ?

নজরুল চুপ করে থাকে।

সারাদিন ঐ দিনে কী করেছিলেন মনে আছে ?

নজরুলের এক প্রকার ধারণা হয়, এ প্রশ্ন আগেও তাকে কে কবে যেন করেছিল, সে উত্তর দিয়েছিল; তার তখন ধারণা ছিল উত্তর দিলেই মুক্তি পাবে সে।

সকালে উঠে কী করলেন ?

এখন সকাল ?

এখনকার কথা নয়। পঁচিশে মার্চের কথা। সকালে উঠে আপনি কী করলেন ?

খবর কাগজ পড়ি।

তারপর ?

কবিতাটা পড়ি।

তারপর ?

বাজার করতে বেরোই : না, বাজার করি অন্যদিন। সেদিন নয়।

তারপর ?

বশীর সাহেব চা খাওয়ালেন।

নিচের তলায় ?

হ্যাঁ।

নিজে চা বানান নি ?

কী জানি, মনে পড়ছে না।

উত্তর তো চটপট দিচ্ছেন।

উত্তর দিলে ছেড়ে দেবেন না আমাকে ?

আপনি মুক্তি পেতে চান ?

বিবৃতিতে সই করতে বলবেন না।

কেন ?

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আচ্ছা, বশীর সাহেব আপনাকে চা খাওয়ালেন। তিনি কিছু বললেন ?

কিছুই বলেন নি।

কিছুই না ?

বললেও মনে নেই। হয়ত বলেছেন।

মনে করে দেখুন।

আমি খুব ক্ষুধার্ত।

বশীর সাহেব কী বললেন ?

অসহ্য ব্যথা করছে।

বশীর সাহেবের সাথে কী কথা হলো ?

বশীর সাহেব বললেন, আমরা এবার স্বাধীনতা পাচ্ছি। ইয়াহিয়া ক্ষমতা দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটা চড় এসে পড়ল তার গালে। অবাক হয়ে চোখ খোলে সে। প্রশ্নের উত্তরগুলো সে ঠিক দিচ্ছে না ? তবে তাকে মারা হলো কেন ?

ইয়াহিয়া আপনার বন্ধু নন, এদেশের প্রেসিডেন্ট।

নজরুল বুঝতে পারে চড় মারার কারণ। বুঝতে পেরে আবার চোখ বোঁজে।

বশীর সাহেব জয় বাংলার নিশান নিয়ে কিছু বললেন ?

জয় বাংলার নিশান ?

হ্যাঁ, যে নিশান নিয়ে আপনি কবিতা লেখেন।

আমি কবিতা লিখেছিলাম ?

বশীর সাহেব কী বললেন ?

মনে পড়ছে না ।

চেষ্টা করে দেখুন।

বশীর সাহেব নিশানটা বাইরে থেকে কেনেন নি। বাড়িতেই সেলাই করে বানিয়েছেন।

প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমি চেষ্টা করছি।

বাসা থেকে বেরুলেন কখন ?

সকালে।

কোথায় গেলেন ?

কী করতে ?

ভাত খেতে।

কোথায় ?

একটা হোটেলে। নৌকার ওপর হোটেল।

হিন্দু হোটেল ?

আমি খুব ক্ষুধার্ত।

আপনি সেখানে ভাত খেলেন ?

আমাকে কিছু খেতে দিন ।

উত্তর দিলেই খেতে দেব আপনাকে।

একটা কিছু খেতে দিন। আমাকে আপনারা কিছু খেতে দিন।

সত্যি কথা বলুন।

আমি সত্যি কথাই বলছি।

মিথ্যে। মিথ্যে বলছেন আপনি।

সত্যি আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

সত্যি কথা বলুন। চালাকি নয়।

চালাকি করছি না।

তাহলে এতক্ষণ সব মিথ্যে কথা বলছেন কেন ?

মিথ্যে কথা নয়।

আপনার উত্তরের সঙ্গে মিলছে না।

চিৎকার করে ওঠে নজরুল। হঠাৎ সে লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে, কিন্তু পায়ের ওপর

দাঁড়াবার মতো শক্তি পায় না। পড়ে যায় মেঝের ওপর। সেখানে একটা পশুর মতো চার হাত পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে চিৎকার করে ওঠে নজরুল।

আমাকে আপনারা মেরে ফেলুন। আমাকে মেরে ফেলুন।

৮

কিন্তু জ্ঞান সে হারায় না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দু'ফোঁটা প্রস্রাব হয়ে যায় তার। সে পরিষ্কার দু'চোখে দেখতে পায়, ঘরের ভিতরে তিনজোড়া চোখ তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে।

পঁচিশে মার্চ আপনি যান নি বাঙালিদের ঘাঁটিতে ?

না, তাদের ঘাঁটি আমি চিনি না।

আপনি তাদের বলেন নি, ঐ রাতেই আক্রমণ করতে হবে ?

না।

কিংবা দেশদ্রোহীদের কেউ আপনাকে সাবধান করে দেয়নি যে ঐ রাতেই আক্রমণ করা হবে সেনাবাহিনীকে ?

কারো সঙ্গে আমার আলাপ নেই।

ওদের সর্দার কারা ?

জানি না।

তাদের ঠিকানা কী ?

জানি না।

কিন্তু আমরা জানি, আপনি তাদের বেশ ভালই জানেন।

আপনারা ভুল করছেন।

ভুল আপনি করছেন। আপনিই ডেকে আনছেন আপনার মৃত্যু। আপনি কবি বলেই এখনো আমরা সম্মান করছি, সময় দিচ্ছি। বলুন, আপনি তাদের চেনেন না ?

বলেছি— না।

বেশ, নাই বা স্বীকার করলেন। সর্দার কারা আমরা জানি। আপনি তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলুন। জনসাধারণকে জানিয়ে দিন যে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলছে। এই বিবৃতিতে দস্তখত করুন। আর কিছু আপনাকে করতে হবে না।

নজরুল চুপ করে থাকে।

দস্তখত করুন।

আমি কবি নজরুল ইসলাম নই।

তাহলে শুধু নজরুল ইসলাম বলেই দস্তখত দিন।

নজরুল তখন হাত বাড়ায়। একটা কলম পৌঁছায় তার হাতে।

কাগজটা কেউ মেলে ধরে তার সমুখে।

আমাকে তাহলে ছেড়ে দেবেন?

হ্যাঁ, দেব।

আমি জাফরগঞ্জে যেতে পারব?

আপনাকে পৌঁছে দেব?

ছেলেমেয়েকে দেখতে পাব?

হ্যাঁ, দেখতে পাবেন।

কলমটা তখন কাগজের ওপর ছোঁয়ায় নজরুল। হঠাৎ তাঁর ভেতর থেকে দ্বিতীয় কেউ যেন ভীষণ কম্পন তোলে তার হাতে। কলমটা স্থির ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ভেতর থেকে ফিসফিস করে তাকে বলে, যখনই সে নজরুল ইসলাম লিখবে তখনি সেটা হয়ে যাবে কবির নাম।

একবার সে তাকায় তার চারিদিকে স্থির মুখগুলোর ওপর।

নজরুলের হাত থেকে কলমটা পড়ে যায়। অব্যক্ত একটা চিৎকার করে সে সংজ্ঞা হারায়।

তারপর চোখে মুখে পানির ছিটে পেয়ে সে জেগে ওঠে। তার জিহ্বা সাপের মতো বেরিয়ে এসে সেই পানি সন্ধান করে। জিহ্বায় পানি ছুঁয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণাটা বিরাট এক পাখির মতো তার বক্ষঃস্থল ভেদ করে ঘরের ভেতরে ডানা ঝাপটাতে থাকে।

দস্তখত দেবেন?

কথাগুলো কানে পশে না তার।

দেবেন দস্তখত?

তখন সে মাথা নেড়ে জানায়— নিঃশব্দে— না।

নজরুল আবার জিভ দিয়ে গালের পানি চাটতে চায়।

পানি খাবেন?

মাথা নেড়ে সে জানায়— হ্যাঁ।

তখন একটা লম্বা পাইপ টেনে আনা হয় ঘরের ভেতরে। তাকে কয়েকজন মিলে ঠেসে চিৎ করে ধরে রাখে মেঝের ওপর। একজন মুখের ভেতরে গুঁজে দেয় পাইপ।

নিঃসাড় পড়ে থাকে নজরুল। যেন সে একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। অপেক্ষা করে সে মুখের ভেতরে পাইপ নিয়ে।

হঠাৎ পানির তোড় শুরু হয়ে যায়। প্রবলবেগে পানি আসতে থাকে পাইপ দিয়ে। ভরে যায় তার মুখ, নামতে থাকে গলা দিয়ে প্রাণপণে সে মুখ থেকে পাইপটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ভয়াবহ একটা হিক্কা ওঠে তার। গলগল করে পেটের ভেতরে ঢুকতে থাকে পানি। ক্রমশ ফুলে উঠতে থাকে তার পেট। তার স্ত্রীর গর্ভের মতো ফুলে ওঠে। প্রথম সন্তান যখন পেটে এসেছিল তখন একবার পেটের ওপর কান পেতে শিশুর হৃদস্পন্দন তাকে শুনতে দিয়েছিল তার স্ত্রী।

পাইপটা সরিয়ে নেয় ওরা। এত পানি পেটে গিয়েছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। ভীষণ বমি বমি করে। সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে উঠে বসতে দেয়া হয় না।

তার পেটের ওপর ওরা কয়েকজন পা দিয়ে চাপতে থাকে। আর সেই চাপে গলগল করে নজরুলের মুখ দিয়ে উলটে বেরিয়ে আসে পানি। নাক দিয়ে পানি, এমনকি কান দিয়েও।

সে এক মুহূর্তের জন্যে সংজ্ঞা হারায়।

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভারি শীতল মনে হয় তার। পানিতে ভেসে গেছে ঘরের মেঝে। সম্পূর্ণ ভিজে গেছে তার শরীর। ভীষণ হাঁপাচ্ছে সে। তার মাথার ভেতরে কোনো কথা কোনো চিত্রই সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর।

একবার, এক ঝলক স্ত্রীর চেহারাটা মনে পড়ে যায় তার। ভালোই করেছিল সে, তার মতো চালচুলোহীন কোনো রিফিউজির মেয়ে বিয়ে না করে। জাফরগঞ্জে ভাইদের কাছে তার স্ত্রী আশ্রয়টুকু অন্তত পাবে যখন সে মরে যাবে।

সে নিশ্চিত হয়ে যায় তার মৃত্যু সম্পর্কে। আর তখুনি মন থেকে মৃত্যু ভয়টা একেবারে চলে যায়।

তার সমুখে বিবৃতির কাগজটা নাচানো হয়। দস্তখত দেবেন?

প্রবলবেগে সে মাথা নাড়ে।

না

ভেবে দেখুন।

না, না।

ওরা কিন্তু আবার পানি দেবে।

দিক।

আবার তাকে পাইপ দিয়ে পানি দেয়া হয়। ঠিক আগের মত আবার তারা তার পেটের ওপর দাঁড়িয়ে পানি বের করে দেয়। এবারে তার জ্ঞান আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফেরে না।

বিবৃতির কাগজটা হঠাৎ দলা পাকিয়ে সাদা একটা পাখি হয়ে ঘরের ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে উড়ে চলে যায়। আর ফেরে না।

নজরুলের মনে হয় তার স্ত্রী ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্ট করে। কিন্তু পারে না। তখন চিৎকার করে সে বলতে চায়, এখানে এসো না তুমি, এখানে এসো না, এসো না। এখানে নরক, এখানে দুর্গন্ধ, এখানে থইথই পানি। তবু তার স্ত্রী চলে যায় না।

পাশে এসে দাঁড়ায় এবং জিজ্ঞেস করে, তোমার মনে পড়ে?

কী?

সেই প্রথম দিন?

যেদিন আমাদের বিয়ে হলো। মনে পড়ে?

হ্যাঁ, মনে পড়ে।

তারিখটা কী ছিল?

পঁচিশে মার্চ।

না গো না। তুমি আবার মনে কর।

মনে করছি। চেষ্টা করছি।

আমাদের বিয়ের তারিখটা কী ছিল ?

মনে পড়েছে।

তাহলে বল।

পয়লা জুন।

আমার পরনে কী ছিল ?

মনে পড়ছে না।

চেষ্টা করো।

পারছি না।

তবু চেষ্টা করো।

তোমার পরনে ছিল লাল শাড়ি।

বিয়ের সময় সব কনেরই লাল শাড়ি হয়। আসলে, তুমি সব ভুলে গেছ। তুমি সব বানিয়ে বলছ। নজরুল তখন আর্ত কণ্ঠে বলে, কুমকুম, তুমি আমাকে ওদের মতো জেরা করছ কেন ?

তুমি সব ভুলে গেছ, তাই।

আমি কী ভুলে গেছি ?

আমাকে।

নজরুল চুপ করে থাকে। দু'চোখ ভরে সে দেখতে থাকে কুমকুমের মুখ। সে মুখ এত কাছে যে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

তুমি এখানে এলে কেন, কুমকুম ?

তুমি সব ভুলে গেছ তাই আসতে হলো।

কী ভুলে গেছি ?

মনে নেই, কী বলেছিলে ?

কবে ?

বিয়ের সেই রাতে। আমার হাত ধরে, আমাকে বুকের কাছে টেনে, কী বলেছিলে তোমার মনে নেই ?

মনে আছে কুমকুম।

তাহলে বলো।

বলেছিলাম, কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। কোনদিন তোমাকে কষ্ট দেব না। দুঃখ যদি আসে সব দু'জনে ভাগ করে নেব।

এইতো মনে পড়েছে তোমার।

তুমি এলে কেন ?

তুমি যে এখন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। তুমি যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। তুমি যে দুঃখ আর ভাগ

করে নিচ্ছ না।

কুমকুম, তুমি যাও, তুমি যাও।

আমার দিকে তাকাও নজরুল।

না।

বল, কেন তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে যাচ্ছ?

এখানে এসো না কুমকুম। এখানে নরক। এখানে দুর্গন্ধ। এখানে থইথই পানি। যাও।

চিৎকার করে ওঠে নজরুল।

তাকিয়ে দ্যাখে, ঘরের ভেতরে কেউ নেই। তাহলে কুমকুম গেল কোথায়? এইতো সে এখানে ছিল।

নজরুল চোখ বোঁজে।

আবার চোখ মেলতেই দ্যাখে, কুমকুম দরোজার পাটে মাথা রেখে কাঁদছে।

কুমকুম, তুমি কাঁদছ?

কুমকুম কোনো উত্তর দেয় না।

কাঁদছ তুমি?

কুমকুমকে আর সেখানে দেখা যায় না। তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় নজরুল। চোখ পড়ে জানালায়। দ্যাখে, জানালার কাছে কুমকুম। জানালায় মুখ চেপে ধরে সে কাঁদছে। তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে নিঃশব্দ কান্নায়।

কুমকুম।

কুমকুম অন্ধকার হয়ে যায়। জানালায় তাকে আর দেখা যায় না। আবার তাকে দেখা যায় শূন্য সাদা বিরাট একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং কাঁদছে।

নজরুল চোখ বোঁজে।

কুমকুম আর আসে না।

বহুদূর থেকে তার ছেলেমেয়েদের ডাক শোনা যায়।

আ— ব— বু— উ।

আসিস না, কাছে আসিস না। তোরা যা। চলে যা।

আব্বু।

কথা শোন তোরা যা।

ডাক থেমে যায় দুটি শিশু কণ্ঠের। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে হাঁপাতে থাকে নজরুল।

দরোজা খুলে যায়।

আমি ডাক্তার।

নজরুল ভালো করে তার মুখ দেখার চেষ্টা করে। বদলে শুধু দেখতে পায় লোকটা ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জে ওষুধ ভরছে একমনে।

দেখি হাতটা।

ডাক্তার ?

হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।

আমি বেঁচে আছি ?

৯

আমি কি বেঁচে আছি, ডাক্তার ?

নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

এটা কি ওষুধ ?

হ্যাঁ, এটা ওষুধ। এটা দিলেই আপনি ভাল হয়ে যাবেন

দাঁড়ান।

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে গম্ভীর গলায় কে যেন ডাক দিয়ে ওঠে। ডাক্তার তখন বক্তার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। বক্তা এগিয়ে আসে ধীর পায়ে।

ডাক্তার, আপনি সরে দাঁড়ান।

বক্তা এবার নজরুলের দিকে পুরো চোখ রেখে তাকায়। ডানা ঝাপটানো ভীষণ গলায় বলে, ভাল করে শুনুন।

নজরুল কান খাড়া করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কানের ভেতরে রেলের তীব্র হুইসিল ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পায় না। পরে, হুইসিলটা হঠাৎ থেমে যায়।

নবাগত লোকটি তখন নজরুলের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনি জানেন কি আছে ঐ ইনজেকশানে ?

না।

জানতে চান ? তাহলে শুনুন। ওতে আছে ক্যানসার ব্যাধির বীজ।

ক্যানসার ?

আপনার শরীরে গেলে কোনোদিন তা ভাল হবে না।

ভাল হবে না ?

না। ক্যানসারের কোনো ওষুধ নেই।

নেই ?

না। আপনার শরীরের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে ছাই হয়ে যাবে। তিলে তিলে যন্ত্রণায় পুড়ে আপনি মারা যাবেন।

আমি মরতে চাই না।

আমি জানি, আপনি মরতে চান না।

আমি বাঁচতে চাই।

জানি, আপনি বাঁচতে চান।

আমাকে বাঁচান। আমাকে আপনি বাঁচান।

লোকটা তখন আবছা একটু হেসে ওঠে।

ভাগ্যে ভাল, আমি এসে পড়েছিলাম। আমি আপনার মতো একজন কবিকে মরতে দেব না। কিছুতেই না। আপনি বেঁচে থাকবেন এবং কবিতা লিখবেন।

আমি নজরুল ইসলাম নই।

আপনি হবেন নতুন নজরুল ইসলাম। নতুন নজরুলকেই আমরা চাই। পুরনো সেই কবিকে নয়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ডাক্তার।

তারপর ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দেয় নবাগত লোকটি। অন্য একটি সুইচ টেপে সে। মৃদু আলোয় ভরে যায় ঘর।

লোকটি বলে, আপনার আর কোনো কষ্ট হবে না। কোনো কষ্ট আর পেতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

অবিলম্বে নজরুলকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভিজে তোয়ালে দিয়ে তার সারা শরীর মুছিয়ে দেয় কেউ। নতুন একটা জামা পাজামা পরিয়ে দেয়া হয় তাকে। খেতে দেয়া হয় গরম এক কাপ দুধ।

দু'হাতে পেয়ালা আঁকড়ে ধরে সবটুকু দুধ সে এক নিঃশ্বাসে পান করে।

পর মুহূর্তে গলগল করে বমি হয়ে যায়।

আবার সন্তর্পণে নিঃশব্দে নোংরাগুলো পরিষ্কার করে দেয় কারা। তাকে ধরে শুইয়ে দেয় বিছানায়। সবাই ঘর থেকে চলে যায়, শুধু সেই নবাগত লোকটি ছাড়া।

লোকটি চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসে।

নজরুল জানতে চায় তার স্ত্রীর কথা। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে, কুমকুম কোথায় ?

কুমকুম কে ?

আমার স্ত্রী। আমার খোকন, আমার মেয়ে মমতা কোথায় ? ওদের ডাক শুনলাম। আমি কুমকুমকে দেখলাম।

কোথায় দেখলেন ?

ঘরের ভেতরে।

ওদের তো এখানে আনা হয় নি। আপনি শুধু শুধু ভাবছেন। ওরা ভাল আছে। আমরা খবর নিয়েছি, ভাল আছে।

ভাল আছে ? খবর নিয়েছেন ?

খবর নিয়েই বলছি। আপনি গেলেই দেখতে পাবেন সত্যি বলেছি কি-না।

যেতে পারব ?

হ্যাঁ পারবেন ?

আমি কোনো দস্তখত দিতে পারব না।

দস্তখত আপনাকে দিতে হবে না।

অবাক হয়ে যায় নজরুল।

দিতে হবে না ?

না। কোনো বিবৃতিতে দস্তখত আপনাকে দিতে হবে না। ওসব কখন ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আসলে, তরুণ সব অফিসারদের নিয়েই হয়েছে মুশকিল। কাকে কী বলতে হয়, কার সঙ্গে কখন কী ব্যবহার করতে হয়, কিচ্ছু বোঝে না।

আমাকে বিবৃতি দিতে হবে না ?

বললাম তো— না। আপনাকে শুধু একটা কবিতা লিখতে হবে।

কবিতা ?

হ্যাঁ, কবিতা। একটি মাত্র কবিতা।

কবিতা লিখব ?

কাগজ-কলম সব আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি শুধু একটা কবিতা লিখে দিন, তাহলেই সব চুকে গেল।

কবিতা ?

হ্যাঁ, কবিতা। এগিয়ে যাবার কবিতা। মানুষকে সুপথে আনবার কবিতা। বড় কবিতা না হলেও চলবে। ছোট একটি কবিতা।

কবিতা ?

কাগজ-কলম রইল। রাতে আপনাকে খাবার দিয়ে যাবে। যখন যা দরকার সব পাবেন। রাতে আপনাকে আর বিরক্ত করব না। সকালে এসে কবিতাটি নিয়ে যাব। আমি এখন আসি।

১০

কবিতা ?

কবিতা লেখার কথা কোনোদিন তো সে ভাবে নি। কী করে কবিতা লেখে কেউ ?

সালেহার মুখ ভেসে ওঠে তার সমুখে।

সালেহা ?

আমাকে ভালোবাসতে না ?

বাসতাম।

অনেক ভালবাসতে ?

অনেক ভালবাসতাম।

তাহলে কখনো বল নি কেন ?

তোমাকে ভালবাসি, আমি বুঝি নি, সালেহা।

এখন ?

এখন ওকথা ভাবা আমার পাপ।

কেন ? —ভালবাসা পাপ ?

না, না, সালেহা।

তাহলে পাপ কেন ?

তুমি যে অন্য কারো বৌ। আমি যে অন্য কারো স্বামী। এখন আমি বলতে পারি না সালেহা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

দেশকে তুমি ভালবাসো না ?

বাসি।

দেশ তো এখন অন্য কারো।

তার মানে ?

দেশ এখন তোমার নয়। দেশ ছিনিয়ে নিয়েছে অন্য কেউ।

তাতে কী ?

তবু তুমি দেশকে ভালবাস ?

বাসি।

সেটা পাপ নয় ?

না সালেহা, দেশকে তখনই তো বেশি করে ভালবাসা যায়। জান, একটা অদ্ভুত কাণ্ড। আমি তো বাংলাদেশে জন্মাই নি। আমার জন্ম সেই বর্ধমানে। চলে এলাম ঢাকায়। কোনোদিন ভাল করে বুঝি নি যে বাংলাদেশ আমার দেশ। কোনোদিন স্পষ্ট করে মনে হয় নি বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। দেশ বলতেই চোখের সমুখে ভেসে উঠত বর্ধমান।

আর এখন ?

সেই কথাই তোমাকে বলছি, সালেহা। ভারি মজার কাণ্ড। সমস্ত শহরের ওপর দিয়ে গুলির ঝড় বয়ে গেল, ট্যাংক গড়িয়ে গেল, বাড়ি ধ্বসে পড়ল, লাশের পাহাড় জমে উঠল রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তারপর দেখলাম বড় বড় সব দালানের মাথায় ওরা ওঠাচ্ছে ওদের পতাকা। ছিঁড়ে ফেলছে আমাদের পতাকা। তখন হঠাৎ বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। ঠিক যেমনটা হয়েছিল তোমার বিয়ের কার্ড পেয়ে।

তুমি কেঁদেছিলে ?

না, কাঁদি নি। তখনো না, এখনো না। বুকের মধ্যে ওই রকম যখন টান লাগে, তখন কাঁদা যায় না। তখন সারা শরীরটাই স্তম্ভিত হয়ে অশ্রুর একটা স্তম্ভ হয়ে যায়, সালেহা। অবাক কাণ্ড, আমি তাকিয়ে দেখি, আমার এই বুকটা বাংলাদেশের জন্যে ভালবাসায় ভরে গেছে। সেই ভালবাসা আছে বলেই আমি বেঁচে আছি।

আমাকে তুমি ভালবাস ?

হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি। সবাইকে আমি ভালবাসি। এখন আমি সবাইকে ভালবাসতে

পারি। তুমি ভাল সালেহা? তুমি ভাল আছ তো?

আমাকে তুমি ভালবাস?

হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি। সবাইকে আমি ভালবাসি। এখন আমি সবাইকে ভালবাসতে পারি। তুমি ভাল আছো সালেহা? তুমি ভাল আছো তো?

আমাকে ভালবাস?

হ্যাঁ, বাসি।

আমার জন্যে একটা কবিতা লিখবে, নজরুল?

কবিতা?

হ্যাঁ, কবিতা। আমার জন্যে। শুধু আমাকে নিয়ে। একটি কবিতা।

আমি তো পারি না, সালেহা।

তুমি পারবে।

না, আমি পারব না। আমি জানি না কী করে কবিতা হয়।

তুমি জানো। নিজের বুকের ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখো। সেখানে একটি কবিতা লেখা হয়ে আছে।

না, সালেহা, না।

আছে নজরুল, আছে।

না, নেই।

আছে নজরুল।

না, সালেহা।

আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আছে। তুমি একবার উঠে দাঁড়াও নজরুল। নিজের বুক চিরে ফ্যাল, তাকিয়ে দ্যাখ— সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে কবিতা। পড় সেই কবিতা তুমি পড়ো। আমাকে পড়ে শোনাও নজরুল। তুমি উঠে দাঁড়াও।

নজরুল ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়।

সালেহা। সালেহা।

চিৎকার করে সে ডাকে। তার চিৎকার শুনে খাকি একজন এসে ঘরে ঢোকে। ব্যক্তিটির দিকে চোখ পড়তেই সমস্ত অঙ্গ বরফ হয়ে যায় তার। ধপ করে সে বিছানার ওপর বসে পড়ে। একটু পানি খেতে চায়। খাকি তাকে জানায়, পানি শিগগিরই তার কাছে আসবে।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায় দরোজা।

বিছানার মাথার কাছে ছোট্ট টেবিলের ওপর কলম চাপা সাদা কাগজটা একবার ফরফর করে ওঠে। পাখির মতো এ কাগজটাও উড়ে যেতে চায়, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। নজরুল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কাগজটার দিকে।

কাগজটা তার সমস্ত শূন্যতা বিস্তৃত করে পড়ে থাকে।

সময় বয়ে যায়, কী থেমে থাকে। সময় আর নজরুলকে উদ্বিগ্ন করে না। একটা জীবনকাল পেরিয়ে যায় কিনা, কে বলতে পারে?

সেই লোকটি এসে সহৃদয় কণ্ঠে জিগ্যেস করে, কবিতা লিখেছেন ?

না।

কবিতা লেখা খুব কষ্টের ?

জানি না। পারি না।

চেষ্টা করলেই হবে। চেষ্টা করে দেখুন।

আপনারা ভুল করছেন।

ভুল তো হতেই পারে। আমি কবি নই। তবে এটুকু জানি যে চেষ্টা করে কবিতা লেখা যায় না।

তাহলে আমাকে বলছেন কেন ?

আপনার একটা কবিতা চাই যে। নতুন একটা কবিতা। আমি সব কটা খবরের কাগজে বলে রেখেছি। আজ রাতে কবিতা যদি দিতে পারেন, কাল সকালেই প্রথম পাতায় সমস্ত কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হবে। আমি সবাইকে বলে রেখেছি। শুধু কবিতার অপেক্ষা। আচ্ছা, আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসব। আপনি এখন কিছু খাবেন ?

কী ?

চমকে ওঠে নজরুল। কতকাল খাওয়ার কথা কেউ তাকে বলে নি।

কিছু খাবেন ?

প্রবল ইচ্ছে হয় কিছু খাওয়ার জন্যে। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে— না, না, না।

পাকস্থলীতে ভয়াবহ একটা আক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। তেতো পানিতে মুখের ভেতরটা ভরে ওঠে তার। দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে সে।

লোকটি বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, আমি এসে কবিতাটি নিয়ে যাব।

চোখ বুজে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে নজরুল।

মাথার কাছে কাগজটা আবার ফরফর করে ওঠে।

বিরাট শূন্য সাদা দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কুমকুম এখন কাঁদে।

তুমি কাঁদছ কেন ?

কুমকুম কোনো উত্তর দেয় না।

তুমি কেঁদ না কুমকুম।

কুমকুম তবু কেঁদে চলে। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নজরুল।

তুমি জানো না, কাঁদলে অমঙ্গল হয়। চুপ কর, কুমকুম, চুপ কর।

তখন লাফাতে লাফাতে খোকন এসে তার কোলে চড়ে বসে।

কীরে খোকন ?

জান আব্বু, কবিতা আবৃত্তি করে আমি আজ ফার্স্ট হয়েছি।

কোথায় ?

বারে, ইস্কুলে। আজ গরমের ছুটি হয়ে গেল কিনা। তাই একটা সভা হলো। আমি কোন কবিতা বললাম, জান?

না তো। কোন কবিতা?

সে ভারি মজার কবিতা।

বল দেখি, শুনি।

খোকন লাফ দিয়ে কোল থেকে নামে। ঘরেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে মুখ ভঙ্গি করে শোনাতে থাকে সে—

বাবুদের তাল পুকুরে

হাবুদের ডাল কুকুরে

সে কী বাস করলে তাড়া

বলি থাম একটু দাঁড়া।

মগজের কোষে কোষে ছন্দটা ছড়িয়ে পড়ে।

বা—বু—দে—র—তা—ল—পু—কু—রে—হা—বু—দে—র—ডা—ল—কু—কু—রে।

কবিতা কী করে হয়?

অক্ষরের পর অক্ষর?

মিলের পর মিল?

পংক্তির পর পংক্তি?

কিন্তু কী নিয়ে কবিতা? কোন কথা? কোন বিষয়?

দরোজা খুলে যায়।

লোকটা জানতে চায়, কবিতা হয়েছে?

কংকালের কোটর থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় নজরুল। লোকটা অপ্রতিভ হয়ে মাথা টেনে নেয়। দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

একটি কবিতা লিখলেই কাল সকালে সমস্ত কাগজে বড় বড় হরফে প্রথম পাতায় বেরুবে।

সে—কী—বা—স—ক—র—লে—তা—ড়া—ব—লি—থা—ম—এ—ক—টু—দাঁ—ড়া।

চৌকির কিনার ধরে নজরুল চক্রাকারে হামাগুড়ি দেয়। উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকু যে আর অবশিষ্ট নেই, সে কথা তাকে আর বিচলিত করে না। পা টেনে টেনে সে হামাগুড়ি দেয় হিংস্র একটা শ্বাপদের মতো, অন্ধকার নিবিড় একটা অরণ্যের ভেতরে চন্দ্রালোকিত একটা জলাশয় সন্ধান করে চলে সে অনবরত।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। লকলক করে ওঠে জ্বলন্ত লাল একটি শিখা। প্রাচীন পারসিক স্তবে ভরে ওঠে করোটি।

কলেজে শৈলেনবাবুর ক্লাসঘরে এসে দাঁড়ান। তাঁর সেই নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি বলে চলেন, প্রাচীন পারসিকদের মধ্যে এই নতুন সত্যের আলোক তিনি ছড়াইয়া দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর দুইজন— শুভ ঈশ্বর, অশুভ ঈশ্বর। তিনি বলেন, স্বর্গরাজ্যে অবিরাম এই দুই

ঈশ্বরের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। সে যুদ্ধে কখনো শুভ ঈশ্বর জয়ী, কখনো অশুভ ঈশ্বর জয়ী।

শ্বাপদের মতোই থমকে যায় নজরুল চার হাত পায়ের ওপর। গোঙানির মতো শব্দ ফুটে বেরোয় তার মুখ দিয়ে। আবার সে চক্রাকারে হামাগুড়ি দিতে থাকে।

হঠাৎ তার চোখের সমুখে এই প্রথম, কবি নজরুল ইসলামের ক্ষ্যাপা চেহারাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। সেই তরঙ্গায়িত কেশর, সেই মাংসল কাঁধ, সেই কাজল দুটি চোখ, ঠোঁটের সেই অস্ফুট হাসি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা। একই নামের দুটি লোক যেন দুটি প্রান্ত ছুঁয়ে, অতল গহ্বর যোজনা করে অন্তহীন একটা সেতু— সেই সেতুর আকাশ ছোঁয়া, প্রতিটি লোহার বরগা কাজী নজরুল ইসলামের নামের একেকটা অক্ষর।

১১

সেই লোকটি আবার এসে দাঁড়ায়। নজরুলকে মেঝে থেকে তুলে বিছানার ওপর সে বসিয়ে দেয়।

ধপ করে পড়ে যায় সে বিছানার ওপর। কিন্তু জ্ঞান হারায় না।

প্রশান্ত চোখে সে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে।

কবিতা ?

নিঃশব্দে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে নজরুলের ঠোঁটে।

হয় নি কবিতা ?

হাসিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনি নিজের কী ক্ষতি করছেন।

জানি।

জানেন ? তবু লিখবেন না ?

না।

শুধু একটি কবিতা ?

একটি কবিতা আমি লিখব না।

লিখলেই মুক্তি পাবেন।

কীসের থেকে ?

এই বন্দি দশা থেকে।

আমি বন্দি নই।

আপনি ভুল করছেন।

ভুল আপনারা করছেন।

একটি কবিতা।

একটি কবিতা নয়।

লিখলেই যেতে পারবেন।

কোথায় ?

জাফরগঞ্জে।

জাফরগঞ্জ কোথায় ?

আপনি জানেন না কোথায় ?

জানি কোথায়। জানি জাফরগঞ্জ আমারই দেশে। আর আমি দেশেই আছি। আমার দেশে। সে দেশের নাম বাংলাদেশ।

চাবুকের মতো চড় পড়ে নজরুলের গালে। একে একে নিঃশব্দে ঘরটা ভরে যায় খাকি পোশাকে।

আরো একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়।

লিখবেন না কবিতা ?

না

তাহলে কোন কবিতা লিখবেন ? বিদ্রোহের কবিতা ?

পারলে সে কবিতাই আমি লিখতাম।

কবিতা লিখতে পারেন না আপনি ?

জানি না।

এখনো মিথ্যে কথা বলছেন ?

মিথ্যা আমি বলি না।

কখনোই না ?

কখনোই না।

বিদ্রোহের প্ররোচনা দেন নি আপনি ?

আপনারা বলতে পারবেন।

বাঙালিকে অস্ত্র ধরতে বলেন নি আপনি ?

বাঙালিকে জিগ্যেস করুন।

এখনো বলতে চান, আপনি কবি নজরুল ইসলাম নন ?

আপনারাই বলছেন।

তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দেয়া হয়। একটা বেঁটে শক্ত লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় তার হাঁটুতে। পায়ের জোড় ভেঙে যায়। ব্যথা বোধ হয় না। যে শব্দ তার কানে পৌঁছোয়, মনে হয় তার উৎস অন্য কোনোখানে।

অস্বীকার কর, তুমি নজরুল নও ?

আমি নজরুল।

কবি নজরুল।

হ্যাঁ, আমি কবি হতে চাই।

কবিতা লিখতে চাও না?

না। তোমাদের জন্যে নয়।

তখন অন্য পায়ের জোড়ে বিদ্যুৎবেগে নেমে আসে বেঁটে শক্ত সেই লাঠিটা। বাঁ পায়ের জোড়টাও ভেঙে যায়।

তুমি কবি?

হ্যাঁ, আমি কবি।

তুমি লিখবে না?

না আমি লিখব না।

তার পেটের নিচে বুট চালিয়ে তাকে উপুড় করে দেয় কেউ। তীব্র একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে তার কোমরে। একবার উৎক্ষিপ্ত হয়ে কোমরটা শেষবারের মতো মেঝের ওপর পড়ে যায়। আবার কেউ তাকে পা দিয়ে সোজা করে দেয়।

নজরুল তুমি লিখবে না?

না।

তার বাম হাতের কনুইয়ের জোড় এবার ভেঙে দেয় ওরা। চিৎকার করবার শক্তিটুকু তার নেই। তবু, মাথার ভেতরে চিৎকার করে সে কুমকুমকে বলে, খোকনকে নিয়ে যাও। মমতাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এখানে এসো না কুমকুম। এখানে নরক। এখানে দুর্গন্ধ। এখানে থইথই পানি।

এখনো ভেবে দ্যাখ, নজরুল।

দেখেছি।

এখনো তোমার ডান হাত ঠিক আছে।

জানি।

এখনো একটি কবিতা তুমি লিখতে পারো।

পারি।

লিখবে তুমি?

না।

লিখবে না?

লিখব না।

তার ডানহাতের জোড়টিও ভেঙে দেয়া হয় তখন। ওদের পায়ের চাপে মুখ দিয়ে কয়েক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আসে তার। দারুণ তৃষ্ণায় নিজের রক্ত সে জিহ্বা দিয়ে চুকচুক করে টেনে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিহ্বা সাড়া দেয় না। মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ ফলের মতো জিহ্বাটা গহ্বর পূর্ণ করে রাখে। লোকগুলোর মুঠোয় মুঠোয় উঠে আসে তার

দীর্ঘ চুলের গুচ্ছগুলো।

সমস্ত ঘর ছড়িয়ে পড়ে তার চুল। উড়তে থাকে নাগকেশর ফুলের অজস্র শুঁড়ের মতো। তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পেছনে কলাগাছ ঘেরা একটা বুনো জায়গা। সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় তাকে। বলা হয় গর্ত খুঁড়তে।

দীর্ঘ আঙুল দিয়ে খামছে ধরতে চায় সে মাটি। কিন্তু আঙুল নড়ে না। একবার শুধু একটুখানি নড়ে উঠে স্থির হয়ে যায়। চোখের কাছে ঘাসগুলো স্থির হয়ে থাকে— যেন বন্ধুরা তাকে দেখতে এসে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। মাটির সোঁদা গন্ধ তার চিত্তের ওপর দিয়ে বয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে সে দ্যাখে, ওরা একটা গর্ত খুঁড়ছে। কোদালের মুখে উঠে আসছে চাঙড় চাঙড় মাটি। আর ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন সেই ঘ্রাণ।

তারপর, হাড়ের জোড় ভাঙার মতো পট একটা শব্দ শোনে সে। বুকের কাছটা হঠাৎ ভারি উষ্ণ মনে হয় তার। দূরে একটা শেয়াল ডেকে ওঠে।

কখনোই কোনো কবিতা না লিখে কবি, কাজী নজরুল ইসলামকে আরো একটি কবিতা না লেখার জন্যে ঠেলে ফেলে দেয়া হয় সেই গর্তে।

তখনো চোখ দুটো খোলা ছিল।

দ্বিতীয় দিনের কাহিনী



সারাদিন অত্যন্ত মন্থর কেটে যাবার পর আচমকা রাত নামে, কেননা দিনের ভেতরে স্মৃতি রচিত হবার অবকাশ সম্ভবত আর নেই। প্রথমে বিশাল একজোড়া ডানার মত ছায়াপাত সমস্ত বস্তু এবং অস্তিত্বের ওপর অনুভব করা যায়; পরে, রোদের ভেতরে সারাদিন বিভিন্ন উৎস থেকে বেরিয়ে এসে শব্দগুলো যে স্তব্ধতাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল অদৃশ্য পঙ্গপাল যেনবা, তারা ক্ষান্ত হয়। এখন স্তব্ধতা আবার তার অলৌকিক ফলের মত ক্লান্তি ফিরে পায়; রাত গভীরতর হয়; স্তব্ধতা, পূর্ণতর। তাহের তার গন্তব্য জলেশ্বরীতে এসে পৌঁছোয়। মুমূর্ষু ব্যক্তির মত রেলগাড়ি সংক্ষিপ্ত একটি আর্তধ্বনি তুলে নিস্পন্দ হয়ে যায়; এরপর আর কোনো ইস্টিশান নেই; এখান থেকে গাড়ি আবার উল্টো দিকে যাত্রা করবে। মাঝখানে ঘণ্টাখানেকের বিরতি, অতএব প্ল্যাটফরমে যাত্রীদের উৎকণ্ঠিত কোনো ব্যস্ততা নেই। গন্তব্যে যে পৌঁছোয়, কেবল সে ছাড়া আর সকলেই এখন নিঃশব্দে ক্রমশ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। বাতাসে ভেষজ গন্ধ সে টের পায়; সে আবিষ্কার করে প্রতিটি শ্বাস গ্রহণ তার ইন্দ্রিয়গুলোকে মাত্রায় মাত্রায় নগ্ন করে তুলছে; শরীর যেন শূন্যগর্ভ একটি পাত্র, বাতাসে মৃদু উত্তেজক তরলে তা একটু একটু করে পূর্ণ হয়ে উঠছে। সচেতনভাবে সে নিঃশ্বাস নেয় এবং প্ল্যাটফরমে উদ্যমহীন অনেকটা সময় ব্যয় করে। অচিরে অন্ধকারে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়; অনতিবিলম্বে চটমোড়া শনের ছাদ, কাঠের ফলকে প্রায় অবলুপ্ত অক্ষরে এই জনবসতির নাম, মাল ও ওজনের কল এবং ভগ্নদশা সূচিমুখ রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরুবার পথ তার চোখে পরিষ্কার হয়ে আসে। তাহের পা বাড়ায়। ইস্টিশানটি অবিকল তেমনি আছে, কেবল মলিন হয়েছে আরো; বিবর্ণ, দরিদ্রতর; কিংবা দীর্ঘকাল শহরবাসের ফলে তারই চোখ এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যাবত প্রকার উজ্জ্বলতায়। কিন্তু সে-মীমাংসায় না গিয়ে সে পা চালায়; বাইরে বেরিয়ে কিছুই কিন্তু চেনা যায় না আর। মনোহারী, মিষ্টি, কাঠ এবং তৈরি পোশাকের এই দোকানগুলো আগে এখানে ইস্টিশানের বাইরেই ঠিক ছিল না; তার স্মরণ হয়, এখানে প্রকাণ্ড এক মাঠ ছিল; পরিচ্ছন্ন মাঠ নয়, সমতল নয়, সবুজ ঘাস নয়, লোমশ কোনো দেহে নিশ্চিহ্নলোম ক্ষতচিহ্নের মত ছিল জায়গাটা; বস্তুত তা ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেই ভাগাড় উধাও হয়েছে, তার বদলে আবির্ভাব ঘটেছে ঠাসবুনোন এই দোকানমালার। প্রতিটি দোকানে উজ্জ্বল পেট্রোম্যাকসের বাতি জ্বলছে বরগা থেকে কুকুরবাঁধা লোহার শেকলে; প্রতিটি দোকানে এখন মানুষ গিসগিস করছে; বাড়ি যাবার আগে যাত্রীরা কেউ খেয়ে নিচ্ছে, কেউবা সওদা করছে। কেবল কাঠের দোকানটিতে আপাতত কারো কোনো প্রয়োজন নেই; এত রাতে কেউ কাঠের প্রয়োজন অনুভব করে না, তবু অভ্যেসবশেই দোকান খুলে আছে নতমুখী দু'টি লোক; সেই লোক দু'টির পাশে ঘুম এখন গুঞ্জন করে। তাহেরের প্রচণ্ড খিদে পায়। অনতিপরে সে মনস্থির করে, মিষ্টির দোকানে কিছু খেয়ে নেবে; বস্তুত আলমারির মিষ্টি তাকে লুব্ধ করে তোলে। দোকানে সে ঢোকে, অতিযত্নে হাতের সুটকেশ নামিয়ে রাখে কাঠের হেলনা বেঞ্চে, তারপর একপাশে জায়গা নিয়ে বসে আলমারির দিকে ক্ষুধার্ত চোখে সে তাকায়। আলমারির কাছে অনেক ক'টি লোক দাঁড়িয়ে আছে; তাদের মধ্যে কে দোকানি, কে-বা পরিচারক সহসা বুঝে ওঠা যায় না; বস্তুত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সে কোনো তফাৎ আবিষ্কার করতে পারে না। এবং তার উপস্থিতি এখন অবিলম্বে কোনো চাঞ্চল্য বা আগ্রহ কারো মনে সৃষ্টি করে না। থরে থরে সাজান খাবার তার ধৈর্যচ্যুত ক্ষুধাকে মৃদু বিবমিষায় বদলে দিতে থাকে, মিষ্টির বদলে ঝালের দিকে সে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে থাকে এবং

আক্ষেপের সঙ্গে নানাপ্রকার ঝোলমাছের কথা তার এখন অনিবার্যভাবে স্মরণ হতে থাকে; এমনকি সে ঘ্রাণ পায় ও অনবরত উসখুস করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে রেলপথের অনেকগুলো ব্রীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং অধিকাংশ রেলকর্মী নিরুদ্দিষ্ট থাকায় ঢাকা থেকে জলেশ্বরীতে পৌঁছুতে পুরো দু'টি দিন তার খসে গেছে। এই দু'দিনে প্রকৃত প্রস্তাবে ঝাল কিংবা ভাত তার মুখে ওঠে নি; মিষ্টি, কলা অথবা বিস্কুটে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। গন্তব্যের সঙ্গে ভাতের কোনো নৈয়ায়িক সম্পর্ক না থাকলেও তার মন এখন গরম ভাতের ভিজে আঠালো গন্ধে আবিল হয়ে থাকে। তার এক প্রকার ধারণা ছিল, কেউ তাকে এগিয়ে নিতে আসবে ইস্টিশানে; কিন্তু সে ধারণাটি ভিত্তিহীন, কারণ ইস্কুলের চিঠিতে এরকম কোনো ইঙ্গিত ছিল না। প্ল্যাটফরমে নেমে সে কাউকে আশা করে নি, এবং কেউ আসে নি বলে ক্ষুণ্নও হয় নি। তবু এখন মিষ্টির দোকানে বসে তার একবার মনে হয়, কেউ তাকে নিতে আসবার ব্যবস্থা করে থাকলে গন্তব্যে এসে আর কিছু না হোক ডাল-ভাত পাওয়া যেত এবং এই মুহূর্তে তার চেয়ে প্রীতিপ্রদ কিছু হতো না। সে এখন সিদ্ধান্তই করে বসে যে খালি পেটে মিষ্টি খেলে তার পাকস্থলী থেকে সব কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসবে এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। জীবনে এখন একটিই মাত্র প্রবল ভয় তার— স্বজনহীন কোনো শহরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া। তার শরীর বিশ্বস্ত রকমে ভাল; সে মনে করতে পারে না কবে তার কঠিন রোগ হয়েছে, সাধারণ সর্দি কিংবা অরুচি বাদে। সংক্ষেপে, সে এখন, এখানে অসুস্থ হয়ে পড়তে চায় না। অনতিবিলম্বে বেঞ্চ থেকে উঠে বাইরে যাবার জন্য যখন সে পা বাড়ায় তখন ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে যায়। দোকানের বাম কোণে টেবিলে মাথা রেখে মধ্যবয়সী এক লোক, যাকে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কোলাহলের মধ্যে ঘুমদেবীর ভজনায় রত, সে হঠাৎ মাথা তুলে তাকায় এবং অপ্রত্যাশিত একটা হুঙ্কার ছাড়ে। মুহূর্তের জন্যে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেদিকে; ক্রেতাকুল অপ্রস্তুত হয়; সামান্য কিছু লোক স্তম্ভিত হয়ে উৎকর্ণ স্থিরতায় বলীভূত হয়ে যায় এবং এই ভঙ্গিতেই ধরা পড়ে যায় যে এরা দোকানেরই কর্মী। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাদের উদ্দেশে সাধারণভাবে আরো একটি সংক্ষিপ্ত হুঙ্কার ছেড়ে জানায় যে, এরা প্রত্যেকেই নিজ-কাজে অত্যন্ত অমনোযোগী, নইলে বিদেশী এই ভদ্রলোক এতক্ষণ এখানে বসে আছেন, তাঁর প্রতি কারো দৃষ্টি নেই কেন? সে আরো বলে, বিদেশী নিতান্ত বিরক্ত হয়েই চলে যাচ্ছেন এবং যে মুহূর্তে তিনি দোকানের নামায় পৌঁছে যাবেন সেই মুহূর্তেই কেউ আর নিজের চাকুরিতে বহাল থাকবে না। তাহের প্রথমত অবাক হয়, লোকটি যদি ঘুমিয়েই ছিল তাহলে তাকে লক্ষ করল কীভাবে? কিন্তু এই বিস্ময় তার ক্ষণস্থায়ী হয়। মুহূর্তে যা তাকে প্লাবিত করে দিয়ে যায় তা হলো এক প্রকার অপরাধবোধ। তার এহেন সামান্য একটি স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে সে কোনো বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চায় না; বস্তুত সে লোকগুলোর জীবিকাহানির সম্ভাবনায় আরষ্ট হয়ে যায়। মৃদু কণ্ঠে সে বলে, আসলে সে সিগারেট কিনতেই যাচ্ছিল। তার মিথ্যা ভাষণ নতুনতর চাঞ্চল্যের জন্ম দেয়, কিংবা বলা যায় বর্তমান চাঞ্চল্য ঘুচে গিয়ে প্রাচীন স্বাভাবিকতা ফিরে আসে বটে। দোকানের কর্মীবাহিনী আবার কাজে মন দেয়; সে আবার তাদের কাছে অনুপস্থিত, অতএব মনোযোগের অবান্তর হয়ে পড়ে; সেই মধ্যবয়সী লোকটি, অবশ্যই যে এ দোকানের মালিক, আবার টেবিলে মাথা রাখে এবং অতি সন্তর্পণে, যেন কাচের একটি পলকা পাত্র সে নামিয়ে রাখে, এবং ঘুমিয়ে পড়ে তিলমাত্র কালক্ষেপ না করে; ক্রেতারা

মিষ্টির হাড়ি হাতে ঝুলিয়ে রাতের রাস্তায় সাবলীলভাবে নেমে যায়; যারা দোকানে বসেই খাচ্ছিল তাদের কেউ কেউ সমুখে শূন্য বাসন নিয়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে সাজান আলমারির দিকে আবার তাকিয়ে থাকে, সম্ভবত মনের মধ্যে খাব-কি-ভাব-না পয়সা-খরচ-করব-কি-করব-না জাতীয় বিতর্কের নীরব অথচ প্রবল কোলাহল শুনতে পায় তারা। তাহের বসে থাকে এবং তাহের বসেই থাকে। কেউ তার কাছে আসে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত করে, কর্তৃপক্ষ তার প্রতি জোর করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলেই কর্মীবাহিনী এখন দ্বিগুণ উপেক্ষা দেখিয়ে তা পুষিয়ে নিতে চায়। সে উঠে পড়ে, এবার বাইরে যাবার জন্যে নয়, যায় আলমারির কাছে এবং তার পছন্দ বলে। আলমারির কাছে রসসিক্ত হাত নিয়ে দাঁড়ান এই লোকটির উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত কড়কড়ে নতুন গামছা জড়ান, সম্ভবত কয়েক ঘণ্টা আগেই সে কিনে থাকবে। প্রতিটি নতুন আবিষ্কার মানুষকে কিছুটা উদ্ধত কিছুটা বিক্ষিপ্ত করে দেয়; মিশ্রিত সেই মনোভাব এই লোকটির মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সে তার মিষ্টির পছন্দ শোনে কিংবা না, হাত নেড়ে অস্পষ্ট একটি ভঙ্গি করে, যার অর্থ হতে পারে— বুঝেছি, যার অর্থ হতে পারে— বসুন গিয়ে। তাহের আবার তার বেঞ্চে ফিরে যায়, পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে এবং মুহূর্তমধ্যে মনে পড়ে যায় যে খানিক আগেই সে সিগারেট কিনতে যাবার কৈফিয়ত দিয়েছিল; তৎক্ষণাৎ সেই মিথ্যের ওপর ধামাচাপা দেবার জন্যে সে সিগারেট দেশলাই দ্রুত গোপন করে ফেলে খাড়া পিঠে বসে থাকে। এক ছোকরা আসে ভিজে ন্যাকড়া হাতে, তার টেবিল সে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিপুণ হাতে মুছে দিয়ে যায়, এবং প্রায় তার পেছনেই নতুন গামছা পরা সেই লোকটা এসে শাদা বাসনে মিষ্টি নামিয়ে দিয়ে যায়; সে ফিরে যেতে না যেতেই আবার সেই ছোকরা আসে, এবার তার হাতে ন্যাকড়ার বদলে সবুজ রঙের মস্তবড় গেলাশ, গেলাশে ফিকে চুনগোলার মত পানি। সে প্রথমে এক ঢোঁক পানি খায়; পানি তার কাছে অত্যন্ত মিষ্টি বলে বোধ হয়। তার শরীরের ভেতর দিয়ে স্নিগ্ধ একটি নদীর প্রবাহ সহসা শুরু হয়ে যায়; রূপকথায় বর্ণিত ইরান দেশের সুন্দরী যার গ্রীবা এতই স্বচ্ছ যে পান খেলে অধোগামী লাল রস প্রত্যক্ষ করা যায়, এখন তার নিজেকে মনে হয় সেই রকম স্বচ্ছ এবং মনে হয় ভাল করে তাকালে তার শরীরের ভেতর দিয়েও দেখা যাবে ফিকে চুনগোলার মত পানি ধীরে নেমে যাচ্ছে। প্রথমে গেলাশটি দেখে তার মনে হয়েছিল পানি অবিশুদ্ধ সম্ভবত; কিন্তু এখানে অতঃপর আর কোনো ঘটনার অবতারণা করবার ইচ্ছে আদৌ তার না-থাকায় সেই পানিই সে খায় এবং তা মিষ্টি বোধ হয়। তার কণ্ঠ থেকে আশ্চর্যসূচক ধ্বনি বেরোয়, সে আরেক ঢোঁক পানি খায়; তার সন্দেহ হয় পানিতে চিনি মিশান আছে; কিংবা এমনও হতে পারে, বাড়তি চিনির শিরা তুলে রাখবার পাত্রেই হয়ত না-ধুয়ে খাবার পানি ধরা হয়েছে। বস্তুত, এ কথা মনে হবার পর সে আবার চুমুক দিয়ে পানিতে এলাচের গুঁড়ো মেশানো শিরারই স্বাদ পায়। তারপর যখন চা আসে, চায়েও সেই সূক্ষ্ম এলাচের ঘ্রাণ পায়। সে প্রায় নিঃসন্দেহ হয় যে এদের এখানে উদ্বৃত্ত শিরার ব্যবহারই এক প্রকার দস্তুর। এমনকি দোকানের বাতাসটুকুও চিনির গন্ধে গাঢ় এবং মন্থর। তাহের এইসব অচির ও বিনাশী চিন্তাগুলো সংবরণ করে না, বরং এতে তার একাকী বসে থাকার শূন্যতা খানিক সহনীয় হয়ে আসে। বস্তুত মন কখনো শূন্য থাকে না; চিন্তা, স্মৃতিচারণ কিংবা দৃশ্যমান জগতকে অবলেহন না করে মন বাঁচে না। সে চায়ে চুমুক দেয়। কিছুকাল আগের সেই মিথ্যা ভাষণের দায়ে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে পকেট থেকে সিগারেট বের

করে এবং আড়ালে মুখ নিয়ে ফস করে ধরায়। তখন তার চোখে পড়ে ইস্টিশানের সেই লোকটিকে, যে বেরুবার পথে যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করছিল। যখন তাকে সে টিকিট দিয়েছিল তখন একবারের অতিরিক্ত সে-মুখের দিকে তাকায় নি। এখন, দোকানের বাইরে বাঁশের যে নিচু বেড়া কুকুর-বেড়াল ঠেকাবার উপায় হিসেবে বহাল, তার ঠিক ওপারেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে; তার স্তম্ভিত ভঙ্গিতেই বুঝা যায়, দোকানে সে ঢুকতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়েছে। এক তরুণের সঙ্গে সে এখন কথা বলছে। নিচু গলায় উচ্চারিত কথাগুলো তলিয়ে গেছে গ্রামোফোনের তীব্র গানে, কেবল তার দ্রুত ঠোঁটের সঞ্চালন লক্ষ করা যায়। দু'একবার সে প্রবলভাবে মাথাও নাড়ে, বোধহয় প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো বিষয়ে সে তার অজ্ঞানতা প্রকাশ করে। তাহের কৌতূহলী হয় এবং চায়ের গেলাশ ধীরে নামিয়ে রেখে সে উৎকীর্ণ হয়ে টিকেট মাস্টার ও তরুণের দিকে আড়চোখে তাকায়। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তার ভগ্নাংশও তার কানে পৌঁছোয় না। সে তখন প্রায় হাল ছেড়ে দেবে, আবার চায়ে চুমুক দিবে এই অবস্থায় একটি সন্দেহ আচমকা তার মনের ওপর ছোঁ দিয়ে যায়; তার সন্দেহ হয় ওরা তাকে নিয়েই কথা বলছে। অচিরেই এ ধারণটি সমূলক বলে প্রমাণিত হয়। সেই তরুণ এবার তাহেরের দিকে চোখেব একটি স্পষ্ট ইশারা ছুঁড়ে দিয়ে টিকিট মাস্টারের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য উচ্চারণ করে। বাক্যটি টিকিট মাস্টারকে বিশেষ ভাবিত করে তোলে, সে দূর থেকে চিন্তাক্লিষ্ট চোখে তাহেরের দিকে তাকায় এবং চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়; তারপর তরুণের দিকে তাকিয়ে আবার সে ভারপিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে; এবার তার মাথা নাড়ায় আগের মত প্রত্যয় বিকীর্ণ হয় না। বরং প্রত্যয়ের অবশিষ্ট বিভাগটুকুও বিলীন হয়ে যায়, বদলে এক করাল অনিশ্চয়তা টিকিট মাস্টারের সমস্ত মুখভারের ওপর দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়; বস্তুত, তরুণের কাছে তার চিন্তাসমেত আত্মসমর্পণ করে। আগন্তুক সে, মিষ্টি দোকানের মালিকের বর্ণনায় বিদেশী সে, মনের মধ্যে হঠাৎ এক আশংকাজনিত অস্থিরতা অনুভব করে ওঠে। যেমন হয়, যে-কোনো অজানাই মানুষের মনে এক ভয় মিশ্রিত কৌতূহলের সঞ্চার ঘটায় অবিলম্বে, তাহের কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তার চোখ থেকে সমস্ত দৃশ্য উধাও হয়ে যায়, সে কেবল টিকিট মাস্টার আর তরুণটিকে দেখতে থাকে, যদিবা তাদের পরবর্তী অভিব্যক্তি থেকে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু প্রত্যাশা প্রত্যাশাই থেকে যায়। কোনো অজানা কারণে দু'জনেই দ্রুত চলে যায়, অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় তাদের উপস্থিতি; এখানে আবার তারা ফিরে আসবে কিনা, তাদের চলে যাবার ভঙ্গিতে মোটেই তা স্পষ্ট হয় না। সে আরেক গেলাশ চা আদেশ করে। নতুন গামছা পরা লোকটি এসে ছোঁ মেরে তার টেবিল থেকে শূন্য বাসন নিয়ে যায় এবং যাবার সময় এমন এক কঠিন মুখভাব দেখিয়ে যায় যাতে স্পষ্ট হয় যে দোকানের মালিকের সেই কথাগুলোতে এখনো সে অজীর্ণতায় ভুগছে। তাহের চায়ের আশায় বসে থাকে। শিগগিরই চা আসে না। বিরাট কেতলিতে চায়ের জন্যে নতুন পানি চুলয় বসতে দেখা যায়। ভিজে ন্যাকড়া হাতে ছোকরাটিকে এবার পাক দিয়ে যেতে দেখা যায়, তাহেরের কাছে আসতে গিয়েও সে আসে না আর, একটেরে গিয়ে জিরতে বসে, কার কাছ থেকে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ সে চেয়ে নেয় এবং বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নাকে-মুখে অবিরল ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। আরো কেউ-কেউ মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে 'ইস, রাত অনেক হলো' বলতে বলতে বাড়ির দিকে লাফিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। কোনো এক অপ্রত্যাশিত চিন্তার মত তার

মনে হয় দোকানের মালিক যে তাকে বিদেশী বলে বর্ণনা দিয়েছিল তা যথার্থই কারণ, অচিরেই তার চারদিকের সমস্ত কিছু সুদূর এবং অপরিজ্ঞাত বলে বোধ হতে থাকে। এবং এই প্রতিসত্যও তার মনে উদিত হয় যে এখানে এদের কাছেও সে একই প্রকারে অচেনা তথা বহিরাগত। বস্তুত, অধিকাংশ মানুষ জীবনের অধিকাংশ মুহূর্তেই পরিচিত বোধসমূহের অন্তর্গত হয়ে বাস করে; যে-মুহূর্তে সামান্যতম অপরিচয়ের অবকাশ, তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কের কোষে কোষে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম হয় এবং অধিকাংশ মানুষেরই তখন যে-ভাবটি দেখা যায় তা বর্জনের, অস্বীকৃতির, এবং পরিচিত বৃত্তের ভেতরে দ্রুত ফিরে যাবার ইচ্ছার। কিন্তু সে বসে থাকে, সে চায়ের অপেক্ষাই করতে থাকে, কারণ, অন্য মানুষের বিপরীতে, এমনকি তার নিজেরই অভ্যস্ত জীবনের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সে আজ সচেতনভাবে এক অপরীক্ষিত ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেছে। অতীতের দিকে সে তাকায় এবং স্মৃতিচারণার জন্যে প্রথম পা ফেলে, কিন্তু কোথায় একটা শেয়াল ডেকে ওঠে, মুহূর্তকাল পরেই ভিন্ন দিক থেকে আরো কিছু শেয়ালের একতান এবার শোনা যেতে থাকে। এই দোকানের পেছনে নিশ্চয়ই কোনো বড় গাছ আছে, আম কিংবা অশথ; বাতাসে তার পাতাপত্রের ভেতরে আচমকা শিহরণ বয়ে যায়; দোকানের টিনের ছাদে ডাল ঘষার প্রশস্ত শব্দ হতে থাকে অতঃপর। হঠাৎ থেমে যায় সব; বাতাস, শেয়ালের ডাক, টিন ঘষা। কাঠের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়, সে দোকানের লোক দু'টির প্রতিযোগিতামূলক কাশি শোনা যায়; অনতিকাল পরেই তাদের দেখা যায় হাতে টিমটিমে লণ্ঠন নিয়ে আসতে। তারা মিষ্টি দোকানে জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরায় এবং নিঃশব্দে নিকষ অন্ধকারের ভেতর নেমে পড়ে। তাহের সচকিত হয়ে লক্ষ করে তাকে চা দেয়া হয়েছে; নতুন পাতায় তৈরি চায়ের ঘ্রাণ তাকে ধোঁয়ার লীলায়িত আঙুলে আদর করে; সে চুমুক দেয়। তারও এখন যাওয়া দরকার; কর্তব্য, রাত্রিবাস করবার সুবিধে কোথায় আছে তা এক্ষুণি জেনে নেয়া; সকলেই বাড়ি যাচ্ছে, ক্রমেই লোক কমে আসছে দেখে তারও ভেতরে এখন দোলা লাগে। সেই দোলা আরো প্রবল হয়ে পড়ে যখন রেলগাড়ির হুইসিল শোনা যায়। অনতিপরে, চাকার নিঃশ্বাসযুক্ত শব্দসমেত রেলগাড়ি জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যায়; বাতাস হঠাৎ দাপাদাপি করে উঠে শান্ত হয়ে যায়; ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে লোকেরা এখন বাড়ির দিকে যায়। তাহের আশা করে ঘরমুখো লোকেদের মধ্যে সে টিকিট মাস্টারকে আবার দেখতে পাবে; ভাল করে তাকায় প্রত্যেকের মুখের দিকে, কিন্তু তাকে আর দেখা যায় না। কিছুকাল আগে তরুণের সঙ্গে সে যে কথাবার্তায় অংশ নিয়েছিল, এখন সেই জটিলতা তাহেরের মনের মধ্যে অমোচনীয় হয়ে দেখা যায়। অবিলম্বে তার ধারণা হয়, চিন্তা করছিল বলেই বিভ্রম দেখছে; কিন্তু না, সেই তরুণ এখন তার নিকটেই সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায় নি; দাঁড়িয়ে আছে, এবং হঠাৎ তাকে একা মনে হলেও অচিরে সে অনুভব করে দূরে আরো যে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে মিষ্টির আলমারি ঘেঁসে তারাও একই উদ্দেশ্যে উপস্থিত ও স্থির। কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য তাহের কল্পনা করতে পারে না; সে একবার একে, একবার তাকে দেখে নেয়, একবার চায়ে চুমুক দেয়, আবার চোখ তোলে। তারা দাঁড়িয়ে আছে, স্থির এবং স্তব্ধ। তাহেরের হাত অজান্তেই তার সুটকেশের দিকে যায়, সেটি সে নিজের কাছে সামান্য খানিক টেনে আনে, যেন প্রমাণ দেবার প্রয়োজন আছে যে আসলেই এর মালিক সে। তরুণ এবার আরো এগিয়ে আসে তার কাছে, কিন্তু তাকে কিছু বলবার আগে

সে ফিরে তাকায় অনুচর দু'জনের দিকে, এবং তারাও এবার এগিয়ে আসে, তবে তরুণ থেকে তারা দূরত্ব বজায় রাখে অবিকল আগের মতোই। তরুণের চোখে মুখে তাহের সেই দীপ্তি দেখতে পায় যা থেকে নেতাকে সনাক্ত করে নেয়া যায় সহজে। তরুণ তার সমুখে এসে নিঃশব্দ হাসিমুখে উল্টো দিকের বেঞ্চে বসে, হাত দিয়ে ইশারা করবার পর তার সঙ্গীরাও ঘনিষ্ঠ হয়, তারা পরের বেঞ্চে বসে পড়ে। তরুণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহেরের যা একটি অনন্তকাল বলে বোধ হয়। তখন তাহেরই প্রথম সরব হয়; সে প্রশ্ন করে, আপনারা কি এখানকারই লোক ? তরুণ সাবলীলভাবে প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি ? এখন, এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে একাধিক। তরুণ কি তার নাম জানতে চায় ? কিংবা পরিচয় ? অথবা, শুধু এখানকারই সে কিনা তার একটি বিবরণ ? এবং এটাও হতে পারে যে প্রশ্নটি আসলে এক সমর্থন প্রত্যাশী উক্তি, যেমন, আপনি কি তবে সেই লোক যিনি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহের স্থির করতে পারে না প্রশ্নের কোন অভিধা ধরে নিয়ে সে উত্তর দেবে, ফলে সে নীরব থাকে। স্পষ্টতই, এ নীরবতা তরুণের মনঃপুত হয় না; অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্নটি সে আবার করে এবং উচ্চগ্রামে। তাহের লক্ষ করে, একটু আগের সেই হাসিটি তরুণের মুখ থেকে এখন সর্বাংশে অন্তর্হিত। তরুণের স্বর এবং মুখমণ্ডলের পরিবর্তন তাহেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে, বিহ্বল করে রাখে, এবং এবারেও সে উত্তর জোগাতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু, একটি জরুরি পরিবর্তন আসে তার নিজের মুখভাবে। সেখানে অস্পষ্ট হাসির আবির্ভাব ঘটে; অনেকটা যেন দলছুট পতঙ্গের মত হাসিটি স্থান বদল করে তরুণের ক্ষেত্র ছেড়ে তার ক্ষেত্রে এসে বসে। তার এই অভিব্যক্তির সঙ্গে কোনো যোগ আছে কিনা বোঝা যায় না, নেতা তরুণের দুই অনুচর সঙ্গে সঙ্গে আরো ঘনিয়ে বসে, বসে এবার তার উল্টো দিকেই। তিনজন পরস্পর গূঢ় দৃষ্টি বিনিময় করে, একসঙ্গে তারা সুটকেশের দিকে তাকায়, আবার তার দিকে তাকায়, আবার নিজেদের ভেতরে দৃষ্টি বিনিময় করে। তাহের তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে; সে টের পায় ঘটনার লাগাম তার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। অতএব সে এক দণ্ডে পরিচয় এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দ্রুতকণ্ঠে জানায় যে তার নাম তাহেরউদ্দিন খন্দকার, এ সুটকেশ তার নিজের এবং তার জন্ম হয়েছিল এখানেই। তার নাম বা সুটকেশের মালিকানা শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করে না। একসঙ্গে তিনজনই বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করে, এখানে মানে এই জলেশ্বরীতে ? তাহের চোখ বন্ধ করবার ভঙ্গি সৃষ্টি করে সম্মতিসূচক মাথা দোলায় এবং স্মিতমুখে যোগ করে যে সে ঘটনা আজ থেকে উনচল্লিশ বছর আগে। মনে মনে সে লক্ষ না করে পারে না যে এই তরুণদের জন্ম তখন দূরের কথা এদের মায়েরাই তখন হয়ত পৃথিবীতে আসে নি অথবা এলেও হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু তরুণ মাত্রেই যে একটি বিষয়ে ঘোর অরুচি ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে থাকে তা হলো তাদের জন্ম পূর্ব সময় সংক্রান্ত কোনো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উত্থাপন। অতএব তাহের এখন মুখের অতিরিক্ত প্রসন্নতাটুকু মুছে ফেলে নিতান্ত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। ক্ষণকাল এতে সে ব্যস্ত থাকায় লক্ষ করে না যে তরুণেরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে নিচু পর্দায়। সে মনোযোগ দিতেই তারা চুপ করে যায়; পরে অনুচরদের একজন মাথা নেড়ে অস্ফুটস্বরে জানায় যে তারা এখানকারই ছেলে, চিরকাল এখানেই তারা আছে, তারা নিশ্চিত যে খন্দকার বলে কোনো পরিবার গোটা জলেশ্বরীতে কেন, তার ধারে কাছেও নেই এবং কখনো ছিল না। বাকি দু'জন নীরবে তার সঙ্গে একমত হয়। বাহুল্য হলেও একই কথা

তারা আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণও করে এবং নতুন কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে তাহেরের মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। তাহের ব্যাখ্যা দিতে যাবে এমন সময় দোকানের মালিক সেই মধ্যবয়সী ঘুমন্ত ভদ্রলোক 'এই যে ক্যাপ্টেন ভাই' বলে সটান কাছে চলে আসে এবং অত্যন্ত বশংবদ গোছের নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ঘটনা কী জানতে চায়। তাহের অনুমান করে, নেতা তরুণই উদ্দিষ্ট ক্যাপ্টেন ভাই। সামরিক বাহিনীর কড়া নিয়ম দুরন্ত সিঁড়ি বেয়ে যে এ উপাধি আসে নি তা ব্যক্তিটির উপস্থিত ব্যক্তিত্ব থেকেই স্পষ্ট। বরং যে আভাস লক্ষ করা যায় তাতে মনে না হয়ে পারে না যে এ উপাধি অর্জনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, অনুষ্ঠান-বহির্ভূত এবং চমকপ্রদ; অথবা পথের পাশে বৃক্ষের মতই স্বাভাবিক তার অভ্যুদয়। তাহের অবিলম্বে তার শ্রোতাদের সাধারণভাবে, বিশেষভাবে ক্যাপ্টেনকে, জানায় যে তার বাবার ছিল বদলির চাকুরি, সেইসূত্রে এখানে সাবরেজিস্টারি আপিসে তিনি বছর কয়েক ছিলেন, সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগের কথা, তখন এই জলেশ্বরীতেই তার জন্ম হয়, পরে সে ঢাকায় যায় এবং সেই শৈশবের পরে আর কখনো সে এই উত্তর অঞ্চলে আসে নি। তার বক্তব্য অখণ্ড এক নীরবতার সূত্রপাত করে। নতুন গামছা পরা সেই কর্মীটি কখন এসে শ্রোতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে কিন্তু মালিকের রুষ্ট দৃষ্টিপাতমাত্র তাকে চলে যেতে হয়; সে চলে যায় এবং সশব্দে বাসন-গেলাশ ধুতে থাকে; শব্দের এই অতিরেক যে তার ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না। দোকানের মালিকের কপালে মুহূর্তের জন্যে রেখাপাত ঘটে; কিন্তু সে সিদ্ধান্ত করে, না, কিছু বলা নয়। শব্দ আগের মত হতে থাকে। তাহেরের বক্তব্য শেষের নীরবতা কেবল ঐ ঠকাস-ঠন ধ্বনি ছাড়া আর কিছুতেই বিঘ্নিত হয় না। ক্যাপ্টেন ইত্যবসরে চোখ বুজে মনের মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে মীমাংসা রচনায় ব্যস্ত থাকে, তার অনুচর দু'জন উসখুস করে, দোকানের মালিকের মুখ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ক্রমশ একপ্রকার উজ্জ্বলতা পেতে থাকে। সে, দোকানি, ক্যাপ্টেনের কাঁধে সন্তর্পণে হাত রাখে, ক্যাপ্টেন ধ্যানক্ষান্ত চোখে জিজ্ঞাসা সমেত তার দিকে তাকায়, দোকানি তখন তাকে এবং তাহেরকে একই সঙ্গে উদ্দেশ করে বলে যে ষোলই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর বিহারিরা বস্তুতপক্ষে বহুরূপী হয়ে উঠেছে; ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা যে বাংলা ভাষা এই বিশ বছর বলে নি, বলতে পারে না বলে ভান করেছে, এখন তারা চমৎকার বাংলা বলছে এবং এই একটি সূত্রেই প্রমাণসিদ্ধ হয়ে যায় যে বিহারিদের মনে চাতুরির বিস্তার কতদূর পর্যন্ত, আসলে তারা, বিহারিরা, বাংলাদেশের আত্যন্তিক জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে এখন বিভিন্ন রন্ধ্রে মাথা গলিয়ে ফিরে আসছে; উদ্দেশ্য, আপন বাড়িঘর সহায়-সম্পত্তি উদ্ধার করা। দোকানির এ বক্তব্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে তাহেরকে সে ঐ বহুরূপীদের একজন বলেই সনাক্ত করছে; কেবল যেটুকু সন্দেহ তাকে এখনো দোদুল্যমান রাখে তা হলো কার সম্পত্তির উদ্ধারকারী হয়ে সে এখানে আজ উপস্থিত। ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে; সে ভঙ্গিতে দোকানির বক্তব্যের প্রতি সমর্থন কিংবা সন্দেহ প্রকাশ পায়, স্পষ্ট বোঝা যায় না। ক্যাপ্টেন তাহেরের দিকে সম্পূর্ণ বিস্ফারিত চোখে তাকায়। দোকানি এতে উৎসাহিত বোধ করে; টেবিলে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সে জানতে চায়, আসলে তাহেরের বাড়ি কোথায় এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে সে তারস্বরে ঘোষণা করে যে তাহের অবশ্যই আবদুস সালাম মজঃফরপুরীর সাবান ফ্যাক্টরির দখল নিতে এসেছে, কারণ উক্ত বিহারিই ছিল এই জলেশ্বরীতে সবচেয়ে ধনবান এবং মজঃফরপুরী যে ছলেবলে তার সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা

করছে না এ কথা উন্মাদেও বিশ্বাস করবে না। দোকানি ধমক দিয়ে জানতে চায়, উক্ত মজঃফরপুরী এখন কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে অবিলম্বে তা জানা প্রয়োজন, কারণ, তারই সাক্ষাৎ প্ররোচনা এবং নির্দেশনায় জলেশ্বরী বাজারের বাঙালি এগারজন গালা-মালের কারবারিকে মিলিটারি ধরে নিয়ে যায় স্কুলবাড়িতে; সেখান থেকে তারা আর ফেরে নি, ইস্কুলবাড়ির কোনো কোনো দেয়াল ও থামে ঘন কালো দাগ, যা রক্তেরই হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। স্কুলবাড়ির উল্লেখে তাহের হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার এ চাঞ্চল্য দোকানি বা ক্যাপ্টেন কারো নজর এড়ায় না; দোকানি তার হাত খপ করে ধরে ফেলে, অনুচর দু'জন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ক্যাপ্টেনের পকেট থেকে পিস্তল বেরিয়ে পড়ে চোখের পলকে। তাহের তখন হেসে ওঠে; পরমুহূর্তে সে আবিষ্কার করে যে ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়, তাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন তারা কাজ ফেলে রাখবার লোক নয়; সে হাসি থামায়, অস্ফুট স্বরে ক্ষমা চায় এবং বলে যে তার আগেই জানান উচিত ছিল, ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি নিয়েই তার এখানে আসা; মহকুমা হাকিম যিনি এই ইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি তিনি স্বয়ং তার সাক্ষাৎকার নেন ঢাকায় এবং নিয়োগপত্র দেন, সেটি তার সুটকেশেই আছে। তার এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত একটি স্তব্ধতার জন্ম হয়। অনুচর দু'জন প্রকাশ্যেই হতাশ ভঙ্গি করে বসে পড়ে, দোকানির কী একটা কাজ মনে পড়ে যেতে 'আসছি' বলে উধাও হয়ে যায় এবং বাসন ধুতে অনাবশ্যক শব্দ করবার জন্যে সে নতুন গামছা পরা কর্মীটির গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন তার পিস্তল লুকোয় না, সে সন্তর্পণে এবং সবার দৃষ্টিগোচরভাবে টেবিলে রেখে দেয়। তারপর তাহেরের মুখের দিকে তিনজনই একবার ভাল করে তাকায়, সুটকেশটিও একবার দেখে নেয় তারা, যেন ওখানে কোনো সমর্থন আবিষ্কার দৃষ্টিপাত মাত্র সম্ভব। অবিলম্বে প্রত্যেকেই চিন্তামগ্ন হয়। অনতিপরে ক্যাপ্টেনকে দেখা যায় জলতল ভেদ করে সে উঠে এলো। সে তার উপাধির সার্থকতা প্রমাণ করে তিনজনের ভেতর প্রথম সে নিজে সজীব হয়ে ওঠে। বিলম্বিত সহাস্যে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন এখন জানায়, হ্যাঁ, অবশ্যই তার জানা ছিল যে ইস্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক ঢাকা থেকে আসছেন। এ বিষয়ে মহকুমা হাকিমের সঙ্গে যে তার গতকালই কথা হয়েছে এটা জানাতেও সে ভোলে না। হঠাৎ অনাবশ্যক উঁচুগলায় সে চার গেলাশ চায়ের হুকুম করে এবং নিঃশব্দে এবার পিস্তলটি পকেটে পুরে তাহেরের দিকে তাকিয়ে সংক্ষিপ্ত এক অর্থহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। তারপর আচমকা উষ্মায় ফেটে পড়ে সে মহকুমা হাকিমের আদ্যন্ত করে এই মর্মে যে গতকাল দেখা হলেও তিনি দয়া করে এটা জানাতে ভুলে গেছেন যে শিক্ষক আসছেন আজ সন্ধের গাড়িতেই। অতঃপর ক্যাপ্টেন দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে এবং জানায়, সরকারি কর্মচারীদের এ হেন গাফিলতি নতুন নয়, এই সেদিন এক শাদা সাহেব এলেন মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তুলতে, তিনি আসবেন সে কথা জানা সত্ত্বেও মহকুমা হাকিম মুক্তিযোদ্ধাদের জানাতে কষ্ট স্বীকার করেন নি, ফলে যা হবার তাই হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকাতে তাদের চট করে একত্র করা গেল না, এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই যেখানে হয় সেই মান্দারবাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো না, সাহেব কী ছবি তুললেন কে জানে, তিনি তো 'ভেরি গুড' 'ভেরি গুড' বলে চলে গেলেন, এখন ক্যাপ্টেনের হয়েছে মুশকিল, তার ছেলেরা এসে রোজ অনুযোগ

করছে ছবিতে তারা থাকতে পারল না, অথচ গুলির মুখে দাঁড়াবার সময় মহকুমা হাকিম ছিলেন কোথায় ? মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বিশেষ মহকুমা হাকিমটির কী ভূমিকা ছিল বোধহয় ক্যাপ্টেন সহসা সেই নীরব বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে যায়; অন্যমনস্কভাবে সে চায়ের গেলাশ নিয়ে ধীরে নাড়াচাড়া করে এখন। তাহের একবার মনে না করে পারে না যে জলেশ্বরীতে তার পৌঁছুবার তারিখটি নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত ছিল; কারণ, যুদ্ধের পর রেলের সময় সঙ্গত কারণেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, এমনকি গাড়িটি গন্তব্যে পৌঁছুবে কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই; তাহেরকে তো দু'দুটো ব্রীজ পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে এবং তিস্তা জংশনে জলেশ্বরীর গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে ঝাড়া ষোল ঘণ্টা। কিন্তু সে বিবরণে তাহের এখন যেতে চায় না। অবিলম্বে সে কোনো হোটেলের সন্ধান চায় যেখানে আজ রাতের মত আশ্রয় নেয়া সম্ভব। ক্যাপ্টেন প্রথমত প্রবলভাবে অস্বীকৃত জানায়; ঘনঘন মাথা নেড়ে জানায় হোটেল বলতে এ তল্লাটে কিছু নেই, যা আছে তা হলো সাব রেজিস্টারি অফিসের আশে-পাশে ভাত খাবার কয়েকটি দোকান, সেখানে বাঁশের লম্বা মাচান বাঁধা আছে বিদেশীদের রাত কাটাবার জন্যে। ক্যাপ্টেন সেখানে রাত্রিবাস অনুমোদন করে না এখন; বরং সে দু'একটি নাম করে যাদের বৈঠকখানায় শোবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া সম্ভব। অনুগ্রহ নিতে তাহের অস্বীকার করে এবং পরিণামে তাহেরই জয়ী হয়। তারা ভাত খাবার দোকানের দিকেই অগ্রসর হয়। পথে নেমে তাহের আত্মার ভেতরে শীতল শিহরণ হঠাৎ অনুভব করে ওঠে। ঢাকায় সন্ধের পর লোক বেরোয় না আজকাল, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে গাছ-পালার সারির ভেতর দিয়ে পথ, সে পথে মানুষের সাক্ষাৎ এই প্রায় মধ্যরাতেও পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন জানায়, এই সড়কের নাম শহীদ বরকতউল্লাহ্ রোড। পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করবার আগের দিন বরকতউল্লাহ্ এখানে প্রাণ দেয়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তবু ক্যাপ্টেন হাত তুলে ইশারা করে, ঐ যে তার কবর। ক্যাপ্টেন অপ্রাসঙ্গিক একটি তথ্য সরবরাহ করে— বরকতউল্লাহ্ খুব ভাল ভাওয়াইয়া গাইত। অচিরে শহীদ বরকতউল্লাহ্ রোড চৌরাস্তায় বিলীন হয়ে যায়; তারা ডান দিনে বাঁক নেয়। ক্যাপ্টেন মৃদুস্বরে ঘোষণা করে, এখন তারা শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড দিয়ে যাচ্ছে। ইস্কুলবাড়িতে বাঙালি সেই এগারজন কারবারিকে মিলিটারি হত্যা করবার পর আনোয়ার হোসেন সেখানে গ্রেনেডসহ হামলা চালিয়ে দু'জন গার্ডকে খতম করে, পরিণামে সে ধরা পড়ে এবং তাকে হত্যা করা হয় তার দেহের একেকটি অঙ্গ ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করে। তার লাশ পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন একবার মাঝখানে কথা থামিয়ে সড়কের পাশে অন্ধকারের দিকে হাঁক দিয়ে বলে, এ-এ-রে, সব ঠিক আছে ? অন্ধকারের ভেতর থেকে তৎক্ষণাৎ কারো গলা শোনা যায়; সে কণ্ঠ আশ্বাস উচ্চারণ করে নীরব হয়ে যায়; আবার স্তব্ধতা এসে অন্ধকারকে ঢাকা দেয়। তারা পা চালায়। শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু সে পথও ফুরোয়। এবার বাম দিকে মোড় নিতে হয় তাদের। তাহের জিজ্ঞাসা করতে যাবে এ সড়কের কী নাম, তার আগেই ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, এ হলো শহীদ্ গেদুমিয়া লেন। মিলিটারিরা গেদুমিয়ার মেয়েকে ধরে নিতে এলে সে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরই একজনের বন্দুক কেড়ে নিয়ে বেয়োনেটের ঘায়ে একজনকে হত্যা করে; তারা তখন বাবা ও মেয়ে দু'জনকেই গুলি করে মারে। মেয়ের নাম ছিল চাঁদবিবি। এই যে গলির পাশেই পুকুর, এর নাম এখন চাঁদবিবির পুকুর। এই পুকুরেই

চাঁদবিবির লাশ বহুদিন পর্যন্ত ভেসে থাকতে থাকতে পচে গলে যায়। অবিলম্বে পুকুরটি দেখা যায়; অন্ধকার রাতেও কোথা থেকে আলোর অস্পষ্ট প্রতিফলন সেখানে তরলতার সংবাদ দেয়। পুকুরপাড়ে বোধ করি সুপুরির গাছ। বাতাসের ক্ষীণ সঞ্চরণ এখন জীবিতের নিঃশ্বাস পতন বলে ভ্রম হয়। ক্যাপ্টেন জানায় এই পুকুরের ওপারেই ছোট্ট একটি মাঠ আছে, সেখানে খোকাভাই ছেলেমেয়েদের গান শেখাত রোজ বিকেলবেলায়— আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি, জয় বাংলার জয়; তাদের পরিকল্পনা আছে এই মাঠে তারা খোকাভাইয়ের জন্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তুলবে। অবিলম্বে তারা পুকুর পেরিয়ে যায়। পুকুর শেষে আবার একটি সড়ক, বড় সড়ক, আড়াআড়ি উঠে আসে এখন; পায়ের নিচে ধুলোর পুরু আস্তরণ টের পাওয়া যায়, পা প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত নিঃশব্দে ডুবে যায়। ক্যাপ্টেন জানায় এ সড়কটির নাম শহীদ সিরাজ আলী রোড। অনিবার্যভাবেই ক্যাপ্টেন সিরাজ আলীর কথা উত্থাপন করে। সড়কের ওপর এক জায়গায় আছে এক কালভার্ট, ময়লা পানি সরে যাবার সরু নর্দমার ওপর; সেই কালভার্টের ওপর সিরাজ আলীকে বাজারের বিহারি রুস্তম কশাই নিজ হাতে জবাই করে। রুস্তমের দোকানের পেছনে থাকত একপাল গরু-ছাগল, জবাই করে বাজারে বিক্রির জন্যে। বাঙালিরা তেইশে মার্চ পাকিস্তানের পতাকা না উড়িয়ে যেদিন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় সেদিন রুস্তম কোনো পতাকাই ওড়ায় নি বলে সিরাজ লোকজন এনে তার সমস্ত গরু-ছাগল নিয়ে যায়। অবশ্য এটা বিপক্ষের বক্তব্য, ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গেই তা জানায়। পরে, পাকিস্তানি সৈন্যরা রংপুর থেকে জলেশ্বরীতে এসে গেলে, প্রথমেই রুস্তম কশাই সিরাজকে ধরে আনে এবং যেভাবে সিরাজ তার গরু-ছাগল জবাই করেছিল বলে তার ধারণা সেই একইভাবে তাকেও সেই একই পথে পাঠিয়ে দেয়। তার নামেই এখন এ সড়ক, শহীদ সিরাজ আলী রোড। ক্যাপ্টেন আরো জানায়, এর শেষ মাথাতেই তারা শহীদ মিনার বানিয়েছে এবং তাহের যদি ইচ্ছে করে একটু এগিয়ে তা দেখতে পারে; তবে শহীদ মিনারের আগেই বাম দিকে যে সড়ক বেরিয়ে গেছে সেটাই তাদের পৌঁছে দেবে ভাত খাবার দোকানে। তাহের ইতস্তত করে; আসলে তার বিবমিষার উদ্রেক হয়, বোধশক্তি আবিল হয়ে আসতে থাকে; চারদিকে সে জীবিতের নিঃশ্বাসের মত বাতাসের সঞ্চরণ শুনতে পায় অজস্র পাতাপত্রের ভেতর। সহসা দূরের কোনো জলধারার মত শেয়ালের নিঃসঙ্গ ডাক সৃষ্টি হয়। রাত অনেক হয়ে গেছে জাতীয় মন্তব্য উচ্চারণ করে তাহের। অচিরেই তারা ভাত খাবার দোকানে এসে পড়ে। ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে একটি স্তিমিত আলোর ইশারা পাওয়া যায়। মৃদু কণ্ঠে কারা কথা বলে। তাদের পায়ের শব্দে সে কণ্ঠ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়; স্তিমিত আলো উধাও হয় নিরন্ধ্র অন্ধকারে। একবার ভুল হয়, আসলে বোধহয় কোনো আলো ছিল না। চোখের পলকে সমস্ত কিছু নিশ্চল স্তব্ধতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন শংকিত সন্দেহের দীর্ঘ লাঙুল সরসর করে মর্ত্যে ঝুলে পড়ে; নাকের ডগায় দোলকের মত সুমিত ছন্দে পাক খায়; গ্রন্থিমোচন করে নতুনতর গ্রন্থির সূত্রপাত ঘটায়। বস্তুত, কিছু ঘটনা আছে যা ইন্দ্রিয়কে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে মানুষের গূঢ় চৈতন্যের মধ্যে বলীয়ানভাবে প্রবেশ করে; এবং নিত্য নিয়ত যাদের ওপর নির্ভর সেই ইন্দ্রিয়গুলো ঐ প্রকার নিয়মভঙ্গের দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে যায়; সংক্ষেপে, যতিহীন বিহ্বলতার জন্ম হয় গোটা অস্তিত্ব জুড়ে। তাহের ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে এসব স্পর্শ করে না আদৌ; সে তাহেরের দিকে স্মিত দৃষ্টি ফেলে জানায় যে

সময়গুণেই মানুষ এখন সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। ক্যাপ্টেন তার সিদ্ধান্ত এখন প্রকাশ করে, এতরাতে বাইরে এতগুলো লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে হোটেলের লোকেরা ভয় পেয়েছে। তাহের এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে নীরবে মাথা দুলিয়ে স্বীকার করে নেয় তা এবং হাতের সুটকেশ নামিয়ে রেখে পরবর্তী ঘটনার অপেক্ষা করে সে। আজকাল সে সমস্ত কিছুই স্বাভাবিকতার গণ্ডির ভেতরে চিহ্নিত করে তুলে রাখে; সে স্বাভাবিকতা এতই স্বচ্ছন্দ যে সে নিজের চিৎ পরিবর্তনের সংবাদও ভাল করে রাখে না। অবিলম্বে ক্যাপ্টেন হাঁক দেয়, এ-এ-এ-রে। বোঝা যায় তার কণ্ঠ জলেশ্বরীর সর্বত্র এতটা পরিচিত যে শুধু অব্যয় ধ্বনির উচ্চারণেই তাকে সনাক্ত করা যায়। ভাত খাবার দোকানের ঝাঁপ নড়ে ওঠে, অন্ধকারে আদৌ তা দেখা না গেলেও শব্দের অস্পষ্ট আভাসমাত্র প্রত্যেকে প্রত্যক্ষই করে বস্তুত। তারপর একলোক ঝাঁপের একাংশ তুলে ধরে সন্তর্পণে, জন্মগ্রহণের মত তার মাথা বেরিয়ে আসে, সে স্থিরমূর্তি আগন্তুকদের দিকে তাকায়। হঠাৎ টর্চের তীব্র আলোয় লোকটির মুখ উলঙ্গ হয়ে যায়; অনুচরদের একজনের হাতে ঐ আলোর উৎস; অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে যাবার অনুরণন বোধ হতে থাকে চারদিকে। তৎক্ষণাৎ লোকটির প্রতিক্রিয়া হয় ঝাঁপের ভেতরে পরিচিত অভ্যস্ত অন্ধকারের ভেতরে মাথা টেনে নেবার, কিন্তু সে সুযোগ সে পায় না; অথবা তাকে দেয়া হয় না। ক্যাপ্টেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পুরো ঝাঁপটাই একটানে তুলে ধরে; সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা ঝাঁপ খাড়া রাখতে হাত লাগিয়ে দাঁড়ায়। সেই খোলা পথে প্রথমে ক্যাপ্টেন, পরে ইশারা পেয়ে তাহের, ভেতরে ঢোকে। অনতিপরে অনুচরেরাও ভেতরে এসে যায়; ঝাঁপ সশব্দে পড়ে যায়; বাতাসে ক্ষণকালের জন্যে দোলা লাগে। দোকানের ভেতর টর্চের আলো এখন সন্ধানী ও সচল হয়। দু'পাশে বেড়া ঘেঁসে ঢালাও দু'টি মাচা বাঁধা, তার ওপরে সারি সারি লোক পাশ ফিরে কেউবা চিৎ হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে ঘুমের গর্তে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। টর্চের আলো তাদের ওপর দিয়ে ঘুরে যায়, স্থির হয় শেষ মাথায় গিয়ে, সেখানে দরোজা, সেটি খোলা, তার ওপারে জমাট অন্ধকার, দরোজার খোলা পথে মাছের ও আবর্জনার গলিত গন্ধ চলাচল করে; টর্চের আলো ফিরে আসে। ক্যাপ্টেন তার অনুচরের হাত থেকে টর্চ নিয়ে ঘুমন্ত লোকগুলোর ওপর স্বয়ং এবার আলো ফেলে; দু'একবার অস্থির সম্পাতের পর আলো নিশ্চল হয়ে যায়— যার ওপরে হয় সে লোকটি উপুড় হয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তাহেরের ধারণা হয়, লোকটি জ্বরে ভুগছে, অথবা শীতকাতুরে। সে না ভেবে পারে না যে এখানে এই ঠাসাঠাসি লোকের মধ্যে তার নিজের জায়গা হবে কোথায় ? নাকি, পাশে অন্য ঘর আছে ? এদিকে, ক্যাপ্টেনের হাতের টর্চ ঘুমন্ত লোকটির ওপর স্থির হয়ে থাকে; ঘুমন্ত সে, কিন্তু স্থানবিশেষে, যেমন হাসপাতাল কিংবা গোরস্তানে, তাকে মৃত বলেও ঠাহর করা অসম্ভব নয়। আসলে জীবন নিজেও জীবনের প্রমাণ নয়। দোকানের যে লোকটি ঝাঁপ তুলে ধরেছিল সে এখন খসখসে গলায় বলে যে ঘুমন্ত এই লোকটি সন্ধে থেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে, তাড়াতাড়ি এশার নামাজ পড়ে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, দীর্ঘদিন পরে ভারতের সঙ্গে পথ খুলে যাওয়ায় গ্রাম থেকে সে জলেশ্বরীতে আসে আজমীর শরিফ যাবার সুযোগ সুবিধে খোঁজ করতে; তার বহুদিনের সাধ আজমীরে খাজা বাবার রওজা মোবারকে যায়। ক্যাপ্টেন টর্চের আলো নিভিয়ে দেয়। আবার অন্ধকারে ঘরের চৌহদ্দি মুহূর্তে উধাও হয়ে বাইরের বৃহত্তর অন্ধকারের সঙ্গে সাবলীলভাবে এক হয়ে যায়। পথে কিংবা ঘরে, মানুষের অবস্থানের আর কোনো তারতম্য

থাকে না। এই অনির্দিষ্টতার ভেতরে কয়েকটি মুহূর্ত পার হয়ে যায়। এক ফোঁটা আলোর জন্যে তাহের যখন অস্থিরতা কেবল বোধ করতে থাকে তখন ফস করে আবার টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন হঠাৎ আজমীর শরিফ দর্শনপিপাসু ঘুমন্ত লোকটির ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে নেয় এবং বলবান এক ধাক্কায় তাকে উপুর থেকে চিৎ করে দিয়ে তার মুখের ওপর টর্চের আলো গুঁজে ধরে। কামানো মাথা কিন্তু সুপ্রচুর দাড়ি-গোঁফ মণ্ডিত শীর্ণ একটি মুখ, চোখ তখনো মুদিত, প্রকাশিত হয়; আর একই সঙ্গে অনুচর দু'জন ঘরের দুই প্রবেশপথে গিয়ে নিঃশব্দে পাহারা বসায়। নাট্যশালায় দর্শকের চোখে যা আকস্মিক, অভিনেতৃর কাছে তা ঘটনার অনন্য স্বচ্ছন্দ বিবর্তন মাত্র। বস্তুত, জীবন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সংঘটিত কোনো নাটক দেখছে বলে তাহেরের এখন ধারণা হয়। অচিরে বাঁশের ঢালাও মাচায় দু'একটি সংক্ষিপ্ত ও সাবধানী মচধ্বনি শোনা যায়; কেউ কেউ যে জেগে উঠেছে তা আর গোপন থাকে না। ক্যাপ্টেন আজমীর-পিপাসু মুদিত-চোখ লোকটির দু'গালে মৃদু চাপড় দেয় তাকে সজাগ করতে, কিন্তু ফল হয় না। তখন সে লোকটিকে কাঁধ ধরে টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে দেয়। এবং তার হাতের আলো একই উত্তেজনার সঙ্গে আবার জ্বলে ওঠে। ঘুম কিংবা ঘুমের অভিনয়ে লোকটির মাথা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, কামানো মাথার বিরাট নগ্ন বর্তুলটি এখন প্রধান দ্রষ্টব্য হয়ে যায়; মুহূর্তে সে বর্তুলতা টাল খেয়ে পেছনে সরে যায়, দাড়ি গোঁফের কৃষ্ণতা চকিতে উদ্ভাসিত হয় টর্চের আলো তার মুখ থেকে লাফিয়ে একবার ঘরের চালে ছিটকে পড়ে, তারপর সব অন্ধকার হয়ে যায়। তাহেরের প্রতিবর্তীক্রিয়া হয় পেছনে সরে যাবার; সে পেছনে সরে আসে কিন্তু অপরদিকের বাঁশের মাচার তীক্ষ্ণ মুখগুলো তার পিঠ অকস্মাৎ বিদ্ধ করে, সে আর্ত অস্ফুট শব্দ করে সমুখে এগোয়। তার চারদিকে বাঁশের মাচার মচমচ আর পায়ের দ্রুত দুপদাপ, অনতিপরে এক ধ্বস্তাধ্বস্তির শ্বাসরুদ্ধকর শব্দ হয়। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা যায়; দোকানের লোকটিকে সে তীব্র স্বরে আদেশ দেয় লণ্ঠন জ্বালাবার জন্যে। লণ্ঠন সম্ভবত হাতের কাছেই ছিল; আদেশ কাজে পরিণত হতে তিলেকের বেশি সময় লাগে না। প্রশান্ত ঘুমের পর মানুষ যেমন জেগে ওঠে তেমনি বিলাস-মন্থর মৃদু আলো সবকিছুর ওপর এসে দাঁড়ায়; দূরে দূরে তরল অন্ধকারের মনোরম পাড় তৈরি হয়ে যায় এখন। দেখা যায়, দু'ধারে মাচার মাঝখানে কাঁচা সরু পথটির ওপর আজমীর-পিপাসু লোকটিকে ক্যাপ্টেনের অনুচরেরা ঠেসে ধরে রেখেছে; লোকটি স্তিমিত এবং মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে; বস্তুত, এখনো তাকে মৃতের মতই স্তম্ভিত বলে ধরে নেয়া যায়। ক্যাপ্টেন তার মুখে আবার টর্চের আলো ফেলতেই সে বেড়ালের মত চোখ বোজে। আলো হঠাৎ সরে গিয়ে নিবদ্ধ হয় দোকানের লোকটির ওপর; সেও তৎক্ষণাৎ কুড়ালের শেষ ঘায়ে কাটা জিগা গাছের মত মাটিতে ঝপ করে পড়ে যায়, কিন্তু তুলনা ঐ পর্যন্তই; সে মুহূর্তে চোখ উল্টে দেয়, বেসামাল লুঙ্গি ঠিক করে নেবার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বোধ করে না, সে তার চার হাত-পা অতিকায় কাঁকড়ার মত নাড়াতে থাকে অবিরাম। একপ্রকার গোঙানি শোনা যায় তার। হতচকিত তাহের তাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবে, ক্যাপ্টেন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। মুখের দিকে বিস্মিত চোখ তুলে তাকায় তাহের, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কয়েক মিনিট আগের সেই পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আর এক করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আরো অবাক হয়ে তাহের লক্ষ করে যে, দোকানে যারা শুয়ে ছিল প্রত্যেকেই তারা এখন জেগে উঠলেও যে যার জায়গায় আগের মতই হাত পা ছড়িয়ে পড়ে

আছে— জেলেরা যেমন নদীর তলে পেতে রাখা জালে মাঝরাতে মাছের ঘাই শুনেও পাটাতনের ওপর সজাগ স্তব্ধ পড়ে থাকে। ক্যাপ্টেন দোকানের লোকটিকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বলে। লোকটি মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় এবং হাউমাউ করে বলে ওঠে যে, সে যা শুনেছে তাইই বলেছে মাত্র, অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব বা অভিসন্ধি তার এক তিলও নেই, বলতে কী সকলেই জানে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় সে বহু লোককে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করেছে, মান্দারবাড়ির আকবর হোসেনকে একাধিকবার সে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের ডাকলে এখনো তারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সাক্ষ্য দেবে। ক্যাপ্টেন শুধু বলে, সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই, যদিও একেকটা লোককে পার করতে সে কত টাকা করে নিয়েছে তাও তার অজানা নয়। একথা শোনামাত্র দোকানের লোকটি 'দুষ্ট লোকে মন্দ বলে' জাতীয় কয়েকটি শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করে আবার মাটিতে ধপাস করে পড়ে যায়, এবার ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরতে। সেখান থেকে শেয়ালের মত তার সুদীর্ঘ হৌ-হৌ-ও শোনা যেতে থাকে। ক্যাপ্টেন পায়ের ধাক্কায় তাকে উঠতে বলে। আবার সে ফস করে উঠে দাঁড়ায়। তখন 'সে দেখা যাবে' বলে ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করে, দোকানে ক্ষুর আছে কিনা? লোকটি উত্তরে যদিও 'আছে' বলে কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষুরের স্থান কোথায় সে ঠিক নির্ণয় করতে পারছে না। অবিলম্বে হুংকার দিয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন, আর তাতেই কাজ হয়। মুহূর্তে একটা খুঁটি বেয়ে সে সরসর ওপরে উঠে যায় এবং চালের সঙ্গে বেঁধে রাখা টিনের সুটকেশ নামিয়ে আনে। তার ভেতর থেকে ক্ষুর বেরোয়। সেটি ক্যাপ্টেনের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এই প্রথম সে সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু কী ভেবে পরক্ষণেই তা পুরনো ভয়ার্ত চেহারা বার করে তার মধ্যে গোপন করে ফেলে। কেবল কণ্ঠার হাড় ঢাকা চামড়ার তলায় তার দেহবন্দি উদ্বেগ ধুকপুক করতে থাকে। ক্যাপ্টেন তার অনুচরদের একজনকে বলে ক্ষুর দিয়ে আজমীর-পিপাসুর গোঁফদাড়ি কামিয়ে আনতে। তাহের আরো একবার সপ্রশ্ন চোখে এবং খানিকটা আহত কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত একটা 'কেন' উচ্চারণ করে। তখন ক্যাপ্টেনের মুখে অনেকক্ষণ পর আবার সেই নিরুদ্বেগ স্মিতহাসি ফিরে আসে। সে দোকানের লোকটিকে বলে তাহেরকে যত্ন করতে। লোকটি বুঝে পায় না কোন আপ্যায়নে রুষ্ট দেবতা তুষ্ট হবেন। তাই সে একবার তাহেরের সুটকেশ ধরে টানাটানি করে, আবার হাত-মুখ ধোবার পানি দেবে কিনা জানতে চায়, সেই সঙ্গে এ ঘোষণাও করে যে, জলেশ্বরীতে একমাত্র তার দোকানেই পাকা পায়খানা পাবেন। পরমুহূর্তে সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, ঠিক মাগরিব নামাজের আগে যখন দাড়ি গোঁফওয়ালা ঐ লোকটি এলো তখনই তার সন্দেহ হয়েছিল, একবার ভেবেও ছিল যে জায়গা নেই বলে দেবে, কিন্তু সখেদে সে জানায়, তার মরহুম বাবা বলে গেছেন সন্ধের খদ্দের ফেরাতে নেই। এইবার সে সত্যি তিলেক হাসে এবং নিজেই এতে উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে যে, বাবা ব্রিটিশ আমলের বলে হালের খবর তার মালুম হবার কথা নয়। বাবা বলে যান আর নাই যান, এই সে কসম করছে, মাগরিব কি ফজর, অচেনা লোকের ঠাঁই তার হোটেলে আর হবে না; বলে, সে মানানসই রকমে বুক টান করে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়ায়; যেন এই ঘোষণাতেই ক্যাপ্টেনের দলগত হওয়া গেল। ক্যাপ্টেন মৃদু হাসে, পেছনের খোলা দরোজার দিকে তাকায়। সেখানে অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে নিয়ে গেছে লণ্ঠনের আলোয় ক্ষৌরি করতে। বিনা-সাবান বিনা-পানিতে সে কাজ চললেও কোনো কাতরধ্বনি শোনা যায় না। বস্তুত, নিঃশ্বাসেরও

কোনো শব্দ নেই। নাট্যমঞ্চের কথা তাহেরের আবার মনে পড়ে যায়; মঞ্চের আড়ালে পরবর্তী দৃশ্যের প্রস্তুতি নেবার নিঃশব্দে সঞ্চরণও এত নিঃশব্দ নয়। দোকানের লোকটিও আবার হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। উদ্বিগ্ন মুখে ক্যাপ্টেনের দিকে সে তাকায়, কিন্তু পেছন ফিরে দরোজার দিকে দেখতে সাহস পায় না। ক্যাপ্টেনের দিকে তার তাকিয়ে থাকা দরোজার দিকে তাকাবার অনুমতি প্রার্থনার মত দেখায়। ক্যাপ্টেন এবার উঁচুগলায় দোকানের রাত্রিবাসকারীদের উদ্দেশে ঘুমিয়ে পড়তে বলে; সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও যোগ করে যে, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, সকালে উঠে যে যার কাজে চলে যাবেন। তার গলা মিলিয়ে যাবার পর অখণ্ড এক নীরবতা নামে। দীর্ঘকাল সে নীরবতা কাটে না। তারপর এ-কোণ সে-কোণ থেকে দু'একবার মচ ধ্বনি ওঠে, বোঝা যায় বাঁশের মাচায় কেউ কেউ পাশ ফিরছে। অচিরে সে মচ ধ্বনি ক্রমাগত মচ মচ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। কারো কারো দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়। কেউ অনুচ্চস্বরে 'আল্লাহ্ গাফুরুর রহিম' বলে। আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আবার শুধু দোকানের লোকটি উদ্বিগ্ন চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। তার কণ্ঠার নিচে উন্মত্ত ধুকপুকও স্তিমিত হয়ে যায়। বাইরে আকাঙ্ক্ষিত শীতল বাতাস বয়। তার ঝাপটা এসে ঘরের ভেতর গায়ে লাগে। বুঝি আকাশের এককোণে বৃষ্টির মেঘ দেখা দেয়। দু'একটা উড়ো পাতা দোকানের বেড়ার গায়ে আছাড় খেয়ে ফরফর করে লাফায়। তারপর তাও আর শোনা যায় না। বাতাসও আর থাকে না। আবার সেই সারাদিনের গুমোট ফিরে আসে। রাত্রিবাসকারী কেউ কেউ এপাশে ওপাশে নিখোঁজ তালপাখার খোঁজ করে। পাখার ওপর অন্ধকারে হাত পড়ার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু বাতাস তারা করে না। আসলে আত্মার শীতলতা বাতাস আর ফেরে না। অবিলম্বে সিগারেটের তৃষ্ণা বোধ করে তাহের; ক্যাপ্টেনও স্মিত মুখে হাত বাড়ায়। দোকানের লোকটি ত্রস্ত উঠে দাঁড়িয়ে আগুন সরবরাহ করে; তাহের তাকেও একটা সিগারেট দিতে গেলে সে লম্বা জিভ কেটে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারের ভেতরে মাথা টেনে নেয়। ক্যাপ্টেনের প্রতি সম্ভ্রমবশতই সে এতবড় একটা ত্যাগ অবলীলাক্রমে করতে পারে। তাকে এখন দেখা না গেলেও বোঝা যায়, অতি কাছেই সে কোথাও ওত পেতে আছে পরবর্তী সেবার সুযোগের অপেক্ষায়। ক্যাপ্টেন প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে আচমকা তাহেরকে জানায়, ইস্কুল অনির্দিষ্টকাল থেকে বন্ধ, বস্তুতপক্ষে ইস্কুলটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়, মিলিটারি কয়েকবারই ইস্কুল খোলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনো ছাত্র পাওয়া যায় নি, জলেশ্বরীর ত্রিসীমাতেও উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী কোনো কিশোর কিংবা উঠতি-গোঁফ কাউকেই পাওয়া যায় নি। ক্যাপ্টেন নিঃশব্দে হাসতে থাকে; বুঝতে অসুবিধে হয় না, ছাত্র উধাও হবার পেছনে ছিল তারই হাত। হঠাৎ হাসি স্থগিত রেখে ক্যাপ্টেন নতুন তথ্য হাজির করে। মিলিটারি ইস্কুলের চারজন শিক্ষককে হত্যা করে, দু'জন শিক্ষক ভয়ে পালিয়ে যায়, তারা আর ফেরে নি, অন্য জেলা থেকে চাকুরি নিয়ে এসেছিল; আর জলেশ্বরীতে এখন একমাত্র উপস্থিত বিক্রমপুরের হেড মৌলবি সাহেব, তবে তিনি জেলখানায়। সেখানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণের কারণ অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর বিরোধী। কেউ বলে, মৌলবি সাহেব মিলিটারির পা-ধরা ছিলেন; আবার কেউ বলে দেশ স্বাধীন হবার পর, তাঁরই শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে জেলখানায় পাঠায় যেন বাইরে থেকে তিনি পৈতৃক প্রাণটা না হারান। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ নিরুদ্বেগ, উচ্চারণের গতি প্রেমালাপের মত ধীর; তাহের বিস্মিত না হয়ে পারে না। আবার সে উদ্বিগ্নও হয়, একা সে স্কুল চালাবে কী

করে ?— বিশেষ, এটা যখন উচ্চ বিদ্যালয়, অন্তত আরো দু'জন শিক্ষক চাই। ক্যাপ্টেন নীরবে ধোঁয়া ছাড়ে, নিমীলিত চোখে সিগারেট উপভোগ করে চলে, যেন এক তরুণ পণ্ডিত শিষ্যকে কঠিন সমস্যা নিয়ে প্রশ্রয়পূর্ণ ধৈর্য সহকারে দেখছে এর সমাধান সে করে কীভাবে। কিন্তু তাহেরের কাছে ইস্কুলের সমস্যার চেয়ে অবিলম্বে বড় হয়ে দেখা দেয় অন্য কিছু; তার মনোযোগ এবং কৌতূহল ধাবিত হয় দরোজার বাইরে যেখানে আজমীর-পিপাসুকে ক্ষৌরি করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। সকলেই, বিশেষ করে তাহের, উৎসুক চোখে তাকায় দরোজার দিকে। অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে ঘরে নিয়ে আসে এবং দু'দিক থেকে তারা তাকে শক্ত করে ধরে তার মুখের পাশে লণ্ঠনটা তেজি করে তুলে ধরে। মাথা তো আগেই কামানো ছিল, এখন দাড়ি গোঁফের অভাবে গোটা মুখটা কুমোর বাড়িতে তৈরি বলে মনে হয়। রক্তশূন্য হলদে সে মুখ; চোখ বিস্ফারিত এবং স্থির; বাক স্তম্ভিত। তাহের একবার তার দিকে, একবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায়; এই মুহূর্তে কী আশা করা সঙ্গত তা তার জানা নেই। দোকানের মালিক লাফ দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে এসে অত্যন্ত আগ্রহে কী বলতে চায়, ক্যাপ্টেন নীরবে তাকে হাত তুলে থামিয়ে দেয় এবং আজমীর-পিপাসুর মুখের দিকে নিঃশব্দ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন অদৃশ্য তুরপুন দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে তার মুখে গভীর এক রন্ধ্র সৃষ্টি করে চলেছে। তাহের প্রশ্ন না করে পারে না, ক্যাপ্টেন কি এই লোকটিকে সনাক্ত করতে পারছে ? হ্যাঁ-সূচক মৃদু মাথা নাড়ে ক্যাপ্টেন এবং মনের অবশিষ্ট সন্দেহটুকু বিলীন হবার অপেক্ষায় সদ্য পরিষ্কৃত মুখের দিকে সে তখনো তাকিয়ে থাকে। তাহের আবার প্রশ্ন করে, অতঃপর লোকটিকে নিয়ে কী করা হবে ? তাহেরের দিকে না তাকিয়ে ক্যাপ্টেন লোকটির ওপর চোখ ফেলে রেখেই জানায়, অবিলম্বে তার বিচার হবে। তাহের জানে না, কী তার অপরাধ, তবু ক্যাপ্টেনের উচ্চারণেই সে বুঝতে পারে, অভিযোগ গুরুতর। হয়ত সে আবারো প্রশ্ন করত লোকটির অপরাধ বিষয়ে, কিন্তু তার আগেই লোকটি এক কাণ্ড করে বসে। তার শীর্ণ দেহে এতটা শক্তি আছে আগে বোঝা যায় নি; সে এখন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে চিৎকার করে ওঠে, আমি তর বাপের মত। সে চিৎকার দোকানে লম্বমান কোনো লোকের নিদ্রার আশু আঘাত হয় না, কিংবা হলেও তারা সযত্নে তা গোপন রাখে। তখন সারা দোকানে প্রবল স্পন্দমান এক নিঃস্তব্ধতার অবতারণা হয়। ক্যাপ্টেন সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়ান এবং লোকটির গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। কাজ হয় এতেই। লোকটি সদ্য ছেঁড়া লতার মত নেতিয়ে পড়ে; ক্যাপ্টেনের ইশারায় অনুচর দু'জন আবার তাকে দু'দিক থেকে শক্ত করে ধরে বাইরে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন দোকানের মালিকের উদ্দেশে বলে, তাহেরকে বিছানা করে দিতে, এবং সতর্ক করে দেয় কোনো প্রকার অসুবিধে যেন তার না হয়। আর তাহেরকে সে বলে, আপনার তো যেতে হবে হাকিম সাহেবের কাছে ইস্কুলের চাবি নিতে, সকালে দোকানের মালিক আপনাকে যাবার পথ দেখিয়ে দেবে। ক্যাপ্টেন দরোজা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তার পেছনে পেছনে অনুচর দু'জন আজমীর-পিপাসুকে নিয়ে রওয়ানা হয়। দোকানের লোকটি দ্রুত হাতে বিছানা করে দেয় এবং নিঃশব্দে অপেক্ষা করে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। তাহের হাতের ভঙ্গিতে জানায় যে তার আর কিছু লাগবে না। সে শোবার আয়োজন করে। দোকানের লোকটি অন্ধকারে আবার মিশে যায়। সমস্ত ঘরে নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। কোথা থেকে একটা মশা আসে এবং অবিলম্বে গুঞ্জন করে ফেরে। একটু একটু শীত

করে। তাহের উঠে বসে সুটকেশ থেকে চাদর বের করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। চাদরটা মাথা পর্যন্ত টেনে নিতেই তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায় অপ্রত্যাশিত একঝলক বাতাসের মত। অচিরে বাতাসটা সরে যায়, তাহের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু আর সে ফিরে আসে না। তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাহের পাশ ফিরে শুতে যাবে এমন সময় বহুদূরে একটা শব্দ এবং তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। শব্দটা আগ্নেয়াস্ত্রের। শব্দটা তার মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু সত্যই হোক আর বিভ্রমই হোক, সে প্রবল বিচলিত বোধ করে; তার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ দ্রুত তালে চলতে থাকে; একবার সে উঠে বসে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু আর কিছু শোনা যায় না। তারপর সে যখন ঘুমের হাত ধরে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা নেয়, তখন মনে হয় অদূরে কাদের যেন অনুচ্চ কণ্ঠ। সেটাও সত্য বলে মনে হয় না তার। সে যেন শুনতে পায় ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ-স্বাক্ষর, এ-রে-এ-এ-এ। প্রান্তর পেরুনো সেই ডাক তাহেরকে এক ধাক্কায় জাগরণ থেকে ঘুমের অতলে ফেলে দেয়। সারারাতে আর একবারও সে জেগে ওঠে না। বহুকাল পরে এ রকম একটা রাত সে অতিবাহিত করে যখন ঘুম বিঘ্নিত নয়, শয্যা বিপন্ন নয়। সকালে উঠে আধ-ভাঙ্গা মনে পড়ে তার, সে একটা স্বপ্ন দেখেছিল; স্বপ্নে একটাই মাত্র স্থিরচিত্র এখন মনে পড়ে তার। জলেশ্বরীতে আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে সে যে নিম্ন বিদ্যালয়ে যেত, বিদ্যালয় ভবনটি ছিল পরিত্যক্ত একটি থিয়েটার হল, তারই অব্যবহৃত ওপরের তলায় ভাঙ্গা গ্যালারিতে সে টিফিন পিরিয়ডে বসে আছে জীবন-বাজারে হারিয়ে যাওয়া তার বন্ধু রঞ্জিত কুমার ধরের সঙ্গে, এবং চিনাবাদাম খাচ্ছে। রঞ্জিত এখন কোথায়? শয্যায় বসে মনে মনে এই নিয়ে সে আন্দোলন করে। বাঁশের চাটাই দিয়ে গড়া দরোজা ঠেলে ভেতরে আসে দোকানের লোকটি এবং হাত কচলে জিজ্ঞেস করে, তাহেরের চা চাই কিনা, তাহলে সে এক্ষুণি কাছারি পাড়ায় গিয়ে স্টল থেকে কিনে আনতে পারে, তার এখানে ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছু হয় না। তাহের তাকে নিরস্ত করে বহু কষ্টে, সে কাছারি পাড়ায় চা আনতে যাবার জন্যে ছিল বদ্ধপরিকর। তাহেরের নিষেধে সে হতাশ এবং বাকহারা হয়ে যায়। পর মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আবার। তাহলে চাট্টি গরম ভাত চাপিয়ে দিই? আপনি ততক্ষণে গোসল করে নিন; পানি তোলাই আছে এবং রোদে গরম দেয়া হয়েছে। দোকানের এই লোকটি যে তাকে এক মুহূর্ত রেহাই দিচ্ছে না, তার কারণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সে এখানে এসেছিল। ক্যাপ্টেনের কথা মনে হতেই তাহেরের মাথার ভেতর একটা কথা ছোঁ মেরে যায়। জিগ্যেস করে, কাল রাতে সত্যি সত্যি একটা গুলির শব্দ সে শুনেছিল কিনা। কথা শেষ হতেও পারে না, দোকানের লোকটি হঠাৎ পাংশু মুখে প্রবল মাথা নাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্খলিত কণ্ঠে জানায়, না, সেরকম কিছু তার কানে যায় নাই। তাহের আবারো যখন একই প্রশ্ন করে যে, আওয়াজ একটা হয়েছিল এবং সে ঘুমিয়ে ছিল না, তাই স্বপ্নে শোনা বলে ভুল করা অসম্ভব। তখন দোকানের লোকটি এক ব্যাখ্যা হাজির করে। কাছেই এক বিরাট বাঁশবন আছে; হয়ত বাতাসে কোনো পাকা বাঁশ নুয়ে গিয়ে থাকবে আর তারই ফলে ট্যাশ জাতীয় শব্দটি গুলির শব্দ বলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা ষোলআনা। 'আপনার পানি দেয়া আছে' বলে লোকটি ঢিলের মুখে মাথা বাঁচানোর ভঙ্গিতে পালিয়ে যায়। তার এই অদ্ভুত আচরণের কোনো অর্থ আপাতত সে উদ্ধার করতে পারে না; চিন্তিত মুখে সে মুখ ধোবার জন্যে বাঁশের মাচায় পাতা শয্যা থেকে নিচে মাটিতে নামে; নামতে হয় প্রায় লাফ দিয়ে, কারণ মাচাটি বুক সমান উঁচু।

বাইরে বেরিয়ে দেখে হোটেলবাসীরা পেছনের উঠানে সারি দিয়ে প্রায়-উপুড় হয়ে বসে কোরাসে প্রচণ্ড শব্দ করে গলা-জিভ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। সবাই তার দিকে একবার ফিরে তাকায় এবং কর্তব্য তখন অকস্মাৎ নীরবতার মধ্যে সম্পাদিত হতে থাকে। জীবনকে এরা ভিন্নভাষী অন্যদেশী বলবান এক প্রভু গণ্য করে এবং সেই প্রভুটির নানা জটিল মনোভাব তারা জানাবার আদৌ চেষ্টা না করে নিরুদ্যম থাকাটাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। অতএব, এরা কোনো কিছুতেই চমকিত নয়, দুঃখিতও নয়; বস্তুত, সমস্ত কিছুই এদের কাছে স্বাভাবিক। তাহের একবার ভাবে, এদের কাউকে সে জিগ্যেস করবে কাল রাতে ঐ শব্দটি সম্পর্কে। কিন্তু অচিরেই সে আশা সে ত্যাগ করে। লোকেরা ভালভাবে অঙ্গ ধুয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। তাহের প্রাতকৃত্য শেষে দোকানের লোকটির কাছে হাকিম সাহেবের ঠিকানা নিয়ে পথে নামে। সুটকেশটা রেখে যায় দোকানের জিম্মায়। লোকটি তাকে হাকিম সাহেবের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চায়; তাহের আরো একবার তাকে নিরস্ত করে। যাবার আগে বলে যায়, ক্যাপ্টেন যদি আসে তাহলে তাকে জানাতে যে সে তাকে আরো একবার দেখতে আগ্রহী। ভাত খাবার দোকান থেকে বেরিয়ে নোংরা একটা ছোট্ট মাঠ পেরুলেই শহীদ সিরাজ্ আলী সড়ক। ভোরের নির্মল আলোয় পথের ধুলো মনে হচ্ছে নরোম একটা গালিচা। মৃদুঠাণ্ডা বাতাস বইছে। একটা গরুর গাড়ি পাশের আমগাছের নিচে শিশিরসিক্ত দাঁড়িয়ে আছে; তার ছইয়ের ভেতর থেকে, আব্রু হিসেবে ঝোলান ছেঁড়া শাড়ির পর্দা তুলে পাড়াগাঁর এক বর্ষিয়সী তাকিয়ে আছে পথের দিকে। কাছারিতে সম্ভবত জমি সংক্রান্ত তার কোনো মামলা আছে। তাহেরের মনে পড়ে যায়, তার বাবা যখন এখানে সাব-রেজিস্টার ছিলেন, তখন ভোরবেলায় কাছারির সামনে এমনসব আগন্তুকের কৌতূহলী চোখ সে দেখেছে। সেই চোখগুলো মামলা-মোকদ্দমার কুটিলতা মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হয়ে এরকম ভোরের দিকে বিশ্বের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাদর গায়ে যে লোকটা দাঁতন করতে করতে অলস পায়ে কোথাও যাচ্ছিল, তাহের তাকে হাকিম সাহেবের কুঠির কথা জিজ্ঞেস করে। লোকটি দৈনন্দিন কণ্ঠে জানায়, সেদিকেই সে যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করলেই তাহের পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু কুঠিতে গিয়ে শোনা গেল, হাকিম সাহেব এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি; আর্দালি ভ্রূকুঞ্চিত করে সন্দেহ প্রকাশ করে, হাকিম সাহেব আপিসের দরকারে বাড়িতে হানা দেয়া হয়ত নাও পছন্দ করতে পারেন। নরম সুরেই সে এ সন্দেহ প্রকাশ করে; তিলমাত্র রুষ্টতা লক্ষ করা যায় না, সম্ভবত তাহেরের শহুরে পোশাক ও মার্জিত চেহারার জন্যে। তখন 'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব' বলে তাহের কুঠির বারান্দায় বহুকালের ব্যবহারে মসৃণ বেঞ্চের ওপরে বসে পড়ে এবং সিগারেট ধরায়। তার ছেলেবেলাতে এই কুঠি ছিল গোরা সৈন্যদের আস্তানা। তখন জলেশ্বরীর ইস্টিশান, পোস্টাপিস, কাছারি সর্বত্র গোরা সৈন্য মোতায়েন ছিল। কানে টেলিফোনের মত একটা যন্ত্র লাগিয়ে, পা লম্বা করে, তারা ইংরেজি বই পড়ত সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। তাহের এবং ছেলেরা দূর থেকে তাদের একদৃষ্টে দেখত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অন্যজগতের মানুষ বলে মনে হতো তাদের। এমনকি, তাহেরের মা, তিনিও দুপুরের রান্না এবং অন্যান্য কর্তব্য শেষ করে, গোসল করে, ভাত খেয়ে, জানালার পাশে এসে দাঁড়াতেন, খিড়কি একটু ফাঁক করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন গোরা সৈন্য দেখবেন বলে। মা'র ভাগ্য ভাল তিনি আগেই গত হয়েছেন, মিলিটারির অন্য একটা চেহারা দেখবার মত দুর্ভাগ্য তাঁর হয় নি। ভোরের এই বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাহের এক অলস অনাবিল প্রশান্তি গভীর খাতে

প্রবাহিত হতে দেখে। মনে হয়, সমুখে সময় অনন্ত; কোনো কিছুতেই অস্থির গতিবান হবার আবশ্যকতা আর নেই। অতি সম্প্রতি তার জীবনে যা ঘটেছে, তাও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে তার চেতনা থেকে। তাহের নিজেকে অসাধারণ রকমে প্রস্তুত বোধ করে আগামীর জন্যে। তবে, স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, সেটা মনে পড়ে দূর থেকে দেখা ছবির মত, স্থির একটা ছবির মত, ব্যক্তিগত একটা সম্পত্তির মত। ঢাকায়, তার বাসায় মিলিটারি এসেছিল, যে ইস্কুলে সে শিক্ষকতা করত সেখানে বাংলাদেশের পতাকা কেন ওড়ান হয়েছিল, কারা উড়িয়েছিল, সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে। কিন্তু অচিরেই বেপথু হয়, তারা আকৃষ্ট হয় তার স্ত্রীর দিকে; অথবা, যেহেতু তারা ধারণা করেছিল, সে সত্য কথা বলছে না, তাই চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে মনোযোগ দিয়েছিল তার স্ত্রীর দিকে। অচিরে, তার স্ত্রীকে তারা ধর্ষণ করে এবং বাসা থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না জাতীয় ধমক দিয়ে চলে যায়। স্ত্রীর জন্যে সে তখন ঔষুধ আনতে বেরোয়, এবং ঘণ্টা দু'য়েক পরে ওষুধ কোথাও না পেয়ে বাসায় ফিরে দেখে, স্ত্রী ছাদে বিজলি-পাখার আংটা থেকে পরনের শাড়ি গলায় ঝুলে আছে। ভোরের আকাশে এখন সন্ধানী আলোর মত উজ্জ্বল রশ্মি বিকিরিত হয়; হাতের সিগারেট শেষ হয়ে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে তাহের আরো একটি ধরায় এবং সযত্নে সচেতনভাবে পরিপার্শ্বের দিকে মনোযোগী হবার চেষ্টা নেয়। আর্দালিটি অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে; হয়ত তাকে চোখে-চোখে রাখবার জন্যে, হয়ত নিতান্তই কৌতূহলবশত নবাগত মানুষটিকে সে দেখে চলে। তাহের তাকে জিজ্ঞেস করে যে হাকিম সাহেব সাধারণত ঘুম থেকে ওঠেন কখন ? 'তার কোনো ঠিক নাই' বলে আর্দালিটি আবার স্মিতমুখে তাকিয়ে থাকে। তখন তাহের উঠে দাঁড়ায় এবং বারান্দায় পায়চারি করে; ক্রমে তার পদচারণার গতি দ্রুততর হয়, শেষ পর্যন্ত তা কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার মহড়ার রূপ ধারণ করে। এতে সে এতটাই নিবিষ্ট ছিল যে কখন কয়েকজন কৌতূহলী লোক অদূরে সমবেত হয়েছে তা চোখে পড়ে না; যখন পড়ে, তখন সে হঠাৎ থামে, কী-করছিল তা উপলব্ধি করতে পেরে ঈষৎ অপ্রতিভ হয়, ফিরে যায় বেঞ্চে এবং অবিলম্বে বসে পড়ে। সেদিন সন্ধে থেকে কারফিউ ছিল, তাই সে রাতে স্ত্রীকে দাফন করা যায় নি; দাফন হয় পরদিন দুপুরে। দুপুরে ইলশেগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল এবং একই সঙ্গে রোদ ছিল। বুড়ো একটা লোক বেঞ্চে তাহেরের পাশে বসে পড়ে, ক্ষণকাল উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জানতে চায়, সে ঢাকা থেকে আসছে কি না ? তাহলে তার কাছ থেকে জরুরি কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, একথা কি সত্য যে, এদেশ এখন পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে ?— একথা কি সত্য যে, এদেশের সমস্ত সোনাদানা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে ?— একথা কি সত্য যে, শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্যে আর ছুটি পাওয়া যাবে না ?— এ কথা কি সত্য যে, হিন্দুরা অচিরেই ফেরত আসছে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির দখল নিতে ? বুড়ো লোকটি প্রবলবেগে কাশতে কাশতে জানায় যে, ১৯৫০ সালে কয়েক বিঘা জমি সে নগদ টাকায় রেজিস্ট্রি করেই জনৈক হিন্দু পাট-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিল। এখন যদি সে ফিরে আসে তাহলে তো সম্পত্তি তাকে ফেরত দিতেই হবে, যা দিনকাল, হয়ত জোর করেই কেড়ে নিয়েছিল বলে দু'পাঁচ বছর জেলও হয়ে যেতে পারে। বুড়ো লোকটি সত্যি সত্যি ভীষণ ভাবিত হয়ে পড়ে এবং সম্ভবত জেল-বাসের সম্ভাবনায় আবার তার প্রাভাতিক কাশিটা প্রবল বেগে ফিরে আসে। আর্দালিটি হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে; মুহূর্তে মুখের স্মিত হাসিটি নিঃশেষে মুছে ফেলে সে এক প্রকার

কাঠিন্য সেখানে আমদানি করে এবং সটান হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ো লোকটি নিমেষে বারান্দা দিয়ে নেমে যায় নিঃশব্দে; তাকে দূরে থাক তার কাশির ক্ষীণতম শব্দেরও আর সন্ধান পাওয়া যায় না। হাকিম সাহেব 'আরে, আপনি এসে গেছেন' বলে তাহেরের সামনে এসে দাঁড়ান। দ্রুত কুশল সংবাদ নেবার পর তিনি আর্দালিকে হুকুম দেন 'বাজে লোকের ভিড় যেন না হয়' এবং তাহেরকে ইশারা করেন অনুসরণ করতে। অচিরে তারা কুঠির পেছনে মজা পুকুরের পাড়ে এসে উপস্থিত হয়। পাড় ঘেঁসে সুপুরি গাছ, বয়োবৃদ্ধ গাছের সার, তাতে আর ফল ধরে না, নিশানবিহীন দণ্ডের মত তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে। হাকিম সাহেব, স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রতি প্রভাতে এখানে মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে বেড়িয়ে থাকেন। ঢাকায় তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, নগরীর ভিড় ব্যস্ততা এবং রাজকর্মচারীদের স্রোতে অসহায়ভাবে তাড়িত উৎক্ষিপ্ত একটি বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা; এখন এই জলেশ্বরীতে তাঁকে দেখায় মরাখালে বিলাসী বজরার মত। তাহেরের আগে আগে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, তারো চেয়ে দ্রুতগতিতে একরাশ বক্তব্য উপস্থিত করেন হাকিম সাহেব। প্রথমে তিনি তার প্রশংসা করেন, নগরী ছেড়ে এই অখ্যাত পশ্চাদপসর মহকুমা শহরে আসবার জন্যে। এ কথাও তিনি জানান যে, ব্রিটিশ আমলে বঙ্গ প্রদেশে জলেশ্বরীই ছিল সবচেয়ে পেছনের মহকুমা এবং মানুষের চেয়ে এখানে মশার সংখ্যা বহুগুণে বেশি, তার ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে ম্যালেরিয়া বাহক মশা, আর মানুষের ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে শিক্ষাবিমুখ, কর্মবিমুখ, প্রগতিবিমুখ। পরমুহূর্তে হাকিম সাহেব বক্তব্য সংশোধন করে জানান যে, কর্মবিমুখ বললে এই বোঝায় যে কর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা আছে এবং সে ধারণা থাকা সত্ত্বেও কর্ম তাদের উৎসাহিত করে না; কিন্তু জলেশ্বরীর ক্ষেত্রে মানুষেরা যে ঐ রকম কোনো ধারণা পোষণ করে তা বোধহয় সত্য নয়, বস্তুতপক্ষে, এখানকার মানুষ অজ্ঞান এবং সেটাই ন্যায্য সিদ্ধান্ত। হাকিম সাহেব সখেদে এবং এক প্রকার সহর্ষে জানান যে, ব্রিটিশ আমল থেকে বিগত সিকি শতাব্দীতেও এ অবস্থার তিলমাত্র পরিবর্তন হয় নি। আসলে, কোনো বৃদ্ধ ইংরেজ আইসিএস যদি এখানে আসেন তাহলে তিনি সেই একই জলেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাবেন। হাকিম সাহেবের কণ্ঠে যে হর্ষ তা বোধহয় এই জন্যে যে, তিনি এই পশ্চাদপসর মহকুমা শহরকে নিজের এমন এক ক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন যেখানে আত্মতুষ্টির ফসল অনায়াসেই করতে পারবেন। হাকিম সাহেব যখন তাঁকে এই মজাপুকুরের পাড়ে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, তখন, স্বীকার করতে বাধা নেই, তাহের একটু অবাক হয়েছিল; এখন সে একটু একটু বুঝতে পারে যেন, যে, এমন কিছু কথা তাঁর, হাকিম সাহেবের আছে যা নিরালায় বলবার দরকার আছে। কিন্তু কী সেই কথা ?— পরিষ্কার হয় না; হাকিম সাহেব একটি প্রশ্নেই অতঃপর নিজেকে নিযুক্ত রাখেন, আর তা হলো— তাহের কেন ঢাকা নগরী ছেড়ে জলেশ্বরীতে এসেছে ? বস্তুত, হাকিম সাহেব সাবধানী মানুষ; তিনি প্রশ্নটি সরাসরি করেন না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটির দিকে বারবার তাহেরকে দাঁড় করাতে চান। তাহের তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে ব্যগ্র বোধ করে না; স্ত্রীর চেহারা দু'একবার তার চোখের ভেতরে ফিরে আসে, সে মাথা নেড়ে তার বিলুপ্তি ঘটায় প্রতিবার; এবং সংক্ষেপে বলে, যে, আপাতত কোলাহল থেকে দূরে থাকাই তার উদ্দেশ্য। কোলাহল ? কিছুক্ষণ ভ্রু গেঁথে মাটির দিকে, মজা পুকুরের দিকে, সবুজ পানার দিকে তাকিয়ে থাকেন; বোধহয় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন— এ বিষয়ে এক্ষুণি কোনো মীমাংসার প্রয়োজন নাই। তিনি, হাকিম সাহেব, অকস্মাৎ তাহেরকে ভিন্ন একটি প্রশ্ন

করেন; তাহের কী উত্তর দেবে ভাবে, সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই তার মাথায় আসে না; শেষে বলে, যে, ঢাকায় আওয়ামী লীগের কারো সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, অতএব তার পক্ষে কথা দেয়া সম্ভব নয় হাকিম সাহেবের বিষয়ে কোনো সুপারিশ সে করতে পারবে। তাহের বিস্মিত হয়, তার মত সামান্য একজন ব্যক্তির কাছে, প্রথম পরিচয়েই হাকিম সাহেব এহেন সাহায্য কেন প্রার্থনা করে বসলেন। তাহের বিদায় নেবার সময় হাকিম সাহেবকে বলে যায়, সে আশা করে তাঁর বদলি শিগগিরই হবে। যখন সে বিদায় নিয়ে চলে আসে, হাকিম সাহেব পেছন থেকে আরেকবার জিগ্যেস করেন, তাহলে সে ইস্কুলে জয়েন করছে? হ্যাঁ, সে করছে, জয়েন করবে বলেই এসেছে। ভেবে চিন্তে কাজ করবেন, স্থানীয় টানাপোড়েনে জড়াবেন না— এ জাতীয় একটা কথা হাকিম সাহেব শেষ উপদেশ হিসেবে ছুঁড়ে দেন। তাহেরের এমত বোধ হয়, একটি লোককে সে খোদিত কবরের সমুখে দাঁড় করিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে আসে। আবার সে জলেশ্বরীর ভেতর দিয়ে হাঁটে। তার একবার মনে পড়ে, জলেশ্বরীর তীর্থস্থানটির কথা— হজরত শাহ সৈয়দ কুতুবউদ্দিনের মাজার; মাজার ঘুরে এলে মন্দ হয় না— এই ভেবে সে চৌরাস্তায় দাঁড়ায় এবং মনে করতে চেষ্টা করে মাজারটি যেন কোন রাস্তায় ছিল। অনেক ভেবেও সে ঠাহর করতে পারে না, অথচ তার যতদূর মনে পড়ে, মাজারটি শহরের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত, এই ভোরবেলায় সে তো শহরের ভেতর দিয়েই এসেছে অথচ চোখে পড়ল না কেন?— সে বিস্ময় বোধ করে; সে অগ্রসর হয়। এখন পথে আরো অনেক মানুষ, সকলেই যেতে যেতে তার প্রতি কৌতূহলী চোখ ফেলে এগিয়ে যায়, চোখের ঐ দৃষ্টির জন্যেই তাদের কারো কাছে আর জিগ্যেস করা হয়ে ওঠে না যে মাজারটি কোথায়; সে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। তার মাথার ভেতরে অকস্মাৎ হাকিম সাহেবের একটি কথা নড়েচড়ে খাড়া হয়ে ওঠে; মজা পুকুরের পাশে হাকিম সাহেব এক পর্যায়ে বলছিলেন, যে, ইস্কুল খোলার অনেক হ্যাংগাম আছে, স্থানীয় কারো মত, যে, ইস্কুল এখন খোলা না হোক। হাকিম সাহেবের কথায় এরকম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, ইস্কুল খোলার চেষ্টা নিয়ে হয়ত বিপদ ঘটতে পারে এবং বিপদটা প্রধানত তাহেরেরই। এ কথার তেমন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি বক্তার কাছ থেকে, কিন্তু তাহের নিজের কাছে স্বীকার না করে পারে না যে, তার পেটের ভেতরে তখন গুরগুর করে উঠেছিল। তাহের নিজেকেই অতঃপর মনে মনে বিদ্রূপ করে এই বলে যে, এই জন্যেই কি তুমি কুতুবউদ্দিনের মাজারে যেতে চেয়েছিলে? হাত তুলে দোয়া করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন কোনো বিপদ না হয়? তাহের নিজেকে শাসন করে— না, মাজারে সে আর যাবে না, মাজারের কথা ভাববে না, স্থানীয় দ্রষ্টব্য হিসেবে পরে কখনো না হয় যাওয়া যাবে, কিন্তু ইস্কুলের কাজ ভালভাবে শুরু হবার আগে আর মাজারের ছায়া সে মাড়াবে না। অবিলম্বে ইস্কুলে যাবে, না, শহর দেখতে বেরুবে এই নিয়ে ক্ষণকালের দোটানায় পড়ে তাহের। অবশেষে, কৌতূহল প্রবল প্রমাণিত হয়; শহরের দিকে সে পা বাড়ায়। জলেশ্বরীতে আটত্রিশ বছর আগে তার জন্ম হয়েছিল। এখানে থাকতেই তার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন এবং এখানেই করা সুপ্রচুর পাটের জমিতে মন দেন। তার বড় চার বোনের বিয়ে হয় এখানে থাকতেই এবং সে মধ্যম, একমাত্র পুত্র, তাকে ঢাকা পাঠান হয় পড়াশোনা করতে। দু'বছর আগে-পরে বাবা-মা দু'জনেরই মৃত্যু হয়। চার বোনের স্বামীরা এসে জমি বিক্রি করে দেয়। তাহের ঢাকায় থেকে যায়। তাহের নিজেই জলেশ্বরী ছাড়ে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে,

তারপর আর আসে নি। এখনো যাবার দিনটি মনে আছে। একটি শিমুল গাছে অসংখ্য ফুল ধরেছিল; চমৎকার রোদ উঠেছিল, তার মেজো বোনের স্বামীর সঙ্গে সে ঢাকাগামী ট্রেনে উঠেছিল; রণজিত ইস্টিশান পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল এবং বিদায়-উপহার হিসেবে নিজের অতিপ্রিয় একটা পকেট ছুরি, যা দিয়ে আমের সময়ে কাঁচা আম কেটে খেত সে, তাকে দিয়েছিল। তাহের চৌরাস্তায় এসে দাঁড়ায়। একটা পথ গেছে, অন্তত তার কৈশোরকালে যেত, ইস্টিশানে, আরেকটা বাজারের দিকে, অন্যটা থানা পেরিয়ে ইস্কুলের দিকে, আর চতুর্থ পথটি খানিক বাদে শহর থেকে বেরিয়ে ডাকবাংলা পাশে রেখে নেমে গেছে ধান খেতের ভেতরে দূরান্তরে, গ্রামগুলোতে। তাহের বাজারের দিকে পা বাড়ায়। অবিলম্বে তাকে যেন দু'পাশে বড় টিনের ঘর চেপে ধরে, জানালাবিহীন ঘর, তেজারতি কারবারের জন্যে প্রতিটি ঘরের সামনে বারান্দা। তখন এত ঠাসাঠাসি ছিল না বাজারের এই পথটা। কোনো কোনো ঘরের মাথায় রঙচটা সাইনবোর্ড; অমুক মার্চেন্ট, অমুক বিপণি, অমুক স্টোর। পুরনো শুধু একটা দোকানই তার চোখে পড়ে— খেলার সাজসরঞ্জাম বিক্রি হতো; ছোটবেলায় কী প্রকাণ্ড মনে হতো দোকানটাকে, এখন যেমন মলিন, তেমনি সংকুচিত মনে হয় প্লেয়ার্স মার্টকে। দোকানের মালিক ছিল খুব সৌখিন, তেল-মসৃণ কালো চিকন; নামটা মনে পড়ে না। এখন এই যিনি বাইরে দাঁড়িয়ে, মাথায় বিরল শাদা চুল নিয়ে সাবধানে দাঁতন করছেন, হয়ত তিনিই সেই লোক। তাহেরের চোখে চোখ পড়ে তার। লোকটি তাকে আধাসন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে থাকেন। তাহের মুহূর্তকাল ইতস্তত করে তার সামনে যায় এবং জিগ্যেস করে, তিনি এই দোকানের মালিক কি-না। লোকটি হ্যাঁ-সূচক মাথা দুলিয়ে, মুখ থেকে একরাশ দাঁতনের রস ফেলে জানায়, দোকান খুলতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি আছে, তার কি কিছু কেনবার প্রয়োজন আছে? ছেলেবেলায় একবার বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে সে এই দোকান থেকে একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল কিনেছিল, তারপর বাবা তাকে কানে ধরে এই দোকানে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাকে ও দোকানিকে একই হারে বকাবকি করে, ফুটবলটা ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা উদ্ধার করেছিলেন; সেই থেকে তাহের আর এ দোকানের সামনে দিয়ে কক্ষনো যেত না, নিতান্ত দরকার হলে রাস্তার অন্যপাড় দিয়ে সুট করে দৌড়ে পার হতো। লোকটির কি সে ঘটনা মনে আছে? নামটাও হঠাৎ মনে পড়ে যায়— ভদ্রমিয়া। তাহের ভদ্রমিয়াকে সাহায্য করে অতীতের দিকে তাকাতে। আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে আছে তার; আরে বাপরে বাপ, সাব-রেজিস্টার সাহেবের কথা এখনো মনে আছে তার। ভদ্রমিয়া বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাকে বসাবার জন্যে; বড় খুশি হয় তাকে দেখে। কোমরের গোছা থেকে চাবি নিয়ে অবিলম্বে দোকান খোলেন এবং চেয়ার টেনে তাকে বসতে দেন। এক পেয়ালা চা খেতেই হবে। কোনো নিষেধ না শুনে ভদ্রমিয়া তক্ষুণি দু'দোকান পরে চায়ের স্টলওয়ালাকে বিষম তাড়া দিয়ে এক কাপ চা করিয়ে নেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহেরের বাবার সুখ্যাতি করতে থাকেন। তারপর, হঠাৎ নিভে গিয়ে দুঃখ করতে থাকেন, দোকান মোটেই ভাল চলছে না গত কয়েক বছর ধরে। না খেলার সরঞ্জাম, না শিল্ড, না গ্রামোফনের রেকর্ড কিছুই বিক্রি হচ্ছে না, অন্য ব্যবসার চেষ্টা করেছিলেন, তাতেও প্রচণ্ড মার খেয়েছেন। এখন উপায়? হাত উল্টে ভদ্রমিয়া বড় ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকেন। আরো জানান, মুক্তিযুদ্ধের ন'টি মাসে তাঁকে, এই শহরের অন্যান্য সকলের সঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে হয়, ফিরে এসে দোকানে একটা মাল পান নি, এমনকি, বাবার আমলের

পুরনো দেয়াল ঘড়িটা পর্যন্ত উধাও হয়েছে। এ-সবই বিহারিদের কাণ্ড, বলে ভদ্রমিয়া তাকে জিগ্যেস করেন, সে তো ঢাকা থেকে আসছে, বিহারিদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেয়া হচ্ছে কি ? আহ এরা যা করেছে, এই বলে ভদ্রমিয়া মুহূর্তে রক্তপিপাসু হয়ে যান, দাঁতন'টা সজোরে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এদের নির্বংশ করা উচিত, এবং ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন, এই বলে দিলাম দেখে নেবেন, বিহারি বাংলাদেশে থাকলে অচিরেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে, দেশে শিয়াল-কুকুর ছাড়া মানুষ আর থাকবে না। ভদ্রমিয়া কাছে একটা চেয়ার টেনে বসেন, বলতে থাকেন এই শহর থেকে সকলের পালাবার ইতিহাস। মিলিটারি যে ঢাকায় নেমে পড়েছে তা তারা কয়েকদিন পর জানতে পারেন। স্থানীয় এম.পি. হাফেজ মোক্তার, তিনি কাউকে কোনো সংবাদ না দিয়ে নিজের ছেলেমেয়ে, ভাই-বেরাদর, টাকা-পয়সা নিয়ে একদিন উধাও হয়ে গেলেন, নিশ্চিন্তে বসে থাকলেন গিয়ে ভারতে, জলেশ্বরীর এতগুলো লোক, যাদের ভোটে তিনি পাশ করলেন, ভোটের আগে যাদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন, সেই মানুষগুলো চারদিকে এক ঝাঁক পাগলা কুকুরের মধ্যে তটস্থ হয়ে পড়ে রইল এখানে। তখন কে এসেছিল বাঁচাতে ? হাফেজ মোক্তার বা তার কোনো চেলাচামুণ্ডা নয়, এই শহরেরই কতগুলো বখাটে ছোকরা; যারা ঘন্টার পর ঘন্টা চায়ের স্টলগুলো গরম করে রাখত আর একদিন দু'দিন বাদেই রংপুর যেত সিনেমা দেখতে, তারাই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে অভয় দিল, যে যার জায়গায় থাকুন, সময় হলে আমরা আপনাদের জানাব কী করতে হবে। তারপর, একদিন রাতদুপুরে পড়ল প্রত্যেক বাড়ির দরজায় ঘা। এক্ষুণি বাইরে আসুন, সেই ছেলেরা বলছে, রংপুর থেকে মিলিটারি রওনা হয়ে গেছে, ভোরের দিকেই এসে পড়বে, সঙ্গে একটার বেশি সুটকেশ নেবেন না, হাঁটতে হবে অনেকদূর। ভদ্রমিয়া বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, পথের মোড়ে বহু লোক, তারা সবাই ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। ছেলেরা পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল রাতের অন্ধকারের ভেতরে; গোটা শহরটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল শহরের বাইরে, শহর ছাড়িয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, ধানক্ষেত ভেঙ্গে, একেবারে ব্রহ্মপুত্রের তীর বরাবার। সারারাত চলবার পর তারা মাত্র অর্ধেক পথ যেতে পারে; অনেকেরই চলবার মত শক্তি থাকে না। অনেকেই বলে, বিশেষ করে যাদের কোমরে জোর আছে, না, থামা চলবে না, থামলেই ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। ঠিক হয়, যারা হাঁটতে সক্ষম তারা এগিয়ে যাক, বাকি সবাই খানিক বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের দিকে আবার রওনা দেবে। ছেলেরা দু'দল হয়ে একদলকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আরেক দলকে দেখাশোনা করতে থাকে। কিন্তু এই পেছনে পড়ে থাকা দলটির আর এগোন হয় না। সকাল সাতটার দিকে দলে দলে জলেশ্বরীর বিহারিরা, যাদের তারা এতকাল পড়শি হিসেবে দেখে এসেছে, পাকিস্তান হবার পর তারা যখন কাটিহার হয়ে জলেশ্বরীতে আসে তখন যাদের এই জলেশ্বরীর মানুষেরা আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, সেই বিহারিরা বন্দুক-সড়কি-ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে তাদের ঘেরাও করবার জন্যে। পলাতক মানুষদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, তবে, ছেলেরা যে কিছু বন্দুক যোগাড় করেছিল, তা কারো জানা ছিল না। ছেলেরা সেই বন্দুক দিয়ে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই তাদের পরাজয় হয়, বেশ কয়েকটি ছেলে প্রাণ দেয় সে খণ্ডযুদ্ধে। বাদবাকি সবাইকে ওরা ধরে নিয়ে যায় এবং লোকদের আবার হাঁটিয়ে ফেরত নিয়ে যায় জলেশ্বরীতে। ভদ্রমিয়ার ভাগ্য ভাল, সে এই দ্বিতীয় দলে থাকলেও বিহারিদের পায়ের আওয়াজ পেয়েই গা ঢাকা

দিয়েছিলেন কাছের এক জঙ্গলে। সেখান থেকেই দেখেছেন ঐ লড়াই; দেখেছেন বিহারিদের প্রত্যেকের গলায় জরির মালা আর হাতে অস্ত্র। ভদ্রমিয়া প্রশ্ন করেন, এই বিহারিদের নিশ্চিহ্ন করাটাই কি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কর্তব্য নয় ? তাহের যাক বাজারে, দেখতে পাবে বড় বড় গুদাম পুড়ে এখনো ছাই হয়ে আছে। বাজারে তো তারা আগুন দিয়েছেই, সে আগুনে তারা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছে ব্যাপারিদের ছোট-ছোট বাচ্চাদের, জীবন্ত সব বাচ্চা বুকফাটা চিৎকার করতে করতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাজারের ঐ আগুনের মধ্যে। তাহের ভদ্রমিয়াকে জিজ্ঞেস করে, আপনি তখন কোথায় ছিলেন ? জলেশ্বরীতে ? বাধা পেয়ে ভদ্রমিয়া কিছুক্ষণ হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থাকেন, তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠেন যে, তিনি তখন ভারতে থাকলেও যারা এখানে ছিল তারাই পরবর্তীকালে এই মর্মন্তুদ কাহিনী সবাইকে বলেছে। ভদ্রমিয়া শেষবাক্য উচ্চারণের অটলতা নিয়ে জ্ঞাপন করেন যে, জলেশ্বরী এখন এক ভয়াবহ গোরস্তান ছাড়া আর কিছুই নয়। নৌকো সম্পূর্ণ ডুবে যাবার পর, বিলের বুকে আবার যে নিস্তরঙ্গতা ফিরে আসে, অবিকল তারই অনুরূপ একটা পরিবেশের ভেতর ভদ্রমিয়া নিষ্ফল দাঁড়িয়ে থাকেন। 'আবার দেখা হবে'— বলে তাহের পথে নামে। কিন্তু ভদ্রমিয়া তাকে রেহাই দেন না। তাহেরের জামার আস্তিন ধরে আবারো জানতে চান সত্যিই সে ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছে কি-না ? সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ভদ্রমিয়া ফিসফিস করে জানায়, এতকাল ইস্কুলের যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম তিনিই সরবরাহ করে এসেছেন, বছর তিনেক যাবৎ জনৈক বিহারি ব্যবসাটা হাতিয়ে নেয়; এখন যদিও বিহারিদের আর কোনো অস্তিত্ব জলেশ্বরীতে নেই, তবু ভদ্রমিয়ার আশংকা অন্য কোনো ব্যক্তি তার বদলে ইস্কুলে সরবরাহ করতে শুরু করবে, হয়ত এম.পি. হাফেজ মোক্তারের কোনো আত্মীয় কিংবা চেলা। তাহের কি এই অন্যায় প্রতিরোধ করতে পারবে না ? ভদ্রমিয়া তাকে আশ্বাস দেন যে, অন্যের চেয়ে সুলভেই তিনি মাল সরবরাহ করবেন। আরো এক পেয়ালা চা ? তাহের এগিয়ে যায়। একেবারে শেষ মাথায় বাজার। তারপরেই রাস্তাটা কাঁচা এবং সরু হয়ে গ্রামের দিকে নেমে গেছে। বাজার বসতো সকাল আর সন্ধেবেলায়। এখনো হয়ত তাই। বাজারের ভেতরে ঢোকে তাহের, আলু পটলের কিছু দোকান ইতিমধ্যেই খুলে গেছে। মাছের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকা, এখন বিপণি শূন্য, কিন্তু আঁশটে গন্ধ ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে আজো। গোয়ালন্দ থেকে রেলে করে বরফ-ঢাকা ইলিশের চালান এলে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, মনে পড়ে তাহেরের। একবার বিরাট এক গজার মাছ উঠেছিল; মাছটা যে গরুর গাড়ি করে আনতে হয়েছিল বাজারে, আর কাটতে হয়েছিল কুড়াল দিয়ে। রক্তাক্ত কুড়ালের ছবিটা এখনো তার স্পষ্ট মনে আছে। অর্থাৎ, এতকাল মনের ভেতরেই ছিল, কখনো মনে পড়ে নি, কিন্তু আজ এই জলেশ্বরী বাজারের মেছোপাড়ায় এসে দাঁড়াতেই চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল সে কুড়াল। তাহের তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে; দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে বাজার থেকে। হাঁটতে থাকে উল্টো দিকে, আবার সেই একমাত্র চৌরাস্তার দিকে। একটা রিকশা এসে পেছনে থামে তার। সে কি কোথাও যেতে চায় ? অবাক হয় তাহের, তার ছোটবেলায় এখানে রিকশা ছিল না, চরণই ছিল একমাত্র ভরসা। না, সে হেঁটেই যাবে। রিকশাওয়ালা তাকে ছাড়ে না। তার বক্তব্য, গাড়ি থাকতে কষ্ট করবেন কেন মিয়া ? রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে তাহেরের মনে হয়, লোকটি এখনো তার পেশায় অভ্যস্ত হয় নি, এখনো তার গায়ে ফসলক্ষেতের ঘ্রাণ, এখনো তার মুখে

কোনো এক ভূমিহীন কিষাণের প্রতিচ্ছবি। এমনকি সে যে রিকশা চালাচ্ছে, মনে হয়, ছিপ নৌকো বেয়ে খাল পার করছে। তাহের তার রিকশায় উঠে বসে পায়ের পরিশ্রম বাঁচাতে নয়, লোকটির সঙ্গে গল্প করতে। লোকটি সখেদে জানায়, চাষাবাস কোথায় মিয়া ? এই রিকশা সে ভাড়া নিয়েছে মহাজনের কাছ থেকে, তাকে দিতে হবে চার টাকা, তারপর যা বাঁচে তার, এর মধ্যে আবার রিকশা মেরামতির খরচ তারই ঘাড়ে; দিনান্তে যদি গোটা তিনেক টাকা পায় তো সেদিন তার রোজগার ভাল হয়েছে বিবেচনা করতে হবে। লোকটি হঠাৎ জানায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তার স্ত্রী মারা যায়। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তাহেরের কণ্ঠনালিতে এক টুকরো পাথর এসে স্থির হয়ে যায়। কোনোরকমে সে শুধু এটুকুই প্রশ্ন করতে পারে, যে, কী হয়েছিল ? রিকশাওয়ালা অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দেয় না। নৌকোর লগি ঠেলবার ভঙ্গিতে সে রিকশা বেয়ে চলে। অনতিপরে আবার সেই মধ্যরাতে শহর ছেড়ে পালাবার কাহিনী শোনা যায়। শহরের বাইরেই সে গ্রামে থাকত; পথের ওপর শত শত পায়ের শব্দ পেয়ে সে জেগে ওঠে; যখন শোনে যে মিলিটারির ভয়ে জলেশ্বরী থেকে বাঙালিরা বেরিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে ভারত যাবে বলে তখন তার আশংকা হয়, পেছনে পড়ে থাকলে তাকে হয়ত মিলিটারি এসে মেরে ফেলবে। অতএব সে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ে স্ত্রী এবং তিন শিশুকে নিয়ে। এক শিশুর ছিল জ্বর এবং উদারময়, পথে তার মৃত্যু হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পেরেছিল, তবে নদী পার হওয়া সম্ভব হয় নাই; কারণ, বাকি দুই শিশুও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় সে জনৈক গ্রামবাসীর বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়। তারা বিনা পয়সায় তাকে আশ্রয় দেয় নি, তার সঙ্গে যাবতীয় যা ছিল, সবই তুলে দিতে হয় এবং এরকম প্রতিশ্রুতিও দিতে হয় যে, গোলমাল মিটে গেলে, সে আতিথ্যের অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করবে আগামী ফসল থেকে। বস্তুত, সেই আতিথ্যের অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতেই তাকে সাব-রেজিস্ট্রি আপিসে গিয়ে লিখে দিতে হয়েছে তার একমাত্র সম্বল, সাড়ে তিনবিঘা জমি। সে না দিলেও পারত, তবু দিয়েছে, কারণ, কথা খেলাপ সে জীবনে করে নাই, দ্বিতীয় কারণ, তার স্ত্রীকেই যখন সে হারিয়েছে ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সেই গৃহস্থ বাড়িতে, তখন জমি দিয়ে আর করবে কী সে ? স্বাধীনতার পরে অনেকে তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন ভাইয়ের কাছে নালিশ করতে, তাও সে করে নাই। রিকশাওয়ালা হঠাৎ একটা সারমর্ম উপস্থিত করে— সকলেই আছে নিজের তালে। তাহের তাকে কোনো প্রশ্ন করে না, শুধু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তার স্ত্রীর মৃত্যু হলো কী করে, শুনতে। অবিলম্বে লোকটি আবার কাহিনীর খেই ধরে ফেলে। সে বলে, ব্রহ্মপুত্র তীরের সেই বাড়িতে থাকাকালীনই মিলিটারি এসে গ্রামে হাজির হয়; তারা জানতে চায় কতজন নদী পার হয়েছে, এ গ্রামে কারা কারা তাদের সাহায্য করেছে ভারতে চলে যেতে। গ্রামটি সীমান্তে অবস্থিত বলে মিলিটারি এখানে পাকাপাকি থানা গড়ে বসে; গ্রামের চারদিকে তারা তাঁবু গড়ে এবং অচিরেই নানা অদ্ভুত আকৃতির কামান-বন্দুক এনে হাজির করে তারা। সে বুঝতে পারে, এদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে ভারতের দিকে আর বেরুতে পারবে না; একমাত্র এক দিকেই সে রওনা হতে পারে, আর তা হলো জলেশ্বরীর দিকে। সে মনস্থির করে জলেশ্বরীতেই সে ফিরে যাবে; বিশেষ, মিলিটারি যখন অভয় দিয়েছে যে জলেশ্বরীতে আর কোনো ভয় নাই, বস্তুতপক্ষে, জীবন সেখানে শুধু স্বাভাবিক নয় আগের চেয়ে বরং তেজি চলছে। তারও জমিতে ফসল কাটাবার সময় হয়ে এসেছে, অতএব সে জলেশ্বরীতে ফিরে যাওয়াই

সাব্যস্ত করে। কিন্তু একথা জানাতেই গৃহস্থের মেজো ছেলে বলে ওঠে যে, তাদের যাওয়া হতে পারে না। সে এতটা জোর দিয়ে কথা বলে যে, দ্বিতীয় বার ইচ্ছাজ্ঞাপন করা যায় না। তার এ বাধা দেবার কারণও স্পষ্ট বোঝা যায় না। রাতে যখন তারা শুয়ে আছে, তখন একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনা তার মনের ভেতর উঁকি দেয়, এবং কথাটা স্ত্রীকে জানাতেই সে বলে ওঠে, তুমি পাগল হয়েছ ? তবু সন্দেহ যখন একবার উদিত হয় তখন তা সরিয়ে ফেলা দুষ্কর। তার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হতে থাকে যে, এ বাড়ির মেজো ছেলে তার স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট। পরদিন সে প্রতিটি হাবেভাবে এ সন্দেহের পক্ষে সমর্থন পেতে থাকে। রিকশাওয়ালা এ কথাও জানায় যে, বাড়ির মেজো ছেলে ছিল মিলিটারির গোপন হরকরা। পরদিন মিলিটারি বাড়িতে এসে চড়াও হয়, এবং লোকটির কথায়, সম্পূর্ণ বানান তল্লাশি চালিয়ে তার স্ত্রীকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আর সে ফেরত আসে নাই। মেজো ছেলে সর্বক্ষণ তাকে আশ্বাস দিয়ে যেত যে, সে তার স্ত্রীকে মিলিটারির হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে ধারণা করে নি যে, সে সত্য কথা বলেছে। একবার সে গ্রাম থেকে বেরুবার চেষ্টা করেছিল, সফল হয় নাই। তারপর, যুদ্ধের শেষ দিনে, যখন গ্রাম থেকে মিলিটারি পালিয়ে যায়, তখন সে তাদের আস্তানায় গিয়েছিল। আস্তানাটি ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল আপিসে। সেখানে পেছনের এক গোয়ালঘরে আবিষ্কার করা যায় এগারটি রমণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ, তার মধ্যে একজন হচ্ছে তার স্ত্রী, বাকি সবাই সে গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের নিরুদ্দিষ্ট বধূ ও কন্যা। দুই শিশুকে নিয়ে সে জলেশ্বরীতে ফিরে আসে। নির্লিপ্ত স্বরে সে জানায় যে, ঐ গৃহস্তের মেজো ছেলেসাক্ষাৎ পেলে সে তাকে হত্যা করবে; বস্তুতপক্ষে তার জীবিত থাকবার বর্তমান একমাত্র উদ্দেশ্য এই হত্যা সংঘটিত করা। তাহের জানতে চায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি আছে কোথায় ? তার কোনো সন্ধান নাই। অবিলম্বে তারা ইস্কুলের কাছে এসে পৌঁছায়। রিকশাওয়ালা বলে, তার বড় ছেলেটি বেশ বড় হয়েছে, তাকে সে ইস্কুলে দিতে চায়, যেন সে লেখাপড়া করে জলেশ্বরীর মত নরক থেকে বেরিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারে। তার এ ইচ্ছার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় তাহের। তার যতদূর জানা, এই জলেশ্বরীর মানুষেরা এতটাই মাটিকে ভালবাসে যে, তিরিশ মাইল দূরে জেলা সদর যেতেও তারা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চূড়ান্ত বিদায় নিয়ে রওনা হয়; অন্তত তার ছেলেবেলাতে এই রকমটাই সে ধারণা পেয়েছিল। আর এই রিকশাওয়ালা প্রার্থনা করেছে, তার পুত্র বড় হয়ে যেন জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যায়। লোকটির এই নির্দয় তিক্ততার সম্মুখে তাহের অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করতে পারে; বলতে গেলে বহুদিন পরে এ ধরনের অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এমনকি তার স্ত্রীর আত্মহত্যার পরেও সে ক্রোধ অনুভব করে নাই, বস্তুত কোনো কিছুই অনুভব করে নাই, যদিও বা করে থাকে, তা ক্রোধ নয়, ঘৃণা নয়, হতাশা নয়, হয়ত শুধু একপ্রকার অনিবার্যতাই সে অনুভব করেছিল। রিকশাওয়ালা জানায়, সে তার ছেলেকে নিয়ে অচিরেই একদিন ইস্কুলে আসবে। তাহের তাকে এই জরুরি সংবাদটি দেয়া এই মুহূর্তে অনাবশ্যক মনে করে যে, এই ইস্কুল বড় ছেলেদের জন্য, প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে। তাহের তাকিয়ে দেখে, ইস্কুলটি বিগত পঁচিশ বছরে কিছুমাত্র বদলায় নাই। লাল ইটের দালান; বিশুষ্ক রক্তের মতই। রঙটা এখনো ইস্কুলের সারাদেহে লেপে রয়েছে। তবে, সমুখে মাঠে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তনটি নিম্নমুখী, মাঠের অধিকাংশই এখন আগাছায় পূর্ণ এবং পথচারীর পদতাড়নায় অসংখ্যস্থলে ঘাসলুপ্ত। অথচ, এই মাঠ একদিন

ছিল সবুজ চাদরের মত, পরিচ্ছন্ন, টান-টান; দু'দিকে ছিল গোলপোস্ট, ছেলেরা রোজ বিকেলে ফুটবল খেলত, একদিকে ছিল শারীরিক কসরত করবার যুগল দণ্ড, শাদা রঙ ছিল তার। এখন সেই দণ্ড যুগল উধাও হয়েছে; গোলপোস্ট মাথায় দণ্ড দুটিও নিরুদ্দেশ; সেখানে বাঁশ বেঁধে দেয়া হয়েছে; আর এতেই বোঝা যায় যে, এখনো এ মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে থাকে। লাল দালানের পাশে ছোট একটা ঘর; ছেলেবেলায় দেখেছিল এই ঘরটির টিনের চালে ছিল লাল টকটকে রঙ, আর দেয়াল ছিল ধবধবে শাদা। এটি ছিল ইস্কুলের আপিস; ছিল তিনটি কামরা, একটি হেড মাস্টারের, মাঝের আপিস, শেষ কামরায় অন্য মাস্টাররা বসতেন। তাহেরের মনে আছে, এই ইস্কুলে সে মাত্র কয়েকমাসের জন্যে পড়েছিল, তারপরেই তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ঢাকায়। ইস্কুলের দপ্তরি ছিল, নামটা এখনো মনে আছে, অযোধ্যা, বিহার থেকে এসেছিল, দীর্ঘকাল জলেশ্বরীতে থেকে চমৎকার স্থানীয় কথা বলতে পারত সে, রাতে সুর করে রামায়ণ পড়ত, বিকেলবেলায় ইস্কুল ছুটির সময় দেখা যেত যে পেতলের থালায় সে লংকা দিয়ে ছাতু ডলছে। অযোধ্যা কি এখন আছে? ইস্কুলের দপ্তরির জন্যে পেছনে একটা শনে ছাওয়া ঘর নির্দিষ্ট ছিল। তাহের এখন সেদিকে এগোয়। ঘরটি আগের জায়গাতেই আছে, তবে, মাথায় এখন তার শনের বদলে টিন। তাহের ভাবে, অযোধ্যা বলে সে ডাক দেবে কি-না? ডাক দিতে হয় না; এক রমণী বাইরে আসছিল, তাকে দেখেই ত্রস্তে মাথায় কাপড় টেনে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যায় ভেতরে, সুপুরির ডোঙা দিয়ে বানানো বেড়ার ওপারে। তাহের কাউকে ডাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। অবিলম্বে একটি লোক বাড়ির ভেতর থেকে আসে; পরনে তার লুঙ্গি, উর্ধাঙ্গ নগ্ন, হাতে দা, ঘরে কোনো কাজ করছিল সে, তাকে আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করে, তিনিই কি নতুন হেডমাস্টার? পরিচয় পেয়ে সে জানায় যে, তার নাম পরাণ এবং সে এই ইস্কুলের দপ্তরি। তাহের তাকে প্রশ্ন করবার লোভ সামলাতে পারে না, অযোধ্যা কোথায়? পরাণ কপাল কুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করে, তারপর জানায় যে, অযোধ্যা বলে কাউকে সে চেনে না। সে আজ দশ বছর ধরে এই ইস্কুলে দপ্তরি পদে আছে, জলেশ্বরীতে তার জন্ম, অযোধ্যা বলে কোনো ব্যক্তির নাম সে কখনো শোনে নাই। সে বরং কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, অযোধ্যা কে? তাহের সে প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো উৎসাহবোধ করে না; একটি মানুষ এভাবে অপসৃত হবার এক প্রকার বেদনা তাকে ক্ষণকালের জন্যে বিচলিত করে। অনাবশ্যকভাবে সজোরে মাথা নেড়ে তাহের সে চাঞ্চল্য মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে, তারপর, পরাণকে বলে ইস্কুল খুলে দিতে। হেডমাস্টারের ঘরের বারান্দায় অলসভাবে শুয়ে আছে একটি গাই, চতুর্দিকে আজ সকালে এবং বিগত কয়েকদিনের গোবর ছড়ানো; দেখে আরো বোঝা যায়, শুধু গাই নয়, একাধিক ছাগলও এই বারান্দায় নিয়মিত বিচরণ করে থাকে, কিংবা শুয়ে শুয়ে পশু জীবনের আকাশ-পাতাল ভাবনা করে। পরাণ অত্যন্ত বিগলিত স্বরে বিনাকুণ্ঠায় নিবেদন করে যে, গাইটি তারই, তবে নিতান্তই পশু বলে স্থান-বিবেচনা-রহিত; তাছাড়া দীর্ঘকাল ইস্কুল বন্ধ বলে, এ-যাবৎ বারান্দা পরিষ্কার রাখবার আবশ্যকতাও দেখা দেয় নি। বস্তুতপক্ষে, ইস্কুল এত তাড়াতাড়ি খুলবে না বলেই তার ব্যক্তিগত ধারণা। তাহের কারণ জানতে চায়। উত্তর হয়, ছাত্র কোথায়? তাছাড়া, দেশের এই অবস্থা, ইস্কুলের চেয়েও জরুরি অনেককিছু পড়ে রয়েছে যেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রথম কর্তব্য। যথা? পরাণ হাতের গামছা দিয়ে হেডমাস্টারের জন্যে নির্দিষ্ট টেবিল ও চেয়ার থেকে ধুলোর পুরু পরত

বিদায় করবার কাজে নিয়োজিত থাকে; অবিলম্বে কোনো উত্তর দেয় না। পরে, সংক্ষেপে শুধু জানায়, ইস্কুল নিয়ে বহু গোলমাল চলছে, এর আগেও বার দুয়েক ইস্কুল খুলবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয় নাই। পরাণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে টেবিল ও চেয়ারের দিকে দেখে, তার ধারণায় যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েছে বলে সে মনে করে, তার ভ্রূ আবার মসৃণ হয়ে যায়, স্মিতমুখে সে তখন তাহেরকে নিঃশব্দে আসন নেবার আমন্ত্রণ জানায় এবং এবার সে আলমারির দিকে ধাবিত হয় সেটি পরিষ্কার করবার জন্যে। তাহের তাকে বোঝায় যে আলমারি পরিষ্কার করবার চেয়েও আশু প্রয়োজন, সমস্ত ইস্কুলটা পরিষ্কার করা; সোমবার ইস্কুল খুলবে। হেডমাস্টার হিসেবে তাহের প্রথম নির্দেশটি দেয়— সমস্ত ইস্কুল প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় যেন গোবর না থাকে। এবং সে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, ইস্কুলের মাঠের ঘাস অন্তর্হিত হবার পেছনে পরাণের গাভীটির এক অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। তাহের বলে দেয়, অতঃপর গাভীটি যেন পরাণের বাসার চৌহিদ্দিতেই থাকে। এর জবাবে পরাণ নিবেদন করে, আজকাল মানুষই শাসনে থাকে না, একটি পশু থাকবে কী প্রকারে! সেই সঙ্গে সে যোগ করে, তার গাভীর দুধ অত্যন্ত মিষ্টি এবং তাহের যদি সম্মত হয় তাহলে সুলভে তাকে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ খাঁটি দুধ এক বাটি করে রোজ বিকেলে দিতে পারে। তাহের তার কাছ থেকে আলমারির চাবি চেয়ে নেয় এবং অবিলম্বে তাকে লোকের সন্ধানে বেরুতে বলে; ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ইস্কুল পরিষ্কারের কাজ শুরু হওয়া চাই। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা সে খাতাপত্র দেখে কাটায়। বিশেষ কিছু জানা যায় না; খাতার বেশিরভাগই অনুপস্থিত; এমনকি মোট ছাত্র সংখ্যা কী, তাও ধারণা করা যায় না। হতাশ হয়ে সে মাথায় দু'হাত চেপে চোখ বুজে বসে থাকে। পরাণ এসে জানায়, লোক দু'জন পাওয়া গেছে বটে, তবে তারা কিঞ্চিৎ বেশি পয়সা দাবি করছে। এখন কর্তব্য কী ? বস্তুতপক্ষে লোক দু'জন বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে। তাহের কি তাদের সঙ্গে নিজে কথা বলে দেখতে চায় ? অবিলম্বে দুই ব্যক্তি এসে ঘরের ভেতরে দাঁড়ায় এবং বিনাবাক্যে বিনা সম্ভাষণে তারা কানখাড়া করে মাটির দিকে চোখ রেখে সংকট-কঠিন চেহারা উপস্থিত করে রাখে। তারা সোমবার সকালের ভেতরই সমস্ত ইস্কুলবাড়ি পরিষ্কার করতে রাজি আছে, বিনিময়ে একেকজন বারো টাকা করে দাবি করে। তাহের দশ টাকায় রাজি করায় এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দাও। লোক দুটি নড়ে না, পরাণের দিকে তারা সপ্রশ্ন চোখে তাকায়। পরাণ নিবেদন করে যে, তারা কিছু আগাম চায়, আগাম পেলে বাড়িতে বাজার করে দিয়ে এসে এবং নিজেরা কিছু জলপান খেয়েই কাজে লেগে যাবে। আপিস ঘরের ভেতরে একটা ছোট সিন্দুক চোখে পড়েছিল তাহেরের, সেটি নিশ্চয়ই ইস্কুলের বেতন ইত্যাদি জমা রাখবার জন্যে এবং প্রয়োজনীয় খরচ মেটাবার জন্যে। তাহের পরাণের কাছে চাবি কোথায় জানতে চায়। পরাণ জানায়, ও সিন্দুক খোলাই আছে এবং ওতে কোনো পয়সা নেই। এ ইস্কুলবাড়িতে যখন মিলিটারিদের আস্তানা বসে তখন সিন্দুকটির ভেতরে যাবতীয় যা উধাও হয়ে যায়। পরাণ আরো জানায় যে, ইস্কুলের সমস্ত খরচ প্রথমে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি হাকিম সাহেবের কাছ থেকে, তারপর তার দস্তখতওয়ালা চিরকুট স্থানীয় এম.পি. অর্থাৎ হাফেজ মোক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাতে দস্তখত করেন, আর তখন সেই চিরকুট দেখে ইস্কুলের কোষাধ্যক্ষ পয়সা দিয়ে থাকেন। এই জটিল পন্থাটি বর্ণনা করে পরাণ অত্যন্ত সন্তোষবোধ করে এবং উজ্জ্বল চোখে তাহেরকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। আসলে

তাহের কোনো সমস্যা দেখতে পায় না। হাকিম সাহেবের সঙ্গে আজ সকালেই তার যে কথা হয়েছে, তাতে এই ধারণাই সে পেয়েছে যে, ইস্কুল পরিচালনায় তাহেরের সিদ্ধান্ত ও মতামতই তিনি সর্বোপরি জ্ঞান করবেন। তাহের আপাতত নিজের পকেট থেকে চার টাকা বের করে দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ করে দেয় এবং অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিতে বলে। আবার সে ইস্কুলের খাতাপত্রে মনোযোগ দেয়। হঠাৎ তার চিন্তা অন্যদিকে ধাবিত হয় এবং খাতা থেকে চোখ তুলে আপিস ঘরটা ভাল করে তাকিয়ে দেখে। বেশ প্রশস্ত ঘর, এক পাশে আরাম করবার জন্যে পাতা রয়েছে বিশাল এক ইজি চেয়ার— তার বেতের ছাউনি বহু জায়গাতেই এখন ছিন্ন, মাথার কাছে কাঠের ফালিতে বহুদিনের তেল এবং ঘাম একপ্রকার আঠালো কালিমা লেপন করে দিয়েছে। তাহেরের মনে হয়, এই ইজি চেয়ারটির কোনো আবশ্যকতা নেই, এটিকে দূর করে দিলে, এখানেই সে বিছানা করে নিতে পারে। এবং তার থাকার জায়গার সুরাহা হয়ে যায়। অবিলম্বে সে বাইরে আসে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করে। কিন্তু পরাণ বা জন মজুর দু'জন, কারুরই সাক্ষাৎ সে পায় না। গলা তুলে সে পরাণকে ডাকে। তবে সাড়া পায় না, একবার ভাবে, পরাণের বাসায় সে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পরাণের স্ত্রী মাথায় বিরাট ঘোমটা টেনে উপস্থিত হয় এবং জানায় যে, পরাণ বাজারে গেছে, দুধ বিক্রি করতে, ফিরতে ফিরতে দুপুর পার হয়ে যাবে। জন মজুর দুটি কোথায় ? পরাণের স্ত্রীর সে কথা জানবার কোনো কারণ নেই, তবু ঈষৎ রুষ্ট তাহের তাকেই প্রশ্নটা না করে পারে না। রমণীটি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ত্রস্ত পায়ে বিদায় হয়। ইস্কুলের অপরিচ্ছন্ন বারান্দায়, ধারে-কাছে জনমানবের চিহ্নহীন বিশাল শূন্যতার মধ্যে তাহের হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর ক্রোধটা শাসন করে, প্রায় অবসন্নচিত্তে সে এসে আপিস ঘরে ঢোকে এবং ঐ ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। অচিরে তার ঘুম আসে; রাতে ভাল ঘুম হয় নাই; নানা প্রকার আকস্মিক এবং বিক্ষুব্ধ স্বপ্নের ভেতর দিয়ে রাতটা গেছে; এখন সে চেষ্টা করেও আর জাগ্রত থাকতে পারে না, ভারি পায়ে মন্থর গতিতে টেনে টেনে সে ঘুমের ঘোর রাজত্বের দিকে চলে যায়। সে যেন ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিল, প্রায় এ রকম মনে হয় সে তার শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে, গন্তব্যে পৌঁছুনোর পর তার স্ত্রী, যার মুখ মোটেও দেখা যাচ্ছে না যদিও চতুর্দিক এখন বিকেলের প্রীতিপদ আলো তার হাত ধরে টানছে। তাহের প্রথমে তার জামার আস্তিনে মৃদু একটা আকর্ষণ অনুভব করে এবং তৎক্ষণাৎ তা উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আরো নিবিড় হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা নেয়। কিন্তু আস্তিনের খুঁট ধরে আকর্ষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। স্মিতমুখে তাহের তখন চোখ মেলে তাকায় এবং মুহূর্তে বাস্তব পারিপার্শ্বের ভেতরে নিজেকে সে আবিষ্কার করে। সে দেখে সাদাকালো ছিট দেয়া একটি বাচ্চা ছাগল তার জামার আস্তিন চিবচ্ছে। লাফ দিয়ে উঠে বসে তাহের। তাকিয়ে দেখে, দূরে চৌকাঠের ওপর ছাগলের মা কাত হয়ে শুয়ে চর্বিত চর্বণ করে চলেছে। ঘড়ির দিকে তাকায়, বিকেল তিনটে দশ। অন্তত তিন ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে ছিল। সময়টা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হয় তার। বাইরে বেরিয়ে দেখে, ইস্কুল যাদের পরিষ্কার করার কথা, সেই জন মজুর দু'জনের চিহ্নমাত্র নেই; অন্যত্র দূরে থাকে, তার আপিস ঘরের বারান্দা সেই আগের মতই গোবরে ঢাকা, অতএব, তারা এ পর্যন্ত কাজে মোটেই হাত লাগায় নি। আবার সেই ক্রোধ ফিরে আসে তাহেরের মাথার ভেতরে এবং তার মুখাপেক্ষী না থেকেই ক্রোধটা আয়তন বিস্তার করতে থাকে। পরাণেরও দেখা পাওয়া যায় না। তার বাসায়

গিয়ে দ্বিতীয় বার ডেকে তার স্ত্রীকে অপ্রস্তুত করা, এবং ততধিক নিজে অপ্রস্তুত হবার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না তাহের। অবিলম্বে সে আপিস ঘরে চাবি দিয়ে বেরোয়। প্রচণ্ড ক্ষুধা সত্ত্বেও তার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না; আসলে, এক প্রকার চিত্তের একমুখিতা তাকে পেয়ে বসে। সে জলেশ্বরীর সদর রাস্তায় যায়, তার ছেলেবেলায় সড়কটির কোনো নাম ছিল না, বস্তুত সড়কটিকে কীভাবে তারা কথায় নির্দিষ্ট করত তাও তার মনে পড়ে না। এখন দেখা যায় সড়কটির শুরুতেই কাঠের ফলকে সদ্য দেয়া নাম উৎকীর্ণ করা রয়েছে বঙ্গবন্ধু সড়ক। দু'পাশে ওষুধ, কাপড়, জুতো, ট্রাক, বাসন কোসনের দোকান, চায়ের স্টল সেখানে বিকেলি চায়ের আসর ইতোমধ্যেই বসে গেছে। তাহের দ্রুত এক গেলাশ চা পান করে নেয়। স্টলের কেউ কেউ কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকায়; এমনকি অনুচ্চস্বরে এও তারা বলাবলি করে যে, সে, তাহের ব্যাংকের নতুন ম্যানেজার হিসেবে জলেশ্বরীতে এসেছে। ভুল সংশোধনের কোনো আবশ্যকতা সে দেখে না; তবে নিজেকে ব্যাংক ম্যানেজারের মত দেখাচ্ছে, এই আবিষ্কারটি তার মনোগত ক্রোধটিকে কিছুটা প্রশমিত করতে সাহায্য করে। তাহের স্টল থেকে বেরিয়ে শোবার জন্যে বিছানা-বালিশ কেনে এবং রিকশা নিয়ে গতরাতের সেই ভাত খাবার হোটেলে যায়, সেখান থেকে নিজের সুটকেসটি সংগ্রহ করে। রাতের শয্যা-ব্যবহারের জন্য সে পয়সা দিতে চায়, কিন্তু দোকানি সবিনয়ে এবং কিছু পরিমাণে সভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। দোকানি জানায় যে, ক্যাপ্টেন ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই, হলে অবশ্যই সে জানিয়ে দেবে যে, তাহের তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। ইস্কুলবাড়িতে ফিরে এসে তাহের পরাণকে দেখতে পায় নিজের শিশুপুত্রকে গাভীর পিঠে চড়িয়ে তাকে আনন্দদানের চেষ্টা করছে। অবিলম্বে তাহের তার কাছে একাধিক বিষয়ে ব্যাখ্যা চায়। পরাণ শিশুপুত্রটিকে বাসার পথে ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে নিবেদন করে, যে, জন মজুর দু'জন ইস্কুল পরিষ্কার করবার কাজ নিয়েছে দিন হিসেবে নয়, চুক্তি হিসেবে; অতএব, তারা কেন অবিলম্বে কাজ শুরু করে নাই, সে প্রশ্ন অযৌক্তিক; সোমবার সকালের মধ্যে যদি তাহের ক্রুদ্ধ হয় তাহলে সেটা সঙ্গত বলে সকল পক্ষই স্বীকার করবে। দ্বিতীয়ত, পরাণ নিজে কেন অনুপস্থিত ছিল ? তার উত্তর, ইস্কুল এখন বন্ধ, অতএব, আইনত সে ইস্কুলে হাজির থাকতে বাধ্য নয়, তাছাড়া, তাহের তাকে বলে নি যে পরাণকে এক্ষুণি দরকার হতে পারে, আর সর্বশেষ কারণ, সে যদি দুধ বিক্রি করতে বাজারে না যায় তাহলে তার পরিবার চলবে কী করে ? ইস্কুল থেকে যে মাইনে সে পায় তা দিয়ে সংসার চালান কোনো ফেরেশতারও কর্ম নয়। পরাণ বরং জানতে চায়, তাহের কি গরিবের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও স্বীকার করবার মত উদার নয় ? তাহের বারান্দায় গোবর সাবধানে এড়িয়ে আপিস ঘরে ঢোকে। পরাণের কথাগুলোতে সে ঈষৎ লজ্জিত বোধ করে এবং অকাট্য যুক্তি দেখতে পায়। তবু মনের এক কোণে খানিকটা অসন্তোষ তখনো দানা বেঁধে থাকে, তাই সে নীরবে একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে দেয়ালে বহু বছর আগে তোলা ইস্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীর বিবর্ণ ফটোগ্রাফগুলো নিস্পৃহ চোখে দেখতে থাকে। হঠাৎ, একটি ছবিতে মনে হয় অযোধ্যা রয়েছে। সে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়। একেবারে পেছনের সারিতে অযোধ্যা সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তার পাগড়ি বাঁধা, যদিও অযোধ্যাকে সে কবে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছে, মনে করতে পারে না। তাহের পরাণকে কাছে ডেকে আঙুল তুলে দেখায়, এই হচ্ছে অযোধ্যা, ইস্কুলের দপ্তরি ছিল সে এবং এর কথাই তাহের ভোরবেলা

জিগ্যেস করেছিল। পরাণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তথ্যটুকু আত্মসাৎ করে এবং পরমুহূর্তে তার চোখ কৌতূহলী হয়ে তাহেরের আনা বিছানাপত্রের দিকে ধাবিত হয়। তাহের তাকে সংক্ষেপে জানায়, যে, সে এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে চায়, সে একা, অতএব, কোনো অসুবিধেই তার হবে না। আহারাদি ? পরাণ কি তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে না ? যদি তাহের তাকে মাসিক কিছু অর্থ দেয় ? কিন্তু তাহেরের যখন পরিবার আসবে ? তার উত্তরে তাহের জানায়, সে মৃতদার এবং সন্তানহীন। মুহূর্তে পরাণ চঞ্চল এবং তৎপর হয়ে ওঠে। হয়ত তাহেরের ব্যক্তিগত এই সংবাদ তার মনে কোনো প্রকার গূঢ় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকবে। অবিলম্বে সে আপিস ঘরটি পরিষ্কার করে ফেলে, স্ত্রীকে ডেকে বারান্দার গোবর ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে লাগায়, এবং নিজে তিনটি বসবার বেঞ্চ ইস্কুল ঘর থেকে এনে দড়ি দিয়ে পাশাপাশি বেঁধে একটা চৌকি হিসেবে দাঁড় করায়, তার ওপর বিছানাটি পেতে দেয় মসৃণ করে। তারপর স্মিতমুখে নিবেদন করে, আজ রাত থেকেই কি তাহেরের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে ? তাহলে অবিলম্বেই তাকে বাজারে বেরুতে হয়। প্রবলভাবে তাহের মাথা নাড়ে। বস্তুতপক্ষে পরাণকে সে এখন আরো একবার অনুপস্থিত হতে দিতে চায় না; নিঃসঙ্গতার সম্ভাবনা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। সে জানায় আজ রাতে নিতান্ত ডালভাতই তার পক্ষে যথেষ্ট এবং যতটা না আগাম দেবার জন্যে, তার চেয়েও বেশি পরাণকে নিকটে রাখবার তাড়নায় সে পাঁচটি টাকা বের করে হাতে দেয় এবং বলে, পরে সে যেন হিসেব করে জানায় মাসে কত হলে তাকে দু'বেলা খাবার দিয়ে তার পোষাবে। পরাণ সম্ভবত স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে দ্রুত বেরিয়ে যায়, তাহের সুটকেশ খুলে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মাথার কাছে একটা পিঠা ভাঙ্গা চেয়ার টেনে তার ওপর সাজায়। পরাণ একটা কাঁসার গেলাশে খানিকটা গরম দুধ নিয়ে আসে, এবং তাকে পান করতে বলে। দুধ পান করবার অভ্যেস তাহেরের কোনোকালে নাই, বস্তুত দুধ দেখলেই তার এক প্রকার বিবমিষার উদ্রেক হয়, কিন্তু এখন পরাণের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টাতেই সম্ভবত সে দুধটুকু নিঃশেষে পান করে। পরাণ তার পায়ের কাছে বসে ইস্কুলের গল্প শুরু করে দেয়। তার নিজের লেখাপড়া হয় নাই, কিন্তু লেখাপড়া সে ভালোবাসে। গ্রামের এক মাদ্রাসায় কিছুকাল সে পড়েছিল; তার বাবা তাকে স্থানীয় মসজিদে মোয়াজ্জিনের কাজটি নিতে বলেছিলেন, কিন্তু দু'দিন পরেই কাজটি তার ভাল লাগে নাই। আসলে, সর্বক্ষণ তার নিজেকে পাপী বলে মনে হতে থাকে। এর রকম মনে হবার আদৌ কোনো কারণ আছে কি-না, তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা ওজু অবস্থায় পাক-সাফ থাকাটাও তার কাছে নিঃশ্বাস বন্ধের সামিল হয়ে পড়েছিল। তবে, আজান দিতে সে ভালবাসে এবং এখনো দিয়ে থাকে। পরাণ আরো জানায়, আল্লার কুদরত বোঝা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়, তার প্রমাণ মিলিটারির কাছে সে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, নিরীহ নিবেদিতপ্রাণ বলে প্রমাণিত হয় এবং তার ব্যক্তিগত সম্পদ কিছুই না থাকলেও, যতটুকু আছে তা মিলিটারি এবং বিহারি উভয় তরফেই লুটের হাত থেকে বেঁচে যায়। পরাণ গলা নামিয়ে সংবাদ দেয়, সংবাদটি গতরাতেই তাহের পায়, যে, এই ইস্কুল ছিল মিলিটারির কয়েদখানা, এখানেই লোক ধরে এনে তাদের ওপর অত্যাচার করা হতো এবং এই আপিস ঘর আর ইস্কুলের প্রধান দালানটির মাঝখানে যে সরু জায়গা সেখানে বন্দিদের গুলি করে হত্যা করা হতো। পরাণ অতঃপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে এবং তার সারাদেহে একমাত্র চোখে চাঞ্চল্য দেখে অনুমান করা যায় যে, নতুনতর

বিষয়ের সন্ধান এখন করে; সম্ভবত কোনো বিষয় খুঁজে পায় না, বা পেলেও তার মনমত হয় না। অবিলম্বে সে নিঃশ্বাস ফেলে তবে এই ক্রিয়াবিশেষণটি অহেতুক যোগ করে জানায় যে, তার মনে হয় না, সোমবার কোনো ইস্কুল খুললেও কোনো ছাত্র আসবে। তার এ সন্দেহের পেছনে কোনো যুক্তি সে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করে না। ফলে, বক্তব্যটি নিরবলম্ব ঝুলে থাকে এবং বিশেষ অস্বস্তিবোধ করে তাহের তথা সে বিচলিত হয়ে পড়ে। প্রায় অসহিষ্ণু কণ্ঠে সে জানতে চায় পরাণের সন্দেহের পেছনে সূত্রগুলো। উত্তর দিতে গিয়ে পরাণ নিজের বাল্যকাল আমদানি করে। তার বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি ছিল সকলেরই শ্রদ্ধাবোধ, নিজে লেখাপড়া করুক আর না-ই করুক শিক্ষিতজনের প্রতি মানুষের ছিল আন্তরিক আনুগত্য, ছাত্ররা ছিল সমাজের গচ্ছিত মূল্যবান স্বপ্নবিশেষ। কিন্তু আজ ? লেখাপড়ার চেয়ে অন্যপ্রকার শক্তি অর্জনই জীবনের পরাকাষ্ঠা বলে পরিচিত হচ্ছে; সে শক্তি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের অথবা অর্থের। তাই জলেশ্বরীর কিছু তরুণ এবং কিশোর বর্তমানে হয় কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে ক্ষুদে সামন্ত সেজে বসে আছে অথবা সীমান্ত পেরিয়ে পাটের চোরাচালানে মনোযোগ দিয়েছে। যারা এ দুয়ের কোনো দলেই ভেড়ে নি তারা বিদ্যা অর্জনের চেয়ে নকল করে পরীক্ষা পাশ করাই সহজতর মনে করছে। আসলে জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় নকলের এত প্রাদুর্ভাব হয় যে, হাকিম সাহেব পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করেন এবং সেই নিয়ে হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্যেই হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। হাফেজ মোক্তার হাকিম সাহেবদের প্রতি অভিযোগ করেন যে, তিনি বিদেশী বলেই জলেশ্বরী ছাত্র-সমাজের প্রতি মমতাহীন। শেষ পর্যন্ত দুই ব্যক্তির দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির মাঝখানে পড়ে পরীক্ষাই স্থগিত হয়ে যায়। হাফেজ মোক্তারের চাপে পড়ে সাবেক হেডমাস্টার সকল ছাত্রকে বিনা পরীক্ষায় পাশ ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং পরদিন তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যান। তাঁর যাবার দিন ইস্কুলের কতিপয় ছাত্র ছিন্ন পাদুকার মালা হাতে করে ইস্টিশানে যায় এবং তাকে বাধ্য করা হয় সেটি পরতে। অবিলম্বে সেখানে হাজির হয় ক্যাপ্টেন ভাই। সে এবং তার অনুচরেরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে, তাতেও কোনো ফল হয় না। অবশেষে ক্যাপ্টেন ভাই সমবেত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করে, তাতে চারজন ছাত্র গুরুতর রকমে আহত হয়। ক্যাপ্টেন নিজে হেডমাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাউনিয়া জংশন পর্যন্ত যায়। এবং তাকে বাহাদুরাবাদ মেলে তুলে দিয়ে জলেশ্বরীতে ফেরে। হাফেজ মোক্তার হাকিম সাহেবকে চাপ দিতে থাকেন ক্যাপ্টেনকে শাস্তি দেবার জন্যে, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে দেখা যায় শহরে মুক্ত এবং নিরুদ্বিগ্নভাবেই ঘুরে বেড়াতে। সে যাই হোক, পরাণ ধারণা করেছিল, অতঃপর আর কোনো শিক্ষক এ ইস্কুলে চাকরি নিয়ে আসবে না; তাই হাকিম সাহেব যেদিন খবর পাঠালেন যে নতুন হেডমাস্টার আসছেন, সেদিন সে ঘোর অবিশ্বাস করেছিল, বস্তুত এ নিয়ে তার স্ত্রীর সাথে কথাও হয়ে গেছে এবং তারা দু'জনেই একমত ছিল যে, কোনো শিক্ষক আসবে না, ইস্কুলও খুলবে না। তাহের মৃদু হেসে এই বাস্তব সত্যটি উপস্থিত করে যে, সে এসেছে, অতএব ইস্কুল না খোলার বা না চলার কোনো কারণ নাই। পরাণ তবু মাথা নাড়ে এবং সে ভঙ্গিতে তার মনোগত খেদ স্ফুরিত হয় অনতিপরে সে জানায় যে, সাবেক হেডমাস্টারের বিদায়ের পর সকল পিতাই এক প্রকার স্থির বিশ্বাস করেন যে অচিরেই ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ লাগবে এবং তাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ফয়সালা করার চেষ্টা করা হবে। কোনো পিতাই চায় না যে তার পুত্রটি গুলির শিকার

হোক; অতএব, এত সহজ হিসেবের কথা যে, তারা কেউই তাদের পুত্রকে পাঠাবে না। আসলে, একাধিকবার ইস্কুল খোলার ঘোষণা দিয়েও কোনো ফল হয় নাই। তাহের প্রশ্ন না করে পারে না, ইস্কুল খুললে পড়াতেন কে ? শিক্ষক কোথায় ? হাকিম সাহেব রংপুর জেলা ইস্কুল থেকে দু'জন শিক্ষক অস্থায়ীভাবে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এ ঘোষণাও করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি নিজে দু'একটা ক্লাস নেবেন যতদিন না নতুন শিক্ষক পাওয়া যায়। তাহের বুঝতে পারে, আজ সকালে হাকিম সাহেব যে কিছু অসুবিধার কথা বলেছিলেন তার স্বরূপ কী ? হাকিম সাহেবের প্রতি তার একপ্রকার শ্রদ্ধা হয়, যে, তিনি রাজকর্মচারী হয়েও, চলতি কেতার বাইরে; স্থানীয় ইস্কুল তার নির্দিষ্ট দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তিনি তার সরকারি দায়িত্বের সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। একটা খটকা লাগে তাহেরের। গতরাতে ক্যাপ্টেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হাকিম সাহেবের ভূমিকা নিয়ে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল পরাণের কাছে শোনা কাহিনীর সঙ্গে ক্যাপ্টেনের অনুমানের কোনো সঙ্গতি তাহের আপাতদৃষ্টে খুঁজে পায় না। বরং অচিরেই সমস্ত কিছু তার কাছে এক জটিল অংকের মত মনে হয়, এমনকি অসংবদ্ধ একতারা ঘটনার যথেষ্ট সমাবেশ বলে মনে হয় যাবতীয় যা সে জলেশ্বরীতে নেমে পর্যন্ত শুনেছে। তাহের মীমাংসা রচনার আশা ছেড়ে দেয়; তার মন ধাবিত হয় আশু প্রসঙ্গে। পরাণকে সে স্মরণ করিয়ে দেয় ইস্কুল পরিষ্কারের কথা। কাল অবশ্যই যেন জন-মজুর দু'জন উপস্থিত হয়, আর পরাণ যেন তাদের পাওনার চিরকুট নিয়ে হাকিম সাহেব ও হাফিজ মোক্তারের কাছে যায় দস্তখত নিতে, সে জানায় তার কাছে এই নগদ দেনা শোধের মত অর্থ আর উদ্বৃত্ত নেই। হঠাৎ বাতাসে ডিম ভাজার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে সমস্ত প্রসঙ্গ লুপ্ত হয়ে জৈবিক আস্বাদ চিত্ত লালায়িত হয়ে ওঠে। পরাণ 'আপনার ভাত তৈরি' জাতীয় অস্পষ্ট একটা উক্তি করে অন্তর্হিত হয়। তাহের অনুভব করে, ক্ষুধায় তার পাকস্থলী এতদূর পর্যন্ত আক্ষেপিত হচ্ছে যে স্থির বসে থাকা যাচ্ছে না। পরাণ অফিস ঘরে কুজোয় নতুন পানি এনে দিয়েছিল, তাহের এখন হাতমুখ ধুয়ে অধৈর্য রসনা নিয়ে টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসে। পরাণ ভাত সাজিয়ে দিতে দিতে আক্ষেপের সঙ্গে জানায়, আজ ডাল আর ডিম ভাজা ছাড়া কোনো ব্যবস্থা করা যায় নি; কুণ্ঠিত স্বরে সে নিবেদন করে, গরিবের রান্নার ক্রটি তাহের যেন ক্ষমার সঙ্গে গ্রহণ করে। পরাণ আশ্বাস দেয়, আগামীকাল সে ভাল মাছের ব্যবস্থা করবে। এর কোনো কথাই তাহেরের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, পৌঁছুলেও মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করে না। আজ চতুর্থদিনে সে আবার ভাত খায় এবং তার কাছে এই সামান্য ব্যঞ্জন অমৃত বলে বোধ হয়। ক্ষুধার নিজস্ব একটি অস্তিত্ব আছে, দেহের সে দাস নয়, ক্ষুধা দেহাতিক্রান্ত এক অনুভূতি হয়ে দেখা দেয় দেহ যখন ক্ষুধা প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়। আবার, ক্ষুধা যেমন শত্রুতায় প্রবল, পরাজয়ে তা একই মাত্রায় দুর্বল। প্রহরের পর প্রহর যে ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, মুহূর্ত মধ্যে তা অপসৃত হয় খাদ্যের পূজা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। তাহের এখন এক প্রকার গভীর অলস্যবোধ করে ক্ষুধানিবৃত্তির পরিণামে, তার চেতনা বিস্তৃত-শিথিল হতে হতে অস্পষ্ট হয়ে আসে, যেমন পরকলা সঠিক স্থাপিত না হলে দুরবিনের ভেতর দিয়ে জগতটাকে দেখায়। পরাণের ক্লান্তিহীন কণ্ঠস্বর তার কাছে পতঙ্গের গুঞ্জন বলে বোধহয়, চায়ের তৃষ্ণা পায়। তার মনে পড়ে যায়, রোজ রাতে ভাত খাবার পরপরই স্ত্রী তাকে চা করে দিত, আসলে মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেত তার স্ত্রী চায়ের পেয়ালা হাতে

দরোজার কাছে সংস্থাপিত। পরাণ অবিলম্বে চায়ের যোগাড় করতে ছোটে। স্ত্রীর নীরব এবং অত্যন্ত প্রীত একটি মুখ অনেকক্ষণ তাকে আবিষ্ট করে রাখে। ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরায় তাহের। বুক ভরে ধোঁয়া নেয়, বাতাস ধীরে-বিলীয়মান ধোঁয়ার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সে। পরাণ চায়ের পেয়ালা সামনে ধরে। একটু অবাক হয় তাহের পরাণের ঘরে এত দামি চিনামাটির পেয়ালা দেখে। সে প্রশংসা না করে পারে না। পরাণ খানিক ইতস্তত করে জানায় যে বিহারিদের অনেক কিছুই অনেকে লুট করে নিলেও সে কিন্তু এক সেট চীনামাটির বাসন ইত্যাদি পয়সা দিয়েই কিনেছে, এই চায়ের পেয়ালাটি সেই সেটেরই অন্তর্ভুক্ত অতঃপর পরাণ তার সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা পাড়ে। আবারো সে জানায় যে ইস্কুলের বেতন দিয়ে তার চলে না, অথচ, শিক্ষা বা বিদ্যালয়ের প্রতি স্বাভাবিক মমতাবশত সে অন্য কোনো কাজের কথা ভাবতে পারে না। অতএব সে এক মহা দুশ্চিন্তায় দিনপাত করছে; জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে তাতে অচিরেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাকে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হবে। এই বলে, সে উৎসুক চোখে তাহেরের দিকে তাকায়, যেন অপেক্ষা করে তাহের তাকে কোনো সংক্ষিপ্ত এবং পরিশ্রমহীন পথ দেখিয়ে দেবেন, যে পথের শেষে সচ্ছলতার অবস্থান। তাহের তার প্রত্যাশা পূরণ করে না, আসলে, সে জানে না যে তার কাছে এমন কোনো উত্তর আছে। সে অর্ধনির্মিলিত চোখে আহার শেষের আলস্য উপভোগ করে চলে। পরাণ তখন আপাতদৃষ্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। ইস্কুলের পেছনে বিরাট একটি জায়গা খালি পড়ে আছে, সেখানে কচু ইত্যাদি জংলা গাছ ও লতাপাতার প্রাদুর্ভাব। তাহের হয়ত জানে না, এ এলাকায় গোক্ষুর সাপের কী আধিপত্য। পেছনের সেই জংলা জায়গাটি, বলতে গেলে, গোক্ষুরেরই রাজত্ব বিশেষ। ইস্কুলের এতগুলো ছাত্রের এত কাছে এ ধরনের ভয়াবহ প্রাণীর উপস্থিতি কি কাম্য ? ইস্কুল নিয়ে আপাতত এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই, নতুন এই সমস্যাটিও তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তাহের স্থির বোঝে যে, এখানে তার কর্তব্য এক প্রকার নয়, বহুবিধ এবং সবক'টিই আশু মনোযোগ এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দাবি করে। অচিরেই সে টের পায়, পরাণের এ-প্রসঙ্গ উত্থাপনের আবৃত্ত কারণটি। পরাণ চায়, পেছনের ঐ জঙ্গল সাফ করে তাতে তরিতরকারি লাগাতে, তাতে সাপের উপদ্রব কমে এবং পরাণেরও কিছু আর্থিক সুরাহা হয়। পরাণ আরো একবার জানায় যে, ঐ জায়গাটুকু ইস্কুলের কোনো কাজে লাগে না, পরিষ্কার করবার পরও কোনো কাজে লাগবে না। এ অবস্থায় সে যদি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারে তো সে চেষ্টার সুফলও একমাত্র তারই প্রাপ্য। এই প্রস্তাবটি রেখেই পরাণ রাতের মত বিদায় নেয় এবং আশ্বাস দিয়ে যায় যে, রাতে কোনো প্রকার আবশ্যক হলে তাকে শুধু ডাক দেবার অপেক্ষা, সে প্রায় সজাগই থাকে সারারাত, তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের আমল থেকে ভাল ঘুম হওয়া তার বন্ধ হয়ে গেছে। আরো সে সাবধান করে দিয়ে যায়, শোবার সময় মশারি ভাল করে গুঁজে শোয় যেন তাহের, অনেক সময় গোক্ষুর সাপ উত্তাপের সন্ধানে বিছানায় সেঁদোয়। তৎক্ষণাৎ কোলের কাছে পা টেনে নিয়ে তাহের সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে বসে, নিমিষে আহারজনিত আলস্য এবং আমেজ অন্তর্হিত হয়, একটা ঠাণ্ডা আতংক স্থান করে নেয় তার বদলে। পরাণ বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় যায় এবং মশারি ভাল করে গুঁজে দেয় চারদিকে, বারবার পরখ করে দেখে কোনো ফাঁক আছে কি না। মাথার কাছে লণ্ঠনের শিখা স্তিমিত করে দিয়ে শান্তি লাগে না, আবার তা উজ্জ্বল করে দেয় সে, দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দেয়, যেন সাপ এলে চোখে পড়ে।

চারদিকে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়, যেন অবিলম্বে কিছু ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু ঘটে না, তাই বলে নিশ্চিত বোধ করাও যায় না; মশারির চাঁদোয়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তাহের। কোথাও একটা শেয়ালের ডাক শোনা যায়, কোথাও একটা শিশু কেঁদে ওঠে, তারপর মাটির অতল থেকে গুরুগুরু একটা ধ্বনি ওঠে, সে ধ্বনির উৎস দূরে কিন্তু অতি অস্পষ্ট একটা কম্পন অনুভব করা যায় বিছানার নিচে, মাটিতে। জলেশ্বরীতে রাতের ট্রেন এলো। কাল এই ট্রেনে তাহের এসেছিল। সম্পূর্ণ একটা দিন পার হয়ে গেল। তার মনে পড়ে যায়, বাবা একটি কথা বলতেন, রোজ রাতে শোবার পর, ঘুমোবার আগে সারাদিনের কথা মনে করবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অভিজ্ঞতার হিসেব নিবি। বাবা চোখ বুজে, একহাত চোখের ওপর ঢাকা দিয়ে, মৃদু পা নাড়াতেন। হয়ত তখন তিনি সারাদিনের হিসেব মেলাতেন, সারাদিনের নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় তাহের, স্ত্রীর জন্য তার অস্তিত্বের ভেতর কোনো অনুপস্থিতির বোধ নেই। তার জীবন যেন একটি বাসে চেপে কোথায় যাওয়া, পথে একজন উঠেছিল এবং তারই পাশে আসন গ্রহণ করেছিল, তার গন্তব্য এখনও আসে নি, তাই এখনো সে যাত্রী, এখনো চলমান। স্ত্রীকে সেকি ভালবাসত না ? তার বিবাহ ছিল আয়োজিত। মায়ের পছন্দে বিয়ে করেছিল সে। কিছু দিন থেকেই মা তাকে বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন, ঠিক যে আগ্রহের সঙ্গে তিনি পুত্রকে বিদ্যার্জনের জন্যে তাগাদা করতেন, একই প্রকার তাড়নায় তিনি তাকে সংসারেও প্রবিষ্ট করান। হাসনা, তার স্ত্রী, তার সঙ্গে প্রথম দেখা বিয়ের রাতে। যেন কেউ তাকে বলেছিল, একটি উপহার রয়েছে তার জন্যে, অবশেষে এলো সেই উপহার, রঙিন কাগজে মোড়া, বাইরে থেকে জানবার উপায় নেই ভেতরে কী আছে, কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে, যে-কোনো উপহারই চিত্তে আনে এক প্রকার চাঞ্চল্য এবং সাগ্রহ অস্থিরতা, সেই অস্থিরতা নিয়ে সে মোড়কটি উন্মোচিত করেছিল আর ভেতরে যা দেখেছিল তা অত্যন্ত প্রীত করেছিল তাকে, মনে হয়েছিল, এরই জন্যে সে অপেক্ষা করেছিল, ঠিক এই উপহারই সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। হাসনাকে তার ভাল লেগেছিল প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্ত থেকেই। আর হাসনার কী মনে হয়েছিল তা তার জানা নেই। যেহেতু এই ঘটনা দ্বিপক্ষীয়, তাই অবিরাম একটি প্রয়াস ছিল তার, যে, হাসনা কি একই প্রকার কৃতজ্ঞ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তাকে, এই প্রশ্নের মীমাংসা সন্ধান করা। অকালপক্ক বালিকার অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে হাসনা তার এ উদ্যমকে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা করে রাখতে সক্ষম হয়। বস্তুত প্রত্যক্ষভাবে তাহের কখনোই জানতে পারে নাই যে হাসনা তাকেই নিবেদন করেছে তার অস্তিত্বের সমগ্র ফসল। বর্তমানে তার অনুপস্থিতিতে, পেছনের দিকে তাকিয়ে সে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় আরো একবার নিয়োজিত হয় তাহের। কিন্তু জীবদ্দশায় যা জানা সম্ভব হয় নাই, মৃত্যুর পর তা কি সম্ভব হতে পারে ? মৃত্যু শুধু জীবন নয়, স্মৃতিও নিঃশেষে মুছে দিয়ে যায়; মৃত্যুর পর, মৃত্যুজনের যে স্মৃতি চিত্ত বহন করে, তা অতীত থেকে আহরিত শ্রেষ্ঠ ফসলের গুচ্ছ নয়, আবশ্যিকভাবেই কল্পনার নবীন ফসল তা। সহযাত্রীর মৃত্যুর পর, তাকে যেভাবে চিত্রে জীবিত রাখলে জীবিতের জীবনযাত্রা সুসাধ্য হয়, সেইভাবেই চিত্র ও চেতনা যুগলে তাকে নির্মাণ করে। বিগতের সঙ্গে এই নবাগতের কোনো প্রকার যোগ নাই, বস্তুত, যোগহীনতাই এ নির্মাণের প্রথম শর্ত। হাসনাকে সে নির্মাণ করেছে কীভাবে ? এই প্রশ্ন উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনার কতগুলো স্থিরচিত্র দেখা দেয়। সেই চিত্রগুলোতে

হাসনাকে প্রধানত গৃহকর্মে নিযুক্ত দেখা যায়। রান্নাঘরে রন্ধনে ব্যস্ত হাসনা, শোবার ঘরে শয্যায় কোন রঙের চাদর বিছানো হবে সেই জরুরি প্রশ্নে চিন্তিত হাসনা, সিনেমা দেখতে বেরুবার আগে দরোজায় তালা দিয়ে বারবার সেই তালার বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখায় নিবিষ্ট হাসনা, তাহেরের জামায় বোতাম লাগাতে সুঁচে সুতো পরাবার জন্যে একাগ্র হাসনা, দোকানে একই পণ্যের দুই বিভিন্ন মার্কার ভেতরে তুলনামূলক গুণ বিচারে মনোযোগী হাসনা প্রায় অন্তহীন এই চিত্রসম্ভার। অতএব, সিদ্ধান্ত তাহলে এই যে, হাসনার সঙ্গে জড়িত তার জীবনের বহিরঙ্গ ? তার কাছ থেকে অনবরত সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে, তাহের, হাসনার ওপর তার দিনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ভর করত ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহের জন্যে। বস্তুত, আপাতত এ ছাড়া সে আর অন্য কোনো উপযোগিতা খুঁজে পায় না হাসনার। অন্ধকারে সিগারেট হাতড়ে ফিরত তাহের, হাসনা মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে খুঁজে দিত; 'একদিন তুমি বিছানায় আগুন লাগাবে'। এখন স্তিমিত নয়, বরং অতি উজ্জ্বল শিখায় লণ্ঠন জ্বলছে, সিগারেট খুঁজে পেতে মোটেই কষ্ট হয় না, অনুপস্থিত হাসনার সেই তিরস্কার স্মরণ করে তাহের সাবধানে এখন সিগারেট ধরায়। তাহলে এখনো সে হাসনার ওপর একদিক থেকে নির্ভরশীল। এখনো হাসনার অনুশাসনে তার জীবন নির্বাহ নিয়ন্ত্রিত। তাই কি ? হাসনা বেঁচে থাকলে তাকে কি সে আসতে দিত এই ত্রিভুবনের অন্তে স্থাপিত জলেশ্বরীতে ? আর যদিও বা আসতে দিত, হাসনা তাকে বাঁ হাতের সব কটা আঙুল একত্রে তুলে নিষেধ করত, দ্যাখো বাপু, গোলমালের ভেতরে জড়িয়ে পড়ো না। ইস্কুল নিয়ে সম্ভাব্য গোলমালগুলো অবিলম্বে তাহেরকে প্লাবিত করে যায়। ছাত্র পাস না করানো নিয়ে স্থানীয় এমপি হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে হাকিম সাহেবের বিতণ্ডার কথা স্মরণ করে সে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন হেডমাস্টারের বিদায় এবং ইস্টিশনে ছাত্রদের ওপর ক্যাপ্টেনের গুলিবর্ষণ তাকে শংকিত করে তোলে যে, তাকেওনা এভাবেই একদিন বিদায় নিতে হয়! অভিভাবকদের আশংকা, পরাণ তাকে বলেছে, একদিন ইস্কুলের ভেতরেই গুলি চলবে, যদি সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় ? হাসনার কথা আবারো মনে পড়ে যায় তার। হাসনা অবশ্যই তাকে নিষেধ করত গোলমাল থেকে দূরে থাকতে, এমন কি জলেশ্বরী ছেড়ে চলে যেতেও উৎসাহ জোগাত। একদিক থেকে তাহের নিশ্চিত বোধ করে যে, হাসনা আর বেঁচে নেই, পদেপদে তাকে বাধা দেবার মত মানুষটি আর এ সংসারে নেই। এক প্রকার অনুযোগ প্রবল হয়ে ওঠে তাহেরের মনের মধ্যে। মনে পড়ে যায়, একটার পিঠে আরেকটা সিগারেট ধরালেই হাসনা ভ্রু কুঞ্চিত করত। কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে সারারাত নীরব থেকে হাসনা তাকে শাস্তি দিত। স্যান্ডেল পরে রওনা হলে, হাসনা পেছনে পেছনে প্রায় ধাওয়া করে বলতো, কেন তোমার জুতোজোড়া কী হলো ? মুরগির রান তাহের পছন্দ করত না, তার জন্যে দিনের পর দিন শুনতে হয়েছে যে, বোধহয় তোমার মা তোমাকে কোনোদিন ভাল খেতে দেয় নি। এ ধরনের শাসন এবং উক্তিগুলো তাহেরকে এখন অত্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে, এবং হাসনা জীবদ্দশায় যা সম্ভব হয় নাই, এখন সেই উত্তরগুলো তার মনে পড়ে যায় এবং মনের মধ্যে উচ্চকণ্ঠেই সে বলতে থাকে, আমার যা ভাল লাগে তাই করি। এই কথাগুলো আবৃত্তি করে তাহের খানিকটা প্রশমিত হয়। এতদিনে হাসনাকে মনের মত উত্তর দেয়া গেছে মনে করে সে বেশ লঘু বোধ করে। এবং আরো একটি সিগারেট ধরায়, যেন হাসনার উপস্থিতিতেই সে একটার পিঠে আরেকটা ধরিয়ে প্রমাণ দিল যে, তার বক্তব্য

কত অসার। এবং অবান্তর। 'আমার যা ভাল লাগে আমি তাই করি'— সহাস্য এই উক্তির অন্য এক অনুষঙ্গ তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ইস্কুল পরিচালনায় সে কি এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে পারবে ? না কি, অসম্ভব বলে দেখতে পাবে যে, যা ভাল লাগে তা সব সময় করা যায় না। তাহলে হাসনারই জিৎ হয়ে যাবে এক অর্থে, এই অর্থে যে, হাসনা তার শাসনের মাধ্যমে যেন অনবরত জ্ঞাপন করত যে, যা ভাল লাগে তা সব সময় করা যায় না। আর সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আপাতত এটুকু স্থির বলে দেখতে পায় তাহের যে, জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় আবার খোলাটা এক প্রকার জেদপ্রসূত। সে জেদ হাকিম সাহেবের। পরীক্ষা-সংক্রান্ত ঐ ঘটনায় তিনি পরাজিত বোধ করেছিলেন বলেই ইস্কুল খোলার জন্যে তার আগ্রহ এতটা উদ্দাম। তাহের এখন পরিষ্কার বুঝতে পারে, কেন হাকিম সাহেব ঢাকায় তাকে অমন তাড়াহুড়ো করে চাকরি দিয়েছিলেন। চাকরি পেয়ে তাহের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে, কারণ এ ধরনের একটা ক্ষেত্র সে খুঁজছিল হাসনার মৃত্যু এবং দেশ স্বাধীন হবার পর। স্বাধীনতার পতাকাশোভিত উল্লাসের ধ্বনি নিনাদিত ঢাকায় বসে থেকে তার মনে হয়েছিল দেশ শুধু রাজধানী ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়, ঢাকা বরং দেশের একটা মুখোশ মাত্র, দেশ আসলে ছড়িয়ে আছে সারাদেশে, তাই সে অনুভব করছিল, দেশের অভ্যন্তরে তার যাওয়া প্রয়োজন এবং নিজের ক্ষেত্রে দেশের জন্যে কিছু করা আশু কর্তব্য। তার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলায় ইস্কুলে তাদের রচনা লিখতে হতো, 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'। বড় হয়ে জেনেছে যে, আহ্বানটি দিয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতা সুরেন ব্যানার্জি। তাঁর সেই ডাকে, সেকালে কোলকাতার বহু মেধাবী ছাত্র এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক নগরী ছেড়ে ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে-গ্রামে তারা শিক্ষকতা করতে শুরু করেছিলেন এই মহৎ ব্রত নিয়ে যে, দেশের তরুণ শক্তিকে তারা সঠিক ধারায় গড়ে তুলবেন, যেন এই নব্য তরুণেরা ভারতবর্ষকে বিদেশীর শাসন থেকে একদিন মুক্ত করতে পারে। শুধু শিক্ষক কেন, তাহেরের মনে আছে, বহু চিকিৎসকও একই প্রেরণায় গ্রামে চলে যান, এই জলেশ্বরীতেই ছিলেন নগেন ডাক্তার, যিনি এখানে আসবার আগে পর্যন্ত ছিলেন কোলকাতার বিশিষ্ট তরুণ চিকিৎসক। নগেন ডাক্তার আঁটো করে পরা ধুতির ভেতরে শার্ট গুঁজে সাইকেলে চেপে গ্রাম থেকে গ্রামে রোগী দেখতে যেতেন। ফর্সা ধবধবে চেহারা ছিল তার। সেই নগেন ডাক্তার এখন কোথায় আছেন, কে জানে ? হয়ত এখানেই, হয়ত পাকিস্তান হবার সময়ে চলে গেছেন ভারতে, সেখানে। কাল একবার সে খোঁজ করবে। জলেশ্বরীতে আসবার আগে নগেন ডাক্তার, নৃপেনদা মাস্টার এদের কথা বারবার মনে হয়েছিল তার। এখন ইস্কুলের অফিস ঘরে শুয়ে থেকে, সাপের ভয়ে জেগে থেকে, আরো একবার মনে পড়ে যায় তাদের কথা। আরো একবার উজ্জীবিত বোধ করে। তার মনে হয়, সমস্ত বাধা-বিপত্তি সহজেই তুচ্ছ করবার মত শক্তি তার চিত্তে এবং প্রয়োজন হলে বাহুতে তার রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সে যদি কোনো অংশ নিয়ে না থাকে তো স্বাধীনতা আসবার পর ভিন্নতর সংগ্রামে সে পুষিয়ে নেবে। বস্তুত, এ সংগ্রামই তার কাছে মহত্তর এবং অধিকতর সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'— এই জলেশ্বরী ইস্কুলেই রচনাটি তাকে লিখতে হয়েছিল, আর এখন সে নিজের বালক বয়সের সেই প্রতিজ্ঞাপূরণে আর কোথাও নয় এসেছে এই জলেশ্বরীতে। তাহেরের মনে হয় এই যোগাযোগটি আকস্মিক তো নয়ই বরং গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। সে নিজেকে এক উজ্জ্বল চিত্রের ভেতরে সংস্থাপিত দেখতে পায় এবং অবিলম্বে ঘুমিয়ে যায়। সময় আমাদের ধারণাসৃষ্ট, অতএব,

সময়জ্ঞান নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তাহের যখন জেগে ওঠে হঠাৎ, লণ্ঠন তখন উজ্জ্বল জ্বলছে, জানালা দিয়ে বাইরে গাঢ় রাত দেখা যাচ্ছে, সে বুঝতে পারে না কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল সে। ঘুম ভাঙল কীসে? আবার সে-ই ডাক ওঠে; এ-এ-রে-এ-এ। অদূরেই কোথাও ক্যাপ্টেন জানান দিয়ে চলেছে তার উপস্থিতি। সারারাত কি সে এমনি করে ঘুরে বেড়ায়? জলেশ্বরী যখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে, তখন কি একমাত্র সে-ই জেগে আছে? স্বপ্ন এবং বাস্তব মিশ্রিত হয়ে যায়, বস্তুত, বাস্তবকে স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়; মনে হয়, তাহের স্বপ্নের ভেতরে ক্যাপ্টেনের ঐ সংকেত শুনছিল। সম্ভবত তাই। ক্যাপ্টেনের কথা সে ভাবছিল, বিশেষ করে সাবেক হেডমাস্টারের বিদায় দিনে ইস্টিশনে তার আবির্ভাব এবং তাকে পাহারা দিয়ে কাউনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কাহিনী শোনার পর থেকে তার চেতনা কিছুতেই ক্যাপ্টেনকে ছেড়ে যেতে পারছিল না। তাহেরের মনে হয়, জলেশ্বরীতে এ পর্যন্ত যতজনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের ভেতরে ক্যাপ্টেনই তার নিকটতম। কেন এটা মনে হয়, তা সে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়। ক্যাপ্টেন তার প্রতি কোনো প্রকার স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখায় নি, বরং ভাত খাবার হোটেলে আজমীর-পিপাসুর সঙ্গে তার আচরণে তাকে করুণাহীন বলেই মনে হয়েছে তার এবং আরো মনে হয়েছে প্রয়োজনে সে তাহেরের প্রতিও একই মাত্রায় করুণাহীন হতে পারে। তবু ক্যাপ্টেনকেই তার আপনতম বলে এখন বোধ হয় এবং তাকেই সে মনে মনে কামনা করে যে প্রভাতে সবার আগে তার সঙ্গেই যেন তাহেরের প্রথম দেখা হয়। এই দেখা করবার আবশ্যকতা কী, তাও সে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে না; কেবল এক প্রকার তীব্র তাগিদ বোধ করে। আবার সেই ডাক শোনা যায়; এ-এ-রে-এ-এ। ধ্বনি দূরে অপসৃত হয়ে যায়। আরো একবার শোনা যায়, এবং তা এক অনন্ত প্রমাণ দূর থেকে। জলেশ্বরীর পথে পথে রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভেতরে ক্যাপ্টেন হেঁটে চলেছে; শহীদ বরকতউল্লাহ রোড দিয়ে, শহীদ আনোয়ার হোসেন রোড পেরিয়ে, শহীদ গেদু মিয়া লেনের ভেতর দিয়ে, চাঁদবিবির পুকুরের পাশ দিয়ে, শহীদ সিরাজ আলী রোডের ওপর দিয়ে, আরো সমস্ত শহীদের নামাংকিত পথ পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন। জীবিত সে, একা, বারবার পাক খেয়ে ঘুরছে। অকস্মাৎ, তাহেরের মনে এই সত্যটি উদ্ভাসিত হয় যে, গোটা শহরটাই এক বিশাল গোরস্থানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। দু'পাশে বাড়িঘরগুলোকে কবরের মত মনে হয় তার। চতুর্দিকে জীবিতের চেয়ে মৃতের নিঃশ্বাস সে টের পায়। তাহেরের আরো মনে পড়ে যায়, জলেশ্বরীতে যার সঙ্গেই সে কথা বলেছে, তারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুর সংবাদ বেশি শুনিয়েছে তাকে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ যে মৃত্যু নামক এক রাজত্বের প্রজায় পরিণত হয়েছে, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে, এক প্রকার হতাশা তাকে অবসন্ন করে ফেলে; সে আর ঘুমের ভেতরে ফিরে যেতে পারে না। তাহের উঠে বসে, সাবধানে পা নামায়, সাপের ভয়ে মৃত্যুর শীতলতা তাকেও খিন্ন করে; সে টেবিলের পাশে চেয়ারে পা তুলে বসে দু'হাতের ভেতরে মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে থাকে। তার ছোটবেলায় যে প্রাণবন্ত জলেশ্বরীকে জানত, এখানে আসবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে জলেশ্বরীর কল্পনায় সে উদ্দীপ্ত বোধ করেছিল, তার সঙ্গে সদ্য পরিচিত এই শহরের কোনো প্রকার মিল নেই। তার পূর্ব-প্রত্যাশাগুলো নিতান্তই অলীক এবং বালসুলভ বলে তার কাছে এখন প্রতীয়মান হয়। সে কী প্রত্যাশা করেছিল? দেশ স্বাধীন হয়েছে, জলেশ্বরীর আশেপাশে তীব্র মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ সে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে

প্রচারিত সংবাদে শুনেছে, গোটা বাংলাদেশে জলেশ্বরীতেই প্রথম মুক্তিযোদ্ধারা সম্মুখ যুদ্ধে শহরের দখল নেয়— অতএব, তাহেরের ধারণা জন্মেছিল, জলেশ্বরী এখন মহত্তর জীবন নির্মাণে নিয়োজিত একটি শহর। তার ব্যক্তিগত গর্ব ছিল এই কারণে যে, এখানেই তার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু, বাস্তবে সে দেখতে পেল, ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতেই এখানকার মানুষ অধিক স্বচ্ছন্দ, জীবনের চেয়ে মৃত্যুর উপাখ্যানেই তাদের প্রবলতর আগ্রহ, পদক্ষেপের বদলে স্তম্ভিত হয়ে থাকাই প্রিয়তর। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর বিস্তারিত নিষ্করুণ বর্ণনাদানে জলেশ্বরীর প্রতিটি মানুষকে সে দেখতে পেয়েছে কোনো পল্লী কবির চেয়েও প্রতিভাধর। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা জলেশ্বরীর মানুষকে ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তীর্ণ করবার বদলে তাদের আরো সংকীর্ণ ব্যক্তিচেতনার ভেতরে টেনে নিয়ে গেছে, যেমন মজাপুকুরে বহুদিন পাঁক কোনো হতভাগ্যকে আকর্ষণ করে থাকে। তাই, হাকিম সাহেবের বারান্দায় সেই বৃদ্ধ তার জমি সম্পর্কে চিন্তিত, ভদ্রমিয়া প্রথম সাক্ষাতেই ইস্কুলের খেলার সরঞ্জাম সরবরাহ করবার চুক্তি আবার ফিরে পেতে নির্লজ্জ রকমে আগ্রহী, পরাণ ইস্কুলের পতিত জমিটুকু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দ্বিধাহীন রকমে প্রস্তুত, জন-মজুর দু'জন বায়না নিয়ে কাজে হাত না দিয়েই উধাও। আজ, এবং কেবল আজই তাদের কাছে সত্য; আপন অস্তিত্ব এবং কেবল আপন অস্তিত্বই তাদের কাছে প্রধান। অথচ, তাহের তার অতীত ফেলে, তার অভ্যস্ত পরিবেশ নির্মম হাতে পেছনে রেখে, জলেশ্বরীতে এসেছে নতুন এবং অর্থপূর্ণ এক ভবিষ্যতের সন্ধানে। নিজেকে প্রতারিত বলে মনে হয় তার। স্ত্রীর আত্মহত্যাতেও সে এতখানি বিচলিত বোধ করে নি। এক দয়াহীন চাবুক তার পিঠের ওপর পড়তে থাকে। আবার দূর থেকে সেই ডাক ভেসে আসে; এ-এ-রে-এ-এ। তারপর কয়েকটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। মনে হয়, কেউ দৌড়ে যাচ্ছে কাউকে ধরতে। বন্দুকের একটা আওয়াজ হয়। তারপর আরো কয়েকটা পটকা ফোটার মত পাতলা আওয়াজ সারিবদ্ধভাবে শোনা যায়। নেমে আসে অখণ্ড স্বস্তিহীন নীরবতা। আর কোনো ধ্বনিতে তা বিদীর্ণ হয় না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবার পরও ক্যাপ্টেনের সেই সংকেত ধ্বনি আর শোনা যায় না। কেবল অসংখ্য গাছের মাথায় মাঝে মাঝে বাতাসের প্রবল প্রবেশ সরসর শব্দ ওঠে এবং চারদিকের স্তব্ধতা প্রবহমান সেই শব্দে আরো অবিভাজ্য হয়ে যায়। গত রাতেও তাহের গুলির শব্দ শুনেছিল; আজ এখন একাধিক গুলির শব্দ শুনে আবার তার মেরুদণ্ডে শীতল প্রবাহ চলাচল করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের ন' মাসে ঢাকায় এমন কোনো রাতের কথা সে মনে করতে পারে না যখন নেপথ্যে, দূরে গুলির শব্দ সে শোনে নাই। কিন্তু তখন তা অন্যপ্রকার অনুভূতি সৃষ্টি করত। সে অনুভূতি সময় ধারণা রহিত অবসন্নতার অনুভূতি। আপন দেহ ক্রমশ কুঁকড়ে একটা ক্ষুদ্রকায় পিণ্ডে রূপান্তরিত হবার অনুভূতি। মুখাবয়বে চোখ-কান-নাক-ঠোঁট পুরু একটা জান্তব ত্বকে আবৃত হবার অনুভূতি। সমস্ত নির্মাণের ভিত্তি যে কঠিন ভূমি, সেই ভূমি এক প্রকার শীতল তীব্র আগুনে অনবরত বাষ্পীয় আকার ধারণ করবার অনুভূতি। কোনো অদৃশ্য উৎস থেকে মন্থর এক আলকাতরার নদী উৎপন্ন হবার অনুভূতি। কণ্ঠস্বর চূর্ণিত কাচ হয়ে যাবার অনুভূতি। গ্রীষ্মের গাছগুলোতে অতিকায় ফুলগুলোতে অপ্রতিরোধনীয় পচন ধরবার অনুভূতি। অন্নবিকারে সমাধিস্থ হবার অনুভূতি। সংখ্যাজ্ঞান, শুদ্ধতম যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের শরীরে পিঙল এবং দীর্ঘ লোম উৎপন্ন হবার অনুভূতি। রৌদ্রে উদ্ভাসিত স্বচ্ছ নীল আকাশে অকস্মাৎ এক ধূসর চাদর তরঙ্গায়িত হয়ে ভেসে যাবার অনুভূতি। তীক্ষ্নস্বর বাঁশির ভেতরে পার্শ্ববর্তী

ব্যক্তিটিকে চিৎকার করেও এক অক্ষর সংবাদ পৌঁছে দিতে না পারবার অনুভূতি। প্রভাতে উঠে পরিচিত প্রতিটি বস্তুর আকৃতি দ্বিগুণ বর্ধিত দেখার অনুভূতি। এ-এ-রে-এ-এ। ক্যাপ্টেনের সংকেতধ্বনি জলেশ্বরীর রাতে তৃতীয় প্রহর ভেদ করে আবার ভেসে আসে। এখন তা আকাঙ্ক্ষিত আশ্বাস উচ্চারণের মত শোনায়। এতক্ষণ পর যেন নিমজ্জমান চেতনা একটা অবলম্বন খুঁজে পায়; তাহের অবিলম্বে সেটা আঁকড়ে ধরে, অচিরে তার কপাল স্থাপিত হয় টেবিলে এবং টেবিল একটা ভাসমান নৌকোর মত সহসা দুলে উঠে দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় অত্যন্ত সাবলীল গতিতে। পরাণ এসে তাকে জাগায় এবং বলে যে, দরোজায় খিল না দিয়ে ঘুমোন তার উচিত হয় নাই। পরাণ আরো বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখে। কেন, বিছানা কি তার পছন্দ হয় নাই ? তাহলে আজই একটা চৌকি বানাবার বায়না দিতে হয়। কেরোসিনও আজকাল পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও বিস্তর দাম, বলতে বলতে পরাণ লণ্ঠনটা নিবিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাহের বেরিয়ে এসে দেখে, জন-মজুর দু'জন এই কাকডাকা ভোরে এসেই কাজে লেগে গিয়েছে, ইতিমধ্যেই একাধিক ক্লাশঘর থেকে আবর্জনা বের করে বারান্দায় স্তূপাকার করে রেখেছে, তার ভেতর থেকে ইঁদুর আরশোলাজাত গাঢ় একটা আতপগন্ধ বেরুচ্ছে। সেই ঘ্রাণ অবিকল তার মায়ের ভাঁড়ার পরিষ্কার করবার বাৎসরিক দিনটির মত। সাধারণত ঐ দিনটি আসত ঈদুল ফিতরের কয়েকদিন আগে। শিশুদের কাছে সেটাই ছিল উৎসব শুরুর ঘণ্টাধ্বনি। বুকের ভেতরে গুরু গুরু করে উঠত; ঝলকে ঝলকে খুশির বাতাস এসে গালে মুখে লাগত; দর্জি এসে সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে মাপ দিয়ে যেত; বাবা হাতের পিঠে শুঁকে শুঁকে ঘোষের কাছ থেকে ঘি কিনতেন; উঠানে এক পাল ঝুটিওয়ালা খাসি মোরগের ছুটোছুটি শুরু হয়ে যেত যতদূর পর্যন্ত তাদের পায়ের দড়ি যায়; ঈদের দিন পর্যন্ত রোজ ভোরে ঘুম ভাঙত ঐ মোরগের মিলিত উষা-আবাহনীতে। তাহের এখন অবিকল তেমনি এক উৎসবের আসন্ন পাদপাত মনের মধ্যে শুনতে পায়; নির্ভার এক ধরনের চাঞ্চল্য তাকে সমুদ্রের সবিরাম ঢেউয়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত দুপুর সে জন-মজুর দু'জনের কাজের তদারক করে, তাদের সঙ্গে থেকে দেখিয়ে দিতে থাকে, দেয়ালের লেখা মোছে, থামের দাগ তোলে, জানালায় যে কটা কাচ এখনো অবশিষ্ট আছে তা পরিষ্কার করে। তাহের সিদ্ধান্ত নেয়, দ্বিতীয় কোনো শিক্ষকের আপাতত অনুপস্থিতিতে সে সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত এই চার ক্লাসের সমুদয় ছাত্রকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে বসতে দেবে এবং সে একাই ক্লাস নেবে পর্যায়ক্রমে। একদলকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে লেখায় বসিয়ে, আরেক দলকে সে পড়া বোঝাবে এবং একেকদিন একেক বিষয়, একটিমাত্র বিষয়ে সে পড়াবে। অঙ্কের বেলায় কিছুটা অসুবিধে হবে, আর আরবি সে আদৌ পড়াতে পারবে না; তবে সে নিজে যদি ক্লাসের একটা অংক বই যোগাড় করে বার কয়েক দেখে নেয় তাহলে কিছুদিন অন্তত চালিয়ে নিতে পারবে, আর আরবি আপাতত স্থগিত থাকলেও বিশেষ অসুবিধে হবে না। তাহের আশা করে, অচিরেই সে হয়ত হেড মৌলবি সাহেবকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে হাকিম সাহেবকে অনুরোধ করে, অথবা, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে; নয়ত সন্ধান করতে হবে স্থানীয় কেউ আছেন কি না যিনি আরবি জানেন, সম্ভবত শহরে একজন কাজি আছেন, বিবাহ-তালাক-ফতোয়া দেবার জন্যে, সে রকম কেউ যদি থাকেন তাহলে তো সমস্যাই নেই। মৌলবি প্রসঙ্গে তার মাথায় জেলখানার কথা ঘুরতে থাকে, সেই সূত্রে মনে পড়ে যায় যে, হেড মৌলবি

সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি মিলিটারির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, আর সেই সূত্র ধরে তার স্মরণ হয় যে, এখানে আসবার প্রথম রাতে সে মিষ্টির দোকানের মালিকের কাছে শুনেছিল, এই ইস্কুলবাড়িতে বাঙালি এগারজন গালামালের কারবারিকে মিলিটারিরা এনে হত্যা করেছিল, তাদের রক্তের দাগ নাকি এখনো কোনো কোনো থামে বর্তমান। তাহের চঞ্চল হয়ে পড়ে। সকাল থেকে খুশির যে চাঞ্চল্য তাকে শিহরিত এবং উদ্যমী করে রেখেছিল, এ চাঞ্চল্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত। হঠাৎ সে গতিহীন, এমন কি লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। জন-মজুর দু'জনকে কাজে ব্যস্ত রেখে সে প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এবং প্রতিটি থাম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। নানা প্রকার দাগ দেখতে পায় সে, কালির দাগ, চুনের দাগ, আঠার দাগ, আলকাতরা, কাঠ-কয়লা, ইটের টুকরো দিয়ে ঘষা ইত্যাদি বহু কিছুর দাগ; জায়গায় জায়গায় চুনকাম খসে গিয়ে ভেতরের ইট বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও কোথাও আস্ত ইট খসিয়ে নেবার ফলে খোড়লের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এত কিছুর ভেতরে কোনটা রক্তের দাগ বা কোথায় রক্তের দাগ সে সম্পর্কে আদৌ কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ দাগই বিবর্ণ এবং গাঢ় খয়েরি, তার প্রায় সবগুলোই রক্তের দাগ বলে নির্ণয় করা যেতে পারে। পরাণ বাজার থেকে দুধ বিক্রি করে ফেরে; সে কাছে এসে জানতে চায় তাহের কি থামের এই দাগগুলোও পরিষ্কার করতে চায়? পরাণ তার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে যে, এ কাজ রাজমিস্ত্রির এবং যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি সময়সাপেক্ষ। 'আপনাকে দেখাই' বলে পরাণ তাকে একটা বড় ক্লাস ঘরে নিয়ে যায়। এ ঘরটায় জন-মজুর দু'জন এখনো হাত লাগায় নি, তাহেরও ইতিপূর্বে আসে নি। ঘরে এসেই তাহেরের চোখে পড়ে চার দেয়ালে উর্দু এবং ইংরেজি হরফে অসংখ্য লেখা, ব্যক্তির নাম, শহরের নাম, দেশের নাম, এবং স্লোগান; হানিফ, মাজহার, সোহেল বশির, মাজিদ, চাকদারা, সেরাই সিধু মণ্ডি বাহাউদ্দিন, ধুদিয়াল, পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জেনারেল নিয়াজি জিন্দাবাদ। পরাণ জানায়, এ ঘরে ছিল সিপাহিদের আস্তানা, আর এর পাশের কামরাতেই বন্দিদের রাখা হতো। পরাণ তাকে সে ঘরে নেবার চেষ্টায় আমন্ত্রণের জন্যে একটা হাত এবং গন্তব্যের দিকে একটা পা বাড়ায়। তার আগেই তাহের প্রায় চিৎকার করে ওঠে, এবং নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে ওঠে। তবু সে তারস্বরে জানায় যে, এসব দেখবার সময় তার নেই, কোনো প্রকার আবশ্যকতা আছে বলে সে বিবেচনা করে না। সেই সঙ্গে তাহের এটা জানাতেও ভোলে না যে, বাজার থেকে ফিরতে পরাণ অনেকটা দেরি করেছে; অবিলম্বে সে যেন মজুরদের সঙ্গে হাত লাগায়। তাহের দ্রুত পায়ে অফিস ঘরে এসে ধপ করে বসে পড়ে এবং ঘনঘন ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে। কেউ তাকে এক মুহূর্তের স্বস্তি দেবে না; অতীত থেকে কেউ দৃষ্টি ফেরাতে চাইবে না। সবাই তাকে একই কথা বারবার বলেও তুষ্ট নয়। সবার ধারণা যেন এই যে সে শুধু জলেশ্বরীতেই নবাগত নয়, গোটা বাংলাদেশেই সে বহিরাগত, অতএব, গত বছরে বাংলাদেশে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; এদেরই সে দায়িত্ব যেন বর্তেছে তাকে অবহিত করাবার। তাও ভাল ছিল, তার ওপর, তাহের এখন পশ্চাদ দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করে যে, প্রতিটি বক্তার স্থির অনুমান, সে ঐ ঘটনাগুলো সম্পর্কে ঘোর অবিশ্বাসী; তাই এটাও তাদের দায়িত্ব, তার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভঞ্জন করা। তাই তারা বক্তব্য শুরু করে চোখে আঙুল দিয়ে যে, দেখুন, এখানে এই হয়েছে, ওখানে ঐ ঘটেছিল। রাতের বেলায় যেমন, এখন তাহের হতাশ বোধ

করে না, তার ক্রোধ হয়, বল প্রয়োগ করে সে ক্রোধের উৎস নির্মূল করবার তীব্র ইচ্ছা হয়। টেবিলের ওপর সজোরে সে একটা ঘুসি মারে এবং নিজেই আহত হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে বিদীর্ণ হয়ে যায়। অচিরে পরাণ এসে হাজির হয়। তার মুখে অনাবিল হাসি। একটু আগে তাহের যে তার প্রতি ক্রোধযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করেছে, এখন তাকে দেখলে আদৌ তার অনুমান করা যাবে না। সে নিবেদন করে, যে, ইস্কুল প্রায় তারা পরিষ্কার করে এনেছে, আর মাত্র তিনটে কামরা বাকি; তাহের নিশ্চুপ অপেক্ষা করে; সে বুঝে গেছে যে অন্তত এটুকু সংবাদ দিতে পরাণ এখানে ছুটে আসবে না এবং ও-রকম প্রশস্ত হাসি ব্যয় করবে না। তার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। পরাণ জানায়, বাকি তিনটে ঘর আজকের ভেতরেই পরিষ্কার করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। তাহেরের কী মত ? সাপখোপের কথা পরাণ আরো একবার তোলে এবং অনুমতির জন্যে উজ্জ্বলতর হাসি বিস্তার করে সধৈর্য অপেক্ষা করে। সাপের ভয়ে তাহেরের কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি; সাপের কথা মনে করিয়ে দিতেই তার মন থেকে আক্রোশ মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সেখানে আতঙ্কের উষা আবির্ভূত হয়। পরাণকে সে অবিলম্বে বলে, প্রস্তাবটি মন্দ নয় এবং জানতে চায়, এর দরুন তারা পারিশ্রমিক কী চাইবে। পরাণ এখানে আসবার আগেই সেটা শুনে এসেছে। বস্তুতপক্ষে, তাহেরের সন্দেহ হয়, পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা হয়ত ভোরবেলাতেই সে শুনে রেখেছে। জন-মজুর ডাকিয়ে গোটা ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলা যায় সহজেই। যে যার কাজে চলে যায়; পরাণ তার বাসায় যায়; তাহের ইস্কুলের খাতাপত্র নিয়ে বসে পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবার মানসে। বেলা ক্রমশ পড়ে যায়। পরাণের স্ত্রী আজ মাছের ঝোল করেছে; দেখতে লোভনীয় হলেও মুখে দিয়ে সে প্রতারিত বোধ করে; রঙটাই খুলেছে, স্বাদ কিছুমাত্র নয়। পেটে অর্ধেক খিদে রেখে সে আহার শেষ করে। রাতের মত পরাণ বিদায় নেয়। তাহের এই প্রথম অনুভব করে যে ইস্কুলেই বাস করবার সিদ্ধান্ত বোধহয় সঠিক হয় নাই। প্রথমত, সাপের ভয়, নিঃসঙ্গতাকে সে ভয় করে না; দ্বিতীয়ত, আহার সংক্রান্ত অসুবিধা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এখনো রাত বেশি হয় নাই। পরাণকে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকে। অন্ধকারের ভেতর থেকে ছায়া মূর্তির মতন পরাণ এসে দেখা দেয়। তার কাছে জানা যায় ঔষুধের দোকান এখনো খোলা আছে। তাহের তাকে বলে কার্বলিক এসিড নিয়ে আসতে; ছোটবেলায় বাবাকে সে দেখেছে, এই জলেশ্বরীতে থাকতে, ঘরের চারকোণে কার্বলিক এসিড রাখতে, রাখলে সাপ আসে না। ঔষধটি কতটা ফলপ্রসূ তা তার জানা নাই, তবু এ ছাড়া ভিন্ন কোনো অস্ত্রের কথা তার জানা নাই। পরাণ বিশেষ উৎসাহিত করে বলে মনে হয় না। বস্তুত সে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, ঔষুধের দোকান খোলা নাও থাকতে পারে; আসলে, আজকাল কোনো দোকানই সন্ধের পর খোলা থাকে না, সূর্য ডোবার আগেই যে যার ঘরে চলে যায়। তখন তাহের তাকে আরো একটা কাজ দেয়, যেন এই মুহূর্তে দ্বিতীয় একটি যুক্তি খাড়া না করলে পরাণকে পথে নামান যাবে না। তাহের একটা কাগজে ইস্কুল পরিষ্কার বাবদ খরচের পরিমাণ লিখে পরাণের হাতে দেয় এবং বলে, এমপি হাকিম মোক্তারের কাছ থেকে দস্তখত নিয়ে আসতে যাতে পরদিন হাকিম সাহেবের পাল্টা দস্তখত নিয়ে টাকাটা অবিলম্বে তোলা যায়। জন-মজুর দু'জন ত আর টাকার জন্যে কাজের শেষেও অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। অত্যন্ত বিরস মুখে পরাণ রওয়ানা হয়। তাহের ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। আলমারিতে একটা পুরনো বই ছিল, পৃথিবীর মানচিত্র; অন্য কোনো

বইয়ের অভাবে তাহের সেই মানচিত্রের পাতা ওলটাতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষে বিলেত যাবার প্রবল ইচ্ছে ছিল তার। মানচিত্রে যুক্তরাজ্যের পাতা খুলে সে দেখতে থাকে, কোথায় অক্সফোর্ড শহর, লন্ডন থেকে কতদূর সে শহর, কোনদিকে তার অবস্থান, সংকেত দেখে সে আবিষ্কার করতে থাকে যাবার ব্যবস্থা কী— রেলপথ, সড়ক, অনুমান করবার চেষ্টা করে লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড যেতে এতটা সময় লাগতে পারে। চোখ তুলে দেখে ক্যাপ্টেন তার সমুখে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ক্যাপ্টেন বিছানার ওপর বসে পড়ে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে, ম্যাপ দেখছিলেন বুঝি ? ক্ষণকালের বিহ্বলতা নিয়ে তাহের তার দিকে তাকিয়ে থাকে; কল্পনা না বাস্তব ঠাহর করতে পারে না। দুর্বল লণ্ঠনের আবিল আলোয় আগন্তুকের শরীরের চেয়ে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর বলে প্রতীয়মান হয়। প্রশস্ততর হাসি উপস্থিত করে ক্যাপ্টেন নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অচিরেই এ অনির্দিষ্টতার অবসান হয়। ক্যাপ্টেন জানায় যে চৌরাস্তায় পরাণের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তার কাছেই সে শোনে যে সে এখানে আছে; বস্তুত, কাল রাতে সে ইস্কুলের অফিস ঘরে আলো দেখেছিল এবং তখনি অনুমান করেছিল, তাহের এখানে বাসা করেছে। ক্যাপ্টেন আরো একবার প্রস্তাব করে, শহরে দু'একজন আছে যারা সানন্দে তাহেরকে আশ্রয় দেবে, শুধু বলার অপেক্ষা। ক্যাপ্টেন প্রত্যয় জ্ঞাপন করে যে, ইস্কুলে বাস করাটা কখনোই স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও ক্যাপ্টেন অধিককাল দাঁড়ায় না; 'থাকার অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন' বলে সে জানায় যে, পরাণকে হাফেজ মোক্তারের কাছে পাঠান আপাতত বৃথা, কারণ ব্যক্তিটি জলেশ্বরীতে নেই, ঢাকায় গেছে; অতএব, তাকে সে বাসায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহেরের প্রশ্নের জবাবে ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে; না হাফেজ মোক্তার কবে ফিরবে, তা জানা নাই। বরং সে জানতে চায়, তাহের চড়ুই পাখি দেখেছে কি না ? সকৌতুক তাহের সন্দেহ প্রকাশ করে যে, বঙ্গদেশীয় কেউ চড়ুই পাখি দেখে নি, এটা সত্য হলে ব্যক্তিটি হয় উন্মাদ অথবা অন্ধ বলেই সাব্যস্ত করতে হবে। ক্যাপ্টেন হাফেজ মোক্তারের সঙ্গে চড়ুই পাখির তুলনা দেয় এবং বলে, যে, চড়ুই পাখি যেমন কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকে না, কেবলি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়, হাফেজ মোক্তারও তেমনি অনবরত ঢাকা-জলেশ্বরী করে। ক্যাপ্টেন তাকে আশ্বাস দেয় ইস্কুল পরিষ্কার বাবদ দেনার জন্যে সে যেন চিন্তা না করে, হাফেজ মোক্তার দু'একদিনের মধ্যে ফিরে না এলে সে নিজেই এর ব্যবস্থা করে দেবে; আসলে পরাণকে সে বলে দিয়েছে মজুর দু'জন কাল যেন তার সঙ্গে একবার দেখা করে। 'একটু চা খাওয়া যাক' বলে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়। অকস্মাৎ তাহেরের চোখে পড়ে ক্যাপ্টেনের পিঠের ওপর এক খর্বাকৃতি কিমাকার আগ্নেয়াস্ত্র ঝুলছে। অস্ত্রটি সে স্বাভাবিকভাবে টেবিলের ওপর, তাহেরের চোখের ওপর, নামিয়ে রাখে এবং বারান্দায় গিয়ে পরাণকে ডাকে। পরাণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় এবং সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘরের ভেতরে তাকায়। ক্যাপ্টেন তাকে দৌড়ে ইস্টিশান থেকে দু'গেলাশ গরম চা আনতে বলে দেয়; নির্দেশ কানে পৌঁছুবার আগেই পরাণকে দেখা যায় ইস্কুলের মাঠ প্রায় অর্ধেক পার হয়ে গেছে। তাহের পকেট থেকে পয়সা বের করবে ভেবেছিল, পকেটে সে হাতও দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন তাকে হাত তুলে নিরস্ত করে। চাওয়ালাকে তার নাম বললেই চা দিয়ে দেবে; ভাবনার কিছু নেই। মনের মধ্যে কোথায় একটা পীড়া অনুভব করে তাহের। বাইরে মাঠের ওপর অন্ধকারকে সঞ্চরণশীল মনে হয়, ভয়াবহ কোনো বিশাল প্রাণীর কুব্জপৃষ্ঠের মত ক্রমশ

উত্তল হয়ে ওঠে সে অন্ধকার, গাঢ় পেশিবল প্রয়োগ সম্প্রসারিত হতে থাকে। ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল শিখায় লণ্ঠন জ্বলতে থাকলেও, অবিলম্বে তার আলো আক্রান্ত হয় সেই অন্ধকার দ্বারা, ঘরটিতে অতিশয় খিন্ন দেখা যায়। স্মিতমুখে ক্যাপ্টেন উচ্চারণের পাড় ঘেঁসে নীরবে তাকে, তাহেরকে, নিরীক্ষণ করে চলে। মনে হয়, কোথাও কোনো একটা চাকা ঘুরিয়ে কেউ এক সুদীর্ঘ রশি গুটিয়ে তুলছে, চরাচরের ওপর দিয়ে সেই রশি অবিরাম প্রায়-অশ্রুত হিসহিস ধ্বনি তুলে চলমান। অকস্মাৎ তাহের নিজেকে ক্যাপ্টেনের করতলগত বলে বোধ করতে থাকে। এক প্রকার ভয় হয় তার, এক প্রকার তৃষ্ণায় তার জিহ্বা ক্রমশ শুকিয়ে আসতে থাকে। অবসন্ন চোখে সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহেরকে অদৃশ্য একটা পাটাতনের সঙ্গে বিদ্ধ করে রাখে। ক্যাপ্টেন তাকে কিছু বলছে না কেন ? অথবা, আচমকা এভাবে তার উপস্থিত হবার পেছনে লুকিয়ে আছে কোন উদ্দেশ্য ? ভয়ের সঙ্গে অস্বস্তির সমপাতনে অভূতপূর্ব উদ্বেগের জন্ম হয় এখন। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, এমনকি কোনো শব্দ উচ্চারণ করে এই ভয়াবহ সম্মোহন ভঙ্গ করাটাও সুবিবেচনা সম্পন্ন বলে তার বোধহয় না। তাহের স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে; বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি তাল সে নিজেরই ইচ্ছারই বিরুদ্ধে বলপূর্বক শুনতে থাকে। আপন শরীরের ওপর দিয়ে সে সেই রশির সঞ্চালন অনুভব করে। এই তরুণের শক্তির উৎস কি ঐ কিমাকার আগ্নেয়াস্ত্র, যা এখন তার ও তরুণের মধ্যবর্তী টেবিলে অলস এবং অহিংসভাবে স্থাপিত ? চোখ ফিরিয়ে অস্ত্রটিকে সরাসরি দেখবার প্রবল বাসনা হওয়া সত্ত্বেও তাহের বিরত থাকে; সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করে সে তীব্রভাবে। অস্ত্র সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া মাত্র সে অনুভব করে তার দৃষ্টির যে সীমানা তারই পাড় ঘেঁসে অস্ত্রটি শায়িত। দৃষ্টি না ফিরিয়ে, কেবল মন সন্নিবেশিত করলেই টের পাওয়া যায় অস্ত্রটির উপস্থিতি; ঝাপসা, টেবিলের রঙের সঙ্গে প্রায় বিলীয়মান। অস্ত্র, নির্মম রকমে নিরপেক্ষ, নির্বিচার, নির্বিকার। বস্তুত, পদার্থ বিদ্যায় বর্ণিত জলের ধর্মের সঙ্গে তার কোনো ভেদ নাই। জল যেমন যখন যে পাত্রে অবস্থান করে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে; অস্ত্রও তেমনি, যখন যার হাতে থাকে তারই তৃতীয় হাতে সে পরিণত হয়। অতিরিক্ত, অধিকারীর চিত্তে পরিবর্তনশীলতাও অস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ আরোপিত হয় অনিবার্যভাবে। মানুষ বিবর্তন মাধ্যমে পরিহার করেছে তার দেহজ অস্ত্রসমূহ; দংষ্ট্রা, নখর, বলীয়ান পেশি; বিকল্প উদ্ভাবন করেছে দেহাতিরিক্ত অস্ত্রসমূহ; কিরীচ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক। যেহেতু নবলব্ধ এই অস্ত্র দেহাতিরিক্ত তাই প্রতিপক্ষের অস্ত্রসম্পদ সম্পর্কে মানুষের এত অনিশ্চয়তা, পরিণামে ভীতিবোধ। আসলে উভয়পক্ষে সমান সমান অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিচলিত বোধ করে; কারণ অস্ত্রের একই সঙ্গে চাই অস্ত্রনিক্ষেপের চাতুর্য এবং চাতুর্য এমনই এক গুণ; পরীক্ষাতেই যার পরিচয় এবং অস্ত্র ব্যবহার ক্ষেত্রে পরীক্ষার অবকাশ নাই; ব্যবহারের কৌশলে তারতম্য ঘটার অর্থ একপক্ষের পতন তথা মৃত্যু। আর তাই সৈনিকের পেশা পৃথিবীতে সর্বাধিক উৎকর্ষ দাবি করে; সৈনিক নির্ভর করে যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে আপন অনুমান শক্তির ওপর সবচেয়ে অধিক মাত্রায়। সৈনিকের শিক্ষা অন্য যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক বাস্তবর্জিত এই অর্থে যে, প্রস্তুতি পর্বে যে শত্রু সৃষ্টি করে সে দক্ষতা অর্জন করে তা নিতান্তই কল্পনানির্ভর। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, সে নিরস্ত্র, এবং অন্যপক্ষ সশস্ত্র, দু'য়ের ভেতরে ব্যবধান মৃত্যুর মতই দুস্তর ও অপরিবর্তনীয়। তাহলে, টেবিলে শায়িত ঐ অস্ত্রের কারণেই সে, তাহের নিজেকে

ক্যাপ্টেনের কাছে বিক্রিত বলে বোধ করছে ? সম্ভাবনাটি উদিত হওয়ামাত্র তাহের প্রবলভাবে তা অস্বীকার করে। আসলে, অস্ত্রে ভীত হওয়াটা সর্বাধিক অগৌরবজনক বলে তার কাছে প্রতিভাত হয়। তার ভেতরে এক প্রকার অহম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে অহঙ্কার, তার অস্তিত্বের অহঙ্কার, তার বিদ্যার অহঙ্কার, তার অভিজ্ঞতার অহঙ্কার। এবং ঐ অহঙ্কারবোধ তাকে দু'পায়ের ওপর আপাতত দাঁড় করিয়ে রাখে; কিন্তু বিপজ্জনক সে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রতি মুহূর্তে আশংকা হয় এই বুঝি সে পড়ে যাবে। পরাণ চা নিয়ে আসে। ময়লা কেতলিটা সে সন্তর্পণে টেবিলের কোণায় রাখে, তারপর ডান হাতে কৌশলে একত্রে ধরা দু'টি খর্বাকৃতি গেলাশ টেবিলে নামিয়ে চা ঢালে, তারপর কেতলিটা আবার টেবিলে রেখে ডান হাতে একটা গেলাশ নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই স্পর্শ করে প্রথমে চা এগিয়ে দেয় ক্যাপ্টেনকে, তারপর একই মুদ্রায় পরবর্তী গেলাশ তাহেরের সামনে সে বাড়িয়ে দেয়, চা দিয়ে আবার একই প্রকার সাবধানতার সঙ্গে সে কেতলিটা তুলে নেয়, যেন ভয়াবহ একটা বোমা সে নাড়াচাড়া করছে, কয়েক পা পিছিয়ে যায় এবং ভয়ার্ত চঞ্চল চোখে ক্যাপ্টেনকে দেখতে থাকে। ক্যাপ্টেন তাকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে। যে প্রশ্নটি মনের মধ্যে দু'দিন থেকে অবিরাম চঞ্চল হয়েছিল, তাহের এখন তাকে মুক্তি দেয়। বিনা ভূমিকায় সে আজমীর-পিপাসুর কথা তোলে এবং জানতে চায়, সেদিন রাতে ভাত খাবার হোটেল থেকে তাকে নিয়ে যাবার পর তার পরিণতি কী হলো ? ক্যাপ্টেন তাহেরের একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়, সুপ্রচুর ধোঁয়া ছাড়ে, এই বিশেষ সিগারেট ব্র্যান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রশংসা করে, এবং জানায় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে সে আরো জানায়, হত্যা বন্দুকের গুলিতে সমাধা করা হয়। কেন নয় ?— টেবিলের ওপর চাপড় মেরে ক্যাপ্টেন জানতে চায় সে কি খারাপ লোক ছিল না ? সে কি মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যায় নি ? লোক চিনিয়ে দেয় নি ? সে কি একদল মুক্তিযোদ্ধাকে কপট দেশপ্রেমে আশ্বস্ত করে তাদের আশ্রয় দিয়ে পরে ধরিয়ে দেয় নি ? 'আমার চারজন সেরা ছেলের নির্মম মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী'— এই কথা বলে ক্যাপ্টেন দীর্ঘ সময়ের জন্যে নীরব হয়ে যায়। হয়ত, এখন তার মনে পড়ে যায় সেই ছেলেদের মুখ, তাদের নাম, তাদের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের দৃশ্য। মাথা নামিয়ে, হাঁটুর ওপর কনুই ভর দিয়ে সে মেঝের কোণের দিকে শূন্য এবং একই সঙ্গে জ্বলন্ত চোখে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। টেবিলের ওপর গেলাশে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চায়ের তৃষ্ণা আর সে বোধ করে না; হাতে সিগারেট পুড়তে থাকে, তামাকের আকর্ষণ আর তাকে আকৃষ্ট করে না। সেই হোটেলে সেদিন রাতে তাহের সত্যসত্যই গুলির শব্দ শুনেছিল, সে শব্দ তার শ্রুতিবিভ্রম নয়। এবং সে শব্দ হোটেলের সকলেই শুনতে পেয়েছিল এবং সকলেই বুঝতে পেরেছিল, ঘটনার পূর্বাপর কী; হোটেলের মালিক নিশ্চিত জেনেও তাকে মিথ্যে বলেছে, শব্দটা বাঁশঝোপে কোনো বাঁশের নুয়ে পড়বার আওয়াজ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এসব কিছুতেই প্রমাণ হয়, এই তরুণকে জলেশ্বরীর সকলেই কতটা ভয় করে, তার সম্পর্কে কোনো কিছুই তারা জানতে চায় না, এবং সেই না জানান কেবল, সে বিদেশী বা নবাগত, তার পক্ষেই প্রযোজ্য, এটাও তাহেরের মনে হয়। সে একই সঙ্গে এই জনপদ এবং এর অধিবাসীদের থেকে অনিচ্ছুক রকমে বিচ্ছিন্ন এবং নতুন করে ভয়ার্ত বোধ করে। সম্ভবত তাকে নীরব থাকতে দেখেই ক্যাপ্টেন বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়, তার কণ্ঠস্বর সশব্দে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে সে জানায়, বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই। ক্যাপ্টেন উঠে

দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের তেজ পরীক্ষা করে, একবার কমায় একবার বাড়ায়, তারপর শিখাটি পূর্বাবস্থায় রেখে সে আসন গ্রহণ করে। অলস প্রশান্ত কণ্ঠে সে বলতে থাকে যে, নির্বিচার হত্যায় সে বিশ্বাসী নয়। অপরাধীর অপরাধ যত বড়ই হোক, সে তাকে নিজ বক্তব্য জানাবার সুযোগ সব সময়ই দিয়েছে; আর, অপরাধের দণ্ড কী হবে, তাও সে একা নির্ধারণ করে না, সে এবং আরো দু'জন দণ্ড সম্পর্কে একমত হলেই শুধু দণ্ড দেয়া হয় এবং তা সমাধা করা হয়; দণ্ড সমাধা করা হয় তিনজন মিলে ; ক্যাপ্টেন জানায়, পরশু রাতে আজমীর-পিপাসুকে আবিষ্কার করবার পর তাকে শহীদ মিনারে নিয়ে যায়; বিচার সাধারণত সেখানেই সম্পন্ন করা হয়। অবিলম্বে অপর দুই বিচারককে সংবাদ পাঠান হয়; তারা সরকারি খাদ্য গুদাম পাহারায় রত ছিল তখন; তারা আসে এবং বিচার বসে। আজমীর-পিপাসুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বিস্তারিত আবৃত্তি করা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় সে সম্পর্কে তার বক্তব্য কী ? প্রথমত সে নীরব থাকে, পরে, প্রতিটি অভিযোগ সে নিজেই স্বীকার করে নেয় এবং প্রাণভিক্ষা চায়। তাকে জানান হয়, প্রাণভিক্ষার সুযোগ তাকে এর আগে দেয়া হয়েছিল, যখন মিলিটারিকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছিল; তখন তার কাছে খবর পাঠান হয় যে এখনো সে যদি বিরত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু তখন সে ঐ প্রস্তাব উপেক্ষা করেই সন্তুষ্ট হয় নাই, সংবাদ বাহককে সে মিলিটারির হাতে তুলে দেয়। আজমীর-পিপাসু তখন বিচারক প্রত্যেকের পা ধরে নিবেদন করে যে, আল্লার কাছেও ক্ষমা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আল্লার বান্দার কাছে সে কেন ক্ষমা পাবে না ? এ কথা সে স্মরণ করায় যে, তাকে ক্ষমা করা হলে রাতের এই অন্ধকারেই সে জলেশ্বরী ত্যাগ করে চলে যাবে, আর কোনোদিন এ মুখো হবে না, তারা বরং তার যাবতীয় যা সহায় সম্পত্তি আছে নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করে নিতে পারবে, এমন কি বললে সে এখনি দলিলের কাগজে লিখে সম্পূর্ণ স্বত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন তাকে জানায় যে, সম্পত্তির প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ তাদের নাই, বস্তুতপক্ষে কেউ বলতে পারবে না যে তার সম্পত্তি তারা আত্মসাৎ করেছে, এ কথা বলে সে তাদের অপমানই করছে; দ্বিতীয়ত, জলেশ্বরী ত্যাগ করে চলে যাবার প্রস্তাবটি আসলে হেত্বাভাষ, কারণ আজমীর-পিপাসু ধৃত হবার আগেই পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দাড়ি গোঁফের আড়ালে গুপ্ত থাকবার কৌশল অবলম্বন করেছিল, অতএব, এ প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য; তৃতীয়ত, তার প্রথম বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর, আল্লা ক্ষমা করলেও তারা ক্ষমা করতে নিতান্তই অপারগ কারণ তারা আল্লা নয়, তাছাড়া, আল্লার সঙ্গে মানুষের তুলনা করাটা তারই বিশ্বাস অনুসারে মহাপাপ বলে বিবেচ্য হবে। অতঃপর তার অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড, এই রায় তাকে শোনান হয়। রায় শোনার পর সে আর উচ্চবাচ্য করে না; চারদিক এবার তাকিয়ে দেখে শুধু সম্ভবত ইহলোক ত্যাগ করবার মুহূর্তে পরিচিত দৃশ্যাবলী সে শেষবারের মত দেখে নিতে চায়, কিন্তু রাতটা অন্ধকার ছিল বলে, সে আশা বিশেষ পূর্ণ হয় না। ক্যাপ্টেন মন্তব্য করে, যে, এই একই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সে এর আগেও লক্ষ করেছে অন্যান্য যাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছে তাহের ভেতরে; প্রতিবারই সে একপ্রকার বিস্ময় এবং ক্ষণস্থায়ী করুণা বোধ না করে পারে নাই। আজমীর-পিপাসুকে শহীদ মিনারের অদূরে একটা জিগা গাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধা হয় এবং সে ও অপর দুই বিচারক একসঙ্গে গুলিবর্ষণ করে প্রাণদণ্ড সমাধা করে। তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে— এই শেষ তথ্যটি জানিয়ে গেলাশের অবশিষ্ট

ঠাণ্ডা চা ক্যাপ্টেন এক চুমুকে নিঃশেষ করে উৎসুক চোখে তাহেরের দিকে তাকায়। দৃষ্টির সে বিশেষ বিভাসটি তাহেরের অবিলম্বে স্পষ্ট হয় না। অখণ্ড এক নীরবতা প্রশস্ত দুই ডানা মেলে ইস্কুলের আপিস ঘরটি অধিকার করে নেয়। পরাণ উঁকি দেয়, সন্তর্পণে দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে এবং চোখের নিমিষে খালি গেলাশ ও কেতলি নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন তাহেরকে আরো একবার বলে যে, ইস্কুল ঘরেই বাসা করবার সিদ্ধান্তটি মোটেই ভাল হয় নি; তার এখনো বিশ্বাস যে, তাহের এভাবে থাকতে পারবে না, অবশ্য সে যদি জলেশ্বরীতে স্থায়ীভাবে বাস করবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে, তাহলে তার বলবার কিছু নেই। তাহের প্রতিবাদ করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। 'তাহলে বাসা আপনাকে একটা নিতেই হবে'— ক্যাপ্টেন এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করে আবার নীরব হয়ে যায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, বাসার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আসলে সে এখনো পরশু রাতের সেই বিচার ও প্রাণদণ্ড দানের ভেতরেই ভ্রমণ করছে। এই অনুমানের সত্যতা অবিলম্বে প্রমাণিত হয়। ক্যাপ্টেন জানতে চায়, তাহের কি আজমীর-পিপাসুকে প্রাণদণ্ড দানের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে? যদি তার কোনো প্রকার বক্তব্য থাকে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় জানাতে পারে। বস্তুত, ক্যাপ্টেন প্রত্যয় প্রকাশ করে যে, তাহের ব্যাপারটি আদৌ অনুমোদন করে নাই। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল আগের ঔৎসুক্য সহসা আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয়, যেন তাহেরের অনুমোদন প্রকাশের ওপর তার সমস্ত অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক রকমে নির্ভর করছে। তাহের বিস্মিতবোধ না করে পারে না। তার অনুমোদন এই তরুণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কীসে? নাকি, এ তার, তাহেরের চিত্তবিভ্রম? সে গভীর সন্ধানী চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকায় এবং দেখে, তখনো সে একই প্রকার আশঙ্কায় দোদুল্যমান। অবিলম্বে তাহের একপ্রকার শক্তি অনুভব করে, দৈহিকভাবে অনুভব করে, ক্যাপ্টেনের কাছে কিছুকাল আগে যে সে নিজেকে বিক্রিত বোধ করছিল, এখন মনে হয়, মূল্যশোধ করে সে মুক্ত হয়ে উঠছে। দীর্ঘকাল বন্দি থাকবার পর হাতের শেকল খুলে নিলেও তার উপস্থিতির অনুভব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায় না, তাহেরও এখন সেই প্রকার বোধ করে, সে এমনকি দু'হাতের আঙুল দিয়ে নিজের কবজি ঘষে, সেই অদৃশ্য শেকলের অনুভব ক্রমাগত মুছতে থাকে, তারপর টেবিলের ওপর রাখা অস্ত্রটি ঠেলে একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের চোখে আশঙ্কার ছায়া গভীরতর হয়। ক্যাপ্টেন দৃষ্টি দিয়ে পদচারণারত তাহেরকে অনুসরণ করতে থাকে। তাহের বলে, না, সে হত্যায় বিশ্বাস করে না। মৃত্যু দ্বারা মানুষের পতন-সম্ভাবতা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায় না। অপরাধীর মৃত্যুতে অপরাধের উৎস নিষ্ফলা করে দেয়া যায় না। আদিম সমাজে, গোষ্ঠী এবং গ্রামের বাইরে যখন জগতের অস্তিত্ব ছিল না, তখন হয়ত হত্যার মাধ্যমে অপরাধের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব ছিল, বস্তুতপক্ষে, প্রাণের বদলে প্রাণ— এই ধারণার জন্ম হয় বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র সমাজে, বর্তমানে সহস্র গ্রাম এবং কোটি মানুষ, এবং তাও বহির্বিশ্ব থেকে কোনো প্রকারেই বিচ্ছিন্ন নয়, এমতাবস্থায় এ নীতি নিতান্তই অচল এবং শুধু তাই নয়, এ নীতি যারা অনুসরণ করে তারা নিজেরাই মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। তাহলে 'আপনি কিছুই দেখেন নি' বলে ক্যাপ্টেন সবিক্ষোভে উঠে দাঁড়ায়, প্রতিবর্তীক্রিয়াসুলভ ভঙ্গিতে টেবিলে রাখা অস্ত্র তুলে নিয়ে কাঁধের সঙ্গে ঝোলায়, বিদায় নেবার প্রস্তুতির মত তা মনে হলেও ক্যাপ্টেন বিদায় নেয় না, বরং তাহেরের বিছানার ওপর দৃঢ় আসন নিয়ে বসে এবং জানতে চায়, তাহের মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালে কোথায় ছিল ? কতটুকু সে দেখেছে ? উদ্যত অস্ত্রের সমুখে স্তোত্রপাঠ কি মূর্খেরই স্বভাব নয় ? অত্যাচারের চাবুক হাত দিয়ে ছিনিয়ে নেয়ার বদলে, সে হাত প্রার্থনায় যুক্ত রাখাটা কি কাপুরুষতা নয় ? ক্যাপ্টেন শহর ও মফস্বলের ভেতরে তুলনামূলক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে। এ কথা সত্য যে, শত্রুপক্ষ শহরেই আক্রমণ শুরু করে প্রথমে; পাশাপাশি এটাও সত্য যে, শহরেই প্রথম শত্রুপক্ষ ফিরিয়ে আনে এক স্বাভাবিকতা, যা কৃত্রিম; কারণ, আন্তর্জাতিক দৃষ্টি শহর ভিন্ন গ্রামে ধাবিত হয় না। অতএব, শত্রুপক্ষ শহরে অত্যাচার কমিয়ে, স্বাভাবিকতার মুখোশ পরিয়ে, গ্রামে গ্রামান্তরে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। 'আমি জীবনে কখনো অস্ত্র ধরি নি'— ক্যাপ্টেন এ কথা বলে কাঁধের অস্ত্র আবার টেবিলে রাখে। কিন্তু সেই তাকে অস্ত্র ধরতে হয়েছে, অস্ত্রচালনা শিক্ষা করতে হয়েছে; কারণ, সশস্ত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা চলে একমাত্র সশস্ত্র হয়েই; বিদেশীর সঙ্গে যেমন বাক্যালাপ করা চলে একমাত্র তার ভাষা আয়ত্ত করেই, আর কোনো পন্থায় নয়। ক্যাপ্টেন হঠাৎ কোমল হয়ে যায়। তার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে আসে, হয়ত চোখের পাতায় সিক্ততার আভাস পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন বলে, সেই চারজন মুক্তিযোদ্ধা, যাদের ধরিয়ে দেয় ঐ আজমীর-পিপাসু এবং পরে যাদের মিলিটারি হত্যা করে এই স্কুল বাড়িতে এনে, তাহের কি জানে, দেশ স্বাধীন হবার পর, তাদের মায়েরা ক্যাপ্টেনকে যখন বলেছিলেন, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে, তখন যে অসহায়বোধ চেতনাকে, অস্তিত্বকে অবসন্ন করে দিয়েছিল তার অণুমাত্র কার হৃদয়ে সংক্রমিত হলে সে নীরব থাকতে পারে না। সে জানে, মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্তু মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ অসম্ভব ? ঘটনা যখন অরণ্যের রীতিতে ঘটে তখন সেই এক রীতিতে তার উপসংহার টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামের এ এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক লহমায় অশুভ শক্তিসমূহ অন্তর্হিত হয় নি; এখনো অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে। বাঙালির সবচেয়ে বড় দোষ কী জানেন ? ক্যাপ্টেন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়— উদারতা এবং নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস; সে বিজ্ঞাপন হচ্ছে, বাঙালি কবি চিত্তের অধিকারী, কোমলপ্রাণ, প্রশস্তবক্ষ। তরুণ জানতে চায়, বাঙালি ভিন্ন কীসে ? কোন জাতি কবিপ্রাণ নয়, বলতে পারেন ? এমনকি, মানুষখেকো অরণ্যবাসী মানুষেরও আছে লোকজ গান আর কবিতার ঐতিহ্য; তাদের কোনো কোনো উদাহরণ পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম। তাছাড়া, মানুষ মাত্রেই প্রকৃতির প্রতিটি বর্ণবদলে দুলে ওঠে, প্রতিটি মর্মর তোলে প্রতিধ্বনি। শুধু মানুষ কেন, যে-কোনো প্রাণীর বেলাতেও তা সত্য; পূর্ণিমা রাতে, বাড়ির পেছনে পরিত্যক্ত অঙ্গনে এমন কুকুর আপনিও দেখেছেন, যে সমুখের দুই থাবা তুলে সুগোল চাঁদ ধরবার ব্যর্থতায় চাপা আর্তনাদ করে উঠেছে। না, বাঙালির কবিপ্রাণতা দ্বিতীয়বিহীন কোনো লক্ষণ নয়। অথচ কোনো প্রকারে এই মিথ্যাটিই বাঙালির সবচেয়ে বড় গৌরবের প্রসঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর, আসুন বাঙালির হৃদয় কোমল এবং উদার, এই প্রসঙ্গে। আপনি কি দেখেন নি, পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অসংখ্যবার দুই ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ? আপনি কি দেখেন নি, বাঙালি পিতা তার সন্তানকে শাস্তি দিতে গিয়ে সারাদিন ভাঁড়ার ঘরে আটকে রেখেছে

শিকল বন্ধ করে ? আপনি জানেন না, বাংলা কোনো ছবিই সফল নয়, যদি সে ছবিতে না থাকে কোনো বালকের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করবার, তাকে প্রহার করবার দৃশ্য ? আপনি বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। কোথায় কবে কাকে ক্ষমা করেছে বাঙালি ? যাকে আপনি ক্ষমা বলবেন, আসলে তা দুর্বলতা। বাঙালি যদি শত্রুকে কখনো ক্ষমা করে থাকে তো, বলতে হবে, প্রতিশোধ নেবার মত যোগ্যতা বা শক্তি ছিল না বলেই অন্য প্রকার জিৎ-এর সন্ধানে সে ক্ষমার কথা উচ্চারণ করেছে। আর এতেই প্রমাণিত হয়, বাঙালি কতটা চতুর যে নিজের দুর্বলতাকেও সে মহৎ পোশাকে সজ্জিত করতে সক্ষম। আসলে, বাঙালি চরিত্রের যদি কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে তো তা হচ্ছে, বিজ্ঞাপনে আস্থা। তাই বাংলাদেশে যেমন যৌনদুর্বলতার প্রতিষেধক, শূলব্যথার ঔষধ বিক্রি হয় লক্ষ লক্ষ টাকার, তেমনি বাঙালি কবি, বাঙালি কোমলপ্রাণ, তথা বাঙালি মানবকুলে মহৎ গোষ্ঠী, খয়ের-গোলা পানির মত এই সালসাটিরও অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করে উপদংশের মত প্রাণঘাতী এই মিথ্যার চিকিৎসা এখন সবচেয়ে আশু প্রয়োজন, এবং তার সময় এখনই। ক্যাপ্টেনের বক্তব্যের সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না তাহের এমনকি অনুমোদনও করতে পারে না, বস্তুত, সে তার কথার প্রবাহে ছিন্নমূল তৃণের মত আবর্তিত হয়ে তলিয়ে যায়। অচিরে একটা গুরুগুরু ধ্বনি ওঠে; সে ধ্বনির উৎস সহসা বোঝা যায় না। বহুদূরে বৈশাখের মেঘের মত চাপা একটা গর্জন ক্রমশ নিকটতর হতে থাকে। ক্যাপ্টেন এবং তাহের, দু'জনেই একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে শোনে সে স্থিরলক্ষে অগ্রসরমান ধ্বনি, এবং দু'জনেই প্রায় একই সঙ্গে উপলব্ধি করে যে, জলেশ্বরীতে রাতের ট্রেন আসছে। ক্যাপ্টেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আগেকার সমস্ত চিন্তা অভিব্যক্তি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় তার চেহারা থেকে, তার চিত্ত থেকে। কেমন একটা ব্যাকুলতা তাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়। এক ধরনের অনিশ্চয়তা তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে থাকে। 'ঢাকা থেকে আমার স্ত্রীর আসবার কথা'— এই কথা বলে ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়। তাহেরের প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, তার স্ত্রী ঢাকায় থাকে, আজ সকালেই টেলিগ্রাম পেয়েছে, সে আসছে; আসলে সে ইস্টিশনে যাবে বলেই এদিকে এসেছিল, সময় ছিল বলে তাহেরের সঙ্গে দেখা করে যায়। ক্যাপ্টেনকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখায়। সে দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ কী তাহের বুঝে উঠতে পারে না; হঠাৎ তার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা উপলব্ধি করে তাহের। আসলে সে ধারণা করতে পারে নি যে ক্যাপ্টেন বিবাহিত; তার স্ত্রী কেন ঢাকায় থাকে তাও তার হৃদয়ঙ্গম হয় না; তার এক প্রকার সন্দেহ হয়, ক্যাপ্টেনকে যদিও জলেশ্বরীতে স্থায়ী বাসিন্দা বলে মনে হয়েছে তার, আসলে সে হয়ত তা নয়। তাহের এক প্রকার নিশ্চিত হয়, যে, এই তরুণের অনেক কিছুই তার জানা নেই। সে প্রবলতর আকষর্ণ বোধ করতে থাকে ক্যাপ্টেনের প্রতি। তাহের বলে, তার যদি আপত্তি না থাকে ইস্টিশনে সেও যেতে চায়। ক্যাপ্টেন হাত তুলে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে। তাহের তবু নিরুৎসাহ হয় না। এক্ষুণি তার ঘুম আসবে না, হাতেও কোনো কাজ নেই, অতএব ইস্টিশনে একবার বেড়িয়ে এলে মন্দ হতো না, এই যুক্তি উপস্থাপিত সে করে ক্যাপ্টেনের সম্মতির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে। ক্যাপ্টেন আরো একবার মাথা নাড়ে। তখন তাহের নিজের প্রতিই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইস্টিশনে যাবার জন্যেও কি এই তরুণের অনুমতি আবশ্যক ? সে কি স্বাধীন সিদ্ধান্তে বেরুতে পারে না ? তাকে জিজ্ঞেস করবারই বা কী প্রয়োজন ছিল ? অথচ, একবার যখন সম্মতি প্রার্থনা করেছে, তখন বিনা অনুমোদনে সে বেরোয় বা কী করে ? ক্যাপ্টেন তাকে

রেখে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। দূরে ট্রেনের হুইসিল শোনা যায়; রাতের অন্ধকারে এবং চিত্তের অনিশ্চয়তা চিরে সে হুইসিল অনিবার্য পরিণতির মত এগিয়ে আসে এবং প্রায় বুকের ওপর প্রবল ঘন নিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইস্টিশান এখান থেকে মাত্র দু'মিনিটের পথ। তাহের কল্পনা করতে থাকে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে। কেমন সে দেখতে ? সন্তান আছে ? কতদিন বিয়ে হয়েছে ? সে যদি ঢাকায় তো ক্যাপ্টেন কেন জলেশ্বরীতে ? কতদিন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ? টেলিগ্রাম করে হঠাৎ আসবার কারণই বা কী ? মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না এই দুর্বিনীত প্রশ্নগুলো। তার নিজের স্ত্রীর কথা আভাস একবার মনে পড়ে যায়। বিয়ের পর থেকে কোনোদিন তারা আলাদা হয় নি, একটি দিনের জন্যেও তারা একজন আরেকজনকে ফেলে কোথাও থাকে নি। তাহেরের শ্বশুরবাড়ি ঢাকাতেই, তাই সেখানে যাবার হলে দু'জনে এক সঙ্গেই গিয়েছে। একবার একমাস সে ছিল শ্বশুর বাড়িতে; সেখানে থেকেই সে ইস্কুল করতে যেত। একদিনের কথা মনে পড়ে যায় তার। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ভুল করে সে নিজের বাড়িতে গিয়েছিল, বাড়িতে পৌঁছেই তার স্মরণ হয়, স্ত্রী বাপের বাড়িতে এবং সেও সেখানে অতিথি। মনে পড়ে, তালা খুলে ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ এক শূন্যতাজড়িত উদ্বেগ তাকে আক্রমণ করেছিল, সে আক্রমণে এতটাই পরাস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। হাসনাকে এ কথা বলতেই সে হেসে উঠেছিল; বড় নির্মম মনে হয়েছিল তার সেই হাসি, খণ্ড খণ্ড কাচের ওপর দিয়ে প্রবল জলধারা বয়ে যাবার মত ভঙ্গুর হাসি। সেই শূন্যতা, সেই উদ্বেগ কি ক্যাপ্টেন কখনো বোধ করে নাই ? কিংবা তার স্ত্রী ? কীভাবে তারা গ্রহণ করেছে এই বিচ্ছেদ ? এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে প্লাটফরমে, এতক্ষণে তারা হয়ত বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। কোথায় ক্যাপ্টেনের বাড়ি ? শহরের ভেতর ? শহরের বাইরে ? আজ রাতেও কি ক্যাপ্টেন বেরুবে তার প্রতিরাতের পাহারায় ? আজ রাতেও কি দূর অন্ধকারের ভেতর শোনা যাবে ক্যাপ্টেনের সঙ্কেত ধ্বনি; এ-এ-রে-এ-এ ? ধ্বনিটা সে সারারাতে একবারও শুনতে পেয়েছিল কিনা, স্মরণ হয় না; ক্যাপ্টেনের স্ত্রী এসেছে কি না, সারাদিনে তাও জানা যায় না। জন-মজুর দু'জন বিকেলের মধ্যেই ইস্কুলের পেছনে জংলা জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলে, সেখানে একটা ডোবা উদ্ঘাটিত হয়, কিন্তু সাপের কোনো বাসার চিহ্ন দেখা যায় না। পরাণ কার্বলিক এসিড এনে আপিস ঘরের চারকোণে রেখে দেয়। জন-মজুর দু'জন হাত পেতে পয়সার জন্যে অপেক্ষা করে, তাহেরের কাছে দেবার মত আর অর্থ নেই, তাদের সে অনুরোধ করে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা, কাল ইস্কুল খুলবে, দুপুরের দিকে তারা যদি আসে তাহলে অবশ্যই বাকি মজুরি তারা পেয়ে যাবে। বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে তারা সংসারের দুরারোগ্য অভাবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে, তাহেরকে মনোযোগ দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তা শুনতে হয়, কারণ, মজুরি না দিতে পেরে যে সংকোচ সে বোধ করে তা মনোযোগ দিয়ে লঘু করা সহজতর হয় তার পক্ষে। অবিলম্বে সে হাকিম সাহেবের উদ্দেশে বেরোয়। সম্ভব কাছারিতে তাকে এখন পাওয়া যাবে। হাফেজ মোক্তার ঢাকায়, তার অনুপস্থিতিতে ব্যয় সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত একটা পথ হাকিম সাহেব অবশ্যই করে দিতে পারবেন। ক্যাপ্টেন যদিও বলেছিল, অসুবিধা হলে তাকে খবর দিতে, তাহের সে প্রেরণা বড় একটা বোধ করে না। বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের প্রতি সে একই সঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বোধ করতে থাকে; ক্যাপ্টেনের সঙ্গে প্রতি সাক্ষাতেই এক প্রকার রহস্যময়

অনিশ্চয়তা গাঢ়তর হতে থাকে তার চিত্তে। কাছারিতে হাকিম সাহেবকে পাওয়া যায় না। কেউ বলে, তিনি মফস্বলে গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নাই। কেউ তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়ারই আবশ্যকতা বোধ করে না। তাহের অনুভব করে প্রতিটি মানুষ অতি সাধারণ নিষ্পাপ যে কোনো প্রশ্নের সাক্ষাতেই কেমন সংকুচিত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্তে একটা কাঠিন্য এসে চেপে ধরে, মানুষগুলো শামুকের মত গুটিয়ে যায়। যে-কোনো প্রশ্নই তারা ঘোরতর সন্দেহের সঙ্গে শ্রবণ করে এবং শীতলতম উপেক্ষার সঙ্গে নীরব থাকে। কাছারির আঙিনায় প্রচণ্ড হট্টগোল আর অনবরত চলাচলের ভেতরে তাহের নিজের নীরবতা এবং ধৈর্য আরো প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে থাকে। সারা বিকেল উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার পর বাজারের মসজিদে মোয়াজ্জিনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ লাল হয়ে যায়; অনতিপরে ঘোর সন্ধ্যার আক্রমণে দিনের অপমৃত্যু হয়; নিরুত্তেজ হ্যাজাকের আলোয় দু'একটা দোকানের অভ্যন্তর আংশিক দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র, বাকি দোকানপাট কোনো এক নীরব সংকেতধ্বনি শুনে ঝটপট বন্ধ হয়ে যায়; অচিরে এবং বলীয়ান স্তব্ধতা একই সঙ্গে জলেশ্বরীতে নেমে পড়ে। আজ রাতের ভেতরেই টাকা তাকে সংগ্রহ করতে হবে। কাল দশটায় ইস্কুল খুলবে। শিক্ষক বিনা একা সে কী করে গোটা দিনটা সামলাবে, সেটাও একটা প্রধান উদ্বেগ হয়ে তাকে দংশন করতে থাকে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধাবোধও তাকে রেহাই দেয় না। হাকিম সাহেবের কুঠিতে বারান্দার বেঞ্চে তাহের অপেক্ষা করে; তার চতুপার্শ্ব থেকে শুরু করে সমুখে যতদূর চোখ যায় অন্ধকার ক্রমশ পুরু হয়ে ওঠে। তারপর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে নানা প্রকার শব্দ উঠতে থাকে, পায়ের শব্দ, গরুর গাড়ির শব্দ, গাছের ভেতরে বাতাসের দৌরাত্মের শব্দ এবং নিস্তব্ধতার ভয়াবহ শব্দ। সাপের ভয় নতুন করে মনের মধ্যে উদিত হয়, কিন্তু আর সে ভয় করে না; চিত্তের এই অবস্থাকে ভয়ের ওপর জয়ী হবার স্পর্ধা বলা যায় না, ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর যে বিকারহীনতার জন্ম হয়, তার চেতনায় এখন সেই প্রতিক্রিয়াহীন পাথরের আবির্ভাব ঘটে। থেকে থেকে কবাজিতে বাঁধা ঘড়ির শব্দ প্রবল হয়ে ওঠে। তাহের নিজের ভেতরে ক্রমশ এক প্রকার ক্রোধের উষাও ছড়িয়ে পড়তে দেখে, এবং তা খানিকটা অসহায় চোখেই সে দেখে; এই ক্রোধ কেন, বা কার প্রতি, তা সহসা বোঝা যায় না; তবে, ক্রোধের আগমনে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা অনেকটা সুসহ বলে প্রতিভাত হয়। আর্দালিটি একবার এসে তাকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করে। সে তাকে উৎসাহ দেয় না। তবু আর্দালিটি জাঁকিয়ে বসে এবং ঢাকা সম্পর্কে জানতে চায়। আপনাদের ওখানে মিলিটারি কেমন অত্যাচার করেছিল? ক'জন ছাত্রীকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল? তাদের কি পরে জীবিত পাওয়া গেছে? এখানে তো অনেকেরই এ সর্বনাশ হয়। আচ্ছা, সে শুনেছে, ধর্ষিতা অনেক মেয়েই গর্ভবতী হয়, তাদের সন্তানগুলো কোথায়? আর্দালি তার মতামত প্রকাশ করে যে এইসব সন্তান অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলা আবশ্যক, কারণ জন্তুর ঔরসে যে সন্তানের জন্ম সেও পরবর্তীকালে জন্তুতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। জলেশ্বরীতে এ রকম সন্তান একটিও নেই, এ কথা সে বিশেষ জোর দিয়ে ঘোষণা করে। সে আরো বলে, জারজ এই সন্তানেরাই শুধু নয়, তাদের মায়েরাও বংশের কলঙ্ক। এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা শোনা যায় অবিলম্বে। আর্দালিটি বলে, বহু ধর্ষিতা রমণী জলেশ্বরীতে হয় আত্মহত্যা করে, অথবা নিজেরাও উধাও হয়ে যায়; তারা প্রশংসার পাত্রী, ধীমতি এবং সমাজের গৌরব বিশেষ। ঢাকার কী পরিস্থিতি? তাহের তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। অবিচল নীরবতাকে

আশ্রয় করে সে হাকিম সাহেবের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে আর্দালিটি উঠে দাঁড়ায় এবং নিরসকণ্ঠে বলে যায়, হাকিম সাহেব কখন ফেরেন, তার কোনো ঠিক নাই, তার মতে অপেক্ষা করাটা নিষ্ফল। আবার সেই অন্ধকার তাহেরের অস্তিত্বের ভেতরে হাতির মত শুঁড় ঢুকিয়ে দেয়, তার হৃৎপিণ্ডকে বেষ্টিত করে টান দিতে থাকে। ছাদে আংটার সঙ্গে ঝুলন্ত তার স্ত্রীর মৃতদেহ অত্যন্ত মৃদু এবং মানসিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অচিরে তা অন্তর্হিত হয় না, অধিকতর উজ্জ্বলতাও তাকে দীপ্তি দেয় না; ছবিটা ফিরে আসে এবং থেকে যায়। হঠাৎ তার বুকের ওপর অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রপাত লাফিয়ে পড়ে, আলোটা যেন দেহপ্রাপ্ত হয়ে তাকে বেগ্গের সঙ্গে চেপে ধরে, স্ত্রীর ছবিটা তলিয়ে যায়, দৃষ্টির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, সমুখে সে কিছুই দেখতে পায় না।

অবিলম্বে উধাও হয়ে যায়, অন্ধকার যেন একটিমাত্র গ্রাসে উদরস্থ করে ফেলে। আলো বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রের ঘর্ঘর শুনতে পায় এবং অনতিপরে সেটাও থেমে যায়। জিপ গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে হাকিম সাহেব নেমে আসে এবং তাহেরের ওপর টর্চের আলো ফেলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। বহুক্ষণ সে অপেক্ষা করছে শুনে আর্দালিকে ডেকে ধমক লাগান। কেন তাকে ভেতরে আলো জ্বেলে বসতে দেয়া হয় নি। তিনি চিৎকার করে জানান যে, তিনি যতক্ষণ আছেন কোনো প্রকার ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন না, প্রত্যেকেরই একটা দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে এবং তিনি চান সে দায়িত্ব পালিত হচ্ছে। তাহের প্রায় হতচকিত হয়ে যায়। তাকে বসতে না দেবার জন্যে এতটা পর্যন্ত শাসন গড়াবে, তার যুক্তি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। হাকিম সাহেব ঘরের ভেতরে লণ্ঠনের শিখা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে পাশে চেয়ার টেনে বসেন এবং জানান যে, দেশে স্বাধীনতা এসেছে সত্য কিন্তু অন্তর্হিত হয়েছে নিয়ম। তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখায়, চুল উষ্কখুষ্ক ধুলোর পরত তাতে, ট্রাউজার মথিত এবং কর্দমাক্ত। সাক্ষাৎ করতে আসবার কারণ তিনি তাহেরের কাছে জানতে চান। হাফেজ মোক্তার কবে পর্যন্ত ফিরবেন তা তারও জানা নাই। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন; টাকার ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় সহসা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। একবার এ রকমও বলেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে তাহেরের উচিত হয় নাই স্কুল পরিষ্কারের কাজে হাত দেয়া। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ না করে পারে না তাহের। সম্ভবত তার কণ্ঠে বিরক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবিলম্বে হাকিম সাহেব মাথা দুলিয়ে স্বীকার করেন যে, স্কুল খোলার আগে পরিষ্কার করা অবশ্যই কর্তব্য। তবে, টাকার কী ব্যবস্থা করা যায়। হাকিম সাহেব প্রায় কৈফিয়ত দেবার সুরে বিনীতভাবে নিবেদন করেন যে, সারাদিন তাকে মফস্বলে ব্যয় করতে হয়েছে বিশেষ একটা জরুরি কাজে, সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন, পথ অত্যন্ত খারাপ, পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছেন; হাকিম সাহেব আশ্বাস দেন, কাল একটা ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন, তাহের যেন নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে যায়। অকস্মাৎ তিনি প্রশ্ন করেন, ইস্কুলেই থাকবার ব্যবস্থা করাটা কি সঙ্গত হয়েছে? তাহের বুঝতে পারে না আজ তার হয়েছে কী? যে-কোনো কথাই তার চিত্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। সে এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং তা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সে জানতে চায়, সবাই তাকে ইস্কুলে থাকবার ব্যাপারে এত সন্দেহ প্রকাশ করছে কেন? হাকিম সাহেব আবারো কৈফিয়ত দেবার সুরে জানান, না, তাহেরকে তিনি অন্য কোনো অর্থে প্রশ্নটা করেন নাই; তবে, ইস্কুলে থাকাটা কোনো স্থায়ী সমাধান হতে পারে না; বরং সে যতদিন ইস্কুলে থাকবে, অন্তত হাকিম

সাহেব মনে করবেন যে, সে এখনো ইস্কুলের চাকুরিতে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়া স্থির করতে পারে নি। হাকিম সাহেব হঠাৎ উদার হয়ে জানান, তাহেরের স্বাধীনতা আছে যে-কোনো জায়গায় বাসা করবার, তবে নিতান্ত কৌতূহল হয়েছিল বলেই তিনি প্রশ্নটা করেছেন, তাহের যেন কিছু মনে না করে। এই একই সন্দেহ ক্যাপ্টেনও প্রকাশ করেছিল। তাহেরের চিত্তে ক্যাপ্টেন প্রভুত্ব বিস্তার করে থাকে। ক্যাপ্টেন সম্পর্কে তার জানবার কৌতূহল হয় এবং সে স্থির করে হয়ত হাকিম সাহেব কিছু জানাতে পারবেন তাকে। হাকিম সাহেব তার বাবড়িতে দ্রুত হাত ঘষতে ঘষতে জানান যে, ক্যাপ্টেন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তিনি জানেন না; শুধু এটুকু বলতে পারেন যে, ক্যাপ্টেন জলেশ্বরীর ছেলে, মুক্তিযুদ্ধের বছর তিনেক আগে সরকারি চাকুরিতে ঢোকে, বেশ বড় চাকুরি, সম্ভবত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিল সে, তারপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সে ঢাকা থেকে পালিয়ে যায় এবং এই জলেশ্বরীতে এসে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। আপনার সঙ্গে তার আলাপ হলো কোথায়? হাকিম সাহেব সরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাহেরের দিকে এবং অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে তার সদুত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রশ্নের সুরেই তাহের অনুভব করে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার আলাপ হওয়াটা হাকিম সাহেবকে কিছুটা সতর্ক করে তুলেছে। তাহের অর্ধসত্য উচ্চারণ করে; সে জানায় প্রথম দিন ক্যাপ্টেন ইস্টিশনে তাকে দেখে নিজেই আলাপ করে এবং হোটেলের পথ দেখিয়ে দেয়। হাকিম সাহেব এ উত্তরে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হন বলে মনে হয় না; তিনি হয়ত মনে মনে অনুসন্ধান করে চলেন, এখন ক্যাপ্টেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার কারণ। অনতিপরে তিনি সখেদে মাথা দোলান ধীরে ধীরে; তারপর আরো ধীরগতিতে উঠে দাঁড়ান আসন ছেড়ে এবং সমুখে উপবিষ্ট তাহের এবং চতুপার্শ্বের অবিচল অন্ধকারের উদ্দেশে তিনি অস্ফুটস্বরে বলেন যে, এই ক্যাপ্টেন হচ্ছে গোলমালের প্রধান সূত্র। হাকিম সাহেবের ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, গোলমালের প্রকার যাই হোক না কেন তার মীমাংসা তার আয়ত্বের বাইরে। তাহের উঠে দাঁড়ায়। সতর্কতার সঙ্গে জানতে চায়, হাকিম সাহেব এ কথা কেন বলছেন? 'খবরের কাগজ তো পড়েন'? হাকিম সাহেব তিক্ত স্বরে এই খোঁচা দিয়ে জানান, যে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অস্ত্র জমা দেবার জন্যে সাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যে সরকারি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও ক্যাপ্টেন বা তার অনুচর কেউই অস্ত্র জমা দেয় নি; পরমুহূর্তে তিনি বক্তব্য সংশোধন করে জানান যে, হ্যাঁ তার অস্ত্র জমা দিয়েছে বটে, তবে সব অস্ত্র নয়; লোক দেখাবার জন্যে সামান্য কয়েকটা রাইফেল আর পিস্তল তার কাছারিতে নিয়ে আসে, কিন্তু আরো মারাত্মক আরো উন্নত বহুবিধ আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছেই রেখেছে এবং এইসব অস্ত্রের সাহায্যে জলেশ্বরীতে বলতে গেলে পাল্টা একটা প্রশাসন খাড়া করেছে। হাকিম সাহেব তাহেরকে এই ভৌগলিক জ্ঞানটিও দেন যে, জলেশ্বরী সীমান্তবর্তী মহকুমা, কাজেই এখানে পাল্টা প্রশাসন থাকার অর্থ অত্যন্ত ক্ষতিকর অরাজকতা বর্তমান থাকা। কঠিন এবং বিরস কণ্ঠে হাকিম সাহেব বলেন, জলেশ্বরীতে এখন কার শাসন চলছে কেউ বলতে পারে না। তিনি আছেন সরকারের প্রশাসনের তরফে, ক্যাপ্টেন হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ, আর হাফেজ মোক্তার, যেহেতু তিনি যে রাজনৈতিক দলভুক্ত সেই দল দেশে এখন সবচেয়ে বড় দল তাই তিনি নিজেকে রাজ-কর্মচারী বা গেরিলাদের চেয়ে শক্তিধর মনে করেন। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে হাকিম সাহেব হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠেন; আচ্ছা, আপনি এখন যান, কাল আমি একবার ইস্কুলে আসব বলে তাহেরকে আচম্কা বিদায় দেন তিনি, লণ্ঠনের

আলোয় অস্পষ্ট উদ্ভাসিত পেছনের একটা দরোজা দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হয়ে যান যেন কোন পার্বত্য গুহার ভেতরে ঢোকেন। তাহের বেরিয়ে আসে; কুঠির সামনে একজোড়া তাল গাছের ভেতর দিয়ে সড়কে পৌঁছুবার পথ, সে পর্যন্ত গিয়ে তাহের হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়; কেন দাঁড়ায় তা সে বুঝতে পারে না; তার গা ছমছম করে ওঠে। সমুখে পথ ভাল করে চোখে দেখা যায় না, চেতনা দিয়ে অনুভব করা যায় শুধু, সেই পথের ওপর নরোম ধুলোয় পা পড়তেই প্রসঙ্গহীন একটা উদ্বেগ তাকে নিমেষে বিদ্ধ করে স্থির হয়ে থাকে। তাহেরের মনে হয়, তার কোনো গন্তব্য নির্মম যাদুকর সমস্ত বাড়িঘর অবলুপ্ত করে দিয়েছে, রেখে দিয়েছে পায়ের নিচে এই প্রতারক কোমল পথ। অবসন্ন পায়ে তাহের এগুতে থাকে; বাঁ দিক দিয়ে এগুলে সোজা চৌরাস্তায় পৌঁছে যাবে সে, তারপর ডান দিকে কিছুদূর গেলেই ইস্কুল, সে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ইস্টিশনে। একের পর এক শহীদদের নামাংকিত সব সড়ক; যেন মৃত্যুর রাজত্বের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, পায়ের নিচে এই কোমলতা মৃতমাংসের, মুখমণ্ডলে বাতাসের শীতলতা প্রেত-উপস্থিতির, দু'পাশে গাছের পাতাপত্রে সরসরধ্বনি গূঢ় সংলাপের। ক্যাপ্টেন যে একদা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিল, এই সংবাদ তাহের এই পরাবাস্তব পরিস্থিতির ভেতরেও বিস্মৃত হতে পারে না; ক্যাপ্টেনের সংলাপ, মুখের অভিব্যক্তি, চিত্তের বিশ্বাসগুলো খণ্ডিতভাবে এখন তার মনে পড়তে থাকে এবং এখন সহজ হয় বোঝা যায়, তার গ্রামীণ পোশাক সত্ত্বেও প্রথম দৃষ্টিতেই কেন তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে তার মনে হয়েছিল। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর ঢাকায় অবস্থানের কারণও এখন সে বুঝতে পারে। তার এক প্রকার সংকোচ হয় যে, ক্যাপ্টেনকে সে অর্ধশিক্ষিত শক্তিমদমত্ত গ্রাম্য যুবক বলে ধারণা করে এসেছে। নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারে না। মানুষ সম্পর্কে এক তরফা ধারণা করবার এই প্রবণতা থেকে এখনো সে মুক্ত হতে পারে নি বলে তার অনুতাপ হয়; অনুতাপে সে খিন্ন বোধ করতে থাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পরেই তার বাড়ি লুট হয়ে যায়; তার কষ্টোপার্জিত অর্থে কেনা, দিনের পর দিন সঞ্চিত স্মৃতিতে বর্ধিত মূল্যসম্পন্ন প্রতিটি জিনিস তস্করের হাতে চলে যায়। সেই থেকে বস্তুর প্রতি তার অধিকার বোধ অন্তর্হিত হয়ে যায়; এখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত মনে করতে পারে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা থেকে। ঠিক একই প্রকারে মানুষ সম্পর্কেও তার দৃষ্টিভঙ্গির বদল হওয়া উচিত ছিল। মানুষের প্রতি যে প্রকার দৃষ্টিপাত করতে সে আজীবন অভ্যস্ত ছিল তারও আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলেই তার বিশ্বাস ছিল। তার মনে পড়ে যায়, ঢাকায় যখন সে নিজের বাড়িতে থাকা আর নিরাপদ বোধ করে নাই, পরে যখন ঢাকা শহরে থাকাটাই তার কাছে অরণ্যবাসের চেয়েও বিপদসংকুল মনে হয়েছে, সেই তখন আশ্রয়ের সন্ধানে, ঢাকা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পথে, মানুষকে নতুন করে চিনেছে সে; আবিষ্কার করেছে এতকাল স্বাভাবিক বলে যা সে জেনে এসেছে তা কত অস্বাভাবিক, কিংবা পূর্বের প্রতিক্রিয়াগুলোই ছিল অস্বাভাবিক। বস্তুত, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের মধ্যে কোনো প্রকার সীমিত সে দেখতে পায় নাই; বিশেষ মুহূর্তের প্রয়োজনে তার ধারণাকৃত নিয়মের উদ্ধত প্রকাশ্য খণ্ডন সে দেখেছে কতবার। মুক্তিযুদ্ধের পর, পেছনের দিকে তাকিয়ে তাহেরের মনে হয়েছিল তার অতীত সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে গেছে তার জীবন থেকে, এবং বিযুক্ত সে অতীত অন্য কারো, তার নিজের নয়; একটা আকস্মিক মৃত্যুর পর তার নতুন করে জন্ম হয়েছে; নতুনভাবে জীবন শুরু করবার জন্যে জাতিস্মর সে স্মরণ করেছে পূর্বে তার জন্ম হয়েছিল যেখানে, সেখানে সে ফিরে এসেছে; অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ বারবার

ফিরে আসে সূক্ষ্মদেহে তার পরিচিত পৃথিবীতে, এই সংস্কারটি তার নতুন এ অস্তিত্বেও লক্ষ করা যায়, প্রেতাত্মা যেমন অপঘাতের কারণ দূর করতে চায়, সড়ক দুর্ঘটনায় যার মৃত্যু সে প্রেতাত্মা যেমন সড়কের ওপর মধ্যরাতে এসে যানচালককে সতর্ক করে দেবার জন্যে ভয়াবহ নীরব চিৎকার করে ওঠে, তাহেরও তেমনি জলেশ্বরীতে আসে আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে, মানুষের পতন গোড়া থেকে ঠেকাতে, আর তাই জলেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা সে গ্রহণ করে; নতুন একটা চেতনাকে সে ধনাত্মক করে তুলবে। তার এ ইচ্ছা যদি বালসুলভ বলে প্রতিভাত হয়, তাহলে গোটা মানবজাতির প্রতিটি স্বপ্নই বালসুলভ; কারণ, সত্য এই যে বাস্তব কখনোই স্বপ্নের অনুরূপ নয়, সম্ভবত বাস্তবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা তখনি যখন বাস্তব স্বপ্নের অভিমুখী হয়ে থাকে। তাহেরের মনে হয়, এই মুহূর্তে তার কল্পনাগত বাস্তব কোনো অর্থেই স্বপ্নের অভিমুখী নয়। এর জন্যে দায়ী করে সে নিজেকে, নিজের পূর্ব সংস্কারগুলোকে, যে সংস্কার তাকে এখনো মানুষ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা গ্রহণ করতে সাবলীলভাবে প্ররোচিত করেছে। ক্যাপ্টেনের প্রতি তার চিন্তা ধাবিত থাকে। চিন্তা যেন একটা দীর্ঘ সপ্রাণ, স্বাধীন রশি, পলকে পলকে অন্তহীন সেই রশি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সবল সরীসৃপের মত বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয় এবং তার পথে যা কিছুই পড়ে সমস্ত কিছুকে চোখের নিমেষে বেষ্টিত করে সে আবার অগ্রসর হয়। আজমীর-পিপাসু যে চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেয় এবং নির্মমভাবে যারা জীবন থেকে অপসারিত হয়, তাদের চোখে না দেখলেও তাহেরের চোখের ওপর অস্পষ্ট চারটি তরুণ মুখ সরসর করে নেমে আসে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎপটে আঁকা চিত্রের মত। চিন্তার রশি মুখাবয়বগুলোকে বেষ্টন করে অবিলম্বে ধাবিত হয় এবং এখন একটি শব্দকে আত্মসাৎ করে নেয়। সে শব্দ আগ্নেয়াস্ত্রের, সেদিন রাতে হোটেলে শুয়ে থেকে যে শব্দটি তাহের শুনেছিল। অবিলম্বে একটা নয়, অনেকগুলো শব্দ শুনতে পায় তাহের; তার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, স্মৃতির এ প্রকার আচরণ তাকে হতবিহ্বল করে দেয়। সে রাতে শোনা একটিমাত্র শব্দ, ক্যাপ্টেনের বিবরণ অনুসারে একই সঙ্গে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্রের মিলিত শব্দ; এখন বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তারপর হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে যায়। যে নীরবতা দ্রুতবেগে ফিরে আসে তার ভেতরে দাঁড়িয়ে অণুমাত্র স্মরণ করবার উপায় নেই যে একটু আগেই এ নীরবতা ছিল অনুপস্থিত। তাহের সিদ্ধান্ত করে, তার চিত্তের ওপর থেকে নিজের প্রভুত্ব কোনো অজ্ঞাত কারণে শিথিল হয়ে পড়েছে, তাই নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, যার একটি তো এইমাত্র লক্ষ করা গেল, অতীতে শ্রুত একটিমাত্র শব্দের রক্তবীজসম্ভব সংখ্যা বর্ধন। সাপের ভয়ও করতে থাকে তার। মনে পড়ে যায়, জলেশ্বরীতে ছোটবেলায় তার ক্লাসের একটা ছেলেকে সাপে কেটেছিল; একদিন সে আর ক্লাসে আসে নাই; তাহেরের মনে হয়েছিল, ছেলেটি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গেছে, কিন্তু সে ছেলে আর ফেরে নাই। তাহের সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়; মাঝে মাঝে তালি দিয়ে শব্দ করে, সাপ থাকলে সরে যাবে। হঠাৎ আবার গুলির শব্দ শোনা যায়; এবারের শব্দ এক ঝাঁক পাখির মত অন্ধকারের ভেতর দিয়ে উড়ে যায়। এতক্ষণে তাহের অনুভব করে, আসলে, এখনকার এবং ইতিপূর্বের সমস্ত গুলির শব্দই বাস্তবিক, মানসিক নয়। কয়েকটা সড়ক ওপার থেকে অস্পষ্ট কোলাহল শোনা যায়, অবিলম্বে সে কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায়। গত কয়েকদিনে তাহের গুলির শব্দে এক প্রকার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার পথ চলতে শুরু করে ক্যাপ্টেনের কথা অনিবার্যভাবে আবার তার মনে পড়ে।

চিত্তের একটি কোণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে ক্যাপ্টেনের সংকেত ধ্বনি এ-এ-রে-এ-এ শোনার জন্যে। সে ধ্বনি শোনা যায় না। ক্যাপ্টেন কি আজো পাহারায় বেরোয় নি ? সম্ভবত কাল রাতে তার স্ত্রী এসে গেছে। ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায় জানা থাকলে তাহের হয়ত একবার এখন সেখানে যেত। হাকিম সাহেবের মুখে তার পূর্বপরিচয় জানবার পর থেকে ক্যাপ্টেনকে একবার দেখবার ইচ্ছা থেকে থেকেই মনের মধ্যে মাতামাতি করছে। অন্ধকারের ভেতরে অতিকষ্টে হাতঘড়িটা দেখে অনুমান হয়, ট্রেন আসবার সময় হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেনকে হয়ত ইস্টিশনে পাওয়া যাবে; মনে হয়, ট্রেনের সময়ে ইস্টিশনে হাজির থাকাটা তার রেওয়াজ; অবিলম্বে ইস্টিশনের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহের। বাঁ হাতে স্কুলটা ফেলে তাহের সেদিকেই এগোয়। এতক্ষণ অন্ধকারে পথ চলবার পর, সে আশা করে, ইস্টিশান পাড়ায় দোকানপাটের উজ্জ্বল আলোয় সে আবার সুস্থ হতে পারবে। কিন্তু, আজ একটি বাতিও দেখা যায় না; সব কটা দোকান বন্ধ এবং প্রত্যাশিত সমস্ত কোলাহল অনুপস্থিত। কেবল মিষ্টির দোকানের সামনে আবর্জনার স্তূপে একটা কুকুর নাক ডুবিয়ে আঁতিপাতি করে খাবার খুঁজছে। একটা কাশির শব্দ পাওয়া যায়। কাঠের দোকানের ভেতর থেকে শব্দটা আসে, এবং বোঝা যায়, ব্যক্তিটি তার বিদ্রোহী কাশিকে আপ্রাণ চেষ্টা করছে থামাতে কিন্তু পারছে না। ইস্টিশান ঘরে এসে দেখে একটা লোক নেই কোথাও। তাহের কি তাহলে সময় ভুল করেছে ? রাতের ট্রেন কি ফিরে গেছে অনেক আগেই ? আবার তার গা ছমছম করে ওঠে। শূন্য প্ল্যাটফরমের ওপর তাহের আরো শূন্য হৃদয় শঙ্কিতভাবে শরীরের ভেতরে ধারণা করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাস্তব এবং বিভ্রমের ভেতরেই শুধু সাবলীল স্থান বিনিময় নয়, সময় সম্পর্কে ধারণা তথা অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতে তিনটি তাসের মত পাকা কোনো খেলোয়াড়ের হাতে কেবলি নতুনতর ভিন্নতর বিন্যাস অর্জন করতে থাকে। গোটা জলেশ্বরীকে সত্য সত্যই মৃতের জনপদ বলে মনে হয় তার এবং সেখানে নিজের উপস্থিতিকে মনে হয় ভরাহাটে ঘুমিয়ে পড়া মধ্যরাতে শয্যায় জেগে ওঠা স্থির আতঙ্কে আবৃত কোনো বালকের মত। কাল ভোরে তাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে; কাল ইস্কুল খুলবে; এখুনি তার ঘুমোতে যাওয়া দরকার। অন্ধকার জনশূন্য নিস্তব্ধ প্ল্যাটফরম থেকে তাহের ইস্কুলের দিকে পা বাড়াবে এমন সময় বহুদূর থেকে সেই গুরুগুরু ধ্বনি ভেসে আসে জলজ দীর্ঘ লতার মত। অবিলম্বে রেলপথের ওপর অতিসূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করা যায়; সে কম্পন ক্রমশ প্রবল হতে থাকে; তারপর রেলপথের ওপরে বাতাসের অশান্ত একটা পাহাড়ি নদীর বাঁধ খুলে যায়, সেই স্রোতধারাকে নির্মমভাবে তাড়িত করে চারদিক কম্পিত করে ট্রেন এসে উপস্থিত হয় বিক্ষুব্ধ দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাহের পেছিয়ে গিয়ে ইস্টিশানের বারান্দায় দাঁড়ায়। মুহূর্তে প্ল্যাটফরম ভরে যায় মানুষের ভিড়ে, একে অপরকে তারস্বরে ডাকবার ধ্বনিতে শিশুর ক্রন্দনে, কুকুরের প্রতিবাদী সবিরাম গর্জনে। ইস্টিশানের আজ টিকেট নেবার জন্যেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। এতক্ষণে তাহের নিশ্চিত হয় যে, ট্রেন আসা সংক্রান্ত সময়ের ভুল সে করে নাই; বস্তুতপক্ষেই কোনো অজ্ঞাত কারণে ইস্টিশান এবং তার চারপাশের প্রতিটি মানুষ উধাও হয়ে গেছে। তাহেরের এখন প্রত্যয় হয়, তারা অন্যত্র চলে যায় নাই, এখানেই আছে, বাতি নিভিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তারা পড়ে আছে অন্ধকারের ভেতরে গহ্বর সৃষ্টি করে। দু'একজন যাত্রী টিকেট মাস্টারের সন্ধান করে, কয়েকজন বন্ধু মিষ্টির দোকানের সামনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; অবিলম্বে দেখা যায় ট্রেনের গার্ডকে

এনজিনের দিকে ছুটে যেতে; লক্ষ করা যায় গার্ড এবং ড্রাইভারের দ্রুত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মানুষেরা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে যে যার গন্তব্যের দিকে পা বাড়ায়, তাদের কোনো প্রকার উচ্চবাক্য শোনা যায় না; নিঃশ্বাস মথিত কর্কশ নীরবতার ভেতরে প্ল্যাটফরম প্রতি মুহূর্তে শূন্য হয়ে যেতে থাকে। অচিরে এনজিনের তীব্র হুইসিল শোনা যায়, গার্ড দৌড়ে তার কামরায় ফিরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে এবং সশব্দে দরোজা বন্ধ করে দেয়। হুইসিল তীব্রস্বরে ছুরিবিদ্ধ আর্তনাদ ছড়িয়ে চলে চরাচরের ওপর, তার সঙ্গে যুক্ত হয় এনজিনের ঘনঘন নিঃশ্বাসপতন, নড়ে ওঠে ট্রেন, সেই হুইসিল সেই নিঃশ্বাস সেই আর্তনাদ অব্যাহত রেখে ট্রেন পেছুতে থাকে। তাহের সহসা বুঝতে পারে, যাত্রীদের মত রাতের এই ট্রেনও জলেশ্বরী থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাচ্ছে। আজ এ ট্রেন এনজিন ঘুরিয়ে সামনে আনবার সময় নষ্ট করতেও সম্মত নয়; পলকে পলকে তার গতি বৃদ্ধি হয়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা যায় ট্রেন মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে লাইনের বাঁকে দু'পাশের জঙ্গলের ভেতরে। তাহের অকস্মাৎ অনুভব করে যে, ইস্টিশানে এসে সে বহির্গামী কোনো যাত্রীকেও দেখতে পায় নি। গোটা ঘটনা তার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও এটুকু সে বুঝতে পারে যে, এরা প্রত্যেকেই কোনো দুর্লক্ষণ দেখতে পেয়েছে, পেয়েছে কোনো মহামারীর আভাস, যা তাহের নিজে পায় নি। এ যেন, নীল পরিষ্কার আকাশের নিচে পদ্মার বুকে কোনো মাঝির হঠাৎ পূর্বাভাস পাওয়া যে কালবৈশাখী আসছে, এ যেন কোনো জন্তুর নিদ্রার ভেতরে সতর্ক লাফ দিয়ে ওঠা যে অরণ্যে মৃত্যুর পদপাত ঘটেছে। তাহের যে এর বিন্দুমাত্র আভাস পায় নি, এতে সত্য সত্যই তার উপলব্ধি হয় যে, বহিরাগত, জলেশ্বরী তার জন্মস্থান হলেও, জলেশ্বরীকে সে পৃথিবীতে অবশিষ্ট তার জন্যে একমাত্র আপন জনপদ মনে করলেও, আসলে জলেশ্বরী তাকে গ্রহণ করে নাই। যদি সে সত্য সত্যই গৃহীত হতো, তাহলে, এখন অন্যান্যদের মত সেও পূর্ব সংবাদ পেয়ে যেত। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভীষণ অবসন্ন বোধ করে এবং ইস্টিশানের বারান্দাতেই অনড় দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছায় নিশ্চেষ্ট নে ভেসে যায়; এ যেন মৃত্যুকে, অবলুপ্তিকে সাদরে ডেকে নেবার প্রেরণা, ঠিক যেমন কোনো কোনো প্রাণী স্বেচ্ছায় সমস্ত উদ্যম বন্ধ করে, শিকার সন্ধান পরিত্যাগ করে অন্ধকার গুহার ভেতরে আরো এক গাঢ় অন্ধকারের অপেক্ষা করে দিনের পর দিন। তার মনে হয়, এভাবে এক অনন্তকাল দাঁড়িয়ে ছিল সে, যখন কোনো নারীকণ্ঠে বিঘ্নিত হয় তার অপনিবিষ্টতা। ব্যাকুলকণ্ঠে নারী তার কাছে জানতে চায়, এই কি জলেশ্বরী ? উত্তর দেবার আগে তাকে ভাল করে দেখার জন্যে তাহের নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনবার প্রবল চেষ্টা করে; তা সুসাধ্য হয় না, তার কণ্ঠে শব্দের আবির্ভাব সহসা ঘটে না। বোবাচোখে সে তাকিয়ে থাকে নারীর দিকে; অন্ধকারেও এক প্রকার আলোর অস্তিত্ব সম্ভব, সে আলোয় নারীর মুখ ঈষৎ ধারণা করা যায়। নারী আরো একবার ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ইস্টিশানে জনপ্রাণীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে; জানতে চায়, আসলেই জলেশ্বরীতে সে নেমেছে কি না। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চিত হয় যে এ নারী ট্রেনে করে এইমাত্র নেমেছে এবং সে নিজে তার অস্তিত্বকে বর্তমান বাস্তবে আবার ফিরে পেয়েছে। নারীর বেশভুষা, সংলাপের ভাষা এবং পায়ের কাছে রাখা সুটকেশ দেখে তাহেরের প্রত্যয় হয়, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী গতরাতে আসে নি, এখন যে তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে ক্যাপ্টেনের স্ত্রী। কিন্তু গতরাতে সে যদি না এসে থাকে তাহলে আজ তার জন্যে ক্যাপ্টেন কেন ইস্টিশানে আসে নি, এই প্রশ্নটি পলকে তার মনে উদিত হয়। নিশ্চিত হবার

জন্যে সে জানতে চায় ক্যাপ্টেন তার স্বামী কি না। তার উত্তরে নারী জানায়, কোনো ক্যাপ্টেনের স্ত্রী সে নয়, সে বিবাহিতা বটে, ঢাকা থেকেও আসছে এবং তার স্বামীর নাম মজহার। ক্যাপ্টেনের পিতৃদত্ত নাম তাহেরের শোনা হয় নি; তার সন্দেহ হয়, মজহার ক্যাপ্টেনেরই নাম। সে নারীকে ক্যাপ্টেনের বর্ণনা দেয়, একদা রাজকর্মচারী ছিল— তাও জানায় যে, বর্ণনা তার স্বামীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বটে। নারী এ প্রত্যয়ও প্রকাশ করে যে তার স্বামী ক্যাপ্টেন নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব। নারী জানতে চায়, ক্যাপ্টেন কোথায় ? তাহের অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তার পাল্টা প্রশ্নে নারী জানায় যে, বিয়ের পর সে কখনো শ্বশুর বাড়িতে আসে নাই, অতএব সে জানে না কোন সড়কে সে বাসা। তাহের আত্মপরিচয় দেয় এবং পরামর্শ রাখে যে, নারী যদি ইস্কুলবাড়িতে আসে তাহলে পরাণকে দিয়ে খবর পাঠান সম্ভব, পরাণ অবশ্যই জানবে ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায়। নারী পথে পা দিয়ে স্বগতোক্তি করে যে, ক্যাপ্টেন তাকে নিতে আসবে না এটা তার জানাই ছিল, কারণ দায়িত্বের পরিচয় জীবনে সে দেয় নি। তাহের লক্ষ না করে পারে না যে, বিবাহিতা নারী প্রায় সকলেই স্বামী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের আগাগোড়া জীবন ধরেই টান দেয়, মুহূর্তমাত্র বিবেচনা করে না যে, বিয়ের আগে লোকটি দীর্ঘ একটি জীবন অতিবাহিত করে এসেছে এবং সে অভিজ্ঞতাগুলোর সংবাদ বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় না। হাসনাও তাহের সম্পর্কে এক প্রকার মন্তব্যই করত— তুমি জীবনে এটা করলে না, সারা জীবন দেখলাম তোমার প্রকৃতি এইই, জীবনে তুমি একবার অন্তত এটা করো ইত্যাদি ইত্যাদি। হাসনাকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করাতে গিয়ে ফল হয়েছে বিপরীত। হাসনা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করেছে কখনো কখনো। তাহের অবাক হয়ে লক্ষ করে, হাসনাকে এখন জীবিত বলে ভ্রম হচ্ছে তার, মনে হচ্ছে, কোথাও সে আছে, আর তাহের তাকে ছেড়ে সামান্য দিনের জন্যে এখানে এসেছে কিন্তু হাসনার কাছে ফিরে যাবার কোনো প্রকার তাড়া তার নেই। তার অর্থ কি এই যে, হাসনাকে সে ভালবাসত না ? হাসনা তার কাছে এমন কোনো দুর্লভ সম্পদ ছিল না যে তার অন্তর্ধানে জীবন শূন্য হয়ে যায় নি ? 'কতদিন ধরে তাকে চেনেন' নারীর এ প্রশ্নে তাহের হঠাৎ বুঝে উঠতে পারে না সে হাসনার কথা বলছে, না ক্যাপ্টেনের ? অবিলম্বে তার লক্ষ হয় যে হাসনাকে তার জানার কথা নয়, এমনকি হাসনার কথাই যে সে এখন ভাবছে তাও তার জানবার কোনো কারণ নেই। নারী সে প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে না, পর মুহূর্তে জানতে চায় এখনো কি সে দলবল নিয়ে আছে ? তাহের স্বীকার করে যে ক্যাপ্টেন সম্পর্কে তার কোনো তথ্যই জানা নেই; মাত্র দু'বার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সম্ভবত পরিচয়ের এই স্বল্পতা নারীকে বিচলিত করে; পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে ওঠে, এক প্রকার আতঙ্ক অনুভব করে; হয়ত, অপরিচিত এই ব্যক্তির সঙ্গে শ্বাসরুদ্ধকারী অন্ধকারের ভেতর অপ্রত্যক্ষ কোনো গন্তব্যের দিকে যেতে তার শঙ্কা হয়। অবিলম্বে সে থেমে পড়ে এবং কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে চায়, কোথাও কোনো মানুষের সাড়া নেই কেন তাও সে জানতে চায়। তাহের সংক্ষেপে তাকে জানায়, ঢাকার মত বড় শহর থেকে পাড়াগাঁয়ে এলে হঠাৎ এ রকম বোধ হয় বৈকি। তাছাড়া, তাকে যে পথের ওপর একা ফেলে সে যেতে পারে না এটাও সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই সত্যটিও তুলে ধরে যে, কারো না কারো সাহায্য নিয়েই তাকে তার শ্বশুর-বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। ইস্কুলের আপিস ঘরের বারান্দায় পরাণ লণ্ঠন স্তিমিত করে রেখে গেছে।

দরোজা খুলে লণ্ঠনের আলো উসকে দিয়ে নারীকে আসন গ্রহণ করতে বলে তাহের। লণ্ঠনের আলোয় তাহের হঠাৎ উপলব্ধি করে, নারী অত্যন্ত রূপসী; ঠোঁটের বঙ্কিমতায় স্পষ্ট আত্মসচেতনতার বিভাসটুকু ধরা পড়েছে, বসবার ঋজু ভঙ্গিতে উপস্থিতির সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। ইস্কুলবাড়িতে আকস্মিক এই নারীর উপস্থিতি তার কাছে মোহনীয় এক অবাস্তবতা বলে প্রতীয়মান হয়। তাহের নিজের উরুসন্ধিতে ইচ্ছার মৃদু সঞ্চারণ অনুভব করে, অকুস্থল থেকে এক প্রকার উষ্ণতা ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কিছুতেই তাকে সে শীতলতায় পর্যবসিত করতে পারে না। কতকাল স্ত্রীসঙ্গ সে করে নাই; শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল কবে সঠিক মনে পড়ে না। একদিন রাতে বাইরে, দূরে, প্রচুর গোলাগুলি চলছিল, তখন হাসনা তাকে জড়িয়ে ধরে মাঝের ঘরে মেঝের ওপর শুয়ে ছিল; গোলাগুলি থেমে যাবার পর হাসনা হঠাৎ তার অঙ্গে হাত রেখেছিল, প্রথমে মনে হয়েছিল আকস্মিকভাবেই হাতটা এসে পড়ে কিন্তু সরিয়ে নিতে গিয়েই সে টের পায় ইচ্ছাকৃত এ হাত রাখা; সরিয়ে নেবার মৃদু চেষ্টাতে হাসনা তার অঙ্গ চেপে ধরেছিল প্রবল মুঠিতে; হাসনা তাকে সে রাতে চেয়েছিল, তাহেরের অঙ্গও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল প্রার্থিত ক্রীড়ার জন্যে, কিন্তু শরীরের ভেতরে মন নামক স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন সত্তাটিকে সে তখন কিছুতেই প্রস্তুত করে তুলতে পারে নাই বরং সেই দুঃশাসনীয় মন তার দেহ থেকে ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছে হাসনার প্রতিটি আমন্ত্রণের ব্যাকুল চাপে। কিছু পরে আবার হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়, নীরব আর্তনাদ করে ফিরে যায় হাসনার হাত, তাহের নিজেকে আবৃত করে হাসনাকে বুকের সঙ্গে নিবিড় জড়িয়ে ধরে গুলি বর্ষণ থেমে যাবার প্রতীক্ষা করে; অচিরে গুলি থেমে যায়, হাসনার হাত আর ফিরে আসে না। তাহের তখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে হাসনার প্রতি; অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রীড়ায় আবার তাকে টেনে না নিয়ে যাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা; তারা পরস্পরের বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়ে। সম্মুখে উপবিষ্টা রূপসী নারীর সুডৌল বাহু দেখে হাসনার বাহু বলে ভ্রমাবিষ্ট হতে ইচ্ছা হয় তাহেরের; নারীর আঙুলগুলো চিত্তবিক্ষোভের প্রেরণায় আক্ষেপ করতে থাকে; তাহের দাঁড়িয়ে থাকে সম্মোহিতের মত; পরিবেশের অবাস্তবতা গাঢ়তর হতে থাকে। হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে ওঠে তাহের। মস্তিষ্কের মেঝেয় হাসনাকে ধর্ষণ করছে ওরা; তাহেরের কণ্ঠ আশ্রয় করে হাসনার আত্মা চিৎকার করে উঠতে চায়; মুহূর্তে শীতল হয়ে যায় তাহেরের সর্বাঙ্গ, স্বেদ এসে কপালে রাজ্য বিস্তার করে। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে সহবাস ইচ্ছা চিত্তে সংক্রামিত হবার জন্যে ক্ষমাহীনভাবে খেদ হয় তার; নিজেকে বিনষ্ট বলে বোধ হয়। অবিলম্বে সে বারান্দায় যায় এবং পরাণের নাম ধরে ডাকে। যতটা প্রবল কণ্ঠে সে ডাকবে ভেবেছিল, তার সিকি অংশ বাস্তবায়িত হয় মাত্র। তীব্র অপরাধবোধ তার কণ্ঠস্বরকে এক প্রকার কম্পনের আরোহী করে রাখে। পরাণের কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। ঘরে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে সে পরাণের বাসার দিকে নেমে যায়। বাসার ভেতরে থেকে অবিলম্বে নড়াচড়ার শব্দ ওঠে। অতি সন্তর্পণে দরোজা খোলার সংক্ষিপ্ত আওয়াজ পাওয়া যায়; সম্মুখের অন্ধকারই যেন অকস্মাৎ সংহত হয়ে পরাণের আকার ধারণ করে। গাঢ় অন্ধকারের ভেতরেও টের পাওয়া যায় পরাণ অত্যন্ত ভীত চোখে তাহেরের দিকে বিস্ফারিত তাকিয়ে আছে। তাহের বিরক্তি প্রকাশ করে যে বহুক্ষণ ধরেই সে তাকে ডাকছে। পরাণ সমান্তরালভাবে সংবাদ দেয় যে, তাহেরের জন্যে বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে, তার ভাত নিয়ে বসে থেকে, তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে করতে এই সবে সে

শুয়ে পড়ছিল। নিরাপত্তার উল্লেখে তাহের কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। পরাণ তাকে জানায় যে ঘণ্টা দুয়েক আগে জলেশ্বরীতে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়। এর অতিরিক্ত কিছু সে বলতে পারে না। তবে, গোলাগুলির শব্দ থেকে যা ধারণা হয়, তাতে বহু লোক নিশ্চয়ই হতাহত হয়েছে এবং প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ক্যাপ্টেন এবং তার অনুচরেরা ছিল একটা পক্ষ, অন্য পক্ষে কারা ছিল সঠিক অনুমান করা খুবই শক্ত। পরাণ আরো জানায়, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, শহরের সমস্ত মানুষ প্রাণভয়ে লুকিয়েছে, এ সময়ে তাহেরেরও উচিত ঘরে বন্ধ থাকা। তাহের এতক্ষণে বুঝতে পারে, হাকিম সাহেবের কুঠি থেকে ফেরবার পথে যে গোলাগুলি শুনেছিল তার কারণ। কিন্তু হঠাৎ এ যুদ্ধ কেন ? কার সঙ্গে যুদ্ধ ? যুদ্ধটা কি হঠাৎ অনুষ্ঠিত হয় ? না, পূর্ব থেকেই এর পরিকল্পনা ছিল ?— তা যদি হবে তাহলে কাল রাতে ক্যাপ্টেন যখন এসেছিল তখন তার সংলাপ এবং অভিব্যক্তি স্মরণ করে কোনো সূত্র আবিষ্কার করা কি সম্ভব ? হতবিহ্বল হয়ে তাহের দাঁড়িয়ে থাকে। পরাণ নিবেদন করে, তার যদি আহারের ইচ্ছা থাকে তাহলে এক্ষুণি নিয়ে আসতে পারে, তবে তার সুচিন্তিত মত হচ্ছে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকা, কারণ, আবার কী হয় আজ রাত্রে তা বলা যায় না। কাল ইস্কুল খোলা নিয়েও একটা আশঙ্কা তাহেরের মনে ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু আপাতত তাকে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর উপস্থিতি বিচলিত করে রাখে। ক্যাপ্টেনের বাসা কোথায় তাহের তাহা জানতে চায়। ফিসফিস করে করে পরাণ জানায়, ক্যাপ্টেন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, তবে তার পিতামাতা, তারা অত্যন্ত গরিব, শহরের শেষপ্রান্তে, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা ভাঙ্গা টিনের বাড়িতে তারা থাকে। পরাণ জানতে চায়, ক্যাপ্টেনকে তার কী দরকার ? আবারো সে মত পোষণ করে, আজ রাতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবার আশা ত্যাগ করাই ভাল। বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের নিরাপত্তা সম্পর্কেও সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয় তাহের, পরাণকে সে ঘরে ফিরে যেতে বলে এবং নিজে ফিরে আসে আপিস ঘরে। ক্যাপ্টেনের স্ত্রী তার দিকে উৎসুক চোখে তাকায়; নীরব জানতে চায় যাবার কোনো ব্যবস্থা হলো কি না ? তাহের তাকে কিছু বলবার আগেই, অতিকাছে, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ ফেটে পড়ে, শব্দটা মিলিয়ে যেতেই বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণের আওয়াজ পাওয়া যায়, তারপর আবার সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। রক্তশূন্য হয়ে যায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর মুখ, টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ায় সে, বিস্ফারিত প্রশ্ন নিয়ে নীরবে সে তাহেরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহের মাথা নাড়ে, আর এই ভঙ্গিতে সে জানিয়ে দেয় যে, তার কোনো ধারণা নেই কোথায় কী হচ্ছে। তাহের বুঝতে পারে, নারীর মনে স্বামীর কথাই প্রথমে উদিত হয়েছে, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র আশঙ্কা তাকে বিদীর্ণ করে যাচ্ছে। তাহের লণ্ঠন স্তিমিত করে টেবিলের নিচে রাখে এবং নারীকে আসন গ্রহণ করতে বলে। ভয়ার্ত কণ্ঠে নারী জানতে চায়, মজাহার এর ভেতরে আছে কি না ? মুহূর্তে সে ভেঙ্গে পড়ে, ঝপ করে বসে, টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নারী। ঢাকা থেকে জলেশ্বরীতে আসতে অন্তত দু দিন তার লেগেছে, যাত্রার সেই ধকলের পর এখন এই গুলিবর্ষণে সে হারিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত সাহস এবং দৃপ্ততা। তাহেরের একবার ইচ্ছা হয়, নারীর কাঁধে হাত রেখে তার সাহস ফিরিয়ে আনে, সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হাসনা সংক্রান্ত চিন্তা তাকে পলকে আবার পঙ্গু করে দেয়, এক প্রকার পাপবোধ তাকে পঙ্গু করে দিয়ে যায়। নারীকে সে কাঁদতে দেয়। নারী

হঠাৎ মুখ তুলে, চোখ মুছে, আপাতদৃষ্টে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে জানায় যে, ভালবেসে তাদের বিয়ে হয়েছিল, বাবা-মার মোটেই মত ছিল না, কেবল তার জেদেই বিয়েটা হয়, তাই এখন কাউকেই সে দোষারোপ করতে পারে না। আবার তার চোখে পানি চিকচিক করে ওঠে। তাহের চেয়ার টেনে সমুখে বসে। তার নিজের বিয়ে ভালবাসার পরিণামে আসে নি; সে বিয়ে ছিল আয়োজিত। নারীর ব্যক্তিগত ইতিহাস তার কাছে নতুন কোনো উপন্যাসের মত আকর্ষণীয় বোধ হয়; সে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। নারী তার কৌতূহল অবিলম্বে মেটায় না। প্রশ্ন করে, তার কি কোনো ধারণা আছে, সচ্ছল এবং সুনির্দিষ্ট জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে মানুষ কেন দুঃখের এক অনির্দিষ্ট জীবন বেছে নেয়? অন্য প্রসঙ্গে যার দায়িত্ববোধ এবং নীতিবোধ এত প্রবল, সে কী করে স্বজন তথা জীবনের একমাত্র অংশীদার স্ত্রীর প্রতি এতটা দায়িত্বশূন্য হতে পারে? মজহার কি গতকয়েক মাসে একবারও তার খোঁজ নিয়েছে? অবশ্যই নয়। তাহেরের কী ধারণা, সে জলেশ্বরীতে এসেছে বলে, এবং এই তার প্রথম শ্বশুর বাড়িতে আসা, মজহার খুশি হবে? কখনোই নয়। তা যদি হতো তাহলে ইস্টিশানে সে তাকে এগিয়ে নিতে আসত। তাহের কি জানে, ঢাকা থেকে এই সীমান্তবর্তী ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসতে কষ্টের পরিমাণ কতটুকু? তাহেরের জানতে কৌতূহল হয়, এতটা কষ্ট স্বীকার করে এভাবে তার এখানে হঠাৎ আসবার পেছনে উদ্দেশ্য কী? বিনাদ্বিধায় সে প্রশ্ন করে বসে। সে প্রশ্ন শুনে নারী প্রথমত চুপ করে থাকে, তারপর বলে যে, মজহারকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিতে সে এসেছে। নারী আরো জানায়, তার সাবেক চাকুরি এখনো বহাল আছে, সরকার রাজি হয়েছেন তাকে শুধু আবার গ্রহণ করতেই নয়, উচ্চতর পদমর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে। মজহারকে সে এ সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিল; তার জবাব পাওয়া যায়, চাকুরি সে আর করবে না। আচ্ছা বলুন, নারী জানতে চায়, রাজকর্মচারীর দায়িত্ব কি দেশ-সেবা নয়? তাহলে, মজহারের লক্ষ্যের সঙ্গে চাকুরি গ্রহণের বিরোধিতা কোথায়? বরং তার তো মনে হয়, রাজকর্মচারী হয়েই সে নিজের স্বপ্ন সহজে এবং সংক্ষেপে বাস্তবায়িত করতে পারবে। নারী স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পাকিস্তান আমলে মজহার ঠিক তাই করেছে, চাকুরিতে থেকেই দেশের কাজ করেছে, আর এর জন্যে তাকে ওপরতলার কত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কতবার তাকে বদলি করা হয়েছে এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে, আর যেখানেই সে গেছে সেখানেই সে প্রবলভাবে বাঙালির স্বার্থরক্ষায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান আমলেই সে যদি সরকারি চাকুরিতে থেকে বাঙালির কল্যাণের জন্যে কাজ করতে পারে, তবে আজ দেশ স্বাধীন হবার পর সে কেন সেই সরকারি চাকুরিকেই ঘৃণা করছে? মজহারের মত প্রতিভাবান কর্মীর কতটা প্রয়োজন দেশের স্বাধীন সরকারের তা কি সে বোঝে না? বেশ সেটা না হয় সে সজ্ঞানেই না বোঝার ভান করল, বিয়ের কি একটা প্রধান প্রতিশ্রুতি নয় যে, স্ত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কল্যাণের দিকে স্বামী অবিচলভাবে মনোযোগী থাকবে? বিয়ের কথাও দূরে থাক, বিয়ের আগে যে ভালবাসার দিনগুলো বর্তমান ছিল, তখনো তো পরস্পরের প্রতি প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকাই ছিল একত্রে পা ফেলার একমাত্র সেতুপথ? নারী হঠাৎ জানতে চায়, মজহারের স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে— তাহের তো তাকে সম্প্রতি দেখেছে, দেখে কি মনে হয়, সে ভাল আহারাদি করছে, শরীরের যত্ন নিচ্ছে, ভাল আছে? তার কুশল নিবেদন করতেই নারী প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার নতুনতর বক্তব্য হয়— কুশলে তো সে থাকবেই, তার

মত দায়িত্বশূন্য বিবেকবোধরহিত ব্যক্তিরা নির্মল কুশলেই চিরকাল থাকে। নারী অবিলম্বে জানায় যে, মজহার যখন ঢাকা থেকে পালিয়ে জলেশ্বরীতে আসে এবং মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তখন তাদের একমাত্র কন্যার বয়স মাত্র দশমাস; সেই দুগ্ধপুষ্য শিশুকে নিয়ে যে তার কী ভোগান্তি হয়েছে তা প্রতিভাযুক্ত কোনো বর্ণনাতেই যথেষ্ট প্রকাশ পাবে না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে নারী; হয়ত সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে স্মৃতিপটে আরো একবার দেখে নেয়, তাহেরও কি সেই দলেরই একজন ? সেও কি তার স্ত্রী পুত্র ফেলে এখানে দেশের কাজে নিয়োজিত আছে ? ম্লান হাসে তাহের। সংক্ষেপে তার একাকীত্বের কথা জানায়, স্ত্রীর আত্মহত্যা করবার কথা অনুক্ত রেখে শুধুমাত্র জানায় যে সে এখন গত। আবার সেই রাতের কথা তীব্র পাখায় তাহেরের বুকের ভেতরে নেমে আসে, যে রাতে বাইরে গুলি বর্ষণের পর হাসনা তাকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, হাসনার হাত অনিচ্ছুকভাবে উত্থিত তার অঙ্গ যে রাতে অধিকার করে রেখেছিল। সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় তাহের, প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বর্তমানে ফিরে আসে, নারীকে সে বলে রাত অধিক হয়ে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেনের সন্ধান আজ রাতে না পাবারই সম্ভাবনা; অতঃপর কর্তব্য নির্ধারণের দায়িত্ব নারীকে দিয়ে সে উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের চতুর্দিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নারী অবনত মুখে চিন্তা করে কিছুক্ষণ, তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাহেরের দিকে তাকায়। না, সে কিছুই ভাবতে পারছে না। অপেক্ষা ভিন্ন যখন পথ নেই, তখন অপেক্ষা করাটাই কর্তব্যের আকার ধারণ করে। রাত বাড়ে। অন্ধকার অধিকতর শক্তিমান হয় ওঠে। কোথাও কোনো কুকুরের নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে বলে তার আক্ষেপ শোনা যায়। পরাণের ছেলেটি একবার কেঁদে উঠতেই তার পিঠে ধুপ ধুপ করে কিল পড়ে। কিছুক্ষণ পর স্বয়ং পরাণের চাপা ডাক শোনা যায়; দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে তাহেরকে সে ডাকছে। ভেতরে এসে নারীকে দেখে সে স্বপ্ন না বাস্তব সহসা নির্ণয় করতে পারে না। নারীর পরিচয় পেয়ে বাস্তব তার কাছে আরো স্বপ্নবৎ বলে প্রতীয়মান হয়। তার কাছেই নারী ব্যাকুলস্বরে জানতে চায়, ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার করবার কোনো উপায় কি নেই ? পরাণ জানায় যে, সেটা এই মুহূর্তে এক প্রকার অসম্ভব প্রস্তাব। তার কাছে থেকে শোনা যায়, আজ সন্ধে থেকেই শহরের মানুষ আভাস পেয়েছিল যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে। তাহের যখন হাকিম সাহেবের উদ্দেশে বেরিয়ে যায়, তখন সে ইস্টিশানের দোকানপাড়ায় গিয়েছিল সওদা করতে, সেখানেই প্রথম সে ইঙ্গিত পায়। পরাণ এখনো জানে না, লড়াইটা সঠিক কার সঙ্গে; তবে, শোনাশোনা সে কয়েকদিন থেকেই শুনে আসছে যে, সীমান্তে যারা পাট আর ধান চোরাচালান করে নিয়ে যায়, ক্যাপ্টেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। ক্যাপ্টেনের পক্ষ সমর্থন করবার সুরে পরাণ বলে, চোরাচালানকারীদের বহুবার হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়, কিন্তু সে কথা তারা শোনে নাই, আর শুনবেই বা কেন ?— বহু বহু বড় বড় লোকই দেশের এই শত্রুতাসাধনের সঙ্গে জড়িত। পরাণ বলে, ক্যাপ্টেন ছিল বলেই জলেশ্বরীতে এখনো যা কিছু সুবিচার আছে, লোকের মনে বল আছে যে অন্যায় একেবারে প্রতিকারহীনভাবে পার হতে পারবে না। পরাণ তার সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে যে, আজ রাতে ক্যাপ্টেন বোধ হয় সেই প্রতিকার করতেই নেমেছে। পরাণ জানায় এর অত্যন্ত দরকার ছিল, প্রত্যেকেই সাপের পাঁচপা দেখেছিল। পরাণের কথায় নারীর চোখেমুখে এক প্রকার উজ্জ্বলতা ফিরে আসে; সেটা নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেনের প্রশস্তিজাত আলো। গৌরব সকলেই চায়, গৌরব যার ফসল সেই দুঃখের চাষ কেউ করতে চায় না।

তাহের অনুভব করে এই ইতিহাস শ্রবণের পর ঘরে একটা স্বাচ্ছন্দ্য নেমে এসেছে। পরাণ এভাবে আবির্ভূত হয় বলে সে মনে মনে তার প্রতি সন্তুষ্ট বোধ করে। পরাণের এভাবে উদিত হবার কারণ সহসা বোঝা যায় না। যেভাবে সে এসেছিল সেভাবেই সে ফিরে যায়। তাহের নারীকে বলে শয্যায় শুয়ে পড়তে। কুণ্ঠিত হাতে সে শয্যা মসৃণ করে দেয়; জানায় যে রাত শেষ হতে এখনো অনেক বাকি আছে। অনেক অনুরোধের পর নারী সম্মত হয়; তাহের দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে একটা চেয়ার টেনে বসে। খানিক পরেই একটু শীত বোধ হয় তার, ভেতর থেকে চাদর আনবার জন্যে তাগিদ বোধ করে, কিন্তু ভেতরে যেতে গা ওঠে না। ভেতর থেকে নারীর কোনো শব্দ ওঠে না। হাসনার মৃত্যুর পর কোনো নারীর এত নিকটে আর কবে সে ছিল মনে করতে পারে না। তার শ্বশুর অন্য লোক মারফত প্রস্তাব করে ছিলেন, হাসনার ছোট বোনকে তাহের যেন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। অত্যন্ত রুচিহীন বলে সে প্রস্তাব তার কাছে মনে হয়েছিল। শেষবার যে বার গিয়েছিল শ্বশুর বাড়িতে, মাস তিনেক আগের কথা, হাসনার ছোট বোনকে তার শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার শয্যা পেতে দেবার জন্যে, সম্ভবত তাহেরকে আকৃষ্ট করাটাই ছিল শাশুড়ির মনোগত ইচ্ছা। তার ফল হয়েছিল এই যে আর কোনোদিন শ্বশুর বাড়ি না যাবার সিদ্ধান্ত সে নেয়। সে কি আবার কোনো নারীকে তার প্রাঙ্গণে ডেকে নিতে পারবে ?— আবার বিয়ে করতে পারবে কি সে ? মৃত্যুর চলাচলে আবৃত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাহের এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে ভাবতে চেষ্টা করে তার ভবিষ্যৎ দিনগুলো কেমন দাঁড়াবে বলে সে নিজেই মনে করে। একাকী থাকতে পারবে কি সে ? হাসনার সঙ্গে যৌথ জীবন যাপন করতে গিয়ে যে সমস্ত সেবায় সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, আবার তার জন্যে চিত্ত কি তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়বে না ? সেই রিকশাওয়ালার কথা মনে পড়ে যায় তার। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে কীভাবে দিনপাত করছে তার পুত্রকন্যা নিয়ে ? তাহের ভাবতে চেষ্টা করে, তার যদি সন্তান থাকত তাহলে সে কী করত ? তাহলে, হয়ত জলেশ্বরীতেই আসা হতো না তার। শিশু সন্তানকে নিয়ে একাকী সে নতুন জীবন শুরু করতে পারত না। তাহলে কি বলতে হবে, সন্তান একটা বাধা স্বরূপ ? রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে তাহেরের। ঐ কবির জীবনে একটা সিদ্ধান্ত সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি ; কবি নিজে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদির কথা আজীবন বলেও নিজের দুই কন্যাকে বিয়ে দেন তাদের অপরিণত বয়সে। সেটা কি স্বার্থপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের ? আজ হঠাৎ এই বারান্দায় বসে তাহেরের দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে যায় যে, ঐ কবি তাঁর কর্মজীবনকে নির্বিঘ্ন রাখবার জন্যই নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদায় করেন সংসারের বাধা তথা তাঁরই কন্যা দুজনকে। তাহেরের যদি কন্যা থাকত, তাহলে সেও কি এভাবে বিদায় করতে পারত তাকে ? না পারত না। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তাঁর বিন্দু মাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হয় না। কিন্তু পর মুহূর্তেই সন্দেহ হয়, সে পারত না কারণ রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা তার নেই বলেই হয়ত। সম্ভবত প্রতিভাবানেরাই পারে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে। ক্যাপ্টেনের কথা চকিতে উদিত হয়। ঢাকার জীবন তথা স্ত্রীকে সে নির্মম হাতে পেছনে ফেলে এসেছে। কিন্তু কোনো প্রকার সমন্বয় কি সম্ভব নয় সংসার ও কর্মজীবনের মধ্যে ? সংসার কি বৃত্তাকার ? কর্মজীবন একটি আয়তক্ষেত্র ? তাদের ভেতরে উপযোজনের কোনো অবকাশ নেই ? এ লক্ষ্যে কোনো প্রকার উদ্যোগ নেবার শুরুতেই যে কোনো একটির গঠন-সংজ্ঞাকে ভাঙ্গতে হবে এবং অনুরূপ করতে হবে অপরটির। অচিরেই তাহের লক্ষ করে যে তার জ্যামিতির

সূত্র ধরে এগোচ্ছে; কিন্তু জীবন তো জ্যামিতি নয়, জীবনের আবশ্যিক শর্ত যে সপ্রাণতা, সেই বিশিষ্ট চিরচঞ্চল দিকটি নিজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করে নেয় ভিন্নতর গঠন-সংজ্ঞা, নিজের গন্তব্য অনুসারী দিকলক্ষ্য এবং গতি। বিশেষ বিভ্রান্ত বোধ করে তাহের। জীবন সম্পর্কে জটিল চিন্তাভাবনা কোনোদিনই তার মনঃপুত ছিল না; বস্তুত যারা সে ধরনের পরিশ্রমে রত থাকে তাদের সে চিন্তাবিলাসী বলেই গণ্য করত। আজ সে ধারণা বদলে নেবার বিশেষ তাগিদ বোধ করে সে; উপলব্ধি করে, চিন্তাই আসলে জীবনযাপনের সার্বক্ষণিক ভিত্তি, অবিকল যেমন জলের ওপরে ভেসে থাকবার জন্যেই চাই নৌকোর নিশ্চিদ্র তলদেশ। তাহের সেই চিন্তারই বিস্তৃত পাটাতনে লম্বমান হয়ে, কোনো এক অদৃশ্য স্রোতের তাড়নায় ভেসে যেতে থাকে সূচীভেদ্য এক অন্ধকার দিকে; কিন্তু দুপাড়ে কোথাও কোনো গ্রামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, বিন্দুপ্রতিম কোনো সান্ধ্যপ্রদীপেরও সাক্ষাৎ সহসা পাওয়া যায় না। তবে, এটুকু মনে হয়, এ অন্ধকার নিশ্চল নয়, মৃত নয়; ভয়াবহ একটা গতির স্পন্দন অবিরাম টের পাওয়া যাচ্ছে, অতিকায় কোনো প্রাণীর মত এই অন্ধকার দীর্ঘ একেকটা বিরতির পর নিঃশ্বাস ফেলছে। সহসা স্তম্ভিত হয় নিঃশ্বাস, গতিরহিত হয় পাটাতন, চকিত হয়ে তাহের উঠে বসে; তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে, কারো পদশব্দ শোনা যায়; দ্রুত, তাহের অভিমুখী; তাহের উঠে দাঁড়ায়, তার দেহ প্রস্তুত হয়ে থাকে পলায়নের জন্যে, কিন্তু তার আবশ্যক হয় না; ক্যাপ্টেন লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে আসে। তার পরনে আজ লুঙ্গির বদলে ট্রাউজার, গায়ে হাতাকাটা জামা, পায়ে ভারি জুতো, কাঁধের দু পাশে ঝোলান দুটি ভিন্ন জাতের আগ্নেয়াস্ত্র। এ সজ্জা সম্পূর্ণ নতুন বলে বোধ হয় তাহেরের কাছে; তার স্মরণ হয় রাত্রির প্রথমার্ধে গোলাগুলির কথা; ক্যাপ্টেনকে সম্পূর্ণ অচেনা বলে বোধ হয় তার। ক্যাপ্টেনের মুখে সেই প্রশ্রয়পূর্ণ হাসিটাও আজ অনুপস্থিত, বদলে সেখানে দুর্ভেদ্য কাঠিন্য, ভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে তাহেরের সঙ্গে কোনোকালে তার দেখা হয়েছিল। অস্পষ্ট একটা শঙ্কা তাহেরকে ক্রমশ আক্রমণ করতে থাকে। কালক্ষেপ না করে ক্যাপ্টেন জানতে চায় তার স্ত্রী কোথায় আছে। তাহের উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন আপিস ঘরে ঢোকে এবং হাতের তীব্র টর্চ থেকে শয্যার ওপরে আলো ফেলে; সে আলোয় ঘুমন্ত নারীর দেহ প্রবল অবাস্তব এবং মৃত্যু-শীতল বলে প্রতিভাত হয়। তাহের ঠাহর করে উঠতে পারে না, এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কী এবং তার অবস্থানই বা কোথায় হওয়া সঙ্গত। নিজেকে গোপন করবার প্রেরণা বোধ করে সে; তাহের নিঃশব্দ পায়ে বারান্দার অপর দিকে সরে যায় এবং চেষ্টা করে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিষ্ক্রিয় করে রাখবার জন্যে। অচিরে ঘরের ভেতরে থেকে ক্যাপ্টেনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। সংসারের প্রতি তার কোনো দায়িত্বের কথা সে সংক্ষেপে অস্বীকার করে, যেন একটা ইস্পাতখণ্ড ঝনাৎ করে মেঝের ওপর পড়ে যায়। অনতিপরে ক্যাপ্টেন দ্রুতগতিতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে এবং চারদিকে তাহেরকে সন্ধান করে; অতিবাধ্য ব্যক্তির মত তাহের এগিয়ে আসে; ক্যাপ্টেন তাকে জানায় যে, আগামীকাল সকালের ট্রেনে তার স্ত্রীকে যেন সে তুলে দেয় অবশ্যই। বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন, তাহের প্রায় তার হাত টেনে ধরে। 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' বাক্যটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাহের উপলব্ধি করে যে, এক মুহূর্ত আগেও এর কোনো পরিকল্পনা ছিল না তার। সিদ্ধান্তটি এতই আকস্মিক এবং মুহূর্তজাত যে, তাহের তৎক্ষণাৎ বুঝে উঠতে পারে না, কী কথা সে ক্যাপ্টেনকে বলতে চায়। তাই ক্যাপ্টেন যখন জানতে চায় তার বক্তব্য তাহের নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে

পড়ে নীরব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর অপ্রস্তুত একটা অস্পষ্ট হাসি সহযোগে স্খলিত কণ্ঠে জানায়, কথা এক্ষুণি হবার আবশ্যকতা নেই, পরে হলেও চলবে। ক্যাপ্টেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তবু, তাকিয়ে থাকে তাহেরের দিকে এবং অবিলম্বে ঘোষণা করে যে, সে জানে তাহেরের বক্তব্য এবং এক্ষুণি শুনতে সে প্রস্তুত। বারান্দার শূন্য চেয়ারে ক্যাপ্টেন বসে পড়ে তাহেরের কথার অপেক্ষায় তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাহেরের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না যে, বারান্দায় একটাই চেয়ার আছে এবং সেটা ক্যাপ্টেন দখল করে নিয়েছে যখন তাহেরের জন্য বসবার দ্বিতীয় কোনো আসন নেই। বস্তুত সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয় এতে, তার সে ক্ষোভ অচিরে ক্রোধে রূপান্তরিত হতে থাকে; তাহের ঘরের ভেতরে যায় চেয়ার আনতে। ক্রোধ একটা দেয়ালের মত, তাই ক্রোধ আড়াল করে রাখে দুপাশের সমস্ত কিছুকে। তাহের বিস্মৃতই হয়ে গিয়েছিল যে, তার আপিসঘরে এখন ক্যাপ্টেনের স্ত্রী উপস্থিত এবং শয্যায় সম্ভবত এখন শায়িতা। তাই ঘরে ঢুকে নারীকে দেখেই সে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে যায় এবং অবিলম্বে চেতনা ফিরে আসতেই প্রভূত লজ্জা স্বীকার করে কিছু বলবার চেষ্টা করে এবং একটা চেয়ার নেবার জন্যে হাত বাড়ায়। নারী শয্যার ওপর বসেছিল, সে উঠে দাঁড়ায় এবং জানতে চায়, ক্যাপ্টেন কি চলে গেছে ? তাহের নীরবে চোখের দিক পরিবর্তন করে বারান্দার প্রতি ইশারা করে। নারী সেদিকে বিনাকালক্ষেপ ধাবিত হয়। বিমূঢ় হয়ে তাহের একাকী দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের ভেতরে আবার সে বুঝতে পারে না, এই মুহূর্তে তার কর্তব্য কী ? বারান্দায় যাওয়া ? না, ঘরে থাকা ? আগেকার সেই ক্রমবর্ধমান ক্রোধ অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং তার বদলে এক প্রকার খিন্নতা তাকে শীর্ণবাহুতে আলিঙ্গন করে ধরে। সে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে। নিজেকে মনে হয় কোনো অদৃশ্য বলবান ব্যক্তির হাতে পুতুলের মত; অনিচ্ছার সঙ্গে সে লক্ষ করে যে, জলেশ্বরীতে আসবার সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ তার নিজের, কিন্তু এখানে আসবার পর কোনো কিছুই সে নিজের ইচ্ছা দ্বারা চালিত করতে পারছে না; বরং এই ক'দিনে প্রতিটি ঘটনা যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাচ্ছে, তেমনি অনিবার্যভাবেই স্পর্শ করে যাচ্ছে, তার চলাচলকে আশাহীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। তার চিত্তের ভেতরে আক্ষেপের সঞ্চার হয়, যে আক্ষেপ একজন বন্দির, যার হাতে পায়ে শেকল এবং সে বন্ধন মোচন করা যার সাধ্যের অন্তর্গত নয়। আবার সেই জ্যামিতিক সমস্যাটি তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে; বৃত্ত এবং আয়তক্ষেত্র। কিন্তু এবার এই সত্যিটিও তার সমুখে উপস্থিত হয় যে, এ সমস্যা তার নয়, সে এ নিয়ে ভাবছে কেন ? তার তো সংসার নেই। তার সমুখে এখন নিরবচ্ছিন্ন কর্মেরই অবকাশ এবং সে দ্বিতীয়বার সংসার করতেও যাচ্ছে না। তার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কেন সে এ সমস্যা নিয়ে এত দীর্ঘকাল ব্যয় করেছে এই কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত। তার স্মরণ হয়, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে দেখে হাসনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, তার, বস্তুতপক্ষে ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর জন্যেই তার এক প্রকার বাসনা জাগরিত হয়েছিল, আর সেই বাসনাই তার চিত্তে কখন বাস্তব সম্ভাবনার আকার ধারণ করে তাকে প্ররোচিত করেছে ঐ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ভাবিত হতে। তাহের আবারও কুণ্ঠিত হয়ে যায় এই কথা ভেবে যে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রীকে সে আকাঙ্ক্ষা করেছে, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও। যদি কোনো অবস্থায় ক্যাপ্টেনের স্ত্রী তার প্রাপনীয় হয়ে দেখা দেয় তাহলে সে হয়ত আবার সংসার করতে সম্মত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সংসার সম্পর্কে তার মূলত কোনো বিরাগ নেই, সংসার যাকে অবলম্বন করে সেই ব্যক্তিটির অভাবেই সংসারের

প্রতি তার এ বৈরাগ্য। তার শ্বশুর যে প্রস্তাব করেছিলেন তারই স্ত্রীর কনিষ্ঠাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে, সেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে তার স্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতে না পারবার দরুন, সংসারের প্রতি অনীহার দরুন নয়, এমনকি হাসনার প্রেমের স্মরণেও এ প্রত্যাখ্যান নয়। তার আবার মনে পড়ে যায় সেই রিকশাওয়ালার কথা। আবার কি সে বিয়ে করতে প্রস্তুত, কিংবা উদগ্রীব! তাহেরের কাছে হঠাৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয় রিকশাওয়ালার সঙ্গে দেখা করা; তার পরম কৌতূহল হয় ঐ সাধারণ মানুষটির ভাবনার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা মিলিয়ে নেবার। তাহের বিস্ময় অনুভব করে অত্যন্ত গভীরভাবে; আবার সে বিবাহিত হতে প্রস্তুত যদি তেমন ব্যক্তির আবির্ভাব কোনোকালে ঘটে কিন্তু অচিরেই তার মনে হয়, ব্যক্তি আপনা থেকেই আসে না, তার আসবার পথ সুগম করে রাখতে হয়, তাকে আবাহন করতে হয় এবং নিজেকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতির ভেতরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। অতএব, সিদ্ধান্ত কি এই যে, তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে ? ঘরের ভেতরে ক্যাপ্টেন এসে ঢোকে, এবং তারই কথার সমর্থনে জানিয়ে বলে, হ্যাঁ। তাহের বুঝতে পারে না, তার চিন্তারই উত্তর এটা কি না। পরক্ষণেই ভ্রান্তি দূর হয়। ক্যাপ্টেন জানায়, হ্যাঁ, তার স্ত্রীকে সে যেন কালই ঢাকাগামী গাড়িতে তুলে দেয়। ঘরের ভেতরে তার স্ত্রীকে দেখা যায় না। ক্যাপ্টেন আরো জানায়, তাহেরের সঙ্গে সে আগামীকাল কথা বলতে আসবে। জুতোর শব্দ তুলে ক্যাপ্টেন উধাও হয়ে যায়। অচিরে রাস্তার ওপার থেকে তার সেই পরিচিত সংকেতধ্বনি ভেসে আসে; এ-এ-রে-এ-এ; একাধিক পদশব্দ ওঠে; তারপর সব মিলিয়ে যায়; যেন মানুষের চলাচল অন্তর্হিত হবার অপেক্ষায় ছিল গাছের প্রতিটি পাতা, তারা এখন আবার মুখর হয়ে ওঠে; অবিরাম শুধু পাতার ভেতরে বাতাসের সরসর ধ্বনি শোনা যেতে থাকে। তাহের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, ক্যাপ্টেনের স্ত্রী বারান্দায় থামে একটা হাত রেখে মূর্তির মত অকম্প চোখে দূরে তাকিয়ে আছে। তাহের কাছে আসতেই নারী সেই একই দিকে দৃষ্টি রেখে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করে, না, সে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ তাহেরের দিকে ঘুরে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে জানতে চায়, কোথায় সে ফিরে যাবে ? তাহের তাকে ঘরের ভেতরে আসবার আমন্ত্রণ জানান ছাড়া আর কোনো বাক্য নিবেদন করতে পারে না। ঘরের ভেতরে সহসা যেতে নারীকে প্রস্তুত বলে মনে হয় না। নারী দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জ্ঞাপন করে যে, ক্যাপ্টেনকে নিয়েই সে ঢাকায় ফিরবে এবং তার এ প্রতিজ্ঞার সাক্ষী থাকতে তাহেরকে সে প্রস্তাব দেয়। তাহের মৃদু হাসে এবং 'আচ্ছা সে দেখা যাবে' বলে আবার তাকে ভেতরে আসতে অনুরোধ জানায়। নারী ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করলে তাহের বিনা ভূমিকায় তাকে জানায় যে, তার স্ত্রীর সঙ্গেও তার নিজের বহু বিষয়ে মতান্তর হয়েছে এবং প্রতিবারই দেখেছে সেটা খুব স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই; অতএব, বিচলিত না হওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। নারী এতে আশ্বস্ত বোধ করে কি না বোঝা যায় না, এক প্রকার ভাবিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে কোনো বিশেষ কিছুর দিকে নয়। তাহেরের মনে হতে থাকে, সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে এখন যেন একটা মীমাংসায় তা মৃদু হয়ে এসেছে, আবার সব কিছু সহজ এবং সুখাতে প্রবাহিত বলে মনে হচ্ছে। তাহের স্বীকার করে নেয় যে, নারী ঢাকা ফিরে যাবে না, তা ক্যাপ্টেন যতবার ইচ্ছে বলুক এবং তার, তাহেরের, নিজের এ বিষয়ে কোনো করণীয় বা দায়িত্ব নেই। কিন্তু এ প্রশ্নও তার মনে উদিত হয় যে, নারী থাকবে কোথায় ? এ ইস্কুল ঘরে বাসা নেয়া অসম্ভব; জলেশ্বরীতে

কোনো আবাসিক হোটেল নেই; এবং নারীর কোনো বন্ধুও নেই এখানে যে তার বাসায় গিয়ে উঠবে। সমস্যাটি উত্থাপন করতেই নারী বাঁ হাতের একটা দ্রুত ভঙ্গিতে তা উড়িয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে যে, তার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না, সে নিজেই নিজেকে দেখতে পুরোপুরি সক্ষম। অতএব, তাহের তার সমুখে অতঃপর নীরবে বসে থাকে। তার ভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়; বস্তুতপক্ষে নারীর উপস্থিতিও তার চোখের ওপর ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে; হাসনার স্মৃতি-সাগর সে দেহ নিমজ্জিত করে এক নবারুণের মুখোমুখি নিজেকে স্থাপিত করে। ভোর হয়ে আসে। পরাণ সন্ত্রস্ত্র চোখে উঁকি দেয় এবং জানতে চায় চা লাগবে কি না। এরই মধ্যে অন্ধকার কেটে গেছে, আকাশ একটা নিভাঁজ ধূসর চাদরের মত দেখাচ্ছে, এটা তাদের দুজনকেই কিছুটা বিস্মিত করে; তারা দুজনেই পরস্পরের দিকে স্মিতমুখে একবার তাকায় এবং স্বস্তি অনুভব করে। ইস্টিশান থেকে পরাণ এসে জানায় যে, কোনো চায়ের দোকান খোলা নেই মনে হয় আজ আর খুলবে না, অতএব চায়ের ব্যবস্থা করা গেল না। দোকান খোলা নেই শুনে তাহের অকস্মাৎ কিছুটা দুশ্চিন্তার স্পর্শ অনুভব করে। গতরাতের গোলাগুলির কথা আবার তার মনে পড়ে যায়; সম্ভবত সেই খণ্ডযুদ্ধের স্মৃতি এখনো জলেশ্বরী ভুলতে পারে নি; এখনো নিঃশ্বাস স্তম্ভিত করে এ শহর অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের। কিন্তু এ আশঙ্কা সে নারীর কাছে ব্যক্ত করে না। পরাণ বিদায় নিতেই নারী জানায় যে, প্রাচীন কাব্যে উপেক্ষিত স্ত্রীকে যে পদদলিতা সর্পিণীর সঙ্গে তুলনা করা হতো সেটা মিথ্যা নয়; নারী ঘোষণা করে যে, তার সংসার রক্ষা করবার যুদ্ধ আজ প্রভাত থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং সর্বশক্তিপ্রয়োগ করে সে যুদ্ধ করে যাবে। অন্যমনস্কভাবে তাহের তার কথাগুলো শোনে, কিছুটা বোঝে, অধিকাংশই গুঞ্জন ধ্বনির মত তার চারপাশ পাক খায়। তাহেরের মনোযোগ এখন ইস্কুলের দিকে, আজ ইস্কুল খোলার দিন। কোনো একটা ছুতোয় সে উঠে পড়ে এবং পরাণকে তার বাসা থেকে বের করে আনে, অবিলম্বে সমস্ত বেঞ্চি চেয়ার টেবিল থেকে ধুলো মুছে ফেলবার নির্দেশ দেয়। তারপর নিজে সে পোশাক বদলে তৈরি হয়ে নেয়। দশটায় ইস্কুল বসবে। সিঁথি করতে করতে সে নারীকে জানায় যে আরো একবার সে ভেবে দেখুক সকাল দশটার গাড়িতে ঢাকা ফিরে যাবে কি না। নারী প্রত্যয়ের সঙ্গে অসম্মতি জানাতেই তাহের প্রস্তাব করে, তাহলে আপাতত সে দিনটা এখানেই কাটাতে পারে, ইস্কুল খোলার ব্যস্ততায়, ছাত্রদের ভিড়ে হয়ত তার দিনটা ভালই কাটবে। পরাণ এসে জানতে চায়, গরম চাট্টি ভাত করে দেবে কিনা। তাহের ক্ষুধার্ত বোধ করলেও নারী আহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না বলে তাকেও বিরত বোধ করতে হয়। তাহের নিজের শয্যা গুছিয়ে, কামরাটিকে ভদ্রস্থ করে বারান্দায় দুটি চেয়ার রাখে। নারীকে সেখানে এসে বসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তাহের হঠাৎ প্রফুল্লকণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে নারীর নাম তার এ পর্যন্ত জানা হয় নাই। নারী বারান্দায় বেরিয়ে এসে জনহীন মাঠের ওপারে স্তব্ধ সড়কের দিকে কিছুকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে যে তার নাম হাসনা। হাসনা তার চারদিকে হঠাৎ এক অসমান্য নীরবতার আবির্ভাব অনুভব করে তাহেরের দিকে ফিরে তাকায়; দেখে, বিস্ফারিত চোখে তাহের তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই তাহের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং দুর্বোধ্য একটা অব্যয়ধ্বনি করে ঘরের ভেতরে ত্রস্তপায়ে চলে যায়। তার দৃষ্টিপাত এবং তিরোধান হাসনাকে আলোড়িত করে দিয়ে যায়; সে বুঝতে পারে না লোকটার হঠাৎ এ হেন আচরণের তাৎপর্য কী হতে পারে। ভ্রু কুঞ্চিত করে হাসনা খানিক

ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু মন নিবিষ্ট করতে ব্যর্থ হয়; মজহারের তীব্র উচ্চারণগুলো এখনো তাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছে। হাসনা সংক্ষিপ্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় বসে; লক্ষ করে তাহের ঘর থেকে বেরিয়ে নিমিষে কোথাও নিজেকে আড়াল করে ফেলে। হাসনা নিশ্চিত হয় যে, তাহের যে কারণেই হোক তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। বিদ্রূপাত্মক একটা হাসির সূক্ষ্ম রেখা তার ঠোঁটের পাড় ঘেঁসে ফুটে ওঠে; সে নিশ্চিত হয় যে মজহারের ধমকে তাহের কাবু হয়ে পড়েছে। মজহার যে তাকে আজ সকালের গাড়িতে তুলে দিতে বলেছে এবং হাসনা যে ঢাকা ফিরে যাবে না বলে ঘোষণা করেছে— এ দুয়ের মাঝখানে পড়ে তাহের এখন সংকটের করাতে বিভক্ত হচ্ছে, এ বিষয়ে হাসনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু, তাহেরের ঐ চকিত দৃষ্টি, সেটা সম্পূর্ণ খাপছাড়া মনে হয়; হাসনা কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারে না যে ঐ দৃষ্টিপাতের অর্থ কী হতে পারে। যদি বর্তমান প্রসঙ্গ বিযুক্ত রেখে চিন্তা করতে হয়, তাহলে হাসনা ধরে নিতে পারে যে, তাহের তার প্রতি সহসা এক অন্তরঙ্গ আকর্ষণ বোধ করছে, সহসা একটা সেতু অপ্রত্যাশিত দুই প্রান্তকে আলিঙ্গন করেছে, সহসা একটা অভাবিত বর্ণের প্রলেপে এই বর্তমান চেনার বাইরে রঞ্জিত হয়ে গেছে। সেটা কী করে সম্ভব ? তবে, সম্ভবপরতা বিচার এখন ঘটনা সম্পর্কে তাকে নিরাসক্ত রাখে না। অবিলম্বে হাসনা তার ব্যক্তিগত সমস্ত সমস্যা বিস্মৃত হয় এবং সদ্যোজাত কৌতূহলসহকারে তাহেরের কথাই ভাবতে থাকে। বস্তুত, মানুষ সর্বক্ষণ অপরের দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে, অপরের হৃদয়, অপরের মনোযোগ, অপরের উদ্যম তার নিজের প্রতি। হাসনার অপেক্ষা সফল হয় না; অচিরে তাহের তার সমুখে আসে না : হাসনা বিস্মিত হয়, এই মুহূর্তে তাহের ভিন্ন আর কাউকে সে ভাবতে পারছে না কেন ?— আর কেউ বলতে যে তার স্বামী মজহারের কথাই বলা হচ্ছে, সেটাও তার কাছে একেবারেই স্পষ্ট হয় না। চারদিকের অভূতপূর্ব স্তব্ধতা তাকে বিচলিত করে না, সে অপেক্ষা করে, সে কার অপেক্ষা করে ? তাহের অথবা মজহারের ? রাতে গোলাগুলি চলবার বিষয়টিও সে অচিরে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, একটি সংবাদের প্রতীক্ষা করে; এবং সেই মুহূর্তের ভেতর তাহের দ্রুত দৌড়ে এসে যখন জানায় যে, গতরাত্রে গোলাগুলিতে ক্যাপ্টেন নিহত হয়েছে, তখনো সে স্মিতমুখেই বসে থাকে। হাসনার চোখে, হাসনার ঠোঁটে, হাসনার চিবুকে কিছুকাল থেকেই যে স্মিত আলোক প্রতিফলিত হয়েছিল, তার সূত্র বা উৎস কী সে নিয়ে অতঃপর বহু বিতর্ক হবে, কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ, নিদারুণ তো বটেই, কারণ এ তারই বৈধব্যের সংবাদ, এই সংবাদ পাবার পরেও স্মিতমুখটি অবিকল একই প্রকার থেকে যাবার রহস্য তাহেরের কাছে কোনোদিনই উন্মুক্ত হবে না এবং এটিও তার কাছে এক বিরাট রহস্য হয়ে থাকবে, যে, এই নারী তারই বিগতা স্ত্রীর সঙ্গে একটি নামে যুক্ত ; সে নাম হাসনা। একদিন এক হাসনাকে ফিরে এসে ফাঁসির দড়িতে লম্বমান দেখতে পায় ; একদিন এই হাসনাকে সে দেখতে পেল স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্মিতমুখে বসে থাকতে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে তাহের তাকে তিরস্কার করে ওঠে, সরাসরি তিরস্কার নয়, তিরস্কারের আকার যেন একটি ধূমকেতু, বড় দ্রুতবেগে তা লক্ষ্যবস্তুর দু দিকে চিরে ধাবিত; বড় দীর্ঘ সেই ধূমকেতুর পুচ্ছ; তাহের জানায়, পরাণের কাছে সে শুনেছে, এবং পরাণ এইমাত্র ইস্টিশানের দোকান থেকে শুনে এসেছে, যে, হাফেজ মোক্তারের দলই মজহারকে খতম করেছে। হাসনা তবুও সেই তাকিয়ে থাকে, স্মিতমুখে। আমরা তো কেবল উপরিতল দেখে থাকি, অন্তঃস্থল কখন ধারা বদলে যায়, রঙ বদলে

যায়, গতি বদলে যায়, আমরা সে সংবাদ রাখি না। নারীর নাম ধরে, কিংবা তার বিগতা স্ত্রীরই নাম ধরে তাহের এখন চিৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে— মৃতকে এখানে কেউ স্মরণ করে না; জীবিতকে এখানে কেউ সম্মান করে না। সমুখের এই নারী এখন তাহেরের উচ্চকণ্ঠের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে যেন ততোধিক উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে এবং জানায়, সে এই কথা জানায়, যে, বাহ, এই তবে স্বাধীনতা ? এরই জন্যে স্বাধীনতা ? অকস্মাৎ একটি বিস্ফোরণের শব্দ হয়; উভয়ে যদি আপন আপন জগতে বন্দি না থাকত, তাহলে দেখতে পেত তার আগে, ঐ প্রচণ্ড শব্দের আগে একটি আলোর ঝলক; ধোঁয়ায় সমস্ত কিছু ঢেকে যায়; পরাণের গাভীটি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মাঠ দিয়ে দৌড়ে যায়; সন্দেহ থাকে না যে ইস্কুল বানচাল করবার জন্যেই বোমা কেউ ফাটিয়েছে। শব্দের অনুরণন তখনো মিলিয়ে যায় নি, তারই ভেতর থেকে ভিন্ন একটি ধ্বনি শোনা যায়, জলেশ্বরীর ইস্টিশানে ট্রেনের হুইসিল, যেন বা মিকাইলের শিঙা, ধোঁয়ার জন্য এমত বোধ হয় এ জগতে তারা দুটি প্রাণী ভিন্ন আর কেউ জীবিত নেই; তাহের নারীর হাত ধরে প্রবল টান দেয়। 'চলুন'। নারী উত্তর দেয়, বক্তার হাত ছাড়িয়ে, নিজেই আবার বক্তার হাত চেপে ধরে, 'না'। অচির কালের মধ্যে পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে দ্বিতীয় একটি বিস্ফোরণ ঘটে।



তুমি সেই তরবারি

একটি মানুষ হঠাৎ কেন বিশেষ হয়ে যায় ? কেন মনে হয় সেই তাকে ছাড়া জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই আর প্রাসঙ্গিক নয় ? সে যদি নেই, তো বুকের ভেতরে কোনো প্রেরণা নেই— কেন এমন মনে হয় ?

যেমন এখন তার, বেলালের, হচ্ছে।

নিচের তলায় অশান্ত পায়চারি করে চলে বেলাল। একটু আগে ঘুমে যে চোখ জড়িয়ে আসছিল, সেই ঘুম এখন অন্য কারো চোখের বলে মনে হয়। বসবার ঘরে কাচের গোল টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শাদা ওয়াইনের খালি বোতলটা। আর একটা বোতল বেশি আনলে এখন পান করত বেলাল, তাহলে সুরার হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়া সহজ হতো তার।

এইতো কিছুক্ষণ আগে ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। সাকিনা আর কাশেম। গেল ওপরের ঘরে, ওদের শোবার ঘরে, গেল শাদা বিছানায়, লেপের গহ্বরে, একে অপরের উষ্ণতার ভেতরে। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর, এখনো মনে হয়— গতকাল।

বেলালকে ওরা নিচে রেখে গেল ওপরের ঘরে। নিচের এই ঘর থেকে ওপরের ঘরে সিঁড়িটা খোলা খাড়া উঠে গেছে। গাঢ় সবুজ কার্পেট মোড়া সিঁড়ি। এখন তার মনে হয়, ঈর্ষার নিশানের মতো ঘন সে সবুজ। সেই সবুজ মাড়িয়ে প্রথমে উঠে যায় সাকিনা, তারপর কাশেম, অনবরত একটি ব্যবধানে। পেছন থেকে কাশেম একবার সাকিনাকে কাতুকুতু দিয়েছিল। 'যাঃ, না, না' বলে সাকিনা তখন দৌড়ে সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ পার হয়ে গিয়েছিল। আর কাশেম মুখ ফিরিয়ে, নিচে বেলালকে, বলেছিল, শুয়ে পড়ো বেলাল, আর দেরি করো না।

নিচের এই বসবার ঘরের পাশেই বেলালের ঘর। কিন্তু সেখানে যাবার কোনো প্রেরণাই সে পায় না। সে দ্রুত পায়চারি করে চলে। টেলিভিশনটা খোলা আছে, কিন্তু সেদিকে দেখার চোখ এখন তার নেই। বরং টেলিভিশনটা বন্ধ করে দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঝুলে পড়ে পিচ্ছিল স্তব্ধতা।

এমন তো কখনো তার মনে হয় নি ? মনে হয় নি, কাশেম বলে কেউ যদি না থাকত, যদি সাকিনা একা হতো, যদি এ বাড়ি তার হতো, এই আসন, এই দরোজা, এই বাতি, দেয়ালে পিকাসোর ছবির এই প্রিন্ট ? ছবির প্রিন্ট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সাকিনাকে সে কোথায় পাবে ?

অথচ সাকিনা তার বন্ধুর স্ত্রী। লন্ডনে তাদের এই বাড়িতে সে নিচের একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। বছর দু'য়েক আগে কাশেমই তাকে ডেকে বলেছে, একা পড়ে থাকার চেয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এসো। সেই বিশ্বাসের মাটিতে আজ এ কোন্ ঘাতক-ফুল ফুটলো ?

কিছুতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বেলাল। তার কেবলই মনে হয়, কী করছে ওরা এখন ওপরের শোবার ঘরে। ওপর থেকে কোনো শব্দ নেই কেন ? এত নিস্তব্ধ কেন ? এমন কিছু কি ওরা করছে যার জন্যে অস্বাভাবিক এই স্তব্ধতা তাদের পালন করতে হচ্ছে ?

বস্ত্রহীন সাকিনার শরীরের ওপর শুয়ে পড়েছে কাশেম ?

নিঃশ্বাস বন্ধ করে উৎকর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে বেলাল।

না, কোনো শব্দ নেই।

না, কোনো আলো জ্বলছে না ওপরে।

না, কোনো রেডিও চলছে না, যে-রেডিও কাশেম ঘরে গিয়েই ছেড়ে দেয় রোজ।

রান্নাঘরে গিয়ে বেলাল চোখেমুখে পানি দেয়। তবু তার চোখ বহু রাত ঘুমহীন জেগে থাকার

মতো দগ্ধ হতে থাকে।

সে এখন কী করবে ?

সন্ধেবেলা এক বোতল ওয়াইন কিনে এনেছিল বেলাল। রাতের খাবারের সঙ্গে ওরা তিনজন খেয়েছিল। এবার সাকিনাকে ঢেলে দিতে গিয়ে বেলালের হাত সাকিনার হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। তখন সাকিনা আর নেবে না বলে গেলাশের মুখ বাঁ-হাতে চাপা দিয়েছিল, সেটা সরিয়ে ওয়াইন ঢেলে দিতে গিয়েই ছোঁয়াছুঁয়ি। তখন কিছু মনে হয় নি, এখন বেলালের মনে হয় তার ঐ হাত, যেখানে ছোঁয়া, অন্য কারো হয়ে গেছে— সেখানে তার নিজের কোনো স্পর্শ অনুভূতি আর নেই।

হাতটাকে বেলাল এখন নিজের ঠোঁটে এনে ছোঁয়ায়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো সরিয়ে নেয় সে হাত। সাকিনাকে তার এত চুমো খেতে ইচ্ছে করছে কেন ? সাদা ওয়াইন কি সে আজ বেশি খেয়ে ফেলেছে ? কেন এমন ইচ্ছে করছে সাকিনাকে নিয়ে শুয়ে থাকতে, ঠিক যেমন, কল্পনায় এখন সে দেখতে পায় কাশেম শুয়ে আছে সাকিনাকে নিয়ে ওপরের ঘরে ? কেন, কেন, কেন তার ইচ্ছে করছে সাকিনার শরীরের ভেতরে উজ্জ্বল নিশান উড়িয়ে ঢুকে যেতে ?

কাবার্ড খুলে দেখে হুইস্কি ছাড়া আর কিছু নেই। ওয়াইনের পর হুইস্কি খাওয়া বিপদজনক। তবু ঢেলে নেয় বেলাল, না পানি, না সোডা, না বরফ— লম্বা একটা চুমুক দেয় সে। বুকের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে নেমে যায় হুইস্কি, কিন্তু সে আগুনও শান্ত মনে হয়, যে আগুন এখন তার ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলছে তার তুলনায়। শব্দহীন, সাদা, সর্বগ্রাসী আগুন। সেই ছোটবেলা থেকে তার একটা স্বপ্ন দাবানল দেখবে, যেদিন সে শব্দটা প্রথম পেয়েছিল বইয়ের পাতায়, সেদিন থেকেই। এই কি সে দাবানল ?

গেলাশ নামিয়ে বেলাল এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির নিচে, প্রায় তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেন তার রাজত্ব এখন অন্য কারো হাতে চলে গেছে, যে অন্য কেউ তারই আদলে তৈরি কিন্তু এখন ভীষণ অচেনা।

কান পেতে শোনে, এখনো ওপরে ওদের ঘরে সেই স্তব্ধতা। এখনো কি কাশেম তার স্বামীত্বের দৈনিক পাওনা আদায় করে চলেছে সাকিনার কাছ থেকে ? যে-সাকিনা অনিচ্ছুক ? নাকি, সম্মত সে ? আগ্রহী সে ? সে-ই পথিকৃত ? সাকিনা ?

টুক করে বাতিটা নিবিয়ে দেয় বেলাল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে সিঁড়ির গোড়ায়। তারপর, আস্তে একটা পা রাখে সে একধাপ ওপরে। দাঁড়ায়। আবার এক ধাপ। আবার দাঁড়ায়। এমনি করে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে সে দাঁড়ায় কান খাড়া করে।

না, কোনো শব্দ নেই। এমনকি নিঃশ্বাসেরও না।

হঠাৎ একটা নতুন অনুভূতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। গ্লানি। এ-কী করছে সে ? বন্ধু দম্পতির শোবার ঘরে আড়ি পাতছে সে ? দ্রুত নেমে আসে বেলাল। আরো খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নেয় গেলাশে। সিগারেট ধরায়। প্রায় দৌড়ে যায় নিজের ঘরে। একটানে খুলে ফেলতে থাকে দিনের পোশাক শরীর থেকে। কোনো মতেই কোনো কিছু ভাববার অবকাশ নিজের মনকে আর সে দিতে চায় না। এক্ষুণি সে সবটা হুইস্কি গিলে ফেলবে, পাজামা পরবে, জোর করে আলিঙ্গন করবে ঘুমকে, তাকে আর কিছুতেই সে ছাড়বে না।

কিন্তু না। পাজামা পরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পাখি তাকে ঠুকরে ঠুকরে খেতে শুরু করল, যে পাখির হাত থেকে পালাবার জন্যে সে এ ঘরে এসেছিল। এবারে তার বুকের ভেতরে কে যেন এনে দিল অমিত সাহস, কে যেন নিপুণ হাতে মুছে দিয়ে গেল বাস্তবতা এবং যুক্তি।

বেলাল স্থির পায়ে একের পর এক সিঁড়ির ধাপ ভাঙ্গতে লাগল।

অচিরে সে পৌঁছুলো কাশেমের দরোজার বাইরে। পুরনো বাড়ি, দরোজা বন্ধ করলেও ভালো করে বন্ধ হয় না, কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। দরোজার সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে অনুভব করা যায় দুধ মেশানো অন্ধকার। বোধহয়, ওদের জানালার পর্দা টানা নেই, রাস্তার বাতি এসে তরল করে দিয়েছে ঘরের অন্ধকার।

এবার শোনা যায়, নিঃশ্বাসের শব্দ। বোঝা যায় না, কার। কাশেম না সাকিনা ? মানুষের নিঃশ্বাস নেবার শব্দ কি এক রকম ? অথচ মানুষ বাঁচে প্রত্যেকে নিজের মতো করে।

দূরে একটা পুলিশের গাড়ি চলে গেল সাইরেন বাজিয়ে অন্ধকারের গালে চড় মারতে মারতে। দরোজার পাশে নিজেকে যথাসম্ভব সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল বেলাল, পাছে ওরা কেউ উঠে পড়ে সাইরেনের শব্দে।

না। কাশেমের কথা জানে না, সাকিনা সব সময় বলে তার ঘুম এত গাঢ় যে পা ধরে পথে টেনে নামালেও তার ঘুম ভাঙ্গে না। সাকিনার ঘুমের ভেতরেও, অমন ঐ পাথর ঘুমের ভেতরেও কি কাশেম কখনো উপগত হয় ?

দরোজা ধীরে ধীরে খোলে বেলাল। অতি সাবধানে, একটু একটু করে, যেন সে নিয়তির নির্দেশ পালন করছে মাত্র। একবারও তার মনে হয় না, ওরা উঠতে পারে, একবারও তার ভেবে রাখবার কথা মনে হয় না যে ওরা জেগে উঠলে সে কী কৈফিয়ত দেবে।

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ায় বেলাল।

গ্যাসের আগুনে ঘরটা গ্রীষ্মকাল হয়ে আছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে লাল-নীল ফুল তোলা লেপ। লম্বা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কাশেম, আর তার কোমরের ওপর পা তুলে পাশ ফিরে সাকিনা। সাকিনা তার খোঁপা খুলে ফেলেছে, খোলাচুলে মুখের অনেকখানি ঢেকে আছে তার। হাতে হীরের আংটি অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। তার একঢালা স্বচ্ছ অন্তর্বাস উঠে এসেছে বুক অবধি। সাকিনার মুখের তুলনায় অনেক বেশি ফর্সা উরু— এখন মনে হচ্ছে মাংস আর মেদ নয়, নরোম কোনো পাথরে তৈরি।

একবার ছুঁয়ে দেখতে প্রবল আগ্রহ হয় বেলালের।

কিন্তু সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। সাকিনার পাশে, ছোট টেবিলে, ঘড়ির বুকে ঘণ্টা-মিনিটের উজ্জ্বল সংখ্যাগুলো এগিয়ে যেতে থাকে অবিরাম এবং নিঃশব্দে।

এ কি শরীরের প্রতি শরীরের দুর্বার আকর্ষণ ? বিশুদ্ধ কাম ? বিয়োগচিহ্নের দিকে যোগচিহ্নের অনিবার্য যাত্রা ?

বেলাল তার নিজের শরীরে হাত রাখে। প্রায় অন্যমনস্কভাবেই লক্ষ করে তার শিশ্ন শিথিল, এক টুকরো রবারের মতো প্রাণহীন, মাছের পাকস্থলীর মতো শীতল। বিস্ময়ে আর্ত অস্ফুট একটা ধ্বনি তার কণ্ঠ থেকে ছাড়া পায়, আর স্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তেই নিবে গিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়।

আবার, নতুন চোখে সে তাকায় ঘুমন্ত দম্পতির দিকে, তার বন্ধু আর বন্ধু স্ত্রীর দিকে, কাশেম আর সাকিনার দিকে। কাশেমের উপুড় লম্বা দেহের ওপর সাকিনার উরুর দিকে। তারপর শুধু সাকিনার মুখের দিকে। সে-মুখে পৃথিবীর সমস্ত মমতা রূপ নিয়ে আছে, পৃথিবীর ভয়াবহ একটি শূন্যতাকে পূর্ণ করে আছে।

২

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, ড্রেসিং গাউনের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে সাকিনা বলল, আরে, তুমি জেগে গেছ ? ঘুম হয় নি রাতে ?

বসবার ঘরে সোফার ওপর পা লম্বা করে বেলাল চা খাচ্ছিল : সাকিনার কথার কোনো উত্তর দিল না সে, একটু হাসল মাত্র।

সাকিনা আবার বলল, শনিবারের ভোরে সারা লন্ডন এখনো ঘুমিয়ে, এখুনি উঠে পড়েছ কী করতে ? কাশেম এখনো ভোঁ ভোঁ করে ঘুমোচ্ছে।

তোমাকে চা করে দিই ?

আমি নিজেই করে নিচ্ছি। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সাকিনা আবার জিজ্ঞেস করল, রাতে ঘুম হয় নি নাকি ?

হ্যাঁ, হয়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে না।

দেয়ালের ওপর বেড়ালের লাফ দিয়ে ওঠার মতো বেলালের একবার মনে হলো, কাল রাতে চুরি করে ওদের ঘরে গিয়েছিল সে, সাকিনা সেটা টের পায় নি তো ? ভালো করে তাকায় সে সাকিনার দিকে। না, কোনো চিহ্ন নেই।

সাকিনা চা করে বেলালের পাশে এসে বসল, একটু দূরত্ব রেখে, কিন্তু মাথাটাকে যথাসম্ভব বেলালের কাছে এনে বলল, কাল রাতে এক কেলেঙ্কারি হয়েছে জানো ?

হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল বেলালের।

কী ?

দাঁড়াও বলছি। গরম চায়ে ঠোঁট পুড়ে গেছে। সাকিনা ঠোঁট গোল করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর জিভ দিয়ে দু'ঠোঁট ভালো করে ভেজায়, চুকচুক শব্দ করে পরীক্ষা করে কতটা পুড়েছে।

না, খুব বেশি পোড়ে নি। সেরে যাবে। কাল রাতে সে-কী ভীষণ স্বপ্ন দেখি, কালো মতো কী একটা আমাকে তাড়া করছে, কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারছি না। এক সময়ে আমাকে ধরে ফেলল। তারপর সে-কী ধ্বস্তাধ্বস্তি। যত মারি কিছুতেই ছাড়ে না। হঠাৎ দেখি, কাশেম আমাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে, আর বলছে, এই কী হলো, আমাকে মারছ কেন ? বুঝলে, ওকেই ধরে মারছিলাম।

বেলাল নিশ্চিত হলো যে, অন্তত তার ওপর তলায় যাবার কথাটা সাকিনা জানে না। সে বলল, এমনিতে তো মারবার সুযোগ পাবে না। ঘুমের ভেতরে মেরে দিলে, ভালো হলো।

মোটেই না। ওকে মারতে চাইব কেন ?

খুব ভালোবাসো ?

বাসিইতো।

তা যখন টের পেলে ওকে মারছ, তখন কী করলে ?

সাকিনা লম্বা একটা চুমুক দিল চায়ে। তার চোখ দু'টো ঝিলিক দিয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে। কীসের সম্ভাবনায় ঈর্ষা এসে বেলালের বুকের ভেতরে দখল নিল। সে কানে কিছু শুনতে না চাইলেও তাকে শুনতে হলো।

ওকে আদর করে দিলাম।

শুকনো গলায় বেলাল জানতে চাইল, আর ও ?

অত শুনে কী হবে ? ছেলেমানুষের অত শুনতে নেই।

বেলালের কেমন জেদ হলো। ঠিক করে কাপ নামিয়ে রেখে সে বলল, না, বলতেই হবে।

যাঃ, কিছু না। উঠে দাঁড়াল সাকিনা। সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, কই, তুমি উঠেছ ? চা আনব ?

ওপর থেকে কাশেমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সাকিনা আবার এসে বসল, এবার বেলালের পাশে নয়, অন্য সোফায়। বলল, কাল কী ওয়াইন খাইয়েছ, আমরা দু'জনেই এমন ঘুম ঘুমোই নি। এখনো ও ঘুমোচ্ছে।

বেলাল উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে বলল, বাজার কিছু করবার থাকে, বলো। চাল, ডাল, মাংস, চা, পনির ? কিছু লাগবে ?

এত তাড়া কীসের ?

দরকার থাকলে বলো, বাজার করে দিয়ে আমাকে একটু বেরুতে হবে। কখন ফিরব, জানি না।

বোসো বোসো। এত ভোরে কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। জানো না বুঝি, লন্ডনে শনিবারের ভোর হয় বারোটায়।

আমাকে আর শেখাতে হবে না। তুমি এসেছ পাঁচ বছর, আমি এখানে আছি দশ বছর।

বেলাল বাথরুমে চলে গেল তৈরি হতে।

দাড়ি কামিয়ে, কাপড় পরে ফিরে এসে দেখে সাকিনা তেমনি ঠায় বসে আছে সোফার ওপর। বদল এইটুকু যে, এখন সে রেকর্ডে গান শুনছে। সাগর সেনের গলায়— 'পথিক পরাণ চল, চল সে পথে তুই, যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই।'

সকালবেলায় এই প্রথম নির্মলভাবে হেসে উঠতে পারল বেলাল। বলল, ব্যাপার কী ? ভোর সকালে বিকেলবেলার জুঁইকে নিয়ে পড়েছ ?

ঠোঁটের পরে আঙ্গুল তুলে নিঃশব্দে চুপ করতে বলল সাকিনা। তারপর গান শেষ হতে রেকর্ড তুলে রেখে রান্নাঘরে গেল সে। সেখানে তার নিজের আর বেলালের চায়ের কাপ দু'টো ধুতে ধুতে কুয়াশা গলায় বলল, আমার এদেশে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না।

সাকিনার গলায় এমন একটা কিছু ছিল যা ভালো করে ধরতে পারল না বেলাল, কিন্তু তাকে খুব দুলিয়ে দিয়ে গেল। রান্নাঘরে খোলা দরোজার পাটে হাত রেখে সে দাঁড়াল। বলল, কারই বা থাকতে ইচ্ছে করে ?

তুমি দশ বছর আছো কেন ?

জানি না।

দেশে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার ?

করে।

যাবে না ?

যাবো।

না, যাবে না। তোমরা কেউ যাবে না, কেউ যাবে না দেশে।

সাকিনার মুখে 'তোমরা' শব্দটা আলতো চমক রেখে গেল বেলালের মনে। ওর ভেতরে কি

কাশেমও আছে ? -

বেলাল বলল, বাজে কথা। দেশে সবাইকে যেতে হবে, একদিন না একদিন। তুমি যাবে, কাশেম যাবে, আমিও যাবো— যদিও স্বীকার করব এদেশে থাকতে কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে, মনের মধ্যে কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে দেশে গিয়ে বোধহয় সুবিধে করতে পারব না, অথচ কেন যে পড়ে আছি তারও কোনো মানে মোদ্দা নেই।

বোঝো তাহলে ?

বুঝি বৈকি।

সাকিনার কাপ ধোয়া হয়ে যায়। সে এখন দুধ গরম করতে থাকে। অন্যমনস্কভাবে ভেজা কাপড় দিয়ে রান্নাঘরের টেবিল মুছতে থাকে, যদিও তার কোনো দরকার বেলালের চোখে পড়ে না।

সাকিনা, আজ সকালে তুমি কিছু একটা ভাবছ।

মোটেই না।

কিছু একটা হয়েছে।

কী আবার হবে ?

নইলে এত সকালে তো তুমি ওঠো না। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে, ঘুম হয়েছিল কিনা। তোমার হয়েছিল তো ?

হ্যাঁ, হবে না কেন ?

তুমি কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বড় বেশি প্রশ্ন করছ।

যাও, মেলা বোকো না। কোথায় যাচ্ছিলে যাও, বাজার আমিই করে নেব।

তা হচ্ছে না। বাজার করবার থাকলে আমার তো করবার কথা। এদেশে সবার কাজ ভাগ করা আছে। বাজার করে দিয়েই বেরুবো।

গরম দুধে কফি করে সাকিনা ওপরে নিয়ে গেল কাশেমের জন্যে। কাশেম সকালে কফি খায়, তাও গরম দুধে। অথচ এই কাশেম যখন বিয়ে করে নি, যখন গোড়ার দিকে সে আর বেলাল একসঙ্গে ছিল, তখন পানি গরম করবার কষ্টে সকালে চা পর্যন্ত খেতে ভীষণ গড়িমসি করত। বেলালকে রোজ বানিয়ে দিতে হতো। তারপর, কাশেম দেশ থেকে সাকিনাকে বিয়ে করে আনল। তখন তিন বছর দু'বন্ধু আলাদা ছিল। এরই ভেতরে একটা নবাব হয়েছে কাশেম।

হঠাৎ বেলালের মনে পড়ে যায়, কাশেম সাকিনাকে দিয়ে কী না করিয়ে নিচ্ছে। সাকিনা চাকরি করে, সে টাকায় সংসার চলে, কাশেম শুধু পড়াশোনা নিয়ে আছে, তাও পরীক্ষা দেয় না ঠিক সময়ে, দিলেও পাশ করে না। কাশেম নিজে গাড়ি চালাতে পারে না, অথচ বৌকে এদেশে এনেই ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি করে পাশ করিয়ে ছেড়েছে। এখন সে পাশে বসে থাকে আর সাকিনার দায়িত্ব তাকে বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার। অফিস থেকে এসে রোজ রান্না করে সাকিনা, কাশেমের দায়িত্ব শুধু দয়া করে দুটি খাবার। আর রাতে— রাতেও সেই সাকিনা, তাকেই দিতে হচ্ছে তার শরীর, কাশেম শুধু নিচ্ছে।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল বেলালের। কাশেমকে ধরে ঝাঁকাতে ইচ্ছে করে তার। পরমুহূর্তেই তার দৃষ্টি পড়ে নিজের অন্তঃস্থলের দিকে। সাকিনার জন্যে তার যে আকর্ষণ তা যদি কাম নয়, তাহলে তা করুণা ?

সাকিনা হাসিমুখে নেমে আসে নিচে।

কফি দিয়ে এলাম, হাত ধরে টানলাম, উঠে এখন খাচ্ছেন।

সাকিনার গলায় এমন কিছু আছে যার উৎস ভালোবাসা থেকে। সে ভালোবাসার সমুখে বেলাল এখন বুঝে পায় না কী করবে। কাশেমকে ভালোবেসে সাকিনা যদি ক্রীতদাসীও হতে চায়, তাতেই বা বেলালের বলার কী আছে ?

সাকিনা বলল, সত্যি সত্যি তুমি বেরিও না যেন। আমার সঙ্গে আগে বাজারে যাবে। তারপর যেখানে যেতে হয় যেও। বুঝেছ ?

সাকিনা রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে থাকে সংসারে কী আছে আর কী নেই। রান্নাঘরের ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায় বসবার ঘর থেকে। বেলাল বসবার ঘরে সোফায় এমন ভঙ্গিতে বসে যেন আধ মিনিটের জন্যে বসেছে মাত্র। কিন্তু সে জানে, সাকিনার ফর্দ তৈরি করতে লাগবে অন্তত পনেরো মিনিট।

বেলাল বলল, জানো সাকিনা, তখনকার ঐ কথার জের টেনে বলছি। শুনছো তো ?

শুনছি। আমি হাতে কাজ করি আর কান দিয়ে শুনি। বলো।

প্রথম যখন এদেশে এসেছিলাম, সেই দশ বছর আগে, ব্যারিস্টারি পড়তে, তখন পুরনো এক বাঙালি, ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছিল সেও, এখন সিভিল সার্ভিসে কাজ করে, এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা, পড়া তার হয় নি, ঠিক আমার মতো, সে বলেছিল, বেলাল সাহেব, এই বিলেতের মাটিও বাংলাদেশের মাটির মতোই নরোম। কখন দেখবেন শেকড় বসে গেছে। আর ছাড়াতে পারছেন না। সেদিন বিশ্বাস করি নি। এখন দেখি তাই। বুঝলে সাকিনা, এখন দেখি, এ লোকটার কথাই ঠিক। দশ বছর হয়ে গেল, না পড়া শেষ করলাম, না দেশে ফিরে গেলাম, রয়ে গেলাম। কীসের জন্যে তা জানি না, আছি এইমাত্র। চাকরি করছি, পাউণ্ড পাচ্ছি, সপ্তাহের কাজের পাঁচটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না, শনি-রবি ছুটি, ছুটির দিন ঘরের দু'টো কাজ করে আর টেলিভিশনে সিনেমা দেখে কোথা দিয়ে কেটে যায় তাও বুঝি না, আবার দেখি সোমবার। আবার ঘানিকল। ভাবি, এও ভালো। যা বিদ্যে দেশে গিয়ে তো পাঁচশ টাকারও কাজ পাবো না। বন্ধুবান্ধব আমার চেয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে দেশে। এখানে তবু ভালো আছি। ধারে গাড়ি কিনে চালাচ্ছি, বছরের ছুটিতে ইয়োরোপ যাচ্ছি, ইংরেজ বান্ধবীদের সঙ্গে গায়ে হাত রেখে কথা বলার সুখ পাচ্ছি, কীভাবে আছি, কেথায় পড়ে আছি, দেশের কেউ জানছেও না, দেখছেও না। আসলে বিলেতে আসাটা আর থাকাটাই আমাদের দেশে বড় একটা কৃতিত্ব। সেটাই যখন হয়ে গেছে, আর চাই কী ? —কই, তুমি কিছু বলছ না ?

বেলালের এতক্ষণে খেয়াল হয় এক নাগাড়ে সে নিজেই কথা বলে চলেছে, যেন নিজের সঙ্গেই। সাকিনা, রান্নাঘরে টেবিলের ওপর উবু হয়ে ফর্দ লিখছে।

বেলাল উঠে এলো সাকিনার কাছে। বলল, আমাকে দিয়ে এতক্ষণ শুধু শুধু বকালে। শোনার ইচ্ছে নেই, বললেই হতো।

সাকিনা ফর্দের দিকে চোখ রেখে, আঙুলের কড়ে কী হিসেবে করতে করতে বলল, ওসব মন খারাপ-করা কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি তৈরি ? আমিও । চলো বাজারে যাই।

সম্ভবত কপালে টিপ আঁকবার জন্যে সাকিনা ওপরের ঘরে ছুটলো। শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে টিপ পরতে সাকিনা খুব ভালোবাসে।

৩

আজ বড় অবসন্ন মনে হচ্ছে কাশেমের। বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে এই শনিবার। এর আগে সাকিনা রাগ করলে দু'ঘণ্টা পরে সে নিজেই ভাব করে নিত। কিন্তু আজ সেই শেষরাত থেকে এখন অন্তত সাতটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, সাকিনা তার সঙ্গে কথা বলে নি। মাঝখানে একবার শুধু কফি দিয়ে ছোট্ট করে ডেকে গেছে। তারপর এইমাত্র বাজারে গেল, তাও না বলে, অথচ সাকিনা এক মিনিটের জন্যে বাইরে বেরুলেও সবসময় বলে বেরোয়। বরং এ নিয়ে কত ঠাট্টা যে তাকে করেছে, তবু অভ্যেসটা ছাড়ে নি। আর আজ ? দুমদাম করে ওপরে এসে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেগুনি টিপ এঁকে, যেতে যেতে আয়নায় দূর থেকে আরেকবার নিজেকে চট করে দেখে নিয়ে, সাকিনা চলে গেল।

পাশে পড়ে আছে কফি। ছোঁয় নি। না, সে আজ বিছানা ছেড়েও উঠবে না। এইভাবে একটা জীবন সে শুয়ে থাকবে। কিচ্ছু করবে না। নিষ্ক্রিয়তার সাধনায় সে সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, আর অন্য কিছুতে তার কৃতিত্ব নাইবা থাকল।

কেন তাকে সাকিনা বারবার মনে করিয়ে দেবে সে পরীক্ষায় ফেলের পর ফেল করে চলেছে ? সে কি বাচ্চা ছেলে ? তার ভবিষ্যৎ ভাবনা কি নেই ? যখন বিয়ে করে নি, তখন বলবার কেউ ছিল না, সেটাই ছিল ভালো। ভালো হয় সাকিনা যদি চলে যায়— যেমন সে এখন বাজারে গেছে বেলালের সঙ্গে, সেই যাওয়াটাই যদি শেষ যাওয়া হয়, ভালো হয়। বেঁচে যায় সে। নিজের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কেউ আর থাকে না।

যাক, বেলালের সঙ্গেই বেরিয়ে যাক সাকিনা। এমন তো কতই যাচ্ছে লন্ডনে। এখানে বাঙালি ছেলের প্রেম দু'টো জায়গায়, এক বিদেশী মেয়ের সঙ্গে, আর পরিচিত কোনো স্বদেশবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে। আশ্চর্য, কথাটা বাবুল তাকে না বলা পর্যন্ত তার কোনোদিন চোখেই পড়ে নি যে লন্ডনে অবিবাহিত বাঙালি মেয়ে যথেষ্ট থাকলেও তাদের সঙ্গে বাঙালি ছেলের প্রেম হয় খুব কম।

বাবুলের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। বিয়ে করে নি সে, বেশ আছে। এর মধ্যে একটা বাংলাদেশী রেস্তোরাঁও খুলেছে একজনের সঙ্গে ভাগে। ঝকঝকে সুট পরে, তকতকে বি-এম-ডব্লু গাড়ি চালায়, একেক ছুটিতে একেক শ্বেতাঙ্গিনীকে নিয়ে সমুদ্র তীরে বেড়িয়ে আসে। লেখাপড়া না করে বাবুলের মতো সে যদি ব্যবসাও করত, তাহলে সাকিনার কথা তাকে শুনতে হতো না। ব্যবসার কথা দু'একবার সে তুলেছেও সাকিনার কাছে, কিন্তু সে শুনতে একেবারেই নারাজ। 'ব্যবসার তুমি কী বোঝো ?' এই কথাটা সাকিনাকে কে বোঝাবে যে ব্যবসাটা মায়ের পেট থেকে শিখে কেউ বেরোয় না। দেশে চাকর বলে বাঙালির যত বদনামই থাক, বিদেশে কিন্তু বাঙালি, বিশেষ করে বাংলাদেশের বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের নয়, ওরা চাকুরি ভালোবাসে, বাংলাদেশের বাঙালিরা ব্যবসা করতে ওস্তাদ বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে, অন্তত এই লন্ডনে।

বাবুলকে ফোন করল কাশেম। ফোনটা তুলতে গিয়ে খানিক কফি চলকে পড়ে গেল কার্পেটে। সাকিনা এসে চোখ কালো করবে। তা করুক। সাকিনাকে ভয় করে না কাশেম। সাকিনার ঐ এক রোগ। ঘরদোর সারাক্ষণ পরিষ্কার করছে। তার সংসারে সবকিছু নিপাট নিভাঁজ। কাশেমের মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুঠে ওঠে। সংসারের বড় আসবাব সে নিজেই, কিন্তু সবচেয়ে অগোছালো।

অনেকক্ষণ পর ফোনের ওপার থেকে গলা ভেসে এলো।

হ্যালো, বাবুল ? আমি কাশেম।

একমুহূর্ত চিনে উঠতে পারল না বাবুল। কোন কাশেম ? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, একসঙ্গে একইদিনে বিলেতে উড়ে এসেছিল তার সঙ্গে যে, এ সেই কাশেম।

কী খবর দোস্ত ? বাংলাদেশের কোনো খবর আছে নাকি ?

হকচকিয়ে যায় কাশেম। ইতঃস্তত গলায় জিজ্ঞেস করে, বাংলাদেশের খবর মানে ?

মানে, ক্যু, ইলেকশান, ইন্ডিয়া— নতুন কিছু শুনলি নাকি ? শালা বাঙালির কাছ থেকে ফোন এলেই বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে-- এই রে, দেশে বুঝি কিছু হয়েছে।

হেসে ওঠে কাশেম।

না, না, সে-রকম কিছু হয় নি। অনেকদিন দেখি না, ভাবলাম, শনিবার দিন; একটু খবর নিই।

চলে আয় আমার রেস্তোরাঁয়। বৌকে নিয়ে আয়।

সে নেই।

নেই মানে ? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে নাকি ?

না, বাজারে গেছে।

তাই বল। জবর ঘাবড়ে দিয়েছিলি, দোস্ত। তোর আবার সুন্দরী বৌ তো, গানটান গায়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে, ভাবলাম— যাক, বৌকে নিয়ে আয় যখন খুশি।

দেখি। চলে আসব আজ। অনেকদিন তোর সঙ্গে কথা হয় না। বেশ আছিস তুই। আমি শালা এখনো বই বগলে করে ইস্কুলে যাচ্ছি।

চলে আয়, চলে আয়।

টেলিফোন রেখে দিল কাশেম। বেশ আছে বাবুল। রেস্তোরাঁর নামটাও বেশ দিয়েছে। 'বুলোক কার্ট'—গরুর গাড়ি। জায়গাটাও ভালো, বেলসাইজ পার্ক। সুস্থির ধনী আর বেপরোয়া তরুণ-তরুণীদের পাড়া। জমজমাট হয়ে থাকে বাবুলের রেস্তোরাঁ। আজই সে যাবে একবার।

ভীষণ তেষ্টা পেল কফির। কাশেম নেমে এলো নিচে। অনাবশ্যক একবার উঁকি দিল বেলালের ঘরে। বেলালও বেশ আছে। ব্যারিস্টারি পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এখন দিব্যি রেস রিলেশনস বোর্ডে চাকরি করছে। কাজের ভেতরে কিছু না— সারাদিন এখানকার বাঙালি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কোথায় কী অত্যাচার হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে, অবিচার হচ্ছে গায়ের রঙের জন্যে, তার খোঁজ করা আর রিপোর্ট লেখা। সে রিপোর্টে তো কচু হয়, মাঝখান থেকে টৈটৈ করে ঘুরে বেড়ানো হয় বেলালের, সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে টেলিভিশন দেখা, সাকিনার সঙ্গে গল্প করা— তখন কাশেমকে মনোযোগ দিয়ে ওপরের ঘরে বসে মোটা মোটা আইনের বই আর ল'রিপোর্ট পড়তে হয়, তারপর মদ খাওয়া, সাকিনার কাছে আবদার করে গান শোনা, শনিবার দিন তাকে নিয়ে বাজারে যাওয়া— বেলালও কিছু মন্দ নেই। সকলেই সুখে আছে, অসুখ কেবল তারই।

সাকিনার বানিয়ে যাওয়া কফি সে গলগল করে ঢেলে দেয় রান্নাঘরে সিংকের ভেতরে। ছোট্ট বৃত্ত তুলে সবটুকু পানীয় অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে, তবু একটা আবছা বাদামি রঙ লেগে থাকে সিংকে ঠিক যেমন সাকিনার কথা মনে না করতে চাইলেও মনে পড়ছে তার।

রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখছিল সাকিনা, স্বপ্নের ভেতরে অবিশ্রান্ত কিল মারছিল সে তাকে। তারপর, ভাল করে ঝাঁকুনি দিতেই জেগে উঠেছিল সাকিনা।

ও, তোমাকে মারছিলাম বুঝি, সোনা ?

হ্যাঁ, মারছিলে তো। এত কী খারাপ স্বপ্ন দ্যাখো ? অ্যাঁ ?

দেখব না ? দেখব তো। আরো দেখব।

দেখবে, দ্যাখো। আমার গায়ে হাত দিও না।

এত মেজাজ কেন, বাবু ?

ঘুমের মধ্যে মারলে কার মেজাজ ঠিক থাকে ?

একশোবার মারব।

কেন, পরীক্ষায় ফেল করি বলে ?

কেন ফেল করো ?

চেঁচিও না, নিচে বেলাল আছে।

শুনুক্ সে।

তাকে তো সব কথাই শোনাও।

কক্ষনো না।

ওর সঙ্গে হেসে অত কী কথা বলো রাতদিন ?

তোমার ছোট মন।

হ্যাঁ, আঁতে ঘা লাগলেই ছোট মন।

চুপ করো।

কেন চুপ করব ? এবার আমি চেঁচাব।

কাশেম কিন্তু চেঁচায় নি। পরীক্ষায় ফেল করবার কথাটা সে নিজেই তুলেছিল। আসলে, তার মনের মধ্যে ঘুরছিল যে সাকিনা যে-কোনো কথাতেই তার ব্যর্থতার কথাটা তুলে বসবে। সে সম্ভাবনা ঠেকাতে গিয়ে কথাটা নিজেই তুলে নিজে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঝগড়া করেছিল।

কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে এসেছিল মন। একটু অনুতাপ যে না হয়েছিল তা নয়। পরীক্ষায় ফেলের কথা সাকিনা তুললেও কখনোই তা নিয়ে সে বেশিক্ষণ মন খারাপ করতে তাকে দেয় নি— এসে কাশেমের গা ঘেঁষে বসেছে, ছুতো করে গায়ে হাত দিয়েছে, আবার আবদার করে স্পষ্ট বলেছেও, আমাকে একটু আদর করো দিকি।

কফি বানিয়ে সোফায় বসলো কাশেম। আজ বাবুলের কাছে সে যাবে। এবং একা যাবে। আজই সে একটা কিছু ঠিক করবে। আর পড়া নয়, পড়া তাকে দিয়ে হবে না। আর দু'দিন এমনি চললে সাকিনা হয়ত বলে বসবে, আমি তোমাকে রোজগার করে খাওয়াচ্ছি।

অতীতের দিকে, নিজের বিয়ের দিনটির দিকে, ঢাকায় লেডিজ ক্লাবে বৌভাতের রঙিন সামিয়ানাটানা দিনটির দিকে বিমূঢ় বিতৃষ্ণার সঙ্গে তাকালো কাশেম।

আর কেউ না জানুক, সাকিনা এখনো টের না পাক, সে নিজে তো জানে, তার বিয়ে করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— বিলেতে বৌ এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে উপার্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, সেই উপার্জনে ব্যারিস্টারি পাশ করবার চেষ্টা করা। সাকিনা একথা জানবার আগেই তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিয়ের পর সাকিনাকে এনে কাজে ঢোকাতেও কম ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হয় নি। এমনভাবে এগোতে হয়েছে যেন সাকিনা কিছুতেই সন্দেহ না করতে পারে। আর বুঝতে না

পারে, নিজের পড়াশোনা নিয়ে ঢাকায় সাকিনার বাবা-মা'র কাছে সে মিছে কথা বলেছে। ব্যারিস্টারির একটা পরীক্ষাও সে পাশ করে নি, অথচ ঢাকায় বিয়ের আগে বলেছে, আর একটা পরীক্ষা দিলেই পাশ, তাতে লাগবে বড়জোর এক বছর। বিলেতে এসে প্রথম কয়েক মাস সাকিনা কেবলই জিগ্যেস করেছে, কবে তোমার পরীক্ষা ? কাশেম বলেছে, এইতো, সামনে। কিন্তু এমন করে তো বেশি দিন চলে না। একদিন তাই বাড়ি ফিরে ফাঁদতে হয়েছিল বিরাট এক কাহিনী।

শোনো সাকিনা, আমাদেরই কপাল খারাপ। আমাদেরই— কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল কাশেম। আমাদেরই কপাল খারাপ, বুঝলে ? কোর্স আগাগোড়া হঠাৎ বদলে গেছে। আবার আমাকে গোড়া থেকে পড়তে হবে। মানে, একেবারে নতুন ছাত্রের মতো।

কাশেমের এখনো নিজেকে প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে সেদিনের সেই অভিনয় নৈপুণ্যের জন্যে। মাথায় দু'হাত চেপে ধরে একটি ঘণ্টা সে ঠায় বসেছিল। সাকিনার হাজার অনুনয়, হাজার মিষ্টি কথা, সান্ত্বনা, কিছুতেই নিজেকে বিচলিত হতে দেয় নি সে। তারপর রাতে যখন সাকিনা তাকে আদরে আদরে ভরে দিয়েছে তখনই সে সিদ্ধান্ত করেছে, আর অভিনয় করবার দরকার নেই; সাকিনা মেনে নিয়েছে এই বিপর্যয়।

যতদিনই লাগুক, তুমি পড়ো। মন খারাপ কোরো না। তোমার মন খারাপ দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই।

সেদিন প্রাণ ভরে কাশেম তার শরীরের স্বাদ দিয়েছে সাকিনাকে। একটা মিথ্যে পার করবার পর নির্ভার শরীরে সে অনেকক্ষণ খেলা করেছে। এখনো সেই রাতটার কথা মনে আছে তার।

তারপর চাকরিতে ঢোকানো। ধার করে চলছিল কাশেমের। প্রধানত বাবুলের কাছ থেকে। কিন্তু ধার কোনো নিয়মিত পথ নয়। বিয়েই সে করেছে বিলেতবাস সহজ করবার জন্যে, পড়া করবার জন্যে, যাতে নিজেকে উপার্জনে নামাতে না হয়।

আমি বলি কী, আমি তো ক্লাশে চলে যাই। বাড়ি বসে একা একা নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগে। সকলেই এখানে চাকরি করে। তুমিও একটা ধরে নাও না। পর মুহূর্তেই সে যোগ করেছিল, 'অবশ্যি, তাড়া দিচ্ছি নে, তোমার ইচ্ছে হলে করবে, না হলে না করবে।' বলতে বলতে সাকিনা একদিন কাজেও ঢুকে যায়, ন'টা পাঁচটা, কেমিস্টের দোকানে। সুগন্ধ বিক্রি করবার কাজ ছিল সেটা। এখন অবশ্য ভালো চাকরি করে সাকিনা, ইনকাম ট্যাক্স আপিসে, সরকারি চাকরি।

সাকিনার একটা গুণ, অনেক কিছুরই পূর্বাপর মিলিয়ে দেখে না; ফলে, কাশেমের অনেক ছলনাই তার চোখে ধরা পড়ে নি। সাকিনা মেনে নিয়েছে তার চাকরি করা, কাশেমের বসে বসে পড়া, পরীক্ষা দেয়া আর হয়ত ফেল করা; সাকিনা আজকাল মেনে নিয়েছে, আফিসে সে যাবে, ফিরে এসে রান্না করবে, স্বামীকে গাড়ি করে ঘুরিয়ে বেড়াবে।

কিন্তু কাশেমকে মাঝে মাঝে এক দুঃসহ গ্লানি এসে ঘুসি মেরে যায়। সাকিনা বুঝতে না পারুক, তাতে তার ছলনা তো আর ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে যাচ্ছে না ? এইসব মুহূর্তে বড় অবসন্নবোধ করে কাশেম। যেমন আজ সকালে, যেমন আজ শেষ রাতে।

শেষ রাতে ঐ ঝগড়ার পর কাশেম নিজেই কাছে টেনে নিয়েছিল সাকিনাকে। পরপর কয়েকটা চুমো দিয়েছিল।

কিছু মনে কোরো না। খারাপ ব্যবহার করেছি।

তখন সাকিনাও তাকে আদর করেছিল অনেক। তখন সাকিনাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে, তখন

সে তার শরীরের ভেতরে যেতে চেয়েছিল সন্ধি শেষে উৎসবের মতো করে। সাড়া দিয়েছিল সাকিনা। সাকিনা তার শিশ্নে হাত রেখেছিল, যেন বাগানে একটা গোলাপ তোলার জন্যে সে হাত বাড়িয়েছে; পরখ করে দেখছে তোলার মতো কি-না, তুলবে কি তুলবে না। কাশেম ধীরে ধীরে ঠেলে ওপরে তুলে দিয়েছে সাকিনার অন্তর্বাস, স্তনের ওপর হাত রেখেছে, দু'আঙুলে অনেকক্ষণ ধরে বোঁটা নিয়ে পাক দিয়েছে; আর সারাক্ষণ সাকিনা তার শিশ্নকে মুঠোর ভেতরে থেকে থেকেই চেপে ধরেছে, যেন ছেড়ে দিলেই ডানা মেলে উড়ে যাবে এই পাখি তার কালো খড়ের বাসা থেকে। কিন্তু কিছুতেই তৈরি হতে রাজি হয় নি কাশেমের শরীর। বাঁ হাতে সে অনুভব করেছে সাকিনার কোমল সুড়ঙ্গ, সেখানে বাসনার জলের সিক্ততা। তার আঙুল ভিজে গিয়েছে, ভেজা আঙুল দিয়ে সে নিজেও চেষ্টা করেছে নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। কিন্তু পারে নি। সাকিনার শরীরের ওপর লম্বা হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংহত করে, সে একবার, শেষবারের মতো জেগে উঠতে চেয়েছে, পাঠিয়ে দিতে চেয়েছে তার অস্তিত্বের প্রতিনিধিকে ঐ সুড়ঙ্গের ভেতরে। না, পারে নি। গ্লানি, গ্লানি। সেই ছলনার গ্লানি, মিথ্যার গ্লানি, ব্যর্থতার গ্লানি তাকে পৌরষত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে নির্মমভাবে। তাতেও কিছু হতো না; কিন্তু হলো। কারণ, কাশেম তখন নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সাকিনাকে প্রায় খাট থেকে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় হিসহিস করে উঠেছিল, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাকে তুমি পাবে না, এই যেমন এখন পেলে না।

হতভম্ব সাকিনা খাটের ওপর নিঃশব্দে উঠে বসেছিল। আর শুধু একটা কথাই বলেছিল, পাশ ফিরে চোখ বোজার আগে, তাও যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারতে।

৪

শনিবারের বাজার করা সোজা কথা নয়। সপ্তাহের এই দিনে লন্ডনের সবাই সাত দিনের বাজার করে রাখে। তাই সুপার মার্কেটগুলো সারাদিন গিজগিজ করে ভিড়ে, বিশেষ করে সকাল থেকে দুপুর আড়াইটে তিনটে অবধি। দোকানের ভেতরে মানুষের ভিড়ে হাঁটবার জো নেই। সারি সারি তাক। তাকের ওপর সাজানো সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। মানুষেরা একের পর এক ছোঁ দিয়ে তুলছে আর ট্রলিতে ছুঁড়ে ফেলছে, এগিয়ে চলছে পরের তাকের দিকে। এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই।

সেফওয়ে সুপারমার্কেটে ঢুকেছিল বেলাল আর সাকিনা। বেলাল ঠেলছে ট্রলি, আর জিনিস তুলছে সাকিনা। এর ভেতরে আরেক বিপদ হয়েছে, দরকারি ফর্দটা রান্নাঘরের টেবিলের ওপরেই ফেলে এসেছে সাকিনা। তাই আবার ভেবে সব নিতে হচ্ছে, সময় লাগছে।

আজ ফর্দ ভুলে গেলে কী করে?

মানুষের সব দিন কি সমান?

রাতটা বোধহয় খুব ভালো গেছে তোমাদের? বেলাল নিজের কণ্ঠে প্রবল ঈর্ষা চেপে বলে।

আবার ছেলে মানুষের কৌতূহল? সাকিনা দুষ্টুমিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর, 'বাজার করো বাজার করো'— বলে সে মনোযোগ দিল পনিরের তাকের দিকে। বলো, এই রশুন দেয়া পনির তোমার পছন্দ?

কাশেমের যা পছন্দ তাই-ই কেনো।

তা তো কিনবই। তুমিও তো বাড়িতে আছো।

তা আছি, বাজারের তিনভাগের একভাগ পয়সা আমি দিচ্ছি। দিচ্ছি না? বেলাল নিজেই বুঝতে পারে না কেন সে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কথাটা মনে করিয়ে দিল। তার মনে হয়, এতে তার এক প্রকার উপশম হলো আত্মার ভেতরে কোথাও।

আমি তা ভেবে বলি নি। থাক, নিতে হবে না রশুন দেয়া পনির।

মানুষের ভিড়ে বারবার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছিল বেলালের সঙ্গে সাকিনার শরীর। প্রথমে কিছু মনে হয় নি বেলালের। যখন খেয়াল হলো তখন ঝিমঝিম করে উঠল তার ভেতরটা। কীসের এক অনিবার্যতায় দুলে উঠল মুহূর্তের জন্যে। তারপর নিজেকে সচেতনভাবে দূরে রাখতে চেষ্টা করল সাকিনার থেকে।

বাজার শেষ হলো দেড়টা নাগাদ। এই সারাক্ষণ বেলাল কিছুতেই ভুলতে পারছিল না গত রাতের কথা, চুপিচুপি সাকিনার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার কথা। তার চোখের সমুখে স্থির একটা ছবির মতো, বেয়াড়া একটা ভিকিরির মতো উপস্থিত হয়েছিল সাকিনার উলঙ্গ সেই ঊরু, কাশেমের পিঠের ওপর—মুখের চেয়ে অনেক বেশি ফর্সা সেই ঊরু।

কিন্তু কাম নয়, করুণা নয়। তাহলে কী নাম এই অনুভূতির?

সাকিনা বলল, চলো গাড়িতে জিনিস তুলে চটপট বাড়ি যাই।

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বাড়ি গিয়ে করে দিচ্ছি।

এখানে কোথাও খেয়ে নিলে হয় না?

সাকিনার সঙ্গে একা আরো কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছে বেলালের। কেন এই ইচ্ছে, কী হবে তা পূরণ হলে, ভালো করে তার জানা নেই। আসলে, সে নিজেই বুঝে দেখতে চায়, কেন সাকিনা এভাবে তার সমস্ত অস্তিত্ব হঠাৎ আচ্ছন্ন করে আছে।

সাকিনা এক পলক ভাবল। তারপর বলল, কোথায় খাবে? বেশি দেরি করব না কিন্তু। কাশেম না খেয়ে বসে থাকবে। ও আবার খিদে একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

আমি না হয় ফোন করে দিচ্ছি।

না, না, আমি ফোন করছি।

পেল্লায় দু'বাক্স ভর্তি জিনিস কেনা হয়েছে সংসারের। সেগুলো টেনে টেনে বেলাল তুলতে লাগল গাড়ি-পার্কে গিয়ে সাকিনার গাড়িতে। দূরে পাবলিক টেলিফোনের বুথের ভেতরে সাকিনা, তার দিকে পেছন ফিরে টেলিফোন করছে।

টেলিফোনের স্টলে পয়সা রেখে সাকিনা বাড়ির নম্বর বাজালো। বেজেই চলল টেলিফোন। ওপার থেকে কেউ ধরল না। লাইন কেটে আবার সে ডায়াল করল। অনেক সময় এমন হয়। লাইন ঠিক মতো লাগতে চায় না। আবারো বেজে চলল, কিন্তু কেউ ধরল না।

ওকে পেলাম না।

টেলিফোন বুথের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল বেলাল।

আমি চেষ্টা করে দেখছি।

বুথের ভেতরে সাকিনার পাশে চাপাচাপি হয়ে দাঁড়াল বেলাল। সে নিজেও ডায়াল করে কোনো উত্তর পেল না। বলল, বোধহয় সিগারেট আনতে গেছে।

বড় উদ্বিগ্ন দেখাল সাকিনাকে।

বেলাল বলল, তুমি বড্ড বেশি ভাবো কাশেমকে নিয়ে।

ওকে নিয়ে ভাববো না তো, কাকে নিয়ে ভাববো?

তাও বটে।

চলো বাড়িতেই যাই।

কিচ্ছু হবে না, বাইরেই খেয়ে যাই। কাশেম না হয় ভাববে, বাজারে দেরি হচ্ছে। বোলো, খিদে পেয়েছিল, খেয়ে নিয়েছ।

এসে বসল ওরা রাস্তার ওপারে উইম্পির দোকানে। এখানে শুধু আলুভাজা আর বিফ বার্গার। বেলালের ইচ্ছে ছিল ভালো কোনো রেস্তোরাঁয় বসে, কিন্তু ধারে কাছে তেমন কোনো জায়গা নেই।

আধথালা খেয়েই সাকিনা বলল, আমি আবার দেখে আসি ও কী করছে।

এখানে কোথায় টেলিফোন?

ঐ তো রাস্তার ওপারে, একটুখানি হাঁটতে হবে।

খেয়ে চলো এক সঙ্গে যাই।

না, তুমি বসো।

সাকিনা চলে গেল। বেলালের অবাক লাগে সাকিনার এই উৎকণ্ঠা দেখে; খানিক ঈর্ষাও হয়। একটা লোক সংসারের দাসত্ব করে হাসিমুখে, সে কি ঐটুকু উৎকণ্ঠার জন্যে? বিবাহিত জীবনে ভালোবাসার প্রকাশ কি উদ্বেগ?

বেলাল এখনো বিয়ে করে নি, করবে বলে এখনো সে ভাবে নি। আসলে, বিয়ের জন্যে কোনো প্রেরণাই সে এতকাল অনুভব করে নি। আজ যেন মনে হয়, সে সবার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, একা এবং ভীষণভাবে একা। আজ হঠাৎ তীব্র করে তার মনে হতে লাগল, এখন, এই সাধারণ এক উইম্পির দোকানে বসে, তার যদি বৌ থাকত, এমন কেউ থাকত যে তাকে ভালোবাসে আর যাকে সে ভালোবাসে।

সাকিনা ফিরে এলো।

সাকিনাকে একেবারে নতুন মনে হলো তার— যেন সে কারো স্ত্রী নয়, স্বতন্ত্র এবং সম্পর্কহীন একটা মানুষ হয়ে সাকিনা তার চোখে ধরা পড়ল।

সাকিনা বলল, পেলাম না।

কোথায় গেল?

বাইরে গেছে। কিন্তু কোথায়?

তুমি বড্ড বেশি ভাবছ। খাও দিকি। তুমি খাও, তারপর একটা আইসক্রিম খাবে। পছন্দ করো তো?

সাকিনা নীরবে খাওয়া শেষ করল।

বেলাল বলল, কাশেমকে তুমি খুব ভালোবাসো, সাকিনা।

প্রশ্নের কিছুটা আভাস থাকলেও বেলালের কথাটা শোনালো একটা ঘোষণার মতো।

সাকিনা উত্তর দিল না।

বেলাল আবার বলল, খুব ভালোবাসো। ভালোবাসার কথা শুনেই এসেছি এতকাল, চোখে দেখি নি। তোমার ভেতরে দেখলাম।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

করো। কী কথা ?

তোমার তো চোখে অনেক কিছু পড়ে, তুমি তো রাতদিন অন্যের সমস্যার সমাধান করে বেড়াও।

তার মানে ?

বাঃ, তুমি সোস্যাল ওয়ার্কার না ?

প্রশংসা না ঠাট্টা করছ, বুঝতে পারছি না। ভূমিকা ছেড়ে প্রশ্ন করো।

আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, আমি ওকে যতটা ভালোবাসি, ও-ও আমাকে ততটা বাসে ?

কাশেম ?

আর কে ? তোমার কী মনে হয় ? বলো না ?

বেলাল চুপ করে রইল খানিক। সে জানে, সাকিনা শুনতে চায়, কাশেমও তাকে একই মাত্রায় ভালোবাসে।

চুপ করে আছো কেন ? কাশেম তো তোমার পুরনো বন্ধু। এতদিনেও তাকে চেনো না ?

চিনি, কিন্তু তোমাদের দু'জনের ভেতরে যা আছে তার কতটা আমি জানি ?

আজ দু'বছর আছো তো আমাদের সঙ্গে। এটুকুও বলতে পারছ না, ও আমাকে ভালোবাসে কি-না ?

সত্যি, কী উত্তর হতে পারে বেলালের কিছুতেই মাথায় এলো না। অথচ, ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে সাকিনা। কাশেম সত্যিই ভালোবাসে সাকিনাকে, এ কথাটা বেলালের জানা থাকলেও এখন স্বীকার করতে তার কষ্ট হতো, ঈর্ষায় কণ্ঠ রুদ্ধ হতো তার।

বেলাল বলল, কেন প্রশ্ন করছ ?

যে জন্যেই করি, উত্তর থাকলে দাও।

প্রশ্নটা যখন তোমার মনে এসেছে, নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে। হয়ত, সে কারণটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। হয়ত, অবচেতন মনে নিশ্চয়ই এমন কিছু হয়েছে যাতে তোমার মনে হয়েছে কাশেম তোমাকে ভালোবাসে না। বলো আমাকে, কী হয়েছে ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছে সাকিনা বলল, না, উত্তর আমি চাই না। জানতে চাই না। এমনিই কথা বলার কিছু ছিল না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তুমি সিরিয়াসলি নিও না। আমি জানি ও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। চলো, ওঠো।

আর একটু বোসো, সাকিনা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বেলাল প্রায় সাকিনার হাতের ওপর হাত রেখে অনুনয় করে, আর একটু বোসো।

বাবা, সোয়া দু'টো বাজে।

আজ সকালে— বলে বেলাল খানিক চুপ করে রইল, তারপর আবার শুরু করল, আজ সকালে তুমি বলছিলে দেশের জন্যে তোমার মন খারাপ করছে।

তা বলি নি তো। বলেছিলাম, এদেশে আমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না।

ভীষণ রাগ হয় বেলালের, সাকিনার ওপর, এক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু সে হেসে ফেলে।

হ্যাঁ, আমারই ভুল। এদেশে তোমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। কেন ওকথা হঠাৎ বললে? কী ভাবছিলে? আজ সকালে তুমি ঘুম থেকেও অনেক আগে উঠেছো। কী হয়েছিল?

কিছু হয় নি তো।

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছিল। আমি জানতে চাই।

দাবি নাকি?

কাশেম কি বলছিল এদেশ থেকে কোনোদিন সে যাবে না?

না, বলে নি।

ওর পরীক্ষা শেষ হতে কি খুব দেরি আছে?

না, এই অল্প ক'দিন।

তুমি মিছে কথা বলছ না তো?

কেন মিথ্যে বলব?

স্বামীকে ভালোবাসো, স্বামীর মুখরক্ষা করতে? কিন্তু আমি তো বাইরের কেউ নই।

তার মানে?

মানে, আমি তো তোমাদের ভালো ছাড়া খারাপ চাই নে, সাকিনা।

সেটা ভেবে দেখতে হবে।

তুমি আবার ঠাট্টা করছ, সাকিনা।

সাকিনার ঐ এক স্বভাব। আন্তরিক গলায় কেউ কোনো কথা বললে, তার সঙ্গে হেয়ালি করবার লোভ সামলাতে পারে না। সেই খেলা করাটা যে সত্যি নয়, বেলাল তা জানে, তবু এখন সাকিনার ও কথায় মনের ভেতরে দুঃখ তার শেকড় ছড়ায়।

বেলাল লক্ষ করল, সাকিনা এখন চেয়ারে নিজেকে শিথিল করে রাখল। বেলাল টের পেল, সাকিনার সেই যাবার তাড়া এখন আর নেই। একটু খুশি হলো সে। আবার সেই দুঃখ, সেই গত রাতের স্মৃতি এসে তার মনের ওপর চাদর ঢাকা দিল।

কই, কিছু বলছ না? সাকিনা জানতে চায়।

বাড়িতে তখন তোমাকে বলছিলাম, আমিও দেশে ফিরে যাবো, একদিন না একদিন। মিথ্যে বলছিলাম। কাশেমের কথা জানি না, তোমার কথা জানি না, আমি কোনোদিন আর ফিরে যাবো না।

বেলাল অবাক হলো সাকিনার মুখে হঠাৎ উদ্বেগের ছাপ দেখে। ঠিক একই মাত্রার উদ্বেগ সে লক্ষ করেছে কাশেমের জন্যেও। তাহলে ঐ যে উদ্বেগ, ওটা কি ভালোবাসার—কাশেমের জন্যে, স্বামীর জন্যে, ভালোবাসার অনন্য প্রকাশ নয়! সকলের জন্যেই সাকিনা অমন উদ্বিগ্ন হতে পারে?

আবার তুমি চুপ করে গেলে। উদ্বেগের বদলে সাকিনার মুখে এখন প্রশ্রয়ের আলো।

না, কই, চুপ করি নি। ভাবছি, হ্যাঁ, সত্যি কথাই তোমাকে বলেছি, আমার আর দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমার কী মনে হয় জানো, সাকিনা? মনে হয়, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে। এদেশে কত আশা করে এসেছিলাম। ব্যারিস্টারি পড়ব, দেশে গিয়ে প্র্যাকটিস করব, রাজনীতি করব, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, বৌ হবে। কয়েকবার ফেল করবার পর, বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। তখন খুব রাগ হয়েছিল তাঁর ওপর। এখন বুঝি। কত কষ্ট করে বাবাকে টাকা

পাঠাতে হতো।

থাক না। ওসব কথা থাক। চলো, বাড়ি যাই। নাকি, কাশেমকে আরেকটা ফোন করব ?

করো। আমি আর কিছুক্ষণ বসতে চাই। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

তোমাদের আজ কী হলো বলো তো ?

লঘু গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে সাকিনা গেল ফোন করতে।

বাবা টাকা পাঠানো বন্ধ করবার পর বেলাল ভেবেছিল কিছুদিন চাকরি করে টাকা জমিয়ে তারপর জমানো টাকায় পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে বাবাকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু চাকরি করতে গিয়ে সময়ের এত অপচয় হলো, টাকা এত কম জমলো, মন এতটাই মরে গেল যে, পড়াশোনায় আর ফিরে যাওয়া হলো না। কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেল সেই জীবনে। মাস গেলে টাকা। সপ্তাহান্তে ছুটি। দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে পাবে বসে সুরাপান, রাতে টেলিভিশন দেখা। মাঝে মাঝে লন্ডনের বাঙালি রাজনীতি করা— মানে, আড়াইজন নিয়ে সভা করা, দেশের সরকারের সমালোচনা করা এবং খুব একটা ভালো কাজ করা গেল— এই তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে মাংসের কারি রান্না করে বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া। মাঝে মাঝে এক পশলা বৃষ্টির মতো শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবী কারো সঙ্গে কয়েকটা মাস মেতে থাকা।

সাকিনা ফিরে এলো। তার মুখের দিকে প্রশ্ন নিয়ে, উদ্বেগের ছোঁয়া নিয়ে তাকাল বেলাল।

না, বাসায় নেই। কোথাও গেছে।

তোমার জন্যে আইসক্রিমটা এবার বলি।

তুমি খাবে না ?

আমি চা খাবো।

চা এলো, আইসক্রিম এলো, কিন্তু আর কোনো কথা হলো না। বেলালেরও মনে কেমন এক ভাবনা হতে শুরু করল, কাশেমটা গেল কোথায় ? এ রকম না বলে তো সে কখনো বাইরে যায় না। নাকি, সত্যি সত্যি রাতে দু'জনের ভেতরে কিছু হয়েছে ? কী হতে পারে ? সেটা জানবার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ব্যাকুল হয়ে থাকে বেলাল। কিন্তু সাকিনা কোনো ইঙ্গিত দেয় না।

তোমার না কোথায় যাবার কথা ছিল ? সাকিনা হঠাৎ জানতে চাইল।

কোথায় ?

বারে, সকালেই তো বললে, বাজার করেই কোথায় নাকি বেরুবে। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

বেলাল আসলে আজ দূরে থাকতে চেয়েছিল, সাকিনার থেকে। দূরে থেকে সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছিল। তার চেয়ে এখন অনেক বেশি কাম্য মনে হলো সাকিনার সঙ্গ, বিশেষ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে কাশেম যখন বাসায় নেই।

বেলাল বলল, হ্যাঁ, যাবার কথা আছে। একটু দেরি হলেও ক্ষতি হবে না। চলো, বাড়িতে ফিরে যাই।

আমার কিন্তু আর একটু বসতে ইচ্ছে করছে।

বসো।

তুমি ঐ কথাটা কিন্তু শেষ করলে না।

কোন কথা ?

ঐ যে তুমি আর দেশে ফিরে যাবে না। কেন যাবে না ? এখানে কী আছে যে তুমি থাকবে ?

কিছুই নেই। এখন পর্যন্ত কিছু নেই। এখানে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, সে মাটিও আমার নয়। পথে কোনো গোলমাল হলে উঁকি দিয়ে দেখি না, কারণ, আমার তা কিছু নয়। কাগজে এদের কোনো সমস্যার কথা পড়লে আমার আঁতে ঘা লাগে না, কারণ তা আমার সমস্যা নয়। রাত দুপুরে পথের মোড়ে গুণ্ডার ভয় করে দৌড় দিই, দেশ হলে দিতাম না, গুণ্ডার সঙ্গে লড়তাম, লড়ি না, কারণ এখানকার পথের মোড় আর রাত দুপুর আমার নয়। কিছুই আমার নয় এখানে, তবু আমি এখানে থাকব, কারণ আমার যৌবনের স্মৃতি দেশে নেই। যেখানে যৌবনের স্মৃতি নেই সেখানে গিয়ে বাস করা যায় না। এখানে সমস্ত কিছুর দূরত্বের ভেতরেই আমার স্মৃতি। এই এক ধরনের আকর্ষণ, এক ধরনের জীবন। চলো, বাসায় যাই।

৫

'দিনটা কী সুন্দর!' পথে বেরিয়েই মনে হলো কাশেমের। দেশে থাকতে দিনের দিকে চোখ দেবার অভ্যেস ছিল না, দরকারও হতো না। বিলেতে মেঘ, কুয়াশা, শীত আর বরফের ভেতরে একেকটা দিন যখন উজ্জ্বল রোদ আর উষ্ণতা নিয়ে আসে তখন বিশেষভাবে সেটা চোখে পড়ে।

আগস্ট এদেশে সোনালি মাস। প্রায় রোজই থাকে রোদ্দুর, অনেকক্ষণ ধরে। বাড়ির বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত কাশেমের চোখে পড়ে নি আকাশের এই নির্মলতা, এই নীল। দরোজার বাইরে পা রাখতেই মনটা তার প্রসন্ন হয়ে উঠল। গতরাতে সাকিনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি, তারপরে শরীরের সেই ব্যর্থতার গ্লানি তার কেটে গেল এক নিমেষে। শিস দিতে ইচ্ছে করল তার। মনে হলো সে আছে ঠিক সেই আগের ম'তো, যখন বিয়ে হয় নি, যখন সে একা থাকত ছোট্ট একটা ঘরে, রাতদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াতো।

একবার মনে হয়েছিল, সাকিনার জন্যে একটা চিরকুট রেখে যায়— তার ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখে নি। সাকিনা বুঝুক, তারও নিজের একটা অস্তিত্ব আছে, জগৎ আছে, মায়ের পেট থেকে পড়েই সে সাকিনাকে বিয়ে করে নি, বিয়ের এই পাঁচ বছর আগে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা অস্তিত্ব ছিল, ছিল অভিজ্ঞতার উৎস এবং নিজের কিছু সিদ্ধান্ত।

এমন চমৎকার একটা দিনে ট্রেনে চড়তে ইচ্ছে হলো না তার। টিউব ট্রেন মাটির তলা দিয়ে ছুটে চলে, দু'দিকে শুধু চাপা সুড়ঙ্গের অন্ধকার, ঝুল ঢাকা দেয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। টিউব স্টেশনগুলো মনে হয় বুদবুদ— বিরাট একেকটা বুদবুদ। মাটির তলা দিয়ে ছুটে এসে ভুস করে সেই বুদবুদ ঠেলে শহরে উঠে পড়া। তার চেয়ে বাস অনেক ভালো। এই সুন্দর দিনে খুশি-খুশি শহরটাকে দেখে দেখে যাওয়া যাবে গন্তব্যে।

কাশেমের পাড়া থেকে বাবুলের সেই বেলসাইজ পার্কে যেতে হলে দু'বার বাস বদল করতে হয়। তা হোক, বাসেই সে যাবে। উঠে পড়ল সে বাসে। টুটিং বেক থেকে চ্যানসারি লেন পর্যন্ত যাবে এই বাস ধরে, তারপর সেখান থেকে সে নেবে হ্যাম্পস্টেডের বাস। নেমে খানিকটা হেঁটে গেলেই বাবুলের 'বুলোক কার্ট' রেস্তোরাঁ।

টুটিং বেক লন্ডনের দক্ষিণে একটা এলাকা। এখানে বাইরে থেকে আসা মানুষের বসতি বেশ। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফ্রিকার লোক এখানে পথের দিকে তাকালে

ঘনঘন চোখে পড়ে। একেক সময় ভিড় দেখে মনেই হয় না লন্ডন— শ্বেতাঙ্গদের দেশ। বরং মনে হয় শ্বেতাঙ্গরাই এখানে বহিরাগত।

দোতলা বাসের ওপর তলায় বসলো কাশেম। ওপর তলায় সিগারেট খাবার অনুমতি আছে, নিচ তলায় নেই, আর কাশেমের এখন ভীষণ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, একের পর এক। আজ সত্যি সত্যি তার মনে হচ্ছে, সম্ভবত এই রোদ্দুর দেখে, সাকিনাকে না বলে বেরুতে পারবার উপেক্ষা-তীব্র মেজাজে, যে, সে আবার ফিরে গেছে লন্ডনে তার প্রথম দিনগুলোর ভেতরে।

হঠাৎ বাসের ভেতরে, পেছন দিকে কী একটা গোলমালের আভাস পাওয়া গেল। ভালো করে কিছু বোঝা গেল না। কনডাকটর হঠাৎ থামিয়ে দিল বাস, আর কিছু লোক দুদ্দাড় করে নেমে পড়ল। দ্রুত উঠে দাঁড়াল কাশেম। বিলেতে আসবার সপ্তাহেই পুরনো এক ছাত্রের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিল, এদেশে কোনো হাঙ্গামা দেখলেই কেটে পড়বে, কারণ তুমি যত নির্দোষই হও পুলিশ এসে তোমার গায়ের রঙ ময়লা দেখে তোমাকেই প্রথম পাকড়াও করবে।

কিন্তু দোতলা থেকে নামতে গিয়ে কাশেম প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেল শ্বেতাঙ্গ এক তরুণের হাতে। ভাগ্যিস ঘুসিটা তার মুখে লাগে নি, যদিও সেটাই ছিল লক্ষ্য, ঘুসিটা লেগেছে কাঁধে। দেশে হলে পাল্টা রুখে দাঁড়াত সে, বিলেতে সে আরো দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে, মাথা নিচু করে দাঁড়াল একেবারে রাস্তায়, তারপর সেখানেও না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল বহুদূরে। দূর থেকে পেছন ফিরে দেখল বাসটা তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর বাসের পাশে একদল ইংরেজ তরুণ মারমুখো জটলা করে আছে।

আর দেখে কাজ নেই। সোজা হাঁটতে শুরু করল কাশেম।

এরকম হরহামেশাই আজকাল লন্ডনে হচ্ছে। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয় সাধারণত। শ্বেতাঙ্গদের হামলা চলে, কটুকাটব্য চলে, মারধোর ছিনতাই হয়— লক্ষ্য অশ্বেতাঙ্গ বহিরাগত। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের লোকের ওপরই পথেঘাটে অত্যাচারের মাত্রাটা বেশি। ইংরেজ ছোকরারা আবার আফ্রিকানদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না বড় বেশি। সম্ভবত ওদের পেটানো লোহার মতো শরীর দেখে।

এক সময় যখন আফ্রিকানদের ওপর দল বেঁধে ইংরেজরা হামলা করেছিল, তখন দাঁত বের করে হেসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা। ভেবেছিল, আমাদের কী ?— ও ইংরেজ আর আফ্রিকানদের ব্যাপার। তারপর যখন ভারতীয়দের ওপর হামলা শুরু হলো, তখন দূরে সরে থেকেছে আফ্রিকানরা। এখন তোমাদের ওপর ঠেলা তোমরাই সামলাও।

আজও লক্ষ করে দেখল কাশেম, বাসের ভেতরে কয়েকজন আফ্রিকান ছিল, তারা চোখ তুলেও দেখে নি। বাস থেকে দৌড়ে নামবার সময় কাশেমের শুধু চোখে পড়েছিল ভারতীয় চেহারার একটি লোক ইংরেজ তরুণদের ঘুসি সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করছে। আফ্রিকানরা চোখ না তোলার জন্যে, প্রতিবাদ না করবার জন্যে এতটুকু খারাপ লাগল না কাশেমের। এদের চুপ করে থাকাটা বোধগম্য, কিন্তু ইংরেজ যাত্রীরা চুপ করে থাকে মানবতার কোন যুক্তিতে ? বাসে, ট্রেনে বা পথে মারামারি দেখলে, কালোর ওপর হামলা দেখলে ইংরেজ আরো নিবিষ্ট হয়ে যায় নিজের কাজে, খবরের কাগজের পাতায়, বন্ধুর সঙ্গে গল্পে। ট্রেনে একবার কাশেমের ওপর, সে অনেকদিন আগে, হামলা করেছিল শুক্রবারের এক সন্ধেবেলায় পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ তরুণ আর চারজন তরুণী একসঙ্গে। গাড়ি ভর্তি ছিল লোক, সবাই শ্বেতাঙ্গ। এক তরুণ এসে কাশেমের পায়ের ওপর বুট চেপে দাঁড়িয়েছিল,

আরেক তরুণ চেষ্টা করছিল তার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট নেভাতে, আরো একজন সেই ফাঁকে টানাটানি করছিল কাশেমের হাতব্যাগ কেড়ে নেবার জন্যে। আর অনবরত তাদের চার সঙ্গিনী খিলখিল করে হাসছিল। বাকি দু'জন তরুণ চোখ রাখছিল কেউ এগিয়ে এলে তার মোকাবিলা করবে বলে। কিন্তু গাড়ি ভর্তি এতগুলো লোক, অন্তত পঞ্চাশজন হবে, কেউ এগিয়ে আসে নি, এমনকি চোখ তুলে একবার কেউ দেখেও নি, ব্যাপারটা কী। কাশেম তাদের আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করে নি। জানে, করে লাভ নেই, বরং উল্টা আরো মার খেতে হবে। সে যথাসম্ভব নিরীহ মুখ করে, অপ্রস্তুত একটা হাসি ফুটিয়ে সহ্য করে গেছে হামলা, আর সারাক্ষণ ভেবেছে কী করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এদিকে, তরুণদের একজন আবার চেষ্টা করছিল তরুণী একজনকে তার গায়ে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে। কাশেম বুঝতে পেরেছিল, একবার কোনো মেয়ে তার গায়ের ওপর পড়লেই চাকু বেরুবে। তরুণরা চেঁচিয়ে উঠবে যে, সে তাদের মেয়েকে অপমান করতে চেয়েছিল। গায়ে হাত দিতে চেয়েছিল। শেষ অবধি, বুদ্ধির জোরেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল কাশেম। গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আপনা থেকে খুলে গিয়েছিল ইলেকট্রিকের দরোজা। সে দরোজা আবার বন্ধ হবার মুহূর্তে দৌড় দিয়ে নেমে পড়েছিল প্লাটফর্মে, যদিও সেটা তার স্টেশন ছিল না। বোকা হয়ে তরুণেরা তাকে গালাগাল দিয়েছিল, কিন্তু বন্ধ জানালার কাচের ভেতরে দিয়ে, ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সে তিরস্কার তার কানে পৌছোয় নি।

কাশেম আর বাস নিল না। কাছেই ছিল টিউব ট্রেনের স্টেশন। ঢুকে পড়ল বেলসাইজ পার্কের টিকিট কিনে।

আজকাল এইসব হাঙ্গামার জন্যে লন্ডনে সে আরো অস্থির বোধ করে। সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে। মাহমুদ। পনেরো বছর এদেশে থাকবার পর যখন মনে হয়েছিল সে আর কোনোদিনই যাবে না, বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিল। তার যাবার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল কাশেম।

চলে যাচ্ছেন তাহলে ?

যাবো না কেন ? এখানে থেকে ইংরেজদের মার খাবার বদলে দেশের গুণ্ডার হাতে মার খাওয়া অনেক ভালো। অন্তত দাঁড়িয়ে কেউ দুটো কথা বলবে। তারপর পরম এক বিশ্ব নিন্দুকের মত মাহমুদ বলেছিল, লন্ডনে শাদার হাতে মার খাবার ভয়ে সন্ধের পর বেরোই না, অচেনা পাড়ায় পা বাড়াই না, আর ঢাকায় কারফিউ বলে বেরুতে পারব না রাত বারোটার পরে— তফাতটা কোথায় শুনি ? এখানে মার খাবো নিতান্ত গুণ্ডার হাতে, ঢাকায় মার খেলে খাবো পলিটিক্যাল গুণ্ডার হাতে। সেটা বরং অনেক সম্মানের।

কাশেমের জানতে ইচ্ছে করে, মাহমুদ এখন কেমন আছে, দেশে কী করছে, সে কি জীবনের সেরা পনেরোটা বছর, যে-বছরগুলোতে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে, সেই বছরগুলো লন্ডনে কাটিয়ে দেবার পর ঢাকায় পারছে নিজেকে মানিয়ে নিতে ?

কাশেম কি পারবে, দেশে ফিরে গেলে আগের মতো আবার জীবনযাপন করতে ? কোনো অসুবিধে হবে না ? একা লাগবে না ? নিজেকে বাইরের এবং আলাদা বলে মনে হবে না ?

অবশ্য, মাহমুদের কথা আলাদা। সে এখানে কস্ট অ্যাকাউনটেন্সি পাশ করে দিব্যি কাজ করছিল। দেশেও নিশ্চয়ই কাজ করছে। বরং দেশে তার সম্মান আরো বেশি। এখানে হাজার জনের ভেতরে একজন, এখানে সে নিম্ন মধ্যবিত্ত; ঢাকায় সে দশজনের একজন, উচ্চ মধ্যবিত্ত।

ভালোই করেছে মাহমুদ দেশে ফিরে গিয়ে। কাশেম যদি পাশটাও করতে পারত। না, পরীক্ষায় পাশ তাকে দিয়ে হবে না। বিয়ে করেই আরো ভুল হয়ে গেছে। যা ভেবেছিল, আদৌ তা হয় নি, অথচ তার মতো আরো অনেকে বিয়ে করে, লন্ডনে বৌয়ের রোজগারে পড়াশোনা সাঙ্গ করে দিব্যি দেশে ফিরে গেছে। যদিও তাদের খবর আর পায় নি— ভালো আছে তারা নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, ব্যবসা করবে সে। পড়ার ব্যর্থতা সে ঢেকে দেবে উপার্জনের প্রাচুর্য দিয়ে। সাকিনাকে সে দেখিয়ে দেবে ইচ্ছে করলে কী-না পারে সে। সাকিনাকে বড় বাড়ি কিনে দেবে সে, কিনে দেবে রান্নাঘরের আধুনিক সাজসরঞ্জাম— যার জন্যে এদেশে এসে বাঙালি মেয়েমাত্র পাগল, কিনে দেবে হিলসের ফার্নিচার, বাজার করতে গিয়ে যাবে রাণী যেখানে বাজার করতে যান সেই হ্যারডসে। তখন যেন সাকিনা আসে তার ব্যর্থতা নিয়ে বিদ্রূপ করতে।

এতক্ষণে বাজার করে বাড়ি ফিরেছে সাকিনা? না, তার সঙ্গে কথা বলবে না। শুধু খবরটা নেবে। পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করলে আগে ডায়াল করতে হয়, ওদিকে কেউ ধরলে হয়ত হ্যালোটুকু শোনা যায়, তারপরই পিপ-পিপ করে দ্রুত একটা টোন আসতে থাকে তখন স্লটে পয়সা ঢোকালে লাইন পরিষ্কার হয়ে যায়, কথা বলা যায়। বাড়িতে কেউ আছে কিনা জানবার জন্যে ঐ হ্যালোটুকু শোনাই যথেষ্ট। পয়সা আর না ঢোকালেই হলো। লাইন কেটে যাবে। বাড়িতে কেউ বুঝতে পারবে না কে ফোন করেছিল। প্রথম জীবনে লন্ডনে এরকম ফোন সে কত করেছে কেউ বাড়িতে আছে কি-না জানবার জন্যে। তারপর পয়সা খরচ না করে সোজা হাজির হয়েছে বাড়িতে আড্ডা দেবার জন্যে। অনেকে আবার শ্বেতাঙ্গিনী বালিকা-বন্ধু শনিবার রাতে বাড়ি আছে না আর কারো সঙ্গে বাইরে গেছে জানবার জন্যে ঐ রকম চুটকি ফোন করেছে নিজের জানান না দিয়ে। বান্ধবী বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই অর্থে কাশেমের কোনো সহচরী ছিল না, দু'একবার চেষ্টা করেছিল ঘনিষ্ঠ হতে, পারে নি। বাঙালি বন্ধু যারা প্রেম করেছে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে, লক্ষ করে দেখেছে তারা কী ঈর্ষায় ভোগে। বিশেষ করে এই জন্যে যে, এখানকার মেয়েরা বিয়ের কথা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত একাধিকের সঙ্গে বাইরে বেরুতে দ্বিধা করে না। সকলেরই পরিচয় তারা দেয় একইভাবে, 'মাই বয় ফ্রেন্ড।' ইংরেজ ছেলেরা কী করে তা সহ্য করে, আদৌ করে কি-না, কে জানে। বাঙালি কাউকে সহজভাবে এই ব্যাপারটাকে নিতে সে দেখে নি।

না, পারবে না সে সাকিনাকে ছেড়ে থাকতে। সকালে রাগের মাথায় মনে হয়েছিল একবার, যে সাকিনা বেরিয়ে যাক বেলালের সঙ্গে। এখন তা ভেবে সীমাহীন গ্লানি হলো তার। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে অমন ভেবেছিল?

এখন ফোন পেলে সে কথা বলবে সাকিনার সঙ্গে।

বেলসাইজ পার্কে নেমে স্টেশনের টেলিফোন বুথে ঢুকলো। অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলল তার বাড়ির নম্বর। কেউ ধরল না। হাতঘড়িতে দেখল, একটা দশ। স্টেশনের ঘড়িতে দেখল, একটা এগারো। এখনো তাহলে বাজার করে ফেরে নি। একটু ইতস্তত করল কাশেম। একবার মনে হলো খুব কাছে হলে এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যেত। কিন্তু টুটিং বেক এখান থেকে ঝাড়া সোয়া ঘণ্টার পথ ট্রেনে গেলে।

বৌ আনিস নি? বাবুল তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল। নাকি সুন্দরী বৌ বলে বার করতে চাস না?

না, তা কেন?

থতমত খেয়ে গেলে কাশেম কখনোই তা লুকোতে পারে না, এটা সে নিজেই ভালো করে জানে। তাই তার রাগ হয় নিজের ওপর এইসব মুহূর্তে, যেমন এখন হলো। আর সে রাগটা লাফিয়ে গিয়ে কল্পনায় সাকিনার ওপর পড়ল। সাকিনা বড্ড বেশি সবার সঙ্গে হেসে গড়িয়ে কথা বলে। লোকে যে সাকিনাকে সুন্দরী বলে, সেটা নির্দোষ বর্ণনা নাও হতে পারে, তার সঙ্গে অশ্লীল কল্পনার একটা মিশেল থাকতে পারে— আর তার জন্যে কি সাকিনা নিজেই দায়ী নয় ?— তার খোলামেলা ব্যবহার ? সাকিনা কি না জেনেই এমন করে ? না, তারও অবচেতন একটা আকাঙ্ক্ষা সবাইকে সে মাতিয়ে ধরা না দিয়ে মজা দেখবে ?

বাবুল কি ভাবছে, তার সুন্দরী বৌ একা বাড়িতে আর কারো সঙ্গে গা মিশিয়ে দিয়ে মজা করছে ? বাবুল তো জানে, বেলাল থাকে তার বাড়িতে।

কাশেম মিছে করে বলল, সাকিনা বাংলাদেশ সেন্টারে গেছে।

সেখানে আবার কী ?

বাঃ, জানিস না, সেখানে বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার ক্লাস হয়, এদেশে যাদের জন্ম, এদেশে এসে যে বাচ্চারা বাংলা ভুলে গেছে সাকিনা তাদের সেখানে বাংলা পড়ায়। সোস্যাল ওয়ার্ক আর কী ?

তার চেয়ে নিজে বাচ্চা বানিয়ে তাকে বাংলা শেখানো ভালো নয় ? হা হা করে হেসে ওঠে বাবুল।

না, নিজের বাচ্চা এখনো নারে। আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েনি। তুই তো দেখছি খুব ব্যস্ত এখন। অনেক খদ্দের। পরে না হয় আসব।

বোস, বোস, কোথায় আবার যাবি ? আড়াইটের সময় শেষ অর্ডার। তিনটের সময় বন্ধ। তারপর আবার খুলছে ছ'টার সময়। মাঝখানে বসে গল্প করা যাবে। খেয়েছিস কিছু ?

না। তোর এখানে খাবো বলেই ভাবছিলাম।

তাহলে আর যাবো-যাবো করছিস কেন ? সন্ধেবেলায় ফাঁকা থাকিস যদি, আমার সঙ্গে চল। ঘরে আজ পার্টি দিচ্ছি। দু'একটা খালি মেয়ে আসছে, লাগিয়ে দিতে পারি; যদি স্বাদ বদল করবার ইচ্ছে থাকে। আবার হা হা করে হাসল বাবুল।

উপার্জনে নিশ্চিত আর স্বচ্ছল হলেই লোকে বুঝি এ রকম করে হাসতে পারে। বাবুলের এই হাসবার ক্ষমতাটিকেও এখন ভীষণ ঈর্ষা করতে থাকে কাশেম। নিজেকে তার পাশে বড় সঙ্কুচিত, অপ্রতিভ মনে হয়। সবদিক থেকে সে-ই শুধু হেরে গেছে। এমনকি সুন্দরী বৌ হওয়াটাও তার কাছে আর কৃতিত্বের কিছু নয়।

অথচ বিয়ে করে প্রথম যখন সাকিনাকে নিয়ে এসেছিল লন্ডনে, যখন সবার তাক লেগে গিয়েছিল, এমন সুন্দরী সুগায়িকা বৌ দেখে, তখন কি প্রতাপশীলই না মনে হতো নিজেকে। আর আজ সেই সৌন্দর্যই তার কাছে তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপের একটা উৎস বলে মনে হয়।

সেই দিনটির কথা আজো মনে আছে কাশেমের, যেদিন প্রথম সে সাকিনাকে দেখেছিল। ঢাকায়, টেলিভিশনের পর্দায়। এক বন্ধুর বাড়িতে সে ছিল সেই সন্ধেয়। কয়েক সপ্তাহের জন্যে গিয়েছিল দেশে, লক্ষ্য ছিল বিয়ে করা; কিন্তু মুখে সেটা তখনো কাউকে ঢাকায় বলে নি। সে খোঁজ করছিল এমন একটা মেয়ে, যে সপ্রতিভ, লেখাপড়া ভালো জানে, বিলেতে এসে চাকরি করতে পারবে।

বন্ধুটি টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, তোরা লন্ডনে রঙিন প্রোগ্রাম দেখিস, দ্যাখ ঢাকার প্রোগ্রাম ভালো লাগে কি-না।

পর্দায় প্রথমেই ফুটে উঠেছিল সাকিনার মুখ। মেয়ে সম্পর্কে তার নিবিড়তম কল্পনাকেও বিমূঢ় করে দিয়ে দেখা দিয়েছিল সাকিনার উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঈষৎ উদ্ধত চিবুক, ঠোঁটের সেই পূর্ণিমা, ভ্রূ-যুগলের সেই ডানামেলা।

কে রে ?

সাকিনা রহমান। নতুন গাইছে, দেখতে যতটা ভালো, গান অতটা কিন্তু নয়।

তোমাকে বলেছে! প্রতিবাদ করে উঠেছিল বন্ধুর বোন। সাকিনার প্রোগ্রাম দেখবে বলে সে পড়া ফেলে উঠে এসেছিল বসবার ঘরে। আমাদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সকলে ওর গানের জন্যে পাগল। সানজিদা খাতুনের নিজের ছাত্রী।

এর কোনোটাতেই কিন্তু প্রমাণ হলো না মেয়েটি ভালো গায়।

চুপ করো তো। শুনতে দাও। আমার ভালো লাগে।

ভাই-বোনের ঝগড়া কিছুই কানে যায় নি কাশেমের। সে শুধু শরীরের সমস্ত প্রার্থনা নিয়ে তাকিয়ে ছিল টেলিভিশনের পর্দার দিকে।

এই মেয়েটি তার জীবনে আসতে পারে না ?

বন্ধুর বোনটিকে ধরেই এগিয়েছিল সে। প্রথমে শুনেছিল, না, ওকে এখন বিয়ে দেবে না; সবাই জানে বিয়ের কথা ওর বাবা-মা এখন মোটেই ভাবছে না। তারপরে শুনেছে কাশেম, কত ছেলে ওর জন্যে পাগল, কত বড়লোকের ছেলে, কত ভালো ছেলে! তবু দমে যায় নি কাশেম। সাকিনার বাবা-মা পর্যন্ত পৌঁছে সে ছেড়েছে। বিয়ে না হোক, প্রস্তাব দিয়ে দেখতে দোষ কী ? কাশেম তার প্রায় সমবয়সী জয়েন্ট সেক্রেটারি মামাকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। অবাক হয়েছিল কাশেম— যে বাধা, যে উপেক্ষা, যে মাত্রায় সে পাবে তার চিহ্নমাত্র না দেখে। বলতে গেলে, তার প্রস্তাব প্রায় লুফে নিয়েছিলেন সাকিনার বাবা।

বিয়ের কয়েকদিন পরে অবশ্য কারণটা জানতে পেরেছিল কাশেম। বন্দুকবাজ একটা দলের কোন এক ছাত্রের চোখ পড়েছিল সাকিনার ওপর। দু'দুবার বাড়িতে হামলাও করেছে। শেষ পর্যন্ত নাকি শাসিয়ে ফোন করেছে, একদিন মেয়ে আর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরবে না। সেই মেয়ের শুধু ভদ্রস্থ বিয়ে নয়, একেবারে বিলেতে পর্যন্ত পাড়ি— এটাকে আল্লার আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন তার শ্বশুর।

নে শালা, ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট, খোদ মালিকের হাতে সার্ভিস। এই বলে বাবুল নিজে কাশেমের সমুখে তন্দুরি চিকেন আর সিংহলদ্বীপের মতো দেখতে নান রুটি এনে রাখল। জানতে চাইল, ড্রিংক করবি কিছু ? লাগাব ?

বিয়ার তো খাই না।

ওরে শালা, বিয়ারে শানায় না, হুইস্কি চাই ?

কাশেম হুইস্কিও বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু এখন মনে হলো, খাঁটি কড়া নেশা করলে বুকের ভেতরে যন্ত্রণাটার লাঘব হতো।

বাবুলের অনবরত 'শালা' সম্বোধনের জের টেনে সেও বলল, হ্যাঁ, শালা, হুইস্কিই চলুক। টিচার্স। বড় দিবি।

ড্রিংকের দামটা কিন্তু তোকে দিতে হবে। খানা আমার ওপর।

বিলেতে থাকার ফলে কোনো কোনো বাঙালি ইংরেজের এই গুণটা পেয়েছে যে মন আর পকেট আলাদা রাখতে শিখেছে। কাশেম জিগ্যেস করল, তোর এখানে ফোনটা কোথায়রে ?

একদণ্ড বৌকে না দেখে বুঝি শান্তি নেই ? এই তো ফোনটা বরাবর বাঁ দিকে। আজ সন্ধেয় থাকতে পারবি কি-না ফয়সালা করে নিস।

বাড়ির নম্বর ডায়াল করল কাশেম। বেলা এখন সোয়া দুটো। বাড়িতে কেউ নেই। বেজেই চলল টেলিফোন।

তাহলে, তারই মতো রাগ করে সাকিনাও কি আজ কোথাও বেরিয়ে পড়ল ? কোথায় যেতে পারে ? বাজার করতে এতক্ষণ লাগবার কথা নয়। নাকি ইচ্ছে করেই ফোন ধরছে না সাকিনা ?

কাশেম ফিরে এসে চিকেনে বিরাট এক কামড় দিয়ে বাবুলকে বলল, যাবো আজ তোর পার্টিতে। দেখি তোর মেয়েগুলো কেমন। এই বলে একটা চোখ দুষ্টুমিতে ছোট করল সে।

৬

বাজার থেকে ফেরার পথে বেলাল হঠাৎ বলল, এই একটু থামো তো।

গাড়ি পাশে দাঁড় করিয়ে সাকিনা বলল, কেন ?

ওয়াইন কিনব।

আবার ওয়াইন ?

বেলাল দুটো বোতল কিনে ফিরল।

কী কিনলে ? কাল রাতের সেটা ?

না, কাল ছিল ব্লু নান; আজকেরটার নাম, যদি জর্মন জানো, তোমরা সামনে বলতে পারছি না।

বলেই ফ্যালো, জর্মন আমি জানি না।

লিব ফ্রাউ মিলশ।

বাংলায় ?

বালিকার দুধ।

যাঃ কী অসভ্য।

আমার কোনো দোষ নেই। নামটা আমি রাখি নি।

সাকিনা হঠাৎ কেমন আঁধার হয়ে গেল। বেলাল নিজের সঙ্গে বাজি ধরল, নিশ্চয়ই কাশেমের কথা আবার মনে পড়েছে তার।

কাশেমের কথা এখনো ভাবছ ?

কী করে বুঝলে ?

শিশুও বুঝতে পারত। জানো সাকিনা, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটা বিয়ে করি।

যেন বৌকে খুব করে জ্বালাতে পারো, এইতো ?

কাশেম তোমাকে জ্বালায় ?

ওর জ্বালাবার সাধ্য কী ? আমি এত ভালোবাসি যে জ্বালাবার সময়ই পায় না।

বেলালের বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। বারবার এই ভালোবাসার কথা না বললেই নয় ? না

হয় ভালোই বাসে, তাই বলে সারাক্ষণ সেটা বলতে হবে? যেন একটা বাচ্চা মেয়ে, খেলনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আসলে, বেলালের সন্দেহ হয়, স্বামীকে সে জীবন্ত বড়সড় একটা খেলনার মতোই ব্যবহার করে।

কাশেম বাড়িতে নেই।

কোথায় গেল বলো তো? এবারে প্রশ্নটা বেলাল নিজেই করে, সাকিনাকে অবকাশ দেয় না। আর সাকিনাও তাকে অবাক করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত গলায় উত্তর দেয়, যেখানেই যাক, ফিরে আসতে হবে।

গাড়ি থেকে বাজার নামালো বেলাল। সাকিনা সব জিনিস, যেখানে যা থাকবার কথা, যেখানে যার লেবেল সাঁটা, সব সাজিয়ে রেখে বাথরুম ঘুরে এসে বলল, তোমার না কোথায় যাবার কথা ছিল। যাবে না?

সাকিনা চাইছে, বেলাল না যাক? মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাবটা ভালো বোঝা গেল না।

হ্যাঁ, যাবার কথা ছিল, ভাবছি যাবো না।

সাকিনা উপুড় হয়ে রেকর্ডের বাক্স থেকে রেকর্ড বাছতে বাছতে বলল, আচ্ছা, তোমার কি কোথাও যাবার জায়গা নেই?

কেন বলছ?

কই, কোনো শনি-রোববারেই তো তোমাকে বিশেষ বেরুতে দেখি না। কাশেম ছাড়া এই দশ বছরে তোমার কোনো বন্ধু ছিল না? কোনো মেয়ে বন্ধুও নেই?

শুনে অবাক হবে, না নেই।

সবার তো থাকে।

সবার কথা জানি না।

আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলবে? সাকিনা আরো নিবিষ্ট মনে রেকর্ড পছন্দ করতে লাগল। কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল?

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল বেলাল। সত্যি কথাটা এই যে, কাশেম একাধিক মেয়েকে চিনত, কারো কারো সঙ্গে তার আলাপও ভালো ছিল, কিন্তু মেয়ে বন্ধু বলতে ঠিক যা বোঝায় তেমন কেউ ছিল না। আর, সাকিনাই বা এখন হঠাৎ এ প্রশ্ন, একেবারে ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন, কেন করবে, তার কারণটাও বোধগম্য হলো না তার।

তোমার কী ধারণা, বেলাল বলল, কাশেম হঠাৎ তার পুরনো কোনো মেয়ে বন্ধুর কাছে গেছে? তাই জিজ্ঞেস করছ?

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলে না।

সাকিনা এতক্ষণে একটা রেকর্ড খুঁজে নিয়েছে। তার মলাট বেলালের চোখের সামনে ধরে সে জানতে চাইল, বাজাই? বাজাবো?

আবা গোষ্ঠির নতুন রেকর্ড এটা। কাশেম বোধহয় কিনে থাকবে কারণ সাকিনা পাশ্চাত্য গান পছন্দ করে না, আর সে, বেলাল, এটা কিনেছে বলে মনে করতে পারে না।

বেলাল বলল, এ রেকর্ড এলো কোত্থেকে?

যেখান থেকেই আসুক। শুনবে কি-না?

তুমি তো বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পছন্দ করো না।

মানুষের কি বদলাতে নেই ?

আছে। থাকবে না কেন ? কেউ কি আমরা চিরকাল এক থাকি ?

আমারও তাই আজকাল মনে হচ্ছে।

কেন আজকাল এ রকম তার মনে হচ্ছে, তার বিস্তারিত কিছু জানাল না সাকিনা। যেমন সে সব সময় করে থাকে, নিচের ঠোঁট দাঁতে কেটে, রেকর্ড বসাতে লাগল। সেই ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়ে বেলাল হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলো। মনে হলো, না মনে হলো না, তার স্পষ্ট উপলব্ধি হলো— কাম নয়, করুণা নয়, সাকিনাকে সে ভালোবাসে; বেলালের আত্মার ভেতরে যে ছোট্ট অথচ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ কেটে গেছে শূন্যতা, সেখানে সম্পূর্ণ করে এক মুহূর্তে ঘনীভূত যে পূর্ণিমার পেরেক বসে গেছে তা সাকিনার।

দু'হাতে হঠাৎ নিজের মুখ ঢেকে ফেলল বেলাল। আর একই সঙ্গে তার শ্রবণ ভরে গেল সঙ্গীতে। সে অস্ফুট স্বরে আর্তধ্বনি করে উঠল।

কী কী হলো ? সাকিনা দ্রুত পায়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে আলতো করে হাত রাখলো।

হাত নামিয়ে কোমল হাসিতে মুখের সংস্কার করে বেলাল অভয় দিল, না, কিছু না।

আরো কিছুক্ষণ তার কাঁধে সাকিনার হাত পড়ে রইল। তারপর সে হাত সরিয়ে ধীরে ধীরে মোড়ার ওপর বসে বলল, যা প্রায় অবিশ্বাস্য শোনালো বেলালের কানে, তোমাকে হঠাৎ খুব সুন্দর মনে হলো।

না, না। নিষেধ করবার কিছু নেই, তবু বারবার মাথা দোলাতে লাগল বেলাল। আর বলতে লাগল, না, না। তারপর সচকিত হয়ে উঠল সে। একি অর্থহীন মাথা নাড়ছে সে ?— কীসের জন্যে 'না, না' বলছে ? তখন সে স্বাভাবিক হতে চাইল। বলল, তুমি ইংরেজি গানও যে ভালোবাসো জানতাম না।

আমার সব কিছুই কি জানো ? সাকিনার কণ্ঠে চেনা সেই লঘুতা ফিরে এলো। জানো ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে জানো ?

না, বাবা, পারব না। বেলাল চেষ্টা করল লঘু গলায় উত্তর দিতে, কিন্তু নিজের কাছেই অচেনা শোনালো নিজের কণ্ঠ।

মৃদু হেসে, ঘুমের ভেতরে শিশু, সাকিনা চোখ বুজলো। চোখ বুজে সে শুনতে লাগল আবার গান। গানের তালে তালে তার ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কার্পেটের সঙ্গে যুক্ত-বিযুক্ত হতে লাগল।

বেলাল উঠে গিয়ে সদ্য কেনা ওয়াইনের একটা বোতল খুলে দুটো গেলাশে ঢালল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, তখনো চোখ বুজে আছে সাকিনা। যখন সে গোলাপ দুটো এনে সামনে দাঁড়াল তখন চোখ মেলে বলল, ও বাসায় নেই, ড্রিংক করব ?

কিন্তু হাত বাড়িয়ে গেলাশ হাতে নিল সাকিনা।

কেন, কাশেম কিছু মনে করবে ? না, করবে না। সারা সকাল বাজার করেছ, ক্লান্ত হয়ে গেছ। খাও। আবা-র গানের সঙ্গে মন্দ লাগবে না।

গেলাশে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে সাকিনা আবারো বলল, দুপুরে কখনো ড্রিংক করি নি যে। ও এসে পড়লে কী ভাববে। ভাববে, আমি অ্যালকোহলিক হয়ে গেছি।

লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বেলাল বলল, সব কথাতেই কাশেমের কথা তোমার মনে পড়ে ?

সেটাই স্বাভাবিক নয় কী ?

তুমিই বলো।

বিয়ে করলে, তোমার বৌয়ের কথা মনে পড়ত না সারাক্ষণ ?

বেলাল তার নতুন বোধ থেকে বলল, কিছুদিন আগে হলেও এর উত্তর দিতে পারতাম না। এখন পারব। হ্যাঁ, মনে পড়ত। ভালোবাসি বলেই মনে পড়ত। যদি বিয়ে করবার জন্যে কাউকে বিয়ে করে ফেলতাম, তাহলে মনে পড়ত না।

সাকিনা সোজা হয়ে বসল। বিয়ে করবার জন্যেই কী কাউকে বিয়ে করা যায় ?

যায়। অনেকেই তা করে। চোখের ওপরেই দেখেছি। আমি পারতাম না। আমি পারি না বলেই এতদিন বিয়ে করি নি, সাকিনা।

একটা গান শেষ হয়ে আরেকটা গান শুরু হলো রেকর্ডে। বিরতির সেই সময়টুকু নীরবে অপেক্ষা করে, নতুন গান শুরু হলে সাকিনা তাকে মনে করিয়ে দিল, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।

কোন প্রশ্ন ?

ঐ যে ছাই। কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল কিনা ? তারপরেই যোগ করল, বলেই ফ্যালো না বাবা, আমি কিচ্ছু মনে করব না। মেয়েলি কৌতূহল বলতে পারো।

এতদিন তো কৌতূহল ছিল না ?

তার মানে মেয়ে বন্ধু ছিল, মুখ ফুটে বলতে পারছ না ?

বেলাল জানে, এ সুযোগ আর যে কেউ হলে নিতো, কিন্তু কিছুতেই সে নিতে পারবে না, মিথ্যে করে বলতে পারবে না যে কাশেমের মেয়ে ছিল। যে পূর্ণিমার পেরেক তার ভেতরে সেই সুখের কষ্ট নিয়ে মিথ্যে বলা যায় না।

বেলাল বলল, না, ছিল না। কাশেমের কেউ ছিল না। ও খুব ভালো ছেলে। অনেকে এর জন্যে ওকে বোকাও বলেছে।

কথাটা সাকিনা গান শুনতে শুনতে চোখ বুজে শোনে, আর মৃদু মৃদু হাসে— কেন, কে জানে ? তখন তার সমুখে দাঁড়িয়ে বিতর্ক-সভায় বক্তৃতা দেবার সুরে বেলাল বলে, বিশ্বাস হলো না ? মিথ্যে বললে বিশ্বাস করতে ? সাকিনা তেমনি রহস্যময়ভাবে চোখ বুজে আপন মনে হাসতে থাকে। বেলালের আরো জেদ চেপে যায়। তোমরা কি মনে করো এদেশে মেয়ে সস্তা ? পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ? বাঙালি ছেলে দেখলেই তাকে বগলদাবা করে বিছানায় যাচ্ছে ? ওটা নিছক বাঙালিদের ধারণা। আমাদের বাড়ির মেয়ের মতই এরা। এদের প্রকাশটা ভিন্ন বলে, আমাদের সঙ্গে মেলে না বলে বুঝতে আমরা ভুল করি। আমাদের বাপমায়েরা, এমনকি বৌয়েরা, মনে করে যে বিলেতে যাওয়া মানেই ইংরেজ মেয়ের বিছানায় যাওয়া।

তুমি খেপে গেলে যে। সাকিনা এখনো সেই রকম হাসছে। সাকিনা এখন তার শূন্য গেলাশটা বাড়িয়ে ধরল বেলালের দিকে।

এক ঝলকের মতো বেলালের মনে হলো, সাকিনা বড় বেশি তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, এতটা ভালো নয়, নেশা চড়ে যাবে, কিন্তু নিজের মাথায় বিতর্কের ঝড়, তাই সাবধান করাটা তুচ্ছ করে দ্রুত ভরে দিল সাকিনার গেলাশ, নিজেও একটু নিল, তারপর বলল, অনেকদিন থেকে আমি দেখেছি, সাকিনা, বাঙালিরা এদেশের শাদা মেয়েদের বড় সহজলভ্য মনে করে। আমি দেখেছি, এই লন্ডনে, বাঙালি সমাজে বাঙালি মেয়ে নিয়ে যখন কথা ওঠে তখন তাদের দোষ গুণ নিয়ে আলোচনা হয়, অমুকে ভালো গান গায়, অমুকে ভালো রান্না করে; কিংবা অমুকে

অহঙ্কারী, অমুকে মুখরা। কিন্তু শাদা মেয়ে, ইংরেজ মেয়ে নিয়ে যখন কথা ওঠে, তখন তার দোষ গুণের কথা ওঠে না, ওঠে ওর বুক ভালো, ওর কোমর সরু; ওর উপুড় ভালো, ওর চিৎ ভালো— ইয়ে, মানে শরীর ছাড়া আর কোনো আলোচনা নেই।

ওয়াইনের ঝোঁকেই কি ?— যে কথা কখনো সাকিনার সামনে সে বলে না, সেইসব উচ্চারণ করে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে থেমে যায় বেলাল। দিশেহারার মতো সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিক। তারপর নিজের আসনে গিয়ে বসে। মনোযোগ দিয়ে হাতের গেলাশটা ঘোরায়।

তুমি কিছু মনে করলে না তো ?

না, না। তুমি ঠিকই বলেছ। তার চেয়েও অবাক, আমি জানতাম না, মানে, কখনো জানার সুযোগ হয় নি, তুমি এদেশে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারো।

মাথা ঠাণ্ডা, মানে ?

অন্তত তোমার বেলায় আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তোমার কোনো ইংরেজ মেয়ে ছিল না, মানে ঐ মেয়ে থাকা বলতে লোকে যে রকম বলে।

ঘরের দুই প্রান্তে বসে এরপর অনেকক্ষণ নীরবে গান শুনল দু'জন।

ওয়াইনের দ্বিতীয় বোতলটা খুলল বেলাল।

আর খাবো ? সাকিনা প্রায় মিনতি করে বলে।

খাও, মাতাল তুমি হবে না।

প্রথম বোতলের তলায় তখনো খানিকটা ছিল, তার শেষ ফোঁটাটুকু ঢেলে নিল বেলাল তার নিজের গেলাশে।

হাসছ যে ? সাকিনা জানতে চায়।

হাসছি, শেষ ফোঁটা আমি নিলাম।

তাতে হাসবার কী আছে ?

এদেশে বলে, বিবাহিতা কোনো মেয়েকে ওয়াইনের শেষ ফোঁটা ঢেলে দিলে, সে বছরে তার বাচ্চা হয়।

যাঃ। আর অবিবাহিত কোনো পুরুষ নিলে ?

বললে বিশ্বাস করবে না, সে বছরে তার বিয়ে হয়।

তার মানে এ বছরে তোমার বিয়ে ? করো না একটা বিয়ে। ভারি মজা হয়। তুমি তো আর এদেশ ছেড়ে যাবে না, এবারে সংসার-টংসার করো, নিশ্চিন্ত হয়ে বোসো।

যেন এক পা ধুলো নিয়ে এক গরিব এসে রাজপ্রাসাদের সমুখে দাঁড়াল খুব ঝকঝকে একটা দুপুরে।

যেন সারাদিন খারাপ থাকবার পর হঠাৎ ভালো হয়ে গেল একটা টেলিফোন।

যেন ঘরে ফেরার পথের 'পরে চাঁদ উঠল মস্ত।

যেন কারো কপালে পড়ল লাল ফোঁটা।

বেলাল বলল, সাকিনা, আমি আর দশটা ছেলের মতোই। অসাধারণ কেউ নই। আমি বিয়ে চাই, সংসার চাই, নিশ্চিন্ত হতে চাই। ভালোবাসা চাই, ভালোবাসতে চাই।

তাহলে, এই বছরেই ?

তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি। কিছুদিন থেকে কেবলই মনে হয় সে আমার, কিন্তু সে আমার হবে কিনা জানি না।

ঠিক তখন বেজে উঠল টেলিফোন— যেন একটা হৃৎপিণ্ড আজীবন নিঃশব্দে চলবার পর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

প্রায় একই সঙ্গে দু'জনে উঠে গেল টেলিফোনের কাছে, একই সঙ্গে হাত বাড়ালো, একই সঙ্গে রিসিভার তুলল যেন তারা। কিন্তু কানে রাখল সাকিনা। আর বেলালের হাত রিসিভার ছেড়ে খুব স্বাভাবিকভাবে আশ্রয় নিল সাকিনার কাঁধে। যেন প্রত্যাশিত। সাকিনা সরিয়ে নিল না কাঁধ, চকিত হলো না এতটুকু। প্রতিদিনের চেনা সেই দীর্ঘ টান গলায় তুলে সাকিনা সাড়া দিল, হ্যালো।

ওপার থেকে কাশেমের গলা ক্ষীণভাবে টের পেল বেলাল। পাশে থেকেও বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, কাশেম বলছে, তুমি ফিরেছ ? জানিয়ে দেবার দরকার ছিল, আজ ফিরতে দেরি হবে, রাত হবে।

কেন ? কেন দেরি হবে ? কোথায় তুমি ?

তার উত্তরে কাশেম কী বলল ভালো করে বুঝতে পারল না বেলাল। তারপর ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। টেলিফোন রেখে দিয়েছে কাশেম।

কিন্তু রিসিভার তখনো আঁকড়ে ধরে আছে সাকিনা।

বেলাল তখন তার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে নামিয়ে রাখল এক হাতে, আর কাঁধের পরে রাখা হাতটা দিয়ে সাকিনাকে ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে।

সাকিনাকে বেষ্টন করে, তার কাঁধে মুখ রেখে বেলাল ঠোঁট ঘষতে ঘষতে উচ্চারণ করল, তুমি, তুমি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সাকিনা।

সাকিনা যেন ভারশূন্য হয়ে গেছে, দু'হাতে তাকে ধরে না রাখলে এক তাল সিলকের মতো পড়ে যাবে।

তুমি কিছু বলো, সাকিনা।

সাকিনার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, একটু দ্রুত, তা স্বাভাবিক করবার চেষ্টায় আরো দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস।

কিছু বলবে না ?

কিছু বলল না সাকিনা। কোমল হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, খালি গেলাশ দুটো হাতে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। সেখানে খুব বড় ধারায় কল ছেড়ে মনোযোগ দিয়ে গেলাশ ধুতে লাগল সে।

৭

দুপুর থেকে এপর্যন্ত, এখন রাত প্রায় দশটা, একটানা হুইস্কি পান করে চলেছে কাশেম। বাবুল বলল, আজ দেখি তোর বেজায় সাহস।

ভীতু ছিলাম কবে ?

যবে থেকে বিয়ে করেছিস, শালা।

খবরদার, আমি যে ছিলাম সেই আছি। হুইস্কির প্রতাপে 'স' তালব্য শ আর 'ছ'গুলো সব দন্ত-স হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে আমি তোর পার্টনাব। গালমন্দ করলে করব না ব্যবসা তোর সঙ্গে।

বিকেলে, রেস্তোরাঁয় বসে দু'জনের কথা হয়ে গেছে। কাশেম বাড়ি আবার বন্ধক দিয়ে হাজার দুয়েক পাউন্ড তুলবে, আর বাবুল দেবে এক হাজার— সেই সঙ্গে বাবুলের অভিজ্ঞতা। দু'জনে সমান অংশীদার হিসেবে প্রথমে ইন্ডিয়ান টেক-অ্যাওয়ে খুলবে। মানে, সেখানে বসে খাবার ব্যবস্থা থাকবে না, রান্না করা ভারতীয় খাবার লোকে কিনে নিয়ে বাড়িতে বা গাড়িতে বসে খেতে পারবে। বাবুল একটা জায়গার কথাও বলেছে। বেলসাইজ পার্ক স্টেশন থেকে কিছুদূর এগোলেই হাতের বাঁয়ে 'রাউন্ডহাউস' থিয়েটার। এককালে এটা ছিল নাকি রেলওয়ে এনজিন জিরোবার জায়গা। প্রকাণ্ড গোল ঘর। কয়লার এনজিন উঠে যাবার ফলে এটাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারপর নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্কার সরকারের কাছে, ব্রিটিশ রেলকর্তৃপক্ষের কাছে, দেন-দরবার করে গোল এনজিন ঘরটা চেয়ে নেন, সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন আজকের দিনের 'রাউন্ড হাউস' থিয়েটার। এখন এখানে নতুন লেখকের, নতুন কোম্পানির কিংবা দেশ-বিদেশের পরীক্ষামূলক নাটকের অভিনয় হয়। ফলে তরুণ-তরুণীর ভিড় বেশি— বিশেষ করে সেইসব তরুণ-তরুণীর, যাদের বলা হয় 'ড্রপ-আউট', যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ, সমাজের সনাতন মূল্যবোধে বিতৃষ্ণ। এদের অনেকেরই আবার প্রাচ্যের দিকে আকর্ষণ বড় প্রবল। বাবুল বলেছিল, ইন্ডিয়ান খাবার এদের আবার ভারী পছন্দ, তাই রাউন্ডহাউসের উল্টো দিকে যদি ঘর পাই তো ব্যবসা জমবে ভালো। সপ্তাহে অন্তত হাজার দেড়েক পাউন্ডের ব্যবসা হতে পারবে।

কিন্তু মাত্র তিন হাজার পাউন্ডে কী ব্যবসা শুরু করা যাবে ? বাবুল আশ্বাস দিয়েছে, তার নিজের রেস্তোরাঁর জন্যে এখন যাদের সঙ্গে বাকির সম্পর্ক আছে, তাদেরই বলে কয়ে ভেড়াতে হবে।

ব্যাস, আর চাই কী। কাশেম সেই বিকেল থেকেই স্বপ্ন দেখছে, তার ব্যবসা জমে উঠেছে, হাজার হাজার পাউন্ড নাড়া-চাড়া করছে, নতুন বাড়ি কিনছে, গাড়ি কিনছে, পরীক্ষায় তার ব্যর্থতার জন্যে সাকিনার অনবরত খোঁটার সোনালি জবাব দিতে পারছে।

সাকিনা কিন্তু অনবরত খোঁটা কখনোই কাশেমকে দেয় নি। এটা এখন তার হুইস্কি প্রভাবিত সিদ্ধান্ত মাত্র। হয়ত গতরাতে তার শরীরের সেই ব্যর্থতারও একটা প্রভাব পড়েছে। আর তাই সে টেলিফোনে সাকিনাকে অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছিল বিকেলবেলায়, কোথায় আছি, ফিরতে কেন দেরি হবে, সে কৈফিয়ত তোমাকে দেবার কোনো দরকার আর দেখছি না।

বাবুল বলল, শালা, এত হুইস্কি খাস নে বলছি। ক্রিস্টিনার কাছে লজ্জা পাবি।

বুঝতে না পেরে কুতকুত চোখে তাকাল কাশেম।

ক্রিস্টিনার তোকে ভালো লেগেছে। আর একটু গরম করে দিলেই তোর সঙ্গে নির্ঘাত যাবে, শালা। বেশি হুইস্কি খেলে তোরটা দাঁড়াবে না।

কাশেম পাশ ফিরে ক্রিস্টিনার দিকে তাকালো। সে তখন দরোজায় হেলান দিয়ে শফির কাছ থেকে সিগারেটের আগুন নিচ্ছে। কাশেমের চোখে চোখ পড়তে ক্রিস্টিনা চোখের পাতা ভারী করে দৃষ্টিতে ধীর-বিদ্যুৎ পুরে দিল।

মেয়েটি জার্মান। ইংরেজি শেখার জন্যে লন্ডনে এসেছে কয়েক মাসের জন্যে। ইয়োরোপ থেকে এইরকম মেয়েরা আসে কিছুদিনের জন্যে, থাকে কোনো পরিবারের সঙ্গে, থাকাখাওয়ার বিনিময়ে বাড়ির কিছু কাজ করে দেয়, আর দুপুরে বা বিকেলে যায় ভাষা শেখার ইস্কুলে। এদের অনেকে আবার বেলসাইজ পার্কে হোস্টেলেও থাকে।

ক্রিস্টিনা তারই মতো আরো দু'টি জার্মান মেয়ের সঙ্গে খেতে এসেছিল বাবুলের রেস্তোরাঁয়।

অনেকে জামার কাপড় ভালো বোঝে, অনেকে ইলেকট্রিকের জিনিস ভালো চেনে, বাবুল চেনে অভিযানে আপত্তি নেই এমন মেয়ে। এখন এই তিন জার্মান তরুণীর লন্ডনে বন্ধু বলতে বাবুল। আজ পার্টিতে এরা আসবে বলেই লোভ দেখিয়েছিল সে কাশেমকে। বাবুলের ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেডের ফ্ল্যাটে ওরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে কাশেমকে সে জুড়ে দিয়েছিল ক্রিস্টিনার সঙ্গে। একটিকে সে রেখেছে নিজের জন্যে, আরেকটি এখনো খালি। আরেকটির জন্যে, মাথা গুনলে এখন চারজন প্রার্থী। চারজনই বাংলাদেশের ছেলে, দু'জন ছাত্র, একজন চাকুরে। আরেকজন রাজনীতি করে— অনিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে বাংলা একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে ; পত্রিকার নাম 'মুক্ত বাংলা।'

'মুক্ত বাংলার' সম্পাদক বশির হোসেন লম্বা এক গেলাশ মার্টিনি নিয়ে কাশেমের মোড়ার পাশে বস্তা-গদির ওপর ধপ করে বসে পড়ল। চামড়ায় মোড়া বস্তা, তার ভেতরে শোলা জাতীয় পদার্থের ছোট ছোট টুকরো পোরা। বসলে প্রথমে বজবজ করে শব্দ হয়, তারপর শরীরের খাঁজ নিয়ে বস্তাটা স্থির হয়।

সেই বস্তার ওপর জুৎ করে বসে, বস্তার গায়ে চাপড় দিয়ে, কাশেমের দিকে তাকিয়ে বশির হোসেন বলল, বাংলাদেশে এত মজার গদি পাবেন না, সাহেব।

কাশেম একটু হেসে আবার তাকাল ক্রিস্টিনার দিকে। ক্রিস্টিনা এখন শফির সঙ্গে কথা বলছে। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না, কেবলই বাঁ হাত নাড়ছে আর শব্দ মনে করবার চেষ্টা করছে। কী বলছে ক্রিস্টিনা ?

কাশেমের দৃষ্টি অনুসরণ করে বশির হোসেন তাকালো ক্রিস্টিনার দিকে। আগাগোড়া ওজন নেবার মতো করে তাকিয়ে রইল খানিক। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কাশেমকেই বলল, বাবুল সাহেবের টেস্ট আছে।

কাশেম ওঠার জন্যে পিঠ সোজা করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরল বশির হোসেন।

আরে সাহেব, আপনাকে দেখে একটু বসলাম, দেশোয়ালি ভাই, পালাচ্ছেন কোথায় ?

বসতে হলো কাশেমকে।

বশির হোসেন বলল, মেয়ে-টেয়ে আমার পোষায় না, সাহেব। সময়ই পেলাম না। সারাদিন চরকির মতো ঘুরতে হয়।

কী কাজ করেন ?

কেন, আমার কাগজ দেখেন নি ?

দেখেছি। শুধু কাগজ বের করেই চলে ?

হাসালেন সাহেব, হাসালেন। কাগজ বের করে বাংলাদেশে পেটের ভাত হয় না, লন্ডনে হবে ? দেশের জন্যে একটু ভালোবাসা আছে বলে গাঁট থেকে গচ্চা দিচ্ছি। যতদিন পারি দিয়ে যাবো। দেশ আমাকে মনে রাখলে রাখবে, না রাখলে দুঃখ নেই।

কাশেমের জানতে ইচ্ছে করছিল, গচ্চা দেবার মতো সেই পয়সাটাই বা আসে কোত্থেকে ?

বশির হোসেন নিজেই তার উত্তর দিল, এই ছোটখাটো একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে, আর দেশিভাইয়ের রেস্টুরেন্টে মাছ-মাংস সাপ্লাই দেই। কোনো মতে ডালভাত হয়ে যায়। আর ঐ যে ঘাড়ে ভূত আছে, দেশের জন্যে কিছু করব, আল্লা সেটুকু চালিয়ে নেন এইভাবে আর কী ?

হুইস্কির ঘোরের ভেতরেও কাশেমের উপলব্ধি হয়, দেশের পেশাটা নিতান্ত নিঃস্বার্থ নয়। দেশ-দেশ করে বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে মেশার সুযোগ হয়, পরিচয়ের একটা সূত্র হয়, আর

কাগজ বের করে নিজের ট্রাভেল এজেন্সি আর অন্যান্য ব্যবসার বিজ্ঞাপন বড় করে ছাপানো যায়। বিলেতে বাঙালি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই এখনো ছাপার অক্ষরকে সমীহ্ করে চলার মতো সরল।

কাশেম আবার উঠতে যাচ্ছিল। ক্রিস্টিনা তার দিকে এখন 'এসো' চোখে তাকিয়ে আছে। আবারো হাত ধরে বসালো বশির হোসেন।

বসুন বসুন, সাহেব। ওসব মেয়েবাজি আপনার আমার পোষায় না। আপনাকে দেখেই বুঝেছি, আপনিও আমারই মতো।

কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না কাশেমের। ভালোও লাগল না। আজ সে বেপরোয়া। সাকিনা তাকে ব্যবসা করতে মানা করেছে, সে আজ ব্যবসা করবে ঠিক করেছে। সাকিনা তাকে পড়া শেষ করতে তাগাদা দিয়েছে, সে আর পড়বে না আজ ঠিক করেছে। সাকিনা তার শরীরের ব্যর্থতা দেখে পরীক্ষা ফেলের খোঁটা দিয়েছে, আজ সে প্রমাণ করবে তার শরীর এখনো সক্ষম— দোষ সাকিনার।

এরই মধ্যে ক্রিস্টিনার জন্যে তার নাভির নিচে তাপের বিকিরণ শুরু হয়ে গেছে।

বশির হোসেন কাশেমের উরুতে প্রচণ্ড চাপড় দিয়ে বলল, আসুন, আপনি আমি একটা কাজের কথা সেরে নেই। আমরা প্ল্যান করেছি, প্রেসিডেন্ট সাহেব লন্ডন যখন আসবেন আমরা কালো পতাকা দেখাবো, হাই কমিশন ঘেরাও করব। তাকে আমরা বুঝিয়ে দেব যে, দেশের মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখলেও বাঙালি এখনো মরে নাই, বাংলার মুক্তির জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার লোক এখনো আছে। ডিকটেটরি চলবে না। গণতন্ত্র দিতে হবে। ইলেকশন দিতে হবে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এসব কথা আমার কাগজেই আপনি পাবেন। লিখতে ভয় পায় না বশির হোসেন, এ লন্ডনে সকলেই জানে। আল্লার রহমতে এখনো মাথা উঁচু করেই চলেছি।

বলে, বশির হোসেন কল্পনায় নিজেই নিজের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর যোগ করল, আপনার দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধবকে বলে আমাদের সঙ্গে সবাই এসে যোগ দেবেন কালো পতাকা হাতে। আপনার মতো কর্মীই আজ দেশ চায়। আমার এই কার্ডখানা রাখুন। কিছু মনে করবেন না, ট্র্যাভেল এজেন্সির কার্ডখানাই দিলাম, এই নম্বরে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ক'জন বন্ধু আসছেন।

কোথায়?

হিথরো এয়ারপোর্টে। প্রেসিডেন্টকে কালো পতাকা দেখাতে।

দেখুন, আমি রাজনীতি করি না।

আরে সাহেব, রাজনীতি কি আমিও করি? তাহলে কবেই দেশে গিয়ে মন্ত্রী হয়ে যেতাম। আমি করি দেশের সেবা। সেবার মন নিয়ে যদি না আসেন তো দেশের উপকার করতে পারবেন না, হয়ত নিজের বাড়িগাড়ি হবে, কিন্তু বাঙালি আপনাকে ক্ষমা করবে না।

ক্ষীণ গলায় কাশেম প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করল। বলল, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি লন্ডনে বসে কী করে সম্ভব? এখান থেকে দেশের কতটুকুই বা আপনি বদলাতে পারবেন?

আলবত পারব। এবার নিজের উরুতেই প্রচণ্ড চাপড় দিল হোসেন। এই তো আপনাদের মহাদোষ। পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এই বাণী ভুলে গেছেন?

কাশেমের সন্দেহ হলো, হয়ত নজরুল ইসলাম এই লাইনগুলো লেখেন নি। কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তার জ্ঞান এত কম যে সন্দেহটা প্রকাশ করতে ভরসা হলো না।

ক্রিস্টিনা কাছে এসে বাঁচিয়ে দিল কাশেমকে। যাক, বশির হোসেনের বক্তৃতা তাকে আর শুনতে হবে না। কিন্তু ভুল। মুহূর্তে ক্রিস্টিনাকে কব্জা করে বসল 'মুক্ত বাংলার' সম্পাদক বশির হোসেন। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে, বিগলিত হয়ে পাশে বসিয়ে, নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, বাংলাদেশ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো ?

ক্রিস্টিনা ভাঙ্গা ইংরেজিতে জানাল, কিছু কিছু জানে। বাংলাদেশের নেতার নামও সে করতে পারে। তারপর অনেক ভেবে ক্রিস্টিনা উচ্চারণ করল, রাখমান।

না, না, রাখমান নহে, রহমান। বশির হোসেন কাছ ঘেঁষে বসল ক্রিস্টিনার। কোন রহমান ? শেখ মুজিবুর রহমান, না, জিয়াউর রহমান ?

ক্রিস্টিনা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল বশির হোসেনের দিকে।

হা হা করে হেসে উঠল বশির হোসেন। বলল, বাংলাদেশে এখন রহমানের ছড়াছড়ি। ঠিক যেমন পাকিস্তানে খানের ছড়াছড়ি ছিল। আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, যত পারেন খান। নিজের রসিকতায় হা হা করে হেসে উঠল বশির হোসেন। তারপরই তার খেয়াল হলো, শেষ কথাটা তো বাংলায় বলেছে সে, ক্রিস্টিনা কিছু বুঝতে পারল না। তখন কাশেমের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কি সাহেব, ট্র্যানস্লেশন করে দিন না ? আমার আবার ইংরেজি-টিংরেজি ভালো আসে না। দেখি, কেমন দেশপ্রেমিক আপনি।

ট্রানস্লেশন করলেই দেশপ্রেমিক হয়ে যাবো ?

মানে কথার কথা আর কী। পাকিস্তানকে নিয়ে একটু পলিটিক্যাল জোক করলাম আর কী। দিন ট্র্যানস্লেশন করে, বিদেশীরা জানুক, বুঝুক, বাঙালি এখনো পাকিস্তানকে ক্ষমা করে নাই।

ঝিম মেরে বসে রইল কাশেম।

তখন তার কোমরের কাছে তীক্ষ্ণ আঙ্গুলের খোঁচা দিল বশির হোসেন আর বলল, কী সাহেব ?

সেই খোঁচা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুন চড়ে গেল কাশেমের। হুইস্কি ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় সে হয়ত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াত না। এখন সে কেবল উঠেই দাঁড়াল না, হাতের গেলাশ বশির হোসেনের মাথার দিকে তাক করে চেঁচিয়ে উঠল, শালা।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা বাঁচিয়ে, দু'হাত তুলে, হাত তুলতে গিয়ে মার্টিনির সবটা ফেলে দিয়ে, সরু বাঁশফাটা গলায় আর্তনাদ করে উঠল বশির হোসেন, আরে, আরে, হেলপ, হেলপ।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ক্রিস্টিনাও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে এসেছে বাবুল, শফি, গোলাম আলী, সাখাওয়াত আর সেই জার্মান দুটি মেয়ে।

বাবুল হাত চেপে ধরল কাশেমের। এই এই কী হচ্ছে ? ব্যাপার কী ?

পাকিস্তানের স্পাই। দালাল।

কে ? কার কথা বলছেন ?

এই আপনার বন্ধুটি। আমি কাগজে লিখব। বশির হোসেন কাউকে ভয় পায় না জেনে রাখুন।

আহ, থামুন, চেঁচামেচি নয়। বশির হোসেনকে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল বাবুল।

কিন্তু তার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল বশির হোসেন। আরো বেশি সরু গলায় চিৎকার করে, হাত নেড়ে সে বলতে লাগল, চেঁচামেচি কী বলছেন সাহেব ? এদের

এক্সপোজ করবার সময় এসে গেছে। এই লন্ডন শহরে হাজার হাজার মীরজাফর আছে, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে, বাবুল সাহেব, তাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

বশির হোসেনকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল বাবুল, কিন্তু সে একপাও নড়ল না। তখন কাশেমের হাত ধরে সে বলল, কী ছেলেমানুষি করছিস ?

আমি তো কিছু করছি না।

আয়, চলে আয়।

কাশেমকে নিয়ে শোবার ঘরে গেল বাবুল। কাশেমের পা টলছে এখন হুইস্কির তাড়ায়। একবার মনে হলো বমি হবে, হলো না। ধপ করে সে শুয়ে পড়ল বাবুলের বিছানার ওপর। বাবুল শুধু বলল, কিছু মনে করিস না। এখানে চুপ করে থাক। মি. হোসেনের সঙ্গে আমার আবার নাকির কারবার, ওকে একটু ঠাণ্ডা রাখা ভালো। আমাদের টেক-অ্যাওয়ে বিজনেসে ও কাজে আসবে। তুই খবরদার উঠিস না।

ওঠার মতো শক্তিও কাশেমের এখন আর নেই। উঠলেই মাথা ঘুরছে, চোখের সমুখে সবকিছু দুটো হয়ে যাচ্ছে, বস্তুত ভেতর থেকে বস্তুর জন্ম হয়ে ছুটে পালাতে চাইছে, আবার ফিরে আসছে।

বাবুল দরোজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো। যাবার আগে শুধু একবার জানতে চাইল, সত্যি করে বলতো, বৌয়ের সঙ্গে তোর কিছু হয়েছে ?

না, না।

আচ্ছা, ঘুম এলে তুই ঘুমো।

সাকিনার মুখ ভেসে উঠল কাশেমের চোখে। সাকিনার সেই সারাক্ষণের হাসিটুকু সমেত। বিছানার পাশে ঝকঝকে শাদা টেলিফোন। ফোন করবে সাকিনাকে ? রাত এখন ক'টা ? হাতঘড়ি চোখের সমুখে ভালো করে তুলে ধরেও ঠাহর হলো না।

বাড়ির নম্বর ডায়াল করল কাশেম। পাশের ঘর থেকে এখন নাচের বাজনা বাজছে। কেউ কি নাচ করছে ? না, ওরা শুনছে কেবল ?

এক ইংরেজ মহিলার গলা শোনা গেল টেলিফোনের ওপার থেকে। ক্লান্ত, বিরক্ত, বয়স্ক গলা। এসময়ে নিশ্চয়ই টেলিফোন আশা করে নি।

সরি, রং নাম্বার।

ভীষণ বমির উদ্রেগ হতে লাগল কাশেমের। আজ দুপুরে থেকে হুইস্কি খাওয়া হচ্ছে।

না, সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। সাকিনাকে সে দেখিয়ে দেবে, তার একটা আলাদা জীবন আছে, তার কাজ করবার ক্ষমতা আছে, সে একাই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে।

সাকিনাকে আঘাত করবার ভয়াবহ প্রেরণা এলো তার ভেতরে।

সে আবার বাড়ির নম্বর ডায়াল করল।

এবারে, ওপার থেকে শোনা গেল সাকিনার গলা।

হ্যালো।

কোনো উত্তর দিল না কাশেম।

হ্যালো, হ্যালো। সাকিনার গলায় যেন অনুনয়।

কাশেম মৃদুস্বরে হেসে উঠল, হাসিটুকু দীর্ঘ করে তুলল সে, কিন্তু কোনো কথা উচ্চারণ করল

না।

হ্যালো, হুইজ দিস ? হ্যালো।

টেলিফোন কেটে দিল কাশেম

৮

টেলিফোন রেখে দিয়ে বিহ্বল চোখে সাকিনা তাকাল বেলালের দিকে।

কে ছিল ?

নাম বলল না।

কী বলল ?

কিছু বলল না। রেখে দিল।

হয়ত রং নাম্বার।

সাকিনা তবু দাঁড়িয়ে রইল টেলিফোনের পাশে।

বেলাল বলল, চলে এসো। বোসো।

সাকিনা মোড়ার ওপর বসে পড়ল।

আমার কাছে এসে বোসো।

সাকিনা তার আসন থেকে নড়ল না। তখন বেলাল উঠে এসে তার হাত ধরল।

এসো, আমার কাছে বোসো। অনেক কথা আছে।

বেলাল তাকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল, নিজে বসল তার পাশে, বলল, এত ভেবো না তুমি, এত ভেবো না। যে তোমাকে নিয়ে একটুও ভাবে না তাকে নিয়ে এত ভেবো না।

সাকিনা চুপ করে রইল।

বেলাল বলল, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমারই সঙ্গে আমার সংসার। তুমি আর আমি এই সংসার করছি। এটা আমাদের বাড়ি, এটা আমাদের জীবন। তুমি শুনছ ?

হ্যাঁ, শুনছি।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কেন তুমি আমাকে ভালোবাসবে ?

তোমাকে ভালোবাসি বলে।

চুপ করে রইল সাকিনা। তারপর বলল, আমি ভালোবাসি না।

ভীষণ দমে গেল বেলাল, কিন্তু সামলে নিতে পারল এক নিমেষেই। বলল, আমি তো ভালোবেসেছি। আপাতত এর চেয়ে বড় কিছু নেই, অন্তত আমার কাছে। এবং তা তোমাকে বলতে পেরেছি। অনেকে তো ভালোবাসার কথা বলতেই পারে না। আমি বলেছি, আর তুমি এখন পর্যন্ত আমাকে তিরস্কার করো নি।

সাকিনার চোখে মুখে এখনো উদ্বেগের চিহ্ন। কে ছিল টেলিফোনে ? এমন তো কখনো হয় নি। জানো, লোকটা মনে হলো, শুধু হাসছে।

সাকিনার একটা হাত বেলাল তুলে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু সাবলীলভাবে ছাড়িয়ে নিল

সাকিনা। বলল, যাকগে, যে হোক সে হোক। দরকার থাকলে আবার ফোন করবে। তোমার খিদে পায় নি ?

না।

রাত অনেক হয়েছে। খিদে না হয় না পেল, ঘুম পায় নি ?

না।

আমি ঘরে যাচ্ছি।

না।

আটকে রাখবে ?

চিরদিনের মতো।

পারবে না।

কেন ? আমার কি জোর নেই ?

আছে। কিন্তু আমি জানি তুমি জোর করবে না।

কী করে জানলে ?

তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে।

বেলাল এর উত্তর দিতে পারল না। সাকিনা ঠিকই বলেছে, জোর সে করতে পারবে না। মনে মনে একবার কল্পনা করবার চেষ্টা করল, কতটা খারাপ সে হতে পারে। এখুনি কি সে উঠে জড়িয়ে ধরতে পারে সাকিনাকে, তার বস্ত্রহরণ করতে পারে ?

না, না।

কী না-না করছ ? সাকিনার কথায় তার সংবিত ফিরে আসে, মনের ভাবনাটাকেই সে অজান্তে উচ্চারণ করছিল ?

সাকিনা বলল, আমি জানতাম, তুমি আমাকে এ কথা বলবে।

জানতে, আমি তোমাকে ভালোবাসার কথা বলব ? কবে থেকে জানতে ?

কিছুদিন থেকে।

সাকিনা কি জানে কাল রাতে সে তাদের ঘরে গিয়েছিল চুরি করে ? উদ্বিগ্ন চোখে বেলাল তাকিয়ে রইল সাকিনার দিকে।

সাকিনা উঠে গেল রান্নাঘরে। সেখান থেকে বলল, আমি তোমার জন্যে খাবার করছি। কিন্তু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়োগে। কাশেমের জন্যে দেরি করে দরকার নেই।

কাশেমের জন্যে আমি দেরি করছি না। তেতো গলায় বেলাল উচ্চারণ করল। কাশেমের জন্যে তুমি দেরি করো। আমার খিদে নেই। আমি শুতে চললাম।

বেলাল দুমদুম করে নিজের ঘরে গেল। ইচ্ছে করেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরোজা। শব্দটা গিয়ে সাকিনার বুকে ঘা দিক। সাকিনা কেন বারবার কাশেমের কথা তুলবে ? এক অর্থে বেলালের ভালোবাসাকেই কি তা তুচ্ছ করা নয় ?

চিৎ হয়ে শুয়ে রইল বেলাল। পোশাক বদলাতে ইচ্ছে করল না। মনের মধ্যে এ রকম একটা আশা হয়ত তার যে সাকিনা তাকে একটু পরেই ডাকবে, তখন পোশাকটা ভদ্রস্থ থাকাই ভালো।

কিন্তু ডাকল না সাকিনা। এমনকি তার চলাচলেরও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। অধিক রাতে প্রায়ই গান করে বা গান শোনে সাকিনা, গানেরও কোনো শব্দ এলো না। রাস্তার মোড়ে রাত এগারটায় শুঁড়িখানা ভাঙ্গার কোলাহল উপচে পড়ল। এক সময়ে সে কোলাহলও নীরবতায় ডুব দিল। আর একইভাবে চিৎ হয়ে, অন্ধকারে শুয়ে রইল বেলাল।

সাকিনা এলো না, সাড়া দিল না।

এলোমেলো মনে পড়তে লাগল কাজের সূত্রে যাদের সঙ্গে পরিচয়, অদের কথা। ব্রিক লেনের বাবর মিয়ার কাছে কাল রোববার হলেও, যেতে হবে। তার এ কাজের একটা দিক এই যে, শনি-রবি নেই, আবার সপ্তাহের মাঝেও ছুটি। বাবর মিয়া তার স্ত্রীকে বিলেতে আনতে চায়, কিন্তু নিজের বিয়েটাই প্রমাণ করতে পারছে না বলে আনতে পারছে না। আজ ছ'বছর একা আছে বাবর মিয়া। বছরখানেক আগে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়, কিছুদিন হাসপাতালে থাকে; এখন আবার কিছুদিন কাজ করবার পর, পুরনো অসুখটা দেখা দিয়েছে। এলাকার সামাজিক কর্মী হিসেবে বেলালের দায়িত্ব তাকে সাহায্য করা। তার সঙ্গে কথা বলেছে বেলাল বহুবার। একটা কথা এখন কানের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবর মিয়া তার হাত ধরে অনুনয় করেছিল, আমার স্ত্রীকে এনে দিন, নইলে আমি আর বাঁচাবো না।

কেন, বাবর মিয়া তার স্ত্রীকে এমন আকুলস্বরে কাছে চায়? সে কি কেবল শরীরের ক্ষুধা, না, হৃদয় বলে একটা কিছু ব্যাপার আছে; যে হৃদয়ের ব্যাপারে অধিকার কেবল তার মতো লেখাপড়া জানা মানুষেরই নয়, আছে বাবর মিয়ার মতো অর্ধশিক্ষিত সাধারণ মানুষেরও?

বাবর মিয়ার সেই আকুলতাকে এখন অন্ধকারে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করে বেলাল। নিজের আকুলতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালো লাগে তার। সাকিনার জন্যে তার যে শূন্যতা, সে কি বাবর মিয়ার শূন্যতার সঙ্গে তুলনীয়?

কেন এমন মনে হয়, আমার এই শূন্যতার সঙ্গে কারো শূন্যতা তুলনীয় নয়? কেন মনে হয়, আমি যেমন করে ভালোবেসেছি, আর কেউ কখনো তেমন করে ভালোবাসে নি? অথচ, তার আগেও তো কোটি মানুষ এসেছে যারা ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পেয়েছে। সবারই কি মনে হয়েছে; আমার মতো আর কখনো কেউ ভালোবাসার জামা গায়ে পরে নি?

অথচ মানুষ তার সেই বিশিষ্ট ভালোবাসাকেই ভাষা দিতে গিয়ে সবচেয়ে পুরনো, ব্যবহারে ব্যবহারে সবচেয়ে দীপ্তিহীন সেই 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' ছাড়া আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। সাকিনাকেও তো সে নতুন কিছু বলতে পারল না, একেবারে নিজের কোনো বাক্যবন্ধ, কোনো শব্দ, কোনো উচ্চারণ তার জিহ্বায় এলো না?

বাবর মিয়াও তো তার হাত ধরে কেঁদে বলেছিল, সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে।

মানুষের এ কী মন্দভাগ্য যে, নিজের একান্ত নিজস্ব কথাটি বলবার জন্যে হাত বাড়াতে হয় অন্যের উদ্ভাবিত শব্দের ভাঁড়ারের দিকে।

এমনকি দূরত্ব আর না-পাবার যন্ত্রণায় যে আর্তধ্বনি তার করতে ইচ্ছে করে, সেই আর্তধ্বনি তো কেরানির সংসারে মাছ বেড়ালে নিয়ে যাবার পর আর্তধ্বনির চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়?

বেলালের হঠাৎ মনে পড়ে যায় মি. সেনের কথা।

মি. চাণক্য সেন। বহুদিন আগে বিলেতে এসেছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনের কাজ নিয়ে। এখন তিনি চাকরি ছেড়ে স্কুল মাস্টারি করছেন। দিব্যি জমিয়ে আছেন শেফার্ডস বুশে।

শেফার্ডস বুশে বাড়ি কিনেছি কেন জানেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বিলেতে, থাকতেন

এই শেফার্ডস বুশ পাড়ায়। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন হ্যাম্পস্টেড পাড়ায়। পারলে সেখানেই বাড়ি কিনতাম। কিন্তু সেখানে কিনতে হলে টাটা কি বিড়লার ঘরে জন্ম নিতে হবে। তাই গরিব মানুষ, শেফার্ডস বুশেই আস্তানা গেড়েছি।

মজার মানুষ মি. সেন। বিয়ে করেন নি। মেয়ের দোষ যাকে বলে, তাও নেই। মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন 'পূর্ণিমা-রাতে তোমারে নেহারি' জাতীয়। মাঝখানে কলকাতায় গিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে একখানা বইও ছাপিয়েছেন— 'সুদূরপ্রিয়া' নামে। আলাপ হলেই এক কপি নিজ হাতে লিখে দেবেন, 'অমুককে কবির শুভেচ্ছাসহ।' কান্তিমান হস্তাক্ষরে স্বাক্ষর করবেন 'চাণক্য সেন।' সপ্রতিভভাবে লজ্জিত হয়ে বলবেন, পড়ে দেখবেন। অনেকে বলেন, মশাই, প্রেম করেন নি, বিয়ে করেন নি, আপনি প্রেমের কী বোঝেন? আমি বলি প্রেম ভালোবাসা হচ্ছে মানুষের একটা থিয়োরি মাত্র। তার জন্যে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানের দরকার হয় না। মশাই, একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গ করলেই কি প্রেমের সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হওয়া যায়?

মি. সেনের সঙ্গে বেলালের প্রথম আলাপ হয়েছিল বিলেতে আসবার কয়েক মাস পরেই। কলকাতার ছেলে অমিত, সেও ব্যারিস্টারি পড়ছিল। বছরখানেক থেকে— এখন পাস করে ফিরে গেছে, সেই অমিত বেলালকে নিয়ে গিয়েছিল স্ট্যান্ডে 'ইয়েটস ওয়াইন লজ'-এ।

'এখানে বহু রকমের ওয়াইন পাবেন, বেলাল বাবু। সারা ইয়োরোপের সেরা লেবেল।' সেই অমিতের বিজ্ঞাপনে রাজি হয়ে সেখানে সে গিয়েছিল। ওয়াইন রসিকদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি, তারই ভেতরে কোনো রকমে একটু ঠেস দেবার জায়গা করে দু'বন্ধুতে পান করছিল, এমন সময় ভুঁড়ি দিয়ে ভিড় ঠেলে এক বাঙালি মধ্যবয়সী অতি সুদর্শন ভদ্রলোকের আবির্ভাব। মাথার মাঝখানে ছোট্ট টাক, কিন্তু টাক ঘিরে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, হালকা নীল রঙের থ্রিপিস সুট পরনে, রুপোর চেনে পকেট ঘড়ি।

আপনারা বাঙালি? একেবারে শাদা বাংলায় ইংরেজদের ভিড়ে প্রশ্ন করেছিলেন মি. সেন। হ্যাঁ-সূচক উত্তর পেতেই ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ঝাড়া দু'সপ্তাহ বাংলা বলি নি, মশাই। আপনাদের দেখেই মনে হলো বাঙালি তরুণ, বুক ঠুকে ঢুকে পড়েছেন ওয়াইন চেখে দেখতে। নতুন এসেছেন তো? দেখেই বুঝতে পেরেছি। বলতে হবে না। চোখে এখনো বাংলার সেই নদী, সেই ধান খেতের ছায়া দুলছে মশাই, দেখেই বুঝতে পেরেছি। ভাবলাম, দেশের দুটো কথা কইগে। তা কদ্দিন আসা হলো? মাস তিনেক? কী খাচ্ছেন এটা? আরে ছ্যাঃ, এ যে আপনাকে মেডিক্যাল দিয়েছে, মশাই, আসল মাল তো নয়। নাঃ, ইংরেজের সেই সততা আর নেই, বুঝলেন। এখন বাঙালির মতোই আলসে আর বাটপাড় হয়েছে, জানলেন। রঙটাই শুধু শাদা। ফেলে দিন, ফেলে দিন। আমি আপনাদের দিচ্ছি; চেখে দেখুন। লাল, না শাদা?

তখন পর্যন্ত বেলালের জ্ঞান নেই ওয়াইন লাল হয়, শাদা হয়, আবার গোলাপিও হয়। অমিত কিছুদিন আগে এলেও আর জানা থাকলেও মি. সেনের কথার তোড়ে বেচারা বোবা হয়ে গিয়েছিলো।

আচ্ছা, শাদাই হয়ে যাক। বাঙালির মাছ-ভাতের পেট, শাদাই সহ্য হবে। বলে মি. সেন দুটি গ্লাশ ধরিয়ে তাদের নাড়িনক্ষত্রের খবর নিয়ে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারের পাশ দিয়ে ঝাড়া এক মাইল হাঁটিয়ে, ভারতীয় এক রেস্তোরাঁয় তুলে খাওয়াতে খাওয়াতে একটা জ্ঞান দিয়েছিলেন, যেটা এখনো মনে আছে বেলালের।

দেখুন মশাই, পড়তে আসা হয়েছে, পড়ায় গাফিলতি করবেন না। বাবা বাড়ি বেচে, জমি

বেচে, পেনসনের টাকা ভাঙ্গিয়ে পড়তে পাঠিয়েছেন, যে ছেলে বিলেতে থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে চিত্তরঞ্জন দাস হয়ে ফিরবে, বৃদ্ধ বয়সে তাদের দয়া করে কষ্ট দেবেন না। অবশ্যি, তাঁরা সেকালের লোক, তাঁদের ধারণা মহাত্মা গান্ধীর মতো, মহম্মদ আলী জিন্নার মতো সব ছেলেই ব্যারিস্টার হয়ে, বক্তা হয়ে, রাজনীতি করে, কেউকেটা হয়ে বসবে। সেদিন যে আর নেই, এখন যে দেশে রাজনীতি করছে উকিল মোক্তার আর কন্ট্রাকটর, তাঁদের সেটা চোখেই পড়ে না। তা যাকগে মশাই, সকলেই একটা জায়গায় ফেঁসে যায়, একটা ধারণা মাথায় বসে যায়, আপনাদের বাবাদের আর কী দোষ দেব।

খেতেও পারেন মি. সেন। ঐটুকু বলবার ফাঁকেই আস্ত আধখানা মুরগির তন্দুরি সাবাড় করে ফেলেছিলেন, হাত বাড়িয়েছিলেন ভূনা ভেড়ার মাংসের পুরো বাটিটার দিকে।

কথা শুনে আর খাবার বহর দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল অমিত আর বেলাল।

সে কী মশাই, আপনারা খাচ্ছে না ? খান, খান। থাকেন তো বেড-সিটারে, খান নিজের হাতে রান্না করা ডাল আর ডিমভাজা; নয়তো ফিশ ফিঙ্গার আর বিফ বার্গার। খান, ভালো করে খান। হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কাজের কথা নয়। বাঙালির সুনাম নষ্ট করবেন না। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে পড়েন নি ?— গায়ে তেল মেখে পুকুরে চান করতে যাবার আগে দেড়কাঠা মুড়ি আধসের খেজুর গুড় দিয়ে খেয়ে বাবু গেলেন চান করতে। এসে তিনপো চালের ভাত আর সেই পরিমাণ মাছ। কোন বইয়ে বলুন তো ? পড়েন নি ? কী পড়েছেন তাহলে ? এই আমাদের এক মহৎ দোষ, জানলেন। এদেশে এসে সাহেব হয়ে তো যাইই, দেশে থাকতেই ইংরেজি উপন্যাস ছাড়া পড়ি না। তা যাকগে, খান, আগে খেয়ে নিন, দুটো কথা বলব, শুনতে মিঠে লাগবে না, আপনাদের দেখে ভালো লেগেছে, না বললেও শান্তি পাবো না। আগে খেয়ে নিন জমাটি করে।

কী কথা বলবার জন্যে এত ভূমিকা, অমিত-বেলাল বুঝতে পারছিল না। সহজ হয়ে বসে থাকতে পারছিল, সে কেবল পেটে খানিক ওয়াইন যাবার কৃপায়। খাওয়া শেষে চিমনি গেলাশে ব্র্যান্ডি নিয়ে মি. সেন একবার অমিতের দিকে, একবার বেলালের দিকে সহাস্য তাৎপর্য নিয়ে তাকালেন।

ভাবছেন, মি. সেন না জানি কোন তেতো কথা বলেন। হয়ত ভাবছেন, রাজনীতি। শুনে দেখবেন, বাঙালি সমাজে এখানে অনেকেই বলে, মাস্টারি নাকি একটা ভাঁওতা, আসলে আমি ইন্ডিয়ান হাইকমিশনেই আছি, ভোল পালটে গুপ্তচরগিরি করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ এ রকম কথা শুনবেন। পাকিস্তানিরা বলে আমি নাকি ঢাকার ছেলেদের মাথায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঢোকাচ্ছি, পাকিস্তান ভাঙ্গবার জন্যে তাদের তৈরি করে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছি। তবে, মিথ্যে বলব না, দেশে আমি সব ছোকরাকেই যেতে বলি, আর এটাও বলব আপনাদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে এক মায়ের দুই ছেলে ; আপসোস হচ্ছে, হায়রে বাঙালি যদি এক থাকতে পারত, কিন্তু এক থাকবে কী করে ? এই তো আমার বাপ-পিতামো ছিলেন ময়মনসিংহে, জমিদারি ছিল; দেখেছি তো, মুসলিমদের কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন গুরুজনেরা ? মুসলিম চাষার ছেলে লেখাপড়ায় একটু ভালো হলেই দাদুকে দেখেছি মশাই, ধরে এনে চাষের কাজে লাগিয়ে দিতেন। তা তারা যদি পাকিস্তান চায় তো তাদের দোষ ? আমি বলি বাঙালি হিন্দুর শিক্ষা হচ্ছে, আরো হোক। হিন্দিওয়ালাদের হাতে মার খেয়ে লাথি খেয়ে শিক্ষা হোক তারা কী করে ছিল মুসলিমদের। তা যাকগে রাজনীতি। চাণক্য সেনকে স্পাই বলে বলুক লন্ডনের বাবুরা, যত পারে বলুক, আমি মশাই ইস্কুলে পড়াই, বাড়ি ফিরে বোতল খুলি, ব্রাহমস-বেঠোফনের মিউজিক শুনি, কবিতা লিখি, তাতেই আমার সুখ।

আরেক পাত্র ব্র্যান্ডির জ[illegible]নিয়েছিলেন মি. সেন। আসল কথায় তখনো আসেন না। ব্র্যান্ডি এলে, চিমনি-গেল[illegible]তের তেলোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেশ গরম করে, তারিয়ে একটা চুমক দিয়ে বলেছিলেন,[illegible] খাবেন বডি টেম্পারেচারে। তবে মশাই, এসব বেশি শিখবেন না। পড়তে এসেছেন[illegible], পাশ করবেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। ব্যাস। কম দিন তো হলো না,[illegible]বছর লন্ডনে। বাঙালি যারাই পড়তে আসে, তাদের এক ডজনের ভেতরে দু'জন ফ[illegible]রে পাশ করে দেশে ফিরে যায়। তার বাকি দশজন ? শুনুন তাহলে। বিলেত বাসের[illegible] 'ফেজ' তাদের। হাসবেন না, মন দিয়ে শুনে যান, কপাল খারাপ থাকলে নিজে[illegible]নই দেখবেন চাণক্য সেন ঠিক বলেছিলো।

তিনটে ফে[illegible]কম ? দুরুদুরু বুকে জানতে চেয়েছিলেন বেলাল। তার বাবা তাকে বিলেতে পড়তে প[illegible]লেন ধানের জমি বিক্রি করে। বাবার কথা মনে পড়েছিল, মাকে তিনি বলেছিলে[illegible]লাল ফিরে এসে আবার জমি করবে ব্যারিস্টারির টাকায়।

তিনটে[illegible] কী রকম ? সেই কথাই তো বলছি। শুনলে তেতো লাগবে। আপনাদের জীবনে না হ[illegible]গবান না করুন, সেই জন্যেই তো ধরে বেঁধে বসালুম আপনাদের। পয়লা ফেজ, ধরুন[illegible]র তিন-চার। বাবা টাকা পাঠাচ্ছেন, আপনিও পড়ছেন। কিন্তু আসলে কী পড়ছেন ? বন্ধু[illegible]ছে, দেশে ছাত্র থাকা কালে যে স্বাধীনতা পান নি সেই স্বাধীনতা পেয়েছেন, মদ ধরে[illegible] হয়ত বান্ধবীও জুটেছে; ভাবছেন, এবার প্রিপারেশন ভালো হয় নি, সামনের যাত্রায় প[illegible]দেব। কিন্তু পরীক্ষা আর আপনার ঐ তা-না-না-না করে দেয়া হলো না। এদিকে, বা[illegible]কা বন্ধ করে দিলেন। তিনি তো আর টাটা-বিড়লা নন মশাই। আপনি তখন পুরনো ব[illegible]ছে গিয়ে পড়লেন বুদ্ধির জন্যে। আসলে, এই পুরনো বন্ধুগুলো হচ্ছেন কুনকে হাতি। [illegible]খেদায় আটকে পড়া বুনো হাতিকে যারা দলে টানে, সেই নচ্ছার এগুলো। পুরনো বন্ধু [illegible]কে সাহস দিলেন, মাংস রান্না করে খাওয়ালেন, বিয়ার খাওয়ালেন আর বললেন— [illegible] চাকরি ধরো, টাকা জমিয়ে সেই টাকায় একটা বছর চোখ বুঝে নাক-কান গুঁজে [illegible]শোনা করে পরীক্ষা দাও। আপনার পছন্দ হয়ে গেল কথাটা। আশার আলো দেখতে [illegible]ন। লেগে গেলেন চাকরিতে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল লন্ডনে আপনার ছাত্র জীবনের দ্বিতীয় [illegible]। কোথা দিয়ে যে তিন-চার-পাঁচ বছর বেরিয়ে গেল, আপনি টেরও পেলেন না। লক্ষ [illegible] দেখেছি, এই দ্বিতীয় ফেজের শেষ দিকে, মানে, আপনার বিলেত বাস যখন বছর [illegible]াতেক হয়ে গেছে, তখন মনে একটা অনুতাপ আসে; দেশের জন্যে খুব একটা টান হয়। [illegible] হয়, হায়রে, অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, বাবা-মার মন ভেঙে দিয়েছি, এবার যে জন্যে [illegible]সছি সেই কাজ করতে হয় অর্থাৎ পড়ে একটা পাশ করতে হয়। কিন্তু চাকরি করে টাকা [illegible]মিয়ে যে পড়া যায় না, সেটা ততদিনে আপনার মালুম হয়ে গেছে। আপনি চারদিকে চোখ [illegible]লিয়ে দেখলেন, অনেকে যা করেছে, আমিও তাই করি না কেন ? বুঝতে পারলেন না ? [illegible]শে গিয়ে বিয়ে করে, বৌকে এদেশে চাকরিতে ঢুকিয়ে সেই টাকায় লেখাপড়া করবার চেষ্টা করেছে অনেকে। আপনারও অগতির গতি। বয়সও হয়েছে, বিয়ের বাজনাটাও বেশ লোভনীয় মনে হচ্ছে, আপনি ধারধোর করে রওয়ানা হলেন দেশের দিকে। শুরু হলো আপনার তিন নম্বর ফেজ। আমাদের দেশে নিতান্ত অভিশাপ না থাকলে তো কেউ আর মেয়ের বাপ হয় না, মশাই। মেয়ের বাপ আপনাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। এমন সোনার চাঁদ ছেলে, এমন ভবিষ্যৎ, আজ বাদে কাল ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে ফিরবে, এমন ছেলে হাতছাড়া করা যায় ? হয়ে গেল আপনার বিয়ে। ফিরলেন বৌ নিয়ে লন্ডনে।

বৌকে জল ধরালেন, মানে মদ, ধোঁয়া ধরালেন শখ করে, মানে সিগারেট; একটু আধটু নাচেও টানলেন, বৌটি বেশ সড়গড় হয়ে উঠল, সুন্দরী হলে তো কথাই নেই— পপুলার, আর আপনি তখন তিন নম্বর ফেজের মধ্যগগনে। বৌ চাকরি করছে, রান্না করছে, আপনাকে খাওয়াচ্ছে, আপনি ইভনিং ক্লাশে যাচ্ছেন, ফিরে এসে বাড়িবাড়ি নেমতন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধীর নিকুচি করছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র আদৌ আসবে না বলে বুক চাপড়াচ্ছেন। আসলে, দেশ যে কত খারাপ সেখানে আদৌ ফিরে যাওয়া যায় না, এই রক্কমটা নিজেকে বোঝাচ্ছেন। তারপর ?

নাটকীয়ভাবে থেমেছিলেন মি. চাণক্য সেন।

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে ছিল বেলাল আর অমিত।

আপনারা কী করে বলবেন ? আপনারা তো আর দেখেন নি, দেখেছি আমি। তারপর, তিন রকম আছে। এক, বৌয়ের গুঁতোয় সত্যি সত্যি পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে যায়। দুই, পরীক্ষা আর দেয়া হয় না, দেশেও কালোমুখ দেখাতে সাধ হয় না, দু'জনেই বিলেতে প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা বাড়ায় আর মিনি-প্রবাসী উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিন, নিজের ভবিষ্যৎ আর বৌ দুটোই হারায়।

বৌ হারায় কী রকম ?

কেউ ভাগিয়ে নিয়ে যায়। বাড়িতে খরচ কুলাবার জন্যে একটা ঘর ভাড়া দেয়া হয় কোনো অবিবাহিত ছাত্রবন্ধুকে। স্বামীর পড়াশোনা নিয়ে খিটিমিটি, ভালোবাসা কর্পূর। তখন বন্ধুটির সহানুভূতি মিঠে মনে হয়, রান্নাঘরে গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি, একটু ড্রিংক করে হাত ধরে টানাটানি, একসঙ্গে অ্যাডালট মুভি, ব্যাস, আর চাই কী। জানাজানি হয়ে গেলে ছাড়াছাড়ি; জানাজানি না হলে আরো চমৎকার, পাণ্ডবের সংসার।

রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক। রেস্তোরাঁ বন্ধ করবার সময়। পথে বেরিয়ে মি. সেন বলেছিলেন, ঘাবড়ে গেলেন না তো, মশাইরা। ভালো ভেবেই বললাম। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। আমার কী মশাই। আমার পড়তেও নেই, বিয়ে করতেও নেই। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে বলেই, আর আপনাদের দেখে আমার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় বলেই, না বলে পারি না। নতুন এসেছেন, ঠিক ঠিক পা ফেলে চলবেন। ঐ যে তিন ফেজের কথা বললাম, তার একটাও যেন আপনাদের জীবনে যেন না আসে, হুঁশিয়ার থাকবেন।

মি. সেনের নিজের জীবনটা খুব জানতে ইচ্ছে করেছিল বেলালের। কিন্তু কী করে একটা হঠাৎ-আলাপ-হওয়া মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় ?

বিয়ে করেন নি কেন ? বিলেত ছেড়ে নিজে তিনি দেশে ফিরে যান নি কেন ? তারও কি কোনো কাহিনী আছে ?

সাকিনার যখন কোনো সাড়া নেই, সাকিনাকে যখন সে তার ভালোবাসার কথা বলেছে, সে যখন অন্ধকারে নিজের ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তখন মি. চাণক্য সেনের ঐ শেষ কথাটা বিদ্যুতের মতো তার মনে পড়ে গিয়েছিল। বন্ধু স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার কথাটা। কিন্তু, এই মুহূর্তে তারো চেয়ে বড় হয়ে মনে পড়তে লাগল মি. সেনের নিজের কী হয়েছিল তা জানা হয় নি। বহুবার এরপর দেখা হয়েছে, কিন্তু কখনোই কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি।

৯

বাবুলের শোবার ঘরে আফ্রিকা ছায়া ফেলে আছে।

দেয়ালে দুটো প্রকাণ্ড ঢাল ; তাদের গায়ের খয়েরি আর চুনশাদা রঙে জ্যামিতিক নকশা আঁকা। দুটো ঢালের মাঝখানে লম্বা দুটো বর্শা ক্রস করে রাখা। জানালার পর্দায় আকাসিয়া গাছের প্রিন্ট। মেঝের দুধসর রঙের কার্পেটের ওপর পাতা ঘন ধূসর ভালুকের ছাল। ঘরের এক কোণে রাখা কাঠের খোলে তৈরি আফ্রিকার দুটো ঢোল, এ দুটো আবার কাজ করে রেকর্ড প্লেয়ারের স্পিকার হিসেবে। বিছানার কভারে বাঘের গায়ের ডোরা কাটা।

নিগ্রো এক তরুণীর সঙ্গে বাবুল কিছুকাল ছিল। তারই প্রভাব এখনো বাবুলের শোবার ঘরে। এশিয়ার মানুষ যাদের বলা হয়, তামাটে রঙের মানুষ, তাদের সঙ্গে নিগ্রো মেয়ের সম্পর্ক কেন, নিগ্রো ছেলেদের বন্ধুত্বও একটা অতি বিরল ব্যাপার। এক ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাস আছে, তার চেয়ে দুঃখের, আছে ঘৃণা। তামাটের পাশ থেকে বাসে-ট্রেনে অনেক সময় শাদারা যেমন উঠে যায়, নিগ্রো এসে বসলেও সেই একই অস্বস্তিতে উঠে যায় তামাটেরা। বাঙালিরা যখন দুঃখ করে বলে, শাদারা তাদের পছন্দ করে না, বাবুল তখন প্রায়ই বলে, 'এতে অবাক হচ্ছো কেন ? তুমিও তো আফ্রিকার ভূষোকালো মানুষ দেখলে পালাই-পালাই করো আর বলো যে গায়ে তাদের মোষের মতো দুর্গন্ধ।'

বাবুলের আফ্রিকান মেয়েটি ছিল বায়াফ্রার। সেখানে গৃহযুদ্ধের সময় মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। লন্ডনে অভাবের তাড়নায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় পরিবার, মেয়েটি এসে ওঠে বাবুলের কাছে।

বাবুল তাকে বিয়ে করবার কথা কখনো ভাবে নি। বাবুল বলত, এত করেছি কালোই বা বাদ থাকে কেন ?

কাশেম যখন বিয়ে করে এলো, এখানে রিসেপশন দিল, তখন বাবুল এসেছিল বায়াফ্রার মেয়েটিকে নিয়ে। মেয়েটি কি গভীর কৌতূহলের সঙ্গে সাকিনাকে দেখছিল, দেখছিল তার বিয়ের গয়না, লাল শাড়ি আর হাতের মেহেদি।

এখনো আবছা মনে পড়ে মেয়েটির কথা। বাবুলের কি মনে পড়ে ?

কী করে বাবুল পারে একটি মেয়ের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থেকে, অবলীলাক্রমে তাকে ভুলে যেতে ? বিছানায় কি জড়িয়ে থাকে না ঘ্রাণ ? হৃদয়ে কি কোনো স্মৃতি ?

সাকিনাকে সেও কি ছেড়ে থাকতে পারবে ? আর, অন্য কোনো মেয়ের শরীরে অন্ধকারে হাত দিয়ে কি তার মনে হবে না, কী ভীষণ অচেনা ?

কাশেমের মাথায় হাত রাখলো ক্রিস্টিনা।

কে ?

আমি ক্রিস্টিনা। নিদ্রা যাইতেছ ?

কাশেম কোনো উত্তর করল না।

ক্রিস্টিনা জিজ্ঞেস করল, এখন কীরূপ বোধ করিতেছ ?

কাশেম চুপ করে রইল।

আমি তবে যাই।

কাশেম তার হাত ধরল। জানতে চাইল, পার্টি শেষ ? ক'টা বাজে ?

কেউ কেউ এখনো রহিয়া গিয়াছে। সেই পাষণ্ড ব্যক্তি যাহার সহিত তোমার বিতণ্ডা হয়, সে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি বর্তমানে বারোটা উত্তীর্ণ।

রাত বারোটা শুনে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করল কাশেম— যেন এক্ষুণি তার বাড়ির দিকে যাত্রা না করলেই নয়। কিন্তু আধো উঠে বসেই আবার সে ঢলে পড়ল বিছানায়। মাথাটা ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে, আর, না সে যাবে না, সাকিনার কাছে যাবে না। এখন থেকে সে একা। তার যা খুশি সে করবে, কারো কথা ভেবে সে কিছু করবে না।

ক্রিস্টিনা, তোমার কথা কিছু বলো।

ক্রিস্টিনার হাত সে ছেড়ে দিল না, নিজের মুঠোর ভেতরে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। ঘরের ভেতরে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে, দেয়ালে ঝোলানো আফ্রিকান একটা মুখোশের ভেতর থেকে। সেই মুখোশের কাটা দুটো চোখ আর ঠোঁটের ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ছে মৃদু আলো। সে আলোয় চেনা কিছুও অচেনা হয়ে যায়, আর অচেনা তো স্বপ্নের মতো মনে হয়।

ক্রিস্টিনার হাত টেনে কাশেম নিজের কপালের ওপর রাখল। অস্ফুট স্বরে বলল, তোমার হাত কী ঠাণ্ডা। খুব ভালো লাগিতেছে।

অনেক হুইস্কি পান করিয়াছ।

সারাদিন।

দুষ্ট ছেলে।

তোমার হাত ভালো লাগিতেছে।

হঠাৎ সাকিনার কথা মনে পড়ে গেল তার। মাঝে মাঝে রাতে সাকিনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, যখন ঘুম আসে না; আর তখন গুনগুন করে গান করে সাকিনা।

ক্রিস্টিনার হাতটা হঠাৎ ফেলে দিল কাশেম।

কী হইল?

সাকিনাকে সে আঘাত করবে। কাশেম ক্রিস্টিনার হাত এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতনভাবে ধরল, এনে রাখল নিজের কপালে।

তুমি আমাকে আঘাত করিতেছ।

ভীষণ জোরে চেপে ধরছিল সে হাত। মুঠো আলগা করে দিল কাশেম।

কেন এ ঘরে আসিলে, ক্রিস্টিনা?

বাবুল বলিল তোমাকে দেখিতে।

বাবুলের সব সথা তুমি শুনিয়া থাকো?

উহার অর্থ?

বাবুল যদি কহিল আজ রাত্রে হস্টেলে ফিরিতে পাইবে না, থাকিয়া যাইবে?

হস্টেল এতক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাবুল যদি কহিল আর কক্ষনো জার্মানি ফিরিয়া যাইতে পারিবে না, ফিরিবে?

জার্মানিতে আমার বাবা মা রহিয়াছে না? ভাই রহিয়াছে না?

আর কে রহিয়াছে?

আর কেহ নয়।

ক্রিস্টিনা এখন নিজেই গা মাথা গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কাশেমের শরীর থেকে এক চিমটি চামড়া তুলে নিয়ে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে খেলা করছে।

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে পড়ল ঘরে। দরোজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বাবুল।

কাশেম ?

কী রে ?

ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে কাশেম।

থাক, থাক, উঠতে হবে না। শুয়ে থাক। বাংলায় বলে বাবুল। লজ্জা পাচ্ছিস ? লজ্জা করে কী হবে ? আর বিরক্ত করব না, চালিয়ে যা।

বাংলায় কাশেম বলল, কখনো এসব করি নি। কেমন লাগছে।

শ্যালা, ন্যাকামি হচ্ছে ?

সত্যি বলছি। কক্ষনো করি নি।

বৌয়ের সঙ্গে তো করেছিস ? একই ব্যাপার।

কাশেমের মনে পড়ে যায়, বাবুল সব সময়ই সাকিনা যে সুন্দরী সে কথাটা উল্লেখ করে। বাবুলের কী ইচ্ছে হয়, এখন হচ্ছে, সাকিনার জন্যে ?

বাবুল বিছানার কাছে এসে, পাশের ছোট্ট টেবিলের দেরাজ খুলে, ক্রিস্টিনাকে আড়াল করে, চকচকে এতটুকু একটা প্যাকেট বার করল। ইংরেজিতে একে বলে— ফরাসি চামড়া ; আর ফরাসিরা বলে— ইংরেজের ওভারকোট। প্যাকেটটা হাত আড়াল করে কাশেমকে দেখিয়ে, এক চোখ টিপে, বালিশের নিচে রেখে দিতে দিতে বাবুল বলল, শালা, লাগতে পারে। অমনি ফাঁসিয়ে দিও না, ঝামেলায় পড়বে। এ মাগিরা এমনিতে ভালো, অমনিতে রক্ত চুষে ছাড়ে।

ক্রিস্টিনার দিকে তাকিয়ে বাবুল ইংরেজিতে বলল, আমার বন্ধুটিকে দেখিও। বেচারা বড় একা বোধ করিতেছে।

আস্তে করে দরোজা ভেজিয়ে বাবুল একটু বেসামাল পায়ে বেরিয়ে গেল।

ক্রিস্টিনা বাংলা বোঝে না, 'মাগি' শব্দের তাৎপর্য সে কল্পনাও করতে পারবে না ; তবু কাশেম ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করতে লাগল। ক্রিস্টিনার দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না অনেকক্ষণ। তার কেমন মায়া করতে লাগল এই বিদেশী মেয়েটির জন্যে— যার বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে, তাদের কথা লন্ডনের এই ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে বসে, সুরা সঙ্গীত আর ফরাসি চামড়ার ভেতরে থেকেও যে মেয়ে ভাবছে।

কী ভাবিতেছ ?

ক্রিস্টিনার কথায় আরো লজ্জা পেল কাশেম।

না, কিছু নহে।

মাথাটা ভীষণ ভারী লাগছে কিন্তু মাথা এলিয়ে দিতেও, ক্রিস্টিনার উপস্থিতিতে, এখন তার খুব সঙ্কোচ হতে লাগল।

ক্রিস্টিনা বলল, তোমার কপাল খুব উষ্ণ দেখিলাম। অপেক্ষা করো।

সে হাতব্যাগ খুলে একটা রুমাল বের করে, পাশের-টেবিলে রাখা পানির বোতল থেকে ভিজিয়ে কাশেমের কপালে চেপে ধরল। বলল, এত হুইস্কি পান করিতে নাই।

ভারী আপন মনে হলো মেয়েটিকে। কাশেম তার কোলের 'পরে হাত রাখল। ক্রিস্টিনার পরনে

জীন ; তাই তার শরীরের কোমলতাটুকু এসে পৌঁছুলো না কাশেমের হাতে, কেবল মনে হলো সুগোল একটা নলের গায়ে হাত রেখেছে সে।

ক্রিস্টিনা বলল, জানো আমার বাবা অত্যন্ত হুইস্কি পান করে। এই লইয়া মার সঙ্গে প্রত্যহ কলহ। বাবা মাকে প্রহার করে। আমাকে প্রহার করে, গুনটারকে প্রহার করে।

গুনটার কে ?

আমার ভাই। গুনটার এখন মানসিক হাসপাতালে।

মানসিক হাসপাতালে কেন ?

আমাদের বাড়িতে কেহ সুস্থ থাকিতে পারে না।

ইংরেজি ভালো জানে না ক্রিস্টিনা, মাঝে মাঝে ভুল শব্দ ব্যবহার করছে, কখনো জার্মান শব্দ, কখনো চুপ করে থাকছে কথার মাঝখানে— শব্দের অভাবে ; তবুও সব মিলিয়ে একটা সাঁকো দাঁড়িয়েছে, হোক তা দুর্বল এবং সরু, ভাবনার পারাপার চলছে।

কাশেম একবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ল্যাংগোয়েজ ল্যাবরেটরিতে বিদেশী কোনো ভাষা শেখার কথা ভাবছিল। তখন যদি জার্মান শিখত তাহলে আজ ক্রিস্টিনার কথাগুলো আরো স্পষ্ট করে সে বুঝতে পারত, সে তার নিজের ভাষাতেই কথা বলতে পারত।

গুনটার কতদিন হাসপাতালে ?

দেড় বৎসর।

নিরাময় হইবে না ?

নিরাময় হয়, আবার অসুস্থ হয়।

আবার রুমাল ভিজিয়ে ক্রিস্টিনা চেপে ধরল কাশেমের কপালে।

আরাম ?

হুঁ ?

এত হুইস্কি পান করিও না। আমার বাবাকে দেখিয়াছিতো ? কী ভীষণ বাজে নেশা। প্রভাতে হুইস্কি পান না করিলে শীতেও ঘাম ঝরিতে থাকে। বাবার অপর নেশা ঘোড়া। ঘোড়াদৌড়। ইংরেজিতে কী বলে জানি না, খেলাটার একটা নাম রহিয়াছে। ঘোড়ার পিছনে ছোট খোলা গাড়ি, অনেকটা রথের অনুরূপ। সেই রথে বসিয়া ঘোড়া ছুটাইতে হয়। জার্মানিতে সবার খুব পছন্দ। বহু লোকে বাজি ধরে। আমার বাবা ঘোড়াকে ট্রেনিং দেন, রথে চড়িয়া ছোটান। তবে নিজের ঘোড়া তো নহে ; বাজির পয়সা পায় ঘোড়ার মালিক। আমার বাবা শুধু মাহিনা পান, আর জিতিলে কমিশন। ছবি দেখিবে বাবার ?

ক্রিস্টিনা হাতব্যাগ থেকে জার্মান একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করে দেখালো। মধ্য বয়সী বিরলকেশ এক ভদ্রলোক রথে বসে আছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু লোক।

সেবার বাৎসরিক দৌড়ে আমার বাবা ফার্স্ট হইয়াছিলেন।

গর্বে জ্বলজ্বল করে ওঠে ক্রিস্টিনার মুখ। তখন মনে হয়, কাশেম এই মেয়েটিকে যেন একটা জীবন জুড়ে চেনে।

আমার বাবা কী বলেন জানো ? বলেন, মরিয়া গিয়া আরেক জন্মে আমি ঘোড়ার পিঠের জিন হইতে চাই ?

বাঃ, মজার তো ?

জিন কেন জানো ? বাবা বলেন, ইহাতে আমার সারা জীবনের নেশা ঘোড়ার পিঠের উপর থাকিতে পারিব। আর সে ঘোড়ায় কোনো রমণী চড়িলে তাহার নিতম্বের নিচে থাকিতে পারিব। বাবার দ্বিতীয় নেশা, রমণী।

খুব লজ্জিত দেখালো ক্রিস্টিনাকে।

মাকে লইয়া বাবা যে কেন সুখী নন, জানি না।

আবছা করে কাশেমের নিজের কথা মনে পড়ল, বাবা-মার কথা মনে পড়ল। তার নিজের মা সুখী না অসুখী ? আশ্চর্য, কোনোদিন এ প্রশ্ন তার মনে আসে নি। মা, মা ; বাবা, বাবা ; তাদের ভেতরে সুখ-অসুখের কোনো অবকাশ থাকতে পারে, এটা যেন ছেলেমেয়ের মনেই আসে না।

সে নিজে কি সাকিনার সঙ্গে সুখ পেয়েছে ?

সাকিনাকে যখন সবাই সুন্দরী বলত, তাকে ঈর্ষা করত, তখন এক প্রকার সুখ হতো, তার মনে পড়ে যায়। এখন কেউ 'সুন্দরী' বললে কাঁটার মতো বেঁধে। একটা বিকেলে নিজেকে ভারী সুখী মনে হয়েছিল। সেদিন খুব বিষ্টি হচ্ছিল। সেদিন কোনো বন্ধুর টেলিফোন আসছিল না। সেদিন বাড়ির কাজ করতে, রান্না করতে ইচ্ছা করছিল না। সাকিনা বলেছিল, চলো, আজ আমরা দুজনে খুব সেজে কোনো রেস্তোরাঁয় যাই। সাকিনা সেদিন ভীষণ সেজেছিল, ঠিক বিয়ের দিনের মতো। লাল শাড়ি, সব গয়না। আর কাশেম নিজে পরেছিল তার তুলে রাখা কালো ভেলভেটের সুট। দু'জনে গাড়ি করে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। 'চলো, অনেক দূরে কোথাও যাই।' চার নম্বর মোটরওয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যেত ব্রিস্টল কিংবা কারডিফ। 'যাবে ? যাই ?' 'না, সাকিনা ; সে অনেক দূর। বেশি পাগলামি হয়ে যাবে।' এয়ারপোর্টের তিন নম্বর ডিপারচার লাউঞ্জ, যেখান থেকে আন্তঃমহাদেশীয় বিমানগুলো যাত্রা করে, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারা। 'দেশে যেতে ইচ্ছে করছে'। 'যাবো, একদিন আমরাও যাবো। এই ডিপারচার লাউঞ্জে একদিন, শিগগিরই একদিন যাবার জন্যে আসব।' তারা বসেছিল লাউঞ্জের ওপরতলায় রেস্তোরাঁয়। সেদিনটা ভারী সুখী মনে হয়েছিল নিজেকে। অথচ এমন কিছু কারণ ছিল না সুখী বোধ করবার।

সুখবোধ তাহলে সম্পূর্ণ নিজের ভেতরে ? বাইরের কোনো কারণ বা আয়োজনের দরকার করে না।

সুখ কি একটা সুন্দর সম্ভাবনার দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা মুহূর্তের নাম ?

ক্রিস্টিনা কাছে। এখন তার মনে হচ্ছে, সে সুখী।

দরোজায় টোকা পড়ল। ক্রিস্টিনা টুক করে কাশেমের কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একটু সরে বসল। দরোজা আধো খুলে কৌতূহলী মুখ বাড়িয়ে দিল বাবুল।

শালা, এখনো কিছু না ?

শোন, শোন। কাশেম তাকে ভেতরে ডাকল, কিন্তু সে এলো না।

বড্ড টাইম নিচ্ছিস রে।

ক্লিক করে দরোজা বন্ধ করে বাবুল চলে গেল।

কী বলল ? জানতে চাইল ক্রিস্টিনা।

মিছে করে কাশেম বলল, আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিল।

এখন আর খারাপবোধ হইতেছে না ?

না। মাথাটা কেবল ধরিয়া রহিয়াছে।

ক্রিস্টিনাকে কাছে টানল কাশেম। সে সরে এলো কাছে। আরো কাছে টানল। আরো কাছে এলো ক্রিস্টিনা। একেবারে কাশেমের বুকের কাছে তার কোমর এসে পড়ল। তার কোমর জড়িয়ে হাত রাখল কাশেম। ক্রিস্টিনা একবার নিজের পা থেকে বুক পর্যন্ত দেখে কাশেমের কপালে ভেজা রুমালের ওপর হাত রাখল। বাবুল যত উস্কানি দিচ্ছে, কাশেমের ততই মায়া বাড়ছে মেয়েটি জন্যে।

লন্ডনে তুমি কী করিতেছ, ক্রিস্টিনা ?

ইংরেজি শিখিতেছি।

ইংরেজি শিখিয়া কী করিবে ?

আমার কাজে লাগিবে।

জার্মানিতে ইংরেজি কী কাজে লাগিবে ?

ক্রিস্টিনা হেসে ফেলল। মিথ্যা কথা বলিতেছি, ইংরেজি জানিলে কাজের অনেক সুবিধা আছে। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করা যায়, এয়ারপোর্টে কাজ করা যায়, পোস্টাপিসে, আন্তর্জাতিক টেলিফোনে কাজ করা যায়।

তুমি কোথায় কাজ করিবে ভাবিতেছ ?

আমি ম্যাসার হইতে চাই।

ম্যাসার ? সে আবার কী ?

জানো না বুঝি ? এত চমৎকার ইংরেজি বলো, ম্যাসার বোঝো না ?

ক্রিস্টিনা হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আফ্রিকান মুখোশের কাটা চোখ— ঠোঁটের ভেতর থেকে চুইয়ে পড়া আলোয় এই প্রথম একাকী ঘরে একটা মেয়ের মতো হলো মনে ক্রিস্টিনাকে— যে মেয়ে একজন পুরুষের শরীর ঘেঁষে বসে আছে, যার দুধফর্সা হাত কামড়ে দেখতে ইচ্ছে করছে— সত্যি কি-না।

কিন্তু সেই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি হলো কাশেমের। একটু ভয়ও করল। সে কখনো কোনো মেয়েকে এমন একটা একা ঘরে এতটা কাছে পায় নি। বাবুল আর অন্য কারো কারো কাছে সে শুনেছে শাদা মেয়ে সহজলভ্যা ; শুনেছে, তারা শরীর দিতে কুণ্ঠিত নয়, মুহূর্তের ভালো লাগার উপহার হিসেবে। তার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সাহসও হয় নি কখনো। তার জীবনে সাকিনাই প্রথম মেয়ে।

গ্লানিটুকু মুছে ফেলতে চেষ্টা করল কাশেম। প্রায় বিশ্বাসও হলো, এরা সহজলভ্যা। নইলে হাত ধরে টানলে কাছে আসবে কেন ? একা ঘরে শায়িত একটা পুরুষের কোল ঘেঁষে বসবে কেন ? ক্রিস্টিনা যদি রাজি থাকে, ক্রিস্টিনার তো বয়স হয়েছে, তাহলে গ্লানি কোথায় ? সাকিনার জন্যে ? সাকিনার মুখখানাও এখন ভালো করে মনে করতে পারে না কাশেম— পাঁচ বছর বিবাহিত কাল কাটিয়ে দেবার পরও, প্রতিটি দিন একসঙ্গে থাকবার পরও। কাশেম আবারো তাকিয়ে দেখে ক্রিস্টিনার দুধফর্সা হাত। নিজেকে জয় করবার চেষ্টা করে। সাকিনা তাকে আঘাত করছে, এখন তার পাল্টা অধিকার আছে সাকিনাকে আঘাত করবার। তার নিজের যা ভালো লাগে সে এখন থেকে তাইই করবে, সাকিনা যদি পারে নিজের ভালো লাগার ক্ষেত্র খুঁজে নিক। সে তাতে এতটুকু কিছু মনে করবে না।

ম্যাসার বোঝো না ? ইহা বোঝো ?

ক্রিস্টিনা হঠাৎ উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাশেমের দুটো কাঁধ দ্রুত কোমল দুটি হাতে টিপে দিতে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেল কাশেম। তাহলে কি সত্যি যে এরা অচেনা পুরুষের গায়ে হাত দিতে দ্বিধা করে না? ভালো লাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে?

কাশেম তার হাত দুটো খপ করে ধরে ফেলল ; বুঝতে পারল না, কী তার করা উচিত। একবার যেন নিজের বুকের ওপর টানবার চেষ্টা করল সে ক্রিস্টিনাকে, কিন্তু সাহস হলো না, আকর্ষণ ঢিলে করেছিল, বরং হাত ছাড়িয়ে দিল সে ক্রিস্টিনার।

ইহাকে কী বলে? ম্যাসাজ। ক্রিস্টিনা বাচ্চা ছেলেকে বোঝাবার মতো করে বলল, ম্যাসাজ করিবার ডিগ্রি আছে আমার।

এতক্ষণে কাশেমের মনে পড়ল, ম্যাসাজ যারা পেশাগতভাবে করে তাদের বলে ম্যাসার। সে জানতে চাইল, ইহার জন্যে ইস্কুল আছে নাকি?

নিশ্চয়ই আছে। অ্যানাটোমি ফিজিওলজি পড়িতে হয়। নহিলে জানিবে কী প্রকারে, কীভাবে ম্যাসাজ করিতে হয়?

তুমি ম্যাসার?

হ্যাঁ। কিন্তু কী জানো, নামকরা ম্যাসাজ-পারলরে কাজ পাইতে হইলে বিদেশী ভাষা জানা চাই। ফরাসি জানি ; এখন ইংরেজি শিখিতেছি। দেশে গিয়া কাজ লইব। ভাগ্যে থাকিলে কখনো নিজে ম্যাসাজ পারলর খুলিতে পারিব।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল ক্রিস্টিনা।

কাশেম নিজেই অবাক হয়ে গেল, যখন সে দেখল এতক্ষণ সে ক্রিস্টিনার হাতের ওপর হাত ঘষে খেলা করছে। হাতটা ছেড়ে দিল সে। আবার নিল একটু পরে। ক্রিস্টিনা তাকে খেলা করতে দিল কিছুক্ষণ। উঠে বসতে চেষ্টা করল কাশেম কিন্তু মাথাটা তখনো ঘুরছে। আবার সে শুয়ে পড়ল। একবার ওঠার চেষ্টায় তার চোখ এখন ঝাপসা মনে হলো। চারদিকের সব কিছু কেমন উধাও হয়ে গেল। মনে হলো, সারা বিশ্বে ক্রিস্টিনা আর সে ছাড়া আর কেউ নেই। আরো মনে হলো, ক্রিস্টিনার সঙ্গে তার কবে থেকেই কথা হয়ে আছে একসঙ্গে শোবে বলে।

ক্রিস্টিনা বলল, আমার ড্রিংক ফুরাইয়া গিয়াছে। লইয়া আসি। তুমি কিন্তু কিছুই পাইবে না।

কী পান করিতেছ?

হুইস্কি।

হুইস্কি? বিশ্বাস করতে পারল না কাশেম। এবারে সত্যি সত্যি সে উঠে বসল বিছানার ওপর। মাথা টাল খেয়ে উঠলেও দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সামলে নিল। তুমি হুইস্কি পান করিতেছ?

হাঁ, নিট পান করিতেছি।

তোমার বাবাকে দেখিয়াও?

বাবার উপর জেদ করিয়াই শুরু করিয়াছিলাম। এখন হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না।

ক্রিস্টিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ লাগল তার ফিরে আসতে। বাবুল নিশ্চয়ই প্রগ্রেস-রিপোর্ট নেবার জন্যে আটকেছিল ওকে। সেই অনেকক্ষণ একা তার ভীষণ খারাপ লাগল। যেন, গভীর রাতে শেষ বাসটাও চলে গেছে ; হিম বাতাসের ভেতরে একা সে দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে।

মেয়েটি ফিরে আসতেই কাশেম তাকে হাত বাড়িয়ে ধরল। কোলের কাছে বসিয়ে গলা বেষ্টন

করে জিগ্যেস করল, তোমার মাথা ঘুরিতেছে না ?

এক বোতল পান করিলেও আমার মাথা ঘোরে না।

কাশেম সরে বসে ক্রিস্টিনাকে টানল। সেও তখন বিছানার ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে পাশাপাশি ঠেস দিয়ে বসল, ছোট্ট একটা চুমুক নিয়ে তাকিয়ে রইল নিজের গেলাশের দিকে।

কাউকে কখনো ভালোবাসো নাই ? কাশেম জানতে চাইল।

না।

বাসো নাই ?

বলিলাম তো, না।

কেন ?

কাশেম তার গেলাশসুদ্ধ হাত টেনে হুইস্কিতে চুমুক দেবার চেষ্টা করল।

না, পান করিও না।

ভালোবাসো নাই কেন ?

কেন আবার ? কেউ নাই বলিয়া। কাউকে ভালো লাগে নাই বলিয়া।

কোনো পুরুষও তোমাকে ভালোবাসে নাই ?

কাশেম জোর করে ক্রিস্টিনার গেলাশ থেকে একটা চুমুক নিল। নির্জলা হুইস্কি। ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সারা শরীর। গলা বুক পুড়ে গেল। তাড়াতাড়ি গেলাশ রেখে ক্রিস্টিনা তাকে জড়িয়ে ধরল, বলল, বলিলাম, পান করিও না। এখন হইল তো ?

তাকে শুইয়ে দিল ক্রিস্টিনা।

বলো, কোনো পুরুষ তোমাকে কখনো ভালোবাসে নাই ?

একজন, সে হয়ত। আমার খুব বন্ধু ছিল। মুখে কখনো বলে নাই।

কোথায় সে ?

এখন সুইৎসারল্যান্ডে।

কাশেম তার নিজের শরীরের ভেতরের উত্তাপ টের পায়। মনে হয়, জীবনে সে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গ করে নি, এমন কি তার স্ত্রীরও না। সে টের পায়, তার শিশ্ন নড়েচড়ে উঠছে। মিথ্যে বলেছিল বাবুল, হুইস্কি খেলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ক্রিস্টিনাও কি এখন ভিজে যাচ্ছে ? জানতে পেলে দ্রুত এবং সহজ হতো ক্রিস্টিনাকে কাছে টানা। নিশ্চিত হওয়া যেত। ক্রিস্টিনার হাতে হাত রাখতেও এখন তার সাহস আর হচ্ছে না। সম্ভবত সে পারবে না। অথচ বাবুল তাকে কতবার বলেছে, কী অবলীলাক্রমে সে সদ্যপরিচিত মেয়ের যোনি-বারান্দায় হাত রেখেছে এবং অচিরেই পোশাকের বাধা সরিয়ে বিযুক্ত করেছে নরোম দুটি দেয়াল। কী করে বাবুল পারে ? মিথ্যে বাহাদুরি করেছে। এখন তার নিজের অসীম ভীরুতার অভিজ্ঞতায় মনে হয়, বাবুল মিথ্যেবাদী।

ক্রিস্টিনার সঙ্গে কিছু হবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিল কাশেম। আর সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে গেল তার মন। অনেক সহজ মনে হলো ক্রিস্টিনার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকা।

মানুষ যেমন বিলেত যেতে না পেরে বিলেত-ফেরত লোকের কাছে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে চায় বিলেতের গল্প, ঠিক সেইরকম গলায় কাশেম জিগ্যেস করল, 'কারো সঙ্গে কখনো করো নাই ?' নেশার মাথায় ইংরেজি লোকচলতি শব্দটা ব্যবহার করতে তার এতটুকু সঙ্কোচ হলো না।

আর, একই রকম সংকোচহীনতার সঙ্গে ক্রিস্টিনা বলল, কেন জানিতে চাহ, করিয়াছি কি-না ? আমাকে বিশ্বাস করো, আমি করিতে চাই না ; শুধু কৌতূহল।

মিথ্যে কথা বলেও সুখ আছে, লক্ষ করে দেখল কাশেম। নিজেকে তার খুব বড় মনে হতে লাগল ; নিজেকে জয় করতে না পেরেও নিজেকে জয়ী বলে দেখাতে তার ভালো লাগল। সাহস করে ক্রিস্টিনার বুকের ওপরও এক পশলা হাত রাখল সে, যেন কথা বলার ভঙ্গিতেই হাতটা রাখা।

কাশেম বলল, আমাকে নির্ভয়ে তুমি বলিতে পারো, ক্রিস্টিনা। কারো সঙ্গে শয়ন করিয়াছ ?

হাঁ, একবার। একজনের সঙ্গে।

গলার ভেতরে হঠাৎ দলা পাকিয়ে উঠল কাশেমের। তার ভীষণ ঈর্ষা হতে লাগল।

সেই ছেলেটি ? সুইৎসারল্যান্ডে যে আছে ?

না। সে অন্য।

তোমার ইচ্ছায় ? অথবা জোর করিয়া ?

অর্ধেক অর্ধেক।

কী রকম ?

শুনিয়া কী হইবে ?

বলিলাম তো, কৌতূহল।

কৌতূহল ভালো নহে।

মাত্র একবার।

একশোবার বলিলে তোমার ভালো লাগিবে ?

কাশেমের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। কী করে ক্রিস্টিনা টের পেল তার ঈর্ষা হচ্ছে ? পাশে আধো শোয়া ক্রিস্টিনাকে দেখে এখন কী দূরের মনে হচ্ছে। কোনোদিন সে ঐ বাগানে যেতে পারবে না।

কাশেম চোখ বুঁজে পাশ ফিরে শুলো।

পরমুহূর্তে তার পিঠের ওপর উবু হয়ে শরীর ঠেকিয়ে ক্রিস্টিনা জিগ্যেস করল, পাশ ফিরিলে কেন ? আমার কথা ভালো লাগিতেছে না ? কাশেমকে টেনে তার মুখ নিজের দিকে আনল ক্রিস্টিনা। বলল, তোমাকে আমার ভালো লাগে। কথা বলো আমার সঙ্গে। একবার মাত্র হইয়াছিল। আর হয় নাই। আর কাহারও সঙ্গে নয়। ঐ একবারও আমার ভালো লাগে নাই। ছেলেরা শুধু চায়, আর চায়। আমার কাছে অপমান মনে হয়। বাবার এক রক্ষিতাকে দেখিয়াছিলাম, শুধু শয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত। অনেকে হয়ত ঐ রকম, আমি হইতে পারি নাই।

ক্রিস্টিনা কাশেমের গালে একটা চুমো দিল।

সন্ধ্যা হইতে দেখিয়াছি তোমার মন খারাপ, কী যেন ভাবিতেছ। কথা বলো, কাশেম। বলিলাম তো তোমাকে আমার ভালো লাগিয়াছে।

এতক্ষণে কাশেম বলল, বড্ড মাথা ধরিয়াছে, ক্রিস্টিনা।

এখনো কমে নাই ?

এত অল্প আলোতেও ক্রিস্টিনার চোখে গভীর উদ্বেগ কাশেম লক্ষ করতে পারল। কিন্তু এখন সত্যি সত্যি তার আরো খারাপ লাগছে। কেবল মাথাই ধরে নি, চারদিকের সমস্ত কিছু

অনবরত দুলতে শুরু করেছে। এমনকি ক্রিস্টিনাও। আর হঠাৎ সমস্ত শরীর দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরুচ্ছে, খিঁচুনি দিয়ে উঠেছে শূন্য পাকস্থলী।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ক্রিস্টিনা কাশেমের শার্ট খুলে সেই শার্ট দিয়েই গা মুছিয়ে দিল তার। কাশেমের জুতো মোজা খুলে কোমরের বেল্ট আলগা করে দিল। তখন একটু ভালো লাগল কাশেমের।

তুমি বেশি ড্রিংক করিতেছ।

তুমি কত ভালো, ক্রিস্টিনা।

এখন চোখ বুঁজিয়া শুইয়া থাকো।

তুমি আমার কাছে থাকিও।

কাশেমের সত্যি সত্যি এখন ক্রিস্টিনাকে, তার শরীর নয়, উপস্থিতিকে পেতে ইচ্ছে করছে। হাত বাড়িয়ে সে হাত ধরল ক্রিস্টিনার।

আছি তো। আমি যাইতেছি না।

তোমার মতো মেয়েকে কেউ কখনো ভালোবাসে নাই কেন ?

কথা বলিও না। চুপ করিয়া থাকো।

ক্রিস্টিনা কাশেমকে উপুড় করে শুইয়ে দিল।

শুইয়া থাকো। আমি দ্যাখো ম্যাসাজ করিয়া দিতেছি, এক্ষুনি চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। ঘুমাইয়া পড়িবে।

ঘুমাইয়া পড়িলে তুমি চলিয়া যাইবে না তো ?

আমি আছি।

তখন সত্যি বলিয়াছো, আমাকে ভালো লাগে তোমার ?

আবার বকিতেছ ?

বলো না, সত্যি বলিতেছ ?

হাঁ, সত্যি।

জানো না, আমি কত খারাপ। আমার কোনো গুণ নাই। আমার কোনো গৌরব নাই। আমি অল্পতে চটিয়া যাই। আমি কারো আত্মত্যাগ বুঝিতে পারি না। আমাকে ভালো লাগার কোনো কারণ নেই কারো। তোমার কিংবা কারো।

তুমি নিজেকে করুণা করিতে শুরু করিয়াছ, কাশেম।

আমাকে করুণা করিবার মতোও কেহ নাই, ক্রিস্টিনা।

তুমি চুপ করিয়া শুইয়া থাকো।

হঠাৎ ক্রিস্টিনার গলায় অনুনয় নেই, সামাজিকতার মধুরতা নেই। আদেশের বর্ণহীন গলা শুনে কাশেম একবার নতুন চোখে তাকাল ক্রিস্টিনার দিকে। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইল।

তার কান্না পেতে লাগল, কিন্তু চোখ ভিজে উঠল না। চোখও এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে ? তার নিজের দেহেরই একটা অংশ তাকে উপেক্ষা করছে ?

আমি তোমাকে ম্যাসাজ করিয়া দিতেছি। এক্ষুনি তোমার ঘুম আসিবে। ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দেখিবে তোমার মন ভালো হইয়া গিয়াছে।

ক্রিস্টিনা ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে গায়ে মাখার পাউডার নিয়ে এলো। যখন কাশেমের

খোলা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল পাউডার, বিস্মিত হয়ে তাকাল কাশেম।

ক্রিস্টিনা বলল, ম্যাসাজ করিতে হইলে পাউডার দিতে হয়। নিজেকে আমার হাতে ছাড়িয়া দাও দেখি। মন হইতে সব ভাবনা মুছিয়া ফ্যালো।

পিঠের ওপর চক্রাকারে হাত ঘোরাতে লাগল ক্রিস্টিনা। বৃত্তটা ক্রমশ বড় করে আনল, আবার গুটিয়ে ছোট করল, আবার বড় করল ; কাঠবেড়ালির পায়ের মতো তরতর করে আঙ্গুলগুলো নামল গলার ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত, আবার দৌড়ে গেল গলার কাছে। তারপর চিৎ করে দিল কাশেমকে। তার বুকের ওপর আবার ঢালল একরাশ পাউডার। আবার সে আঙুল দিয়ে আলতো চাপ দিয়ে বুকের ওপর ছোট দুটো বাদামি বৃত্তের চারপাশে বৃত্ত আঁকতে লাগল।

কাশেম তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল ক্রিস্টিনার দিকে।

এ-কী, আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছ যে ?

তোমাকে দেখিতেছি।

না, দেখিও না। ম্যাসাজ করিবার সময় নিয়ম নাই। ম্যাসারকে দেখিতে হয় না। চোখ বোঁজো।

চোখ বুঁজলো না কাশেম। তার চোখে, নিজেই সে টের পেল, আকাঙ্ক্ষা এখন জোনাকির মতো জ্বলছে নিবছে।

চোখ বন্ধ করিবে না ?

পারিতেছি না।

ক্রিস্টিনা উঠে গিয়ে, সুইচ খুঁজে, মুখোশের ভেতরে আলোটা নিবিয়ে দিল। এক মুহূর্তে ছায়া হয়ে গেল সবকিছু। কেবল জানালার স্বচ্ছ পর্দা দিয়ে বাইরের একটু আলো এখনো বাস্তবতাকে খানিক জাগিয়ে রাখল, কিংবা বাস্তবতার শেষ ধাপটিকে অসম্ভবের জলে ভিজিয়ে দিল।

ক্রিস্টিনা পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, ভালো লাগিতেছে ?

শরীরটাকে আরো শিথিল করো। মন হইতে সব ভাবনা মুছিয়া ফ্যালো। ইস্কুলে আমাদের শিখাইতো, নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে না পারিলে ম্যাসাজে কোনো কাজ হয় না।

ক্রিস্টিনা কাশেমের ট্রাউজার ছাড়িয়ে নিল, সাবলীলভাবে ভাঁজ করে মেঝের ওপর রেখে দিল যত্ন করে। তারপর তার শরীরে ঢেলে দিল আরো খানিক পাউডার। কাশেমের মনে হলো সুগন্ধে এই ঘর পাখা মেলে দিয়েছে। তার শরীর নির্ভার হয়ে গেছে। একটু আগের সেই কান্না এখন অন্য কারো বলে মনে হচ্ছে। তার ঘুম পাচ্ছে।

সে চোখ বুঁজলো।

তার পায়ের আঙ্গুল থেকে ক্রিস্টিনার কাঠবেড়ালি যাত্রা শুরু করল, উঠে এল কোমর পর্যন্ত, আবার নেমে গেল। আবার উঠল ; আবার নামল। আবার, আবার।

আর সেই একেকটি দৌড়ে একটু একটু করে লাফিয়ে, জেগে উঠল তার শিশ্ন, অন্তর্বাসের নাইলন সৃষ্টি করল জীবন্ত ছোট্ট এক পিরামিড।

কিন্তু কাশেম নিজে তা টের পেল না। যখন সেই পিরামিডের ওপর ক্রিস্টিনার হাত এসে স্থির হলো, তখন সে টের পেল তার শরীরের প্রস্তুতি।

কাশেম হাত দিয়ে পিরামিডের ওপর ক্রিস্টিনার হাত চেপে ধরল, কিন্তু আরেক হাতে ক্রিস্টিনা তা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া এখন আর কিছু রইল না তার শ্রুতিতে।

নিঃশব্দে ক্রিস্টিনা কাশেমের অন্তর্বাস থেকে মুক্ত করে আনল মৃদু কম্পমান তার শিশ্ন, একটা আঙ্গুলের ছোঁয়া দিয়ে বারবার বেষ্টন করে দিতে লাগল শিশ্নের মুখ।

এখন সমস্ত কিছু বায়ুস্তরে ভাসমান।

এখন বস্তুপুঞ্জ তরল একটি প্রবাহে বহমান।

ক্রিস্টিনার হাত ধীরে, অতি ধীরে উঠছে, নামছে— যেন সে মা কিংবা চিকিৎসক।

ক্রিস্টিনার হাত ভিজে গেল, তবু সে থামল না।

প্রথমে মনে হলো এই উৎস অক্ষয় এবং চিরঅব্যয়, কিন্তু সমস্ত কিছুই এ জগতে বিনাশী এবং অচিরস্থায়ী।

ক্রিস্টিনা যখন কাশেমের দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন সে ঘুমিয়ে গেছে। নিপুণ ম্যাসারের মতো রুমাল ভিজিয়ে মুছিয়ে দিল তার শিশ্ন, টেনে তুলে দিল অন্তর্বাস। তারপর, দরোজা খুলে বাথরুমে গিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুলো নিজের। সিংকের ওপর উপুড় হয়ে বমি করল সে অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর সিংক ভালো করে পরিষ্কার করে আয়নায় এই প্রথম নিজেকে দেখল ক্রিস্টিনা। ঠোঁটে হাসি এনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। এবং ভাবল, মানুষ কী অসহায় এবং কত সামান্যে তুষ্ট হয়।

১০

বেলাল তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। না, এভাবে শুয়ে থাকা যায় না। সাকিনার কাছে তার উত্তর পেতেই হবে। সাকিনা তাকে ভালোবাসে কিনা ? কিংবা বাসতে পারে কিনা ? ভালোবাসার কথা বলার আগে, বেলালের মনে হয়েছিল, সাকিনার ভালোবাসার জন্যে একটা জীবন সে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু, আজ তাকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে অবধি উত্তর শোনার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ তবু নিজেকে শান্ত করে রাখতে পারছিল, কিন্তু এখন আর পারা যাচ্ছে না। কাশেম এখনো বাড়ি ফেরে নি. রাত প্রায় পৌনে দুটো, সাকিনাকে এমন করে আর একা পাওয়া যাবে না। এক্ষুনি পেতে হবে তার কাছ থেকে উত্তর, যে-কোনো উত্তর।

পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এখন বেলালের কাছে এতটা তুচ্ছ হয়ে গেছে যে কাশেম তার এককালের বন্ধু, সেই তার বাড়ি না ফেরাতেও কোনো উদ্বেগ হচ্ছে না। বরং এমন মনে হচ্ছে কাশেম আর না ফিরুক।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল টেলিভিশন খোলা। কিন্তু এতরাতে কোনো অনুষ্ঠান নেই বলে পর্দায় একটা নীল রং আর মৃদু একটানা একটা শব্দ। টেলিভিশন বন্ধ করতেও ভুলে গেছে সাকিনা ?

তার মতো স্থির এবং গোছালো মেয়ের পক্ষে এই ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। ব্যাকুল হয়ে উঠল বেলাল। অঘটন কিছু হয় নি তো, বেলালের এই অজান্তে ঘুমিয়ে পড়বার ঘণ্টা খানেকের ভেতরে ?

দ্রুত সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

সাকিনাদের শোবার ঘরের দরোজা বন্ধ। হাতলে চাপ দিয়ে দেখল, ভেতরে থেকে বন্ধ নয়,

কেবল ভেজিয়ে দেয়া। দরোজা খুলল বেলাল।

বিছানার পাশে ছোট বাতিটা জ্বলছে। বুকের ওপর খোলা একটা বই নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে সাকিনা। নিঃশ্বাসের তালে তালে বইটা উঠছে নামছে। মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কম বয়সের মনে হচ্ছে সাকিনাকে।

অপলক চোখে তাকিয়ে রইল বেলাল।

এই মানুষটাকে সে ভালোবাসে।

এই তো সেই স্পন্দমান অস্তিত্ব যার জন্যে এতকাল অপেক্ষা করে ছিল সে।

কাল রাতে যখন চুরি করে সে এ ঘরে এসেছিল, তখনো ঠিক এমনি করে ঘুমিয়ে ছিল সাকিনা, কিন্তু পাশে ছিল কাশেম, আর কাশেমের ওপর তার দেহের ভার। আজ সাকিনা একা এবং আরো সুন্দর। একটা হাত পেটের ওপর খোলা নাভির ওপরে, আরেকটা হাত আছে বই ছুঁয়ে। আঙ্গুলের নখে খয়েরি রঙের প্রলেপ, মৃদু আলোতেও চকচক করছে। কপালের টিপ কখন হাত লেগে মুছে গেছে, ছড়িয়ে গেছে খানিকটা। তাহলে শুতে যাবার উদ্যোগ সে আদৌ করে নি বিছানায় আসবার সময়। তাহলে টিপ মুছে বিছানায় যেত।

পাশে ড্রেসিং টেবিলের ওপর সারি সারি সাজানো সুগন্ধ, লিপস্টিক, পলিশ, পেনসিল, কাঁটা, ইতস্তত পড়ে আছে কিছু আংটি, একটা চেন। আধোখোলা কাবার্ডের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঙ্গার থেকে ঝুলে আছে শাড়ি। ছোট টেবিলে মশলার কৌটো, এক গেলাশ পানি।

দরোজাটা নিঃশব্দে পেছনে ভেজিয়ে দিল বেলাল।

তারপর আবার তাকিয়ে রইল সাকিনার ঘুমন্ত মুখের দিকে। এই সেই মুখ যার মতো আর কারো মুখ নয়। মুখখানা এত সুন্দর বলেই কি ভালো লেগেছিল তার! হাসলে দাঁতের পাটিতে পূর্ণিমার জন্ম হয় বলেই কি মন ছুঁয়ে গিয়েছিল তার? গানের অমন উদাস-গভীর গলা বলেই কি তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করেছিল তার জীবন?

কাশেমও তো এ সবই দেখেছিল, আর বিয়ে করেছিল; সাকিনা বলে কাশেম তাকে ভালোবাসে। কিন্তু কেন তার মনে হয় তার মতো সাকিনাকে সে ভালোবাসে না? এ কি ঈর্ষার উক্তি?

বিছানার কাছে এলো বেলাল।

সাকিনাকে কোনোদিন না পেলেও সে অবিরাম ভালোবাসতে পারবে। কাশেম কি পারবে?

বারবার, প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশেমের সঙ্গে নিজের তুলনা সে করে চলে ; অথচ করতে চায় না।

বিছানায় কাশেমের দিকটা শূন্য। সেখানে আস্তে আস্তে বসলো বেলাল। এই বিছানায় ওদের দুটি শরীর এক হয়ে যায়, এই বিছানায় সম্পন্ন হয় অধিকার। এখানে তার বিন্দুমাত্র স্বত্ব নেই। কী হয়, যদি সে ছিনিয়ে নেয়?

না, ছিনিয়ে নিতে সে পারবে না। সাকিনা তখন ঠিকই বলেছিল, ভালোবাসে বলেই জোর সে করতে পারবে না কখনো।

ঘুমিয়ে থাক সাকিনা। সে আজ সারা রাত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে ; হয়ত এই প্রথম, এই শেষ, আর কখনো সুযোগ পাবে না সে এমন করে এ মুখখানা দেখার।

আলোয় কষ্ট হচ্ছে না ওর?

সাকিনার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সাবধানে বাতিটা নিবিয়ে দিল বেলাল। হঠাৎ তার মনে হলো, কাল সে এ ঘরে এসেছিল, সাকিনা জানতে পারে নি ; আজও সে এ ঘরে এসেছে, সাকিনা জানে না। কিন্তু কাল তাকে ভালোবাসার কথা বলে নি, আজ বলেছে। আজ তার খুব ইচ্ছে করল, সাকিনা জানুক সে ঘরে এসেছে, বসে আছে তার বিছানায় তারই স্বামীর অংশে।

ঘরে পর্দা টানা বলে অন্ধকার প্রায় নিরন্ধ্র। পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায় সাকিনার তাই সে খুব হিসেব করে হাত বাড়িয়ে কোলের ওপর থেকে বইখানা আলগোছে তুলে আনল। মেঝের ওপর বই নামিয়ে রেখে আরো কিছুটা সরে বসলো সে সাকিনার কাছে।

তখন সাকিনা অস্ফুটস্বরে ম-ম-ম শব্দ করে হাত রাখলো বেলালের গায়ে। আদুরে আরো একটা শব্দ করে তাকে কাছে টানলো সাকিনা। সেই টানে বেলাল একটু এগিয়ে পরমুহূর্তেই নিজেকে শক্ত করে ফেলল।

জড়ানো গলায়, নতুন কথা বলতে শেখার মতো আধো গলায় সাকিনা বলল, এসো না ?

সে তাকে কাশেম বলে, তার স্বামী বলে ভুল করছে।

না, বেলাল তাকে ভুল করতে দেবে না ; ভুলের আদর সে নেবে না।

বেলাল ডাকল তখন, সাকিনা।

কী ?

সাকিনা।

তখন ধড়ফড় করে উঠে বসল সাকিনা। একটা হাতে হঠাৎ বেলালের কাঁধ চেপে ধরল, পরক্ষণেই ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। বলল, ও তুমি।

এত স্বাভাবিকভাবে কথাটা সে উচ্চারণ করল, যেন বেলালেরই আসবার কথা ছিল বিছানায়। সাকিনা নড়েচড়ে পা ছড়িয়ে ভালো করে শুয়ে বলল, বাতি নিবিয়ে রেখো না। এখনো তার কথায় সেই প্রথম কথা বলার অস্পষ্টতা।

সাকিনার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাতি আবার জ্বেলে দিল বেলাল। দেখল, সাকিনা চোখ বুঁজে আছে। সাকিনা কনুই দিয়ে এখন তার চোখ ঢাকল।

চোখে লাগছে ?

বাতিটা থাক।

এতক্ষণে বেলালের ধারণা হলো সাকিনা ঘুমের জন্যে নয়, শোবার ঘরে এইরকম জড়ানো গলাতেই কথা বলে। তার মনে হলো, একান্ত ব্যক্তিগত একটা কিছুর অংশ পেলো সে এখন।

কটা বাজে ?

দুটো পাঁচ। সময়টা বলেই বেলাল একটু উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করল, হয়ত এক্ষুনি সাকিনা উঠে বসবে, কাশেমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে ; সে গেল কোথায় ? কিন্তু সময় শুনে সাকিনা তেমনি চোখের ওপর কনুই চাপা দিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলল না।

সাকিনার হঠাৎ কেবলি মনে পড়তে লাগল, কাল রাতে তাকে লাথি দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিল কাশেম। মনে হতে লাগল, আর এই লোকটি এখন তার ঘরে তার বিছানার পাশে বসে আছে, একে একটু অনুমতি দিলে মমতা আর আদরে অবশ করে দেবে।

দুটো ছবি তার মনের মধ্যে স্থির হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কোনোটাতেই তার যেন কোনো অংশ নেই, সে শুধু দর্শক। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

সাকিনা।

বলো।

সাকিনা।

ওঃ, বলো, আমি শুনছি। ইচ্ছে করে একটু বিরক্তি একটু অসহিষ্ণুতা সে ছড়িয়ে দিল গলায়, যেন বেলাল মনে না করে সে প্রশ্রয় দিল। অথচ, একটু যে দিতে ইচ্ছে করছে না, তা নয়। যেন যেদিকে যেতে নিষেধ, সেদিকেই যাবার জন্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পা পড়ছে।

আর বেলাল নিজে কিছুতেই ভুলতে পারছে না কাশেমের কথা, যে কাশেমের স্ত্রীকে তার ইচ্ছে করছে নিজের অস্তিত্বের ভেতরে পুরে রাখতে।

বেলাল বলল, আমাকে বলবে সাকিনা ?— কাল তোমাদের কী হয়েছিল ?

সাকিনা উত্তর দিল না। আর বেলালের অনুতাপ হতে লাগল, কেন সে এ প্রশ্ন করতে গেল ? তার ভালোবাসায় দ্বিতীয় কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই, তবু কেন সে এ ভুল করল!

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে সাকিনা কথা বলে উঠল।

সকালে তোমাকে মিথ্যে বলেছি। আমাদের ঝগড়া হয়েছে। ও আমাকে একটুও ভালোবাসে না। তোমাকে মিথ্যে করে বলেছি, ও আমাকে আদর করেছে।

কেন মিথ্যে বলতে গেলে আমাকে ?

আমি জানতাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো। ওঃ কী ওয়াইন খাইয়েছ, এখনো মাথা টলছে। নেশা-নেশা লাগছে। একটু বই পড়তে এসে আউট হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

সাকিনা চেষ্টা করে নিজের অনুভূতিটাকে এমনি করে চাপা দিতে।

কিছু খেয়েছ ? খাওনি তো ? শেষে বলবে, থাকার পয়সা দিই, খাওয়ার পয়সা দিই, অথচ ঘুমোতে পাই না, খেতে পাই না। চলো, চলো, নিচে চলো।

সাকিনা বিছানা ছেড়ে উঠে, বিছানা ঘুরে এসে, বেলালের হাত ধরে টান দিল। পয়সার উল্লেখে বড় নিষ্ঠুর মনে হলো সাকিনাকে। কিন্তু সে তো জানে না, সাকিনা আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেদিকে যেতে নিষেধ সেদিকে না যেতে।

চলো, চলো, আর বসে থেকো না। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার কথা রবি ঠাকুরের কিছু কবিতা নয় যে গাল পেতে শুনতে হবে। এসো তো।

প্রায় তাকে টানতে টানতে নিচে নামালো সাকিনা।

বলো, কী খাবে ? বিফবার্গার ভেজে দিতে পারি, ফিশ ফিঙ্গার ভেজে দিতে পারি, আর কী দিতে পারি ? ওমলেট এত রাতে ভালো লাগবে না। টোস্ট করে স্যান্ডউইচ করে দিই ? কর্ন বিফ আছে, লেটুস পাতা আছে, টোম্যাটো আছো। একটুও সময় লাগবে না। দেব ?

তুমি ? ভেতরের রাগটাকে যথাসম্ভব গোপন করে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল বেলাল।

আমিও খাবো। আমি কি ভালোবাসায় পড়েছি যে না খেয়ে থাকব ? নো স্যার।

ভীষণ রাগ হতে লাগল বেলালের। মেয়েটি এমন করে কথা বলছে কেন ? এত চপলতা কীসে ? ঠাট্টা করছে তার ভালোবাসা নিয়ে ?

বেলাল বলল, যা ইচ্ছে করো।

সাকিনা হঠাৎ থমকে গেল। তার মানে ?

ভালোবাসি বলে খিদে পাবে না, তেমন বয়স আমার নেই। এত খিদে পেয়েছে, স্যান্ডউইচ

ওমলেট সব খাবো।

তুমিও আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ ?

না তো।

নিশ্চয়ই করছ। খিদে পেলে নিজে বানিয়ে নাও, আমি কিছু করতে পারব না।

এবারে তুমি ঝগড়া করছ।

তাহলে তোমার জন্যে বানাই।

না।

এই বললে তুমিও খাবে। না, কেন ?

যারা ঝগড়া করে তাদের হাতে আমি খাই না বলে।

হো হো করে হেসে ফেলল বেলাল।

চমকে উঠল সাকিনা। কত সহজে রাগ ভুলে হেসে উঠতে পারল বেলাল। অবিকল তারই মতো। ঠিক সে যেরকম বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। অথচ, কাশেম একবার রাগ করলে পড়তে সময় লাগে, পড়লেও অনেকক্ষণ ধরে গাঁ গাঁ করতে থাকে।

হাসতে দেখে বেলালকে খুব আপন মনে হয় সাকিনার। কিন্তু কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আবার হাসা হচ্ছে ? এই ঝগড়া করে এই হাসতে লজ্জা করে না ?

সাকিনাই খাবার তৈরি করল। স্যান্ডউইচ। রান্নাঘরেই দাঁড়িয়ে খেল তারা। বেলাল বলল, ফোনে তখন কাশেম বলল, দেরি হবে। এখন তো প্রায় পৌনে তিনটে। তোমার ভাবনা হচ্ছে না ?

তোমার কী মনে হয় ?

বাড়িতে বেড়াল থাকলেও ভাবনা হয়।

কাশেম বুঝি বাড়ির বেড়াল ?

জানি তোমার স্বামী। তাই তো জিগ্যেস করছি, ভাবনা হচ্ছে না ? একবারও কিছু বলছ না। নাকি, ঠিকই জানো কোথায় গেছে, কবে ফিরবে, আমাকে শুধু শুধু ভাবিয়ে মারছ ?

না এলে তুমি খুশি হও তো ?

তুমি খুশি না হলে আমি কী করে হই ?

হঠাৎ সাকিনা বেলালের বুকের ওপর থেকে খানিকটা জামা খপ করে ধরে তাকে কাছে টেনে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলল।

ফুঁপিয়ে উঠে বলল, ও কক্ষণো এ রকম করে নি।

বেলাল তাকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল।

তুমি বলো, ও আমাকে ছেড়ে যায় নি। বিশ্বাস করো, ওকে আমি কিচ্ছু বলি নি।

সাকিনার মাথা বেলাল তার নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। সান্ত্বনা দিল না, কিছুই বলল না, একটু পরে শুধু একটা হাত রাখল তার পিঠের 'পরে। তারপর চোখের জলে লজ্জিত সাকিনা মুখ তুলল ; তখন বেলাল নামিয়ে আনল তার মুখ। কিন্তু চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সাকিনা। তখন গালে চুমো দিল বেলাল।

সাকিনা বলল, কাঁদলে কি আমাকে সুন্দর দেখায় ?

কেন বলছ ?

আদর করলে যে। বলে, সাকিনা আর দাঁড়াল না, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যখন সে প্রায় ওপরে পৌঁছে গেছে তখন বেলাল তাকে অনুসরণ করল।

শোবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বেলাল অনুমতি প্রার্থনা করল।

আসতে পারি ?

একবার তো এসেছিলে। তখন জিগ্যেস করো নি।

তখন তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। ভেতরে এসে দাঁড়াল বেলাল। সাকিনা তখন ঘষে ঘষে কপালের টিপ তুলছে।

সাকিনা বলল, দেখো, তোমার জামায় আমার টিপ লেগে যায় নি তো।

বুকে মাথা রাখবার সময় লেগেও থাকতে পারে, কিন্তু বেলাল তার তদন্ত করল না। বলল, লাগুক, কিছু হবে না।

তোমার বন্ধু এসে দেখলে কী বলবে ?

বন্ধুটি এসেই আমার জামা দেখবে না কিছু।

টিপ তুলে সাকিনা বলল, একটু বাইরে দাঁড়াবে ?

অপ্রতিভ হেসে বেলাল ঘরের বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর জিগ্যেস করল, তখন আমাকে ঠোঁটে চুমো খেতে দিলে না কেন ?

ঘরের ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর এলো না। কাপড়ের খস খস শব্দ শোনা গেল। সাকিনা শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে কি ?

কই, উত্তর দিলে না ? বেলাল একটু উঁচু গলায় এবার বলল।

কীসের উত্তর ?

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে কেন ?

ওটা সবার জন্যে নয়।

নিজেকে ভীষণ বঞ্চিত মনে হলো বেলালের। সাকিনাকে দুর্বোধ্য বলে মনে হলো। কখনো মনে হয় তার ভালোবাসায় সম্মতি আছে সাকিনার ; আবার মনে হয়, নেই। কখনো মনে হয় সাকিনা সেই ওয়াইনের ঝোঁকেই বলছে, কখনো মনে হয় তার কথার পেছনে অনুভূতির অমৃত আছে।

ঘরের ভেতর বাতি নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ঠেস ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বেলাল ; বুঝতে পারল না কী এখন তার করা উচিত।

ভেতর থেকে সাকিনার গলা শোনা গেল। 'আমি শুয়ে পড়লাম। তুমিও যাও।' তার একটু পরে, 'তুমি আছো ওখানে ?'

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল বেলাল। বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বসতে পারি ? ভয় নেই, তোমার ঠোঁটে চুমো খেতে চাইব না।

পাগলের মতো কোরো না। কী আবার কথা ?

অনেক কথা। অনেক জরুরি কথা।

কাল বোলো।

কাল আমাকে কাজে বাইরে যেতে হবে।

তবু, আজ থাক। কাল বোলো।

কাল যদি কাশেম ফিরে আসে, কোথায় কীভাবে বলব ?

ফিরে তো আসবেই।

তাহলে আমার সঙ্গে বাইরে যাবে ?

ও কিছু মনে করবে না ?

না, আমি এক্ষুনি বলতে চাই। আমি আর পারছি না, সাকিনা। তোমার এক্ষুনি শুনতে হবে। আমাকে তুমি ভালো না বাসো, সে আমি বুঝব, তোমাকে আমি মিথ্যের ভেতরে দেখতে পারব না।

বুঝতে পারলাম না।

তখন বিছানার ওপর বসল বেলাল। ঘরের দরোজা খোলা বলে সিঁড়ির আলো খানিকটা এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে সাকিনা বুক অবধি লেপ টেনে ছাদের দিকে চোখ রেখে শুয়ে আছে।

কাশেমকে তুমি ভালোবাসো ?

বাসি তো।

জীবন দিয়ে, মন দিয়ে, সব দিয়ে ভালোবাসো ?

শুনে কষ্ট পাবে।

তবু বলো, আমি শুনতে চাই।

হ্যাঁ, আমার সব দিয়ে ওকে আমি ভালোবাসি।

ফস করে সিগারেট ধরালো বেলাল।

সাকিনা বলল, না, সিগারেট ধরিও না। ওকেও আমি শোবার ঘরে খেতে দিই না। ঘর গন্ধ হয়ে যায়। ও টের পাবে।

যে আমি এসেছিলাম এ ঘরে ?

সাকিনা চুপ করে রইল।

বেলাল তখন বলল, না, ওকে তুমি ভালোবাসো না। বাসতে পারো না। তুমি যাকে বলছ ভালোবাসো, সেটা ভালোবাসা নয়।

কী তাহলে ?

অভ্যেস। ভালো তুমি বাসো নি, তুমি অভ্যস্ত হয়েছ মাত্র।

কেন এ কথা বলছ ? কাঁপা গলায় সাকিনা প্রশ্ন করল।

এভাবে ভালোবাসা হয় না। হতে পারে না। ভালোবাসা এ রকম নয়, সাকিনা। আমি আমার জন্য বলছি না। আমি বলছি না, আমার ভালোবাসাই ভালোবাসা। কিন্তু এটুকু আমি বলতে পারি যে, ভালো তুমি ওকে বাসো নি। এ মিথ্যে। আমার পক্ষে কিছু বলাও মুশকিল। বললেই তুমি হয়ত মনে করবে, আমার স্বার্থ আছে বলেই তোমাদের ভালোবাসাকে তুচ্ছ করছি। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভালোবাসি বলেই, তোমার ভালোর জন্যেই এভাবে বলতে পারছি। তাতে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও, দেবে।

বেলাল একটু থামল, সাকিনা কিছু বলে কি-না, অপেক্ষা করল। সাকিনার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। খেয়াল হলো, সিগারেট সে নেভায় নি। কোনো অ্যাশট্রে হাতের কাছে পেল না। তখন উঠে গিয়ে বেলাল বাথরুমে সিংকের নলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সিগারেটটা।

ফিরে এসে, পায়ের স্যান্ডেল খুলে বিছানার ওপর অনেকখানি উঠে বসে সাকিনার মাথায় হাত রাখল। হাত বুলিয়ে দিল খানিক। প্রায় ফিসফিস ক'রে বলল, তোমাকে আমি ভালোবাসি, সাকিনা। তোমাকে আমি আঘাত দিতে চাই না। তোমার মতো একজনের জন্যে আমি সারা জীবন তাকিয়ে ছিলাম। তুমি জানো না, যেদিন প্রথম টের পেলাম আমার বুকের ভেতর কী হচ্ছে, আমি লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম, আমি তোমার দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিলাম না। সে আজ পাঁচ ছ'মাস আগের কথা। প্রথম মনে হয়েছিল, আমার মতো খারাপ কেউ নেই, বন্ধুর বৌয়ের দিকে চোখ পড়েছে। মনে হয়েছিলো, এ হয়ত শরীরের টান শুধু আর কিছু না। মনে হয়েছিল, তোমাকে একবার বিছানায় পেলে আমার সব ব্যাকুলতা চলে যাবে। এখন এই অন্ধকারে, তোমার বিছানায় শুয়ে, তোমার গায়ে হাত রেখেও আমি বলতে পারি, তোমার শরীর আমি চাই না। আমি চাই তোমাকে, তোমার অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সব, সব চাই তোমার। জানি না মানুষ কেন কাউকে ভালোবাসে। কিন্তু এটুকু বুঝি, ভালোবাসা একদিনে হয় না, আর ভালোবাসা যখন সত্যি সত্যি হয়, শরীরটা তখন অনেক নিচে পড়ে থাকে। তুমি কিছু বলছ না?

কী বলব?

তোমার কাছে আসি?

কাছেই তো আছো।

তবু মনে হয় তোমার কাছে নেই। আমার সবচেয়ে যে কাছের, তারই কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে আছি। তোমার সঙ্গে আমার সংসার হলেও, আমার কেবলই মনে হতো আমাকে আরো কাছে যেতে হবে তোমার সেই কাছে যাবার সাধনায় আমার সারাটা জীবন কেটে যেত। জানো সাকিনা, এই ক'টা মাস যেদিন থেকে বুঝেছি যে তোমাকে ভালোবাসি, সেদিন থেকে মনে মনে আমি তোমার সঙ্গে সংসার করছি। রাতে শুতে যাবার আগে শেষ যে মুখখানা মনে পড়ে সে তোমার মুখ, সকালে চোখ মেলেই যে মুখখানা দেখতে পাই সে তোমার মুখ, সাকিনা। তুমি কিছু বলো। কিছুই নেই তোমার বলার? এই কি আমার দায় যে আমিই শুধু বলব?

সাকিনা কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

বলো, কী বলছিলে?

কিছু না।

এত চুপ করে থেকো না। আমি নই, অন্য কেউ যদি তোমাকে এমন ব্যাকুল হয়ে ভালোবাসত, আর আমি যদি তা জানতাম, তাহলে বলতাম, এমন চুপ করে থেকো না, সাকিনা।

সাকিনা উল্টো দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুলো।

সুরাপান এখন না করেও নিজেকে খুব মাতাল মনে হচ্ছে বেলালের, এই অবস্থাটাকেই ভীষণ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার। 'আমার একটু শীত করছে' বলে লেপের কোণ তুলে পা ঢুকিয়ে দিল। তারপর বুক পর্যন্ত লেপ টেনে সাকিনার মুখ নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাকিনা ফিরল না।

তখন তার পিঠের 'পরে হাত রেখে বেলাল বলল, তুমি নির্ভয়ে আমার দিকে ফিরতে পারো। নিজেই বলেছ যে তুমি জানো আমি কখনো জোর করব না। আমি তোমার শরীর চাই না; চাই, তবে এভাবে চাই না; আমি তোমার ভালোবাসা চাই; কিছু বলো।

সাকিনা উল্টো দিকে মুখ রেখেই বলল, কেন তুমি বললে, ওকে ভালোবাসি তা ভুল ?

বললে তুমি কিছু মনে করবে না তো ?

আমার পাশে আছো, কিছু মনে করি নি তো। তুমি বলতে পারো।

বেলাল কনুইয়ে ভর করে উঠে সাকিনার গালে একটা আদর করল ছোট্ট করে। সাকিনার কাছে নিজেকে খুব কৃতজ্ঞ মনে হলো। পাশে শুতে দেয়াটাও যে কত বড় দেয়া হঠাৎ চোখে পড়ল।

বলো, চুপ করে আছো কেন ?

তোমার কাছেই শুনেছি, কাশেম তোমাকে টেলিভিশনে দেখে পছন্দ করেছিল। আমার পুরনো বন্ধু হলেও সে কথা আমাকে বলে নি। লন্ডন থেকে যাবার সময় আমাদের বলে গিয়েছিল, বিয়ে করতে যাচ্ছে। তুমি সুন্দরী, যে কেউ তা স্বীকার করবে, যে কেউ তোমাকে দেখলে দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখবে। এতে খুশি হবার মতো মেয়ে তুমি নও, তা আমি জানি। কারণ, তোমার নাক-চোখ-মুখ তুমি তৈরি করো নি, এতে তোমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই, তোমার হয়ত এটুকুই যে সেই জন্মসূত্রে পাওয়া সৌন্দর্যটুকু উজ্জ্বল রুচি স্নিগ্ধ করে রাখতে জানো। কিন্তু দেখো, মানুষ যখন রূপ দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে কারো জন্যে, সে কিন্তু ঐ রূপটুকুর জন্যেই ব্যাকুল হয়, হৃদয়ের জন্যে নয়, তার ভেতরের কোনো গুণের জন্যে নয়, উপার্জিত কোনো কৃতিত্বের জন্যে নয়। রূপ আমাদের আয়ত্ত্বে নয় বলেই রূপবতীকে জয় করে নেবার জন্যে, বশ করবার জন্যে আমরা খেপে উঠি। তাই দেখবে, ছেলে হোক মেয়ে হোক যার যত বেশি রূপ, সে রূপ সম্পর্কে তত বেশি উদাস। তাই দেখবে, রূপসীর স্বামী ততটা রূপবান নন, আর রূপবানের বৌ তেমন রূপসী নয়।

থামলে কেন ?

না, থামি নি। আমাকে বলতেই হবে যা আমি দেখেছি তোমাদের ভেতরে। কাশেম তোমার রূপ দেখে ভুলেছিল। বিয়ে করবার দরকার ছিল তার, নির্মম তার কারণ। মি. সেনকে তুমি চেনো ? চেনো না। তিনি তোমাকে বলে দিতেন, কাশেমের দরকার ছিল বৌ আনবার, পড়াশোনা শেষ করবার জন্যে।

তার মানে ?

বেলালের দিকে পাশ ফিরল সাকিনা। মুখের ওপরে বেলালের নিঃশ্বাস টের পেয়ে মাথা কিছুটা দূরে নিয়ে গেল সে। বলল, পড়াশোনার জন্যে ?

ইতস্তত করল বেলাল। তার উচ্চারণ করতে কষ্ট হলো এর উত্তর। সাকিনা ভীষণ আহত হবে। সে আঘাত তার নিজের বুকেই বজে উঠবে।

পড়াশোনার জন্যে, মানে কী ? বেলাল চুপ করে রইল। তখন তার বুকে ছোট্ট টোকা দিয়ে সাকিনা আবার বলল, এই, বলো না।

তবু বলতে পারল না বেলাল। মিথ্যে করে বলল, অনেকদিন পড়ায় অবহেলা করেছিল। তাই দরকার ছিল শাসনের। সেই শাসন করবার জন্যে বৌ। সেই জন্যেই দেশে গিয়েছিল। তোমাকে দেখে পছন্দ হয়েছিল। না, তোমাকে নয়, তোমার রূপ তার পছন্দ হয়েছিল। তুমি না হয়ে অন্য যে কেউ হতে পারত, যার রূপ তাকে দুলিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তোমার রূপ আর তুমি এক নও। তুমি তুমি। বুঝতে পারছ ?

সাকিনার নিঃশ্বাস পতনেরও শব্দ যেন আর শোনা যাচ্ছে না।

বেলাল বলল, না, আর বলব না। বেলাল চুপ করে রইল।

বলো।

কী হবে বলে ? এখন তুমি ওর বৌ, সেটা তো অস্বীকার করতে পারি না।

তাতে কী ? তুমি বলো। আমি শুনতে চাই। একটু পরে সাকিনা বলল, আমার গান কিন্তু ওর ভালো লেগেছিল। গান গাইতে দেখেছিল আমাকে টেলিভিশনে।

জানি।

সেটা গুণ নয় ?

জানো সাকিনা, আমাদের দেশে পত্রিকায় পাত্রীর বর্ণনা কী লেখে ? গৃহকর্মে সুনিপুণা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীত শিল্পী। বিশেষ করে হিন্দু বাড়িতে দেখবে, মেয়ের গলা থাক আর নাই থাক, বাবা-মা গান শেখায়। সে বিদ্যেটা ছেলেকে আকর্ষণ করবার জন্যেই শেখানো হয়, গানের জগতে কোনো অবদান রাখবার জন্যে নয়।

সাকিনা মৃদু গলায় প্রতিবাদ করে উঠল। আমি কিন্তু গান শিখেছিলাম গানের জন্যে, বিয়ের জন্যে নয়। গান আমার ভালো লাগত। লেগে থাকলে নামও হতো।

লেগে থাকলে না কেন ?

বারে, বিয়ে হয়ে গেল যে। চলে এলাম যে।

তার মানেই গান তোমার কাছে দ্বিতীয় হয়ে গেল। বিয়েটাই বড়। না সাকিনা, গান যদি তোমার সত্যি সত্যি প্রাণ হতো, তুমি গান ছাড়তে পারতে না।

ছাড়ি নি তো ?

রান্নাঘরে গুনগুন করো, এখানে কারো বাড়িতে পার্টিতে অনুরোধে গান করো, সেটাকে গান করা বলে না।

আমি তা স্বীকার করি না। গান ভালোবেসে আসরে গাইতে হবে, রেকর্ড বের করতে হবে, রেডিওতে গাইতে হবে— তার কোনো মানে নেই। একটা মানুষ নিজের জন্যেও গান ভালোবাসতে পারে। পারে না ? সেটার কোনো দাম নেই ?

বেলাল চুপ করে রইল।

কই, জবাব দাও।

তর্কটা গান নিয়ে হচ্ছে না, সাকিনা। আমাকে তুমি বলো, মানুষ সুন্দর কীসে ? তার ভেতরটা সুন্দর বলে। গান জানো কি-না, রূপ আছে কি-না, ধনী কী গরিব, ফ্যাশানে সবার আগে কী-না এসব কিছুর কোনো যোগ নেই ভেতরের ঐ সৌন্দর্যের সঙ্গে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বলো, কাশেম তোমাকে মুখোমুখি নয়, টেলিভিশনে কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেই তোমার ভেতরের সেই সৌন্দর্য টের পেয়ে গেল, প্রেমে পড়ে গেল আর বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠল ?

সাকিনা বলল, না হয় রূপ দেখেই খেপে উঠেছিল, বিয়ের পরেও তো ভালোবাসা হতে পারে ? আর তুমি শুধু ওর দিক থেকেই বলছ, আমার যেন অস্তিত্বই নেই।

নিশ্চয়ই তোমার অস্তিত্ব আছে। তুমি আমাকে বলবে তো, যে ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছ ? না, সাকিনা, প্রথম দেখায় প্রেমে পড়া, এ আমি বিশ্বাস করি না। ওটা নেহাত আকর্ষণ— কারো বেলায় রূপ, কারো বেলায় টাকা, কারো বেলায় সুনাম ; কারো বেলায় অন্য কোনো বাস্তব স্বার্থের আকর্ষণ। আমাকে তুমি বোলো না যে, প্রথম দেখেই প্রেমে তুমি পড়েছিলে। তোমার

বাবা দেখেছেন ছেলে বিলেতে আছে, ব্যারিস্টারি পড়ছে, ভবিষ্যৎ আছে ; তুমি দেখেছ, মানুষটি কুৎসিত নয়, মানুষটি সপ্রতিভ—

বিয়ের পরে ভালোবাসা হতে পারে না ?

না, পারে না। নির্মম কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বেলাল। বিয়ের পরে দু'জন দু'জনে অভ্যস্ত হয়ে যায় মাত্র। যারা হয়, তাদের দেখে আমরা বলি, ওরা সুখী, ওদের ভালোবাসা আছে ; যারা অভ্যস্ত হতে পারে না, তারা মনে করে ভালোবাসা পেলাম না ; তাদের ছাড়াছাড়ি হয় কিংবা সারা জীবন ঝগড়া করে যায়।

তুমি নিজে তো বিয়ে করো নি, তোমার কথা মানব কেন ?

বিয়ে করি নি কিন্তু দেখেছি। ভালোবাসা ছাড়া বিয়ে করব না বলেই এতকাল করি নি যদিও আমার সব বন্ধুই প্রায় করেছে।

তোমার কাছে তাহলে ভালোবাসা কী ?

বিজ্ঞান বইয়ের মতো সংজ্ঞা দিতে পারব না। তুমি যখন আমার ভেতরটাকে ছুঁয়ে গেলে, এই ছ'মাস ধরে ভেবেছি এই কি ভালোবাসা ? এটাই যদি ভালোবাসা হয় তো এটাই ভালোবাসার উদাহরণ, সংজ্ঞা দিতে পারব না। এই তো, তোমার রেকর্ডের র‍্যাকে দেখেছিলাম সেদিন ভানুসিংহের পদাবলীর রেকর্ড। তার ভেতরে আছে, তোমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যাকে ভালোবাসি তার ভেতর নাকি অনন্তের সন্ধান আমরা পাই। তাহলে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, যার ভেতর অনন্তের সন্ধান আমরা পাই তাকেই আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সেটা একটি মেয়েই যে কেন হবে, তাও ভালো করে বুঝতে পারি না। আবার কোথা যেন পড়েছিলাম, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে আছে নিজস্ব এক শূন্যতা, সেই শূন্যতা খাঁজে খাঁজে যখন কারো অস্তিত্ব দিয়ে ভরে যায়, তখনি ভালোবাসা সেই মানুষটির জন্যে। আবার একজন আমাকে বলেছিলেন, আমাদের ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে সুন্দর করে তোলে যে তাকেই আমরা ভালোবাসি; না, সাকিনা, সংজ্ঞা দিতে পারছি না, বলতে পারছি না, ভালোবাসা কী ?— কেবল কিছু উদাহরণ ছাড়া বোঝাবার মতো আমার কিছু নেই।

সাকিনার একটা হাত টেনে নিল বেলাল। সেই হাতের ওপর অনেকক্ষণ ধরে চাপ দিয়ে নীরব হয়ে রইল সে। যেন সমস্ত শব্দ আর উচ্চারণ ঘনীভূত হয়ে এক নিরেট স্তব্ধতায় পরিণত হয়েছে।

বেলাল বলল, প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ি নি আমি। অনেকদিন থেকে চেনা ছিল। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি, এই মানুষটির জন্যেই আমার অপেক্ষা, আমার গড়ে ওঠা। একটু একটু করে সে আমার সর্বস্বের সঙ্গে এক হয়ে গেল। স্বার্থ আর বাস্তবতার কথা ভাবলে, তাকে পাবার কোনো কথা নয় আমার। তবু তাকেই আমার ভালোবাসতে হচ্ছে। এই অনিবার্যতার জন্যেই বুঝেছি, এ আমার নিয়তি, এতেই আমার পরিণতি, এখানেই আমার ভালোবাসা।

সাকিনাকে জড়িয়ে ধরল বেলাল। আবারো গাল ফিরিয়ে দিল সাকিনা। সেখানেই ঠোঁট রেখে বেলাল বলল, তুমি আমার।

ঠিক তখন নিচে বাইরের দরোজায় ক্লিক করে একটা শব্দ হলো।

১১

রাত এখন পৌনে পাঁচটা। কিন্তু রাত নয়, লন্ডনের আকাশে ভোরের আলো গভীর হয়ে আছে। ট্যাকসির পয়সা চুকিয়ে দরোজা খুলল কাশেম। একবার ভয় হয়েছিল চাবিটা হয়ত ওখানে পড়ে গেছে। শেষে একরাশ খুচরো পয়সার ভেতরে খুঁজে পাওয়া গেল চাবিটা।

হুইস্কির নেশাটা কেটে গেছে, এখন ভয়াবহ শূন্য লাগছে মাথার ভেতরটা— সমস্ত সন্ধে এবং রাতটাকে অবাস্তব আর অন্য কারো জীবনের বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই বোধটাই তার ভেতরে এনে দিয়েছে আগে কখনো যার সাক্ষাৎ সে পায় নি, এক ধরনের স্বনির্ভরতা ও ঔদ্ধত্য।

বসবার ঘরের ভেতর দিয়ে ওপর যাবার মুখেই সে দেখতে পেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে বেলাল। একটু অবাক হলো, এই শেষরাতেও বেলালের পরনে ট্রাউজার দেখে। কিন্তু শূন্য মাথায় সে ভাবনার কোনো পরিণতি এলো না।

বেলাল স্বাভাবিকভাবে হাসবার চেষ্টা করল। বলল, একটু ওপরে গিয়েছিলাম। বাথরুমে।

ও।

তুই এই এখন ফিরলি?

হ্যাঁ।

কাশেম তরতর করে ওপরে উঠে গেল। শোবার ঘরের দরোজা খুলে শব্দ করে খুট করে জ্বালিয়ে দিল ঘরের বড় বাতিটা।

সাকিনা ঘুমিয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। সাকিনার ঘুম যত গাঢ়ই হোক, ঘরের বড় বাতি জ্বাললে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় সব সময়; আজ ভাঙ্গল না, কিন্তু সেটাও শূন্য মাথায় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো না।

বিছানার পাশে বসে কাশেম জুতো খুলতে লাগল।

একবার তাকিয়ে দেখল সাকিনাকে। কিন্তু ঘুমন্ত সাকিনার মুখ তাকে ছুঁয়ে গেল না— না হৃদয়ে, না শরীরে।

এখন সে বিছানায় যাবে। ঘুমোবে?

না, আজ রাতের মতো ঘুম সে ঘুমিয়েছে। ক্রিস্টিনার হাতে সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ব্যর্থতা তরল প্রবাহ হয়ে নির্গত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল এক প্রশান্ত জলপ্রবাহে। তারপর ঘুম থেকে যখন জেগে উঠেছিল, তখন এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল সে বাড়িতেই আছে। তারপর, তার মনে হয়েছিল বাড়ি কাকে বলে? যেখানে স্বচ্ছন্দে ফিরে যাওয়া যায় সেটাই তো বাড়ি।

তার কোনো বাড়ি নেই।

বাড়িতে সে ফিরে যাবে না— সেই বাড়ি, যেখানে সাকিনা।

দরোজা খুলে দেখেছিল, সোফার ওপরে বাবুল আর একটি মেয়ে কম্বল টেনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আর মেঝের ওপর শুয়ে আছে ক্রিস্টিনা আর একটি মেয়ে। সমস্ত ঘর শান্ত হয়ে আছে ঘুমের ভেতরে। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে রাতের পার্টির গেলাশ, প্লেট, বোতল। চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ায় এখনো ভারী হয়ে আছে বাতাস।

একবার একটু অবাক মনে হলো তার, বাবুল তাকে নিজের ঘরে নিজের বিছানায় পাঠিয়ে নিজে কেন সোফায় শুয়ে আছে? কী তার স্বার্থ? বন্ধুর জন্যে আত্মত্যাগ? কিন্তু কেউ তো বিনা

কারণে কিছু করে বলে তার জানা নেই। সাকিনাই তার প্রমাণ। স্ত্রী, অথচ সেও তো বিমুখ; তার চেয়ে বেশি বিমুখ আর কেউ নয় আজ।

বাবুল বারবার বলে, সাকিনা সুন্দরী। যখনই দেখা হয়েছে, বাবুল সাকিনার গায়ে হাত রেখে কুশল জিগ্যেস করেছে, সামাজিক রসিকতা করেছে। সেটা এখন অত নির্দোষ বলে তার মনে হয় না। সাকিনার জন্যে তার ভেতরে একটা ইচ্ছে হয় নিশ্চয়ই। কিছুদিন আগে হলেও এই ভাবনা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। আজ, এখন মনে হয়, প্রশ্রয় দিলেও কিছু এসে যায় না তার।

ক্রিস্টিনার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছিল কাশেম। তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে নাম ধরে ডেকেছিল। তখন উঠে পড়েছিল মেয়েটি, আর তাকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে কাশেম ডেকে এনেছিল শোবার ঘরে।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ক্রিস্টিনা। তুমি আমাকে যা দিয়েছ আর কেউ আমাকে দেয় নি। কেন তুমি আমাকে ফেলে একা শুতে গেছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর অনবরত তার বুকে, তার পিঠে, কোমরে, পেছনে, সে সহিংস দুটো হাত দিয়ে আদর করছিল।

এসো, বিছানায় এসো।

না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

না। তুমি আমাকে চেনো না, জানো না।

আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

তুমি আমাকে চাও না, তুমি আমার শরীর চাও।

আমি তোমাকে চাই, তোমার সব চাই, ক্রিস্টিনা।

তোমার নেশা হয়েছে।

এসো বিছানায়। একবার তো এসেছিলে।

না, আসি নি।

আমাকে ধরো নি? হাতে নাও নি?

আমি ম্যাসার, আমার পারলরে এলেও তোমাকে হয়ত করে দিতাম, তার জন্যে পয়সা নিতাম।

পয়সা নিতে? ভীষণ আহত হয়েছিল কাশেম। পয়সা নিতে তুমি? তাহলে তুমি বেশ্যা।

গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল ক্রিস্টিনা। আর কক্ষনো বলবে না। কাউকে না। আমি বেশ্যা নই এ কথাটা জানার মতো পরিচ্ছন্ন যেদিন হতে পারবে, আশা করি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কাউকে কিছু না বলে কাশেম টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকিয়ে চলে এসেছিল।

হ্যাঁ, ওভাবে বলা তার উচিত হয় নি। বাবুলকে সে বলবে ক্রিস্টিনার সঙ্গে আবার তার দেখা করিয়ে দিতে। ক্রিস্টিনাকে সে ভুলতে পারবে না। ক্রিস্টিনার কাছে আঘাত পেয়ে সে সইতে পারবে না, যদিও ক্রিস্টিনা তার হবে না।

হতে কি পারে না?

তার বিয়ে না হলে, ক্রিস্টিনাকে সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারত। এখনো কি পারে না? এদেশে

তো সব সময়ই বিয়ে ভাঙ্গছে, আবার বিয়ে করছে মানুষ। এদেশের মানুষদের জন্যে তার একটু ঈর্ষা হয়। কী সহজে তারা ছক ভেঙ্গে আবার ছক সাজাতে পারে। কেবল আমাদেরই দেশে বিয়ে মানেই জন্মজন্মান্তরের বন্ধন। ছেলেবেলায় ইস্কুলে যাবার পথে একটা লোকের দেখা মিলত ফুটপাতে। সে লটারির ব্যবসা করত। খোপে খোপে শস্তা জিনিস সাজিয়ে রেখে চিৎকার করে লোক ডাকত, 'চলে যায় ভাগ্য পরীক্ষা। ট্রাই করুন, চেষ্টা করুন, তদবির করুন। কেউ হাতি পায়, কেউ ঘোড়া পায়, কেউ সাইকেল পায়।' তার সেই কথাগুলো এখনো স্পষ্ট মনে আছে কাশেমের। বাঙালির বিয়েটা ঐ রকম, সাইকেল পেলে আর আর ঘোড়ার কথা ভেবো না বাপু, ঘোড়া পেলে ঘোড়া নিয়েই তুষ্ট থাকো হাতির দিকে চোখ দিও না।

ক্রিস্টিনাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে তার। এইতো সে বাবুলের সঙ্গে ব্যবসা করবে, পাউন্ড রোজগার করবে, ক্রিস্টিনাকে নিয়ে চমৎকার থাকবে। দেশে ফিরে যাবে না সে। ব্যারিস্টারি পাস না করাটা যে কোনো অপরাধই নয়, ব্যর্থতাই নয়, সে কথাটা দেশে বাবা-মা আত্মীয়স্বজন কাউকে বোঝানো যাবে না। তার চেয়ে এই লন্ডন, এই ক্রিস্টিনা অনেক ভালো।

অনেকক্ষণ কাশেমকে বিছানার পাশে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সাকিনা আর চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করে থাকতে পারল না। প্রথমে ভয় ছিল, হয়ত বেলাল যে তার ঘরে ছিল সেটা কাশেম টের পেয়ে যাবে। কিন্তু যায় নি, টের পেলে এতক্ষণে তা বোঝা যেত। সাকিনা হাত রাখল কাশেমের পিঠে।

তুমি এলে?

উত্তর দিলে না কাশেম।

উঠে বসল সাকিনা। কখন এলে?

তবু কিছু বলল না কাশেম। বরং সে আবার জুতো পায়ে দিয়ে মনোযোগ দিয়ে ফিতে বাঁধতে লাগল। সাকিনা লেপ ঠেলে নীল স্বচ্ছ রাতের জামায় শীতে খানিকটা শিউরে উঠে দু'হাত বুকের ওপর ক্রস করে কাশেমের সমুখে এসে দাঁড়াল।

কোথায় ছিলে সারারাত?

যেখানেই থাকি।

আপত্তি করছি না। কেবল জানতে চাচ্ছি, কোথায় ছিলে?

সাকিনার এই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটা খেপিয়ে তোলে কাশেমকে। সাকিনা যদি বলত তার আপত্তি আছে, যদি হৈচৈ করে উঠত, তাহলে বরং খুশি হতো কাশেম। ক্রিস্টিনা কি বলতে পারত, শেষ রাতে সে ফিরে এলে, যে, তার আপত্তি নেই?

সাকিনাকে শারীরিকভাবে আঘাত করবার জন্যে কাশেমের হাতের পেশি ফুলে উঠতে লাগল। কিন্তু জোর করে শান্ত করল সে নিজেকে। আর সেই সংযত হবার চেষ্টায় তার দূরত্ব আরো বেড়ে গেল, নির্মম হয়ে গেল সে।

রাগ করেছ? বলবে না, কোথায় ছিলে? সাকিনা তার পাশ ঘেঁষে বসলো। তার মুখে মিনতির হাসি, আপোষের কাঁপন।

যদি বলি কোনো মেয়ের কাছে ছিলাম, খুশি হবে?

আমি তো বলি নি যে মেয়ের কাছে ছিলে।

বলো নি। কিন্তু ভাবছ।

তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?

তুমি স্বপ্ন দেখছ।

এরকম করে বোলো না, আমার কান্না পাচ্ছে।

কাশেমের কাঁধে সাকিনা মাথা রাখল। মৃদু ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিল কাশেম।

তুমি সত্যি খুব রাগ করেছ।

বারবার এক কথা বলো না।

তুমি বলো, রাগ করো নি।

বলতে পারব না।

তাহলে রাগ করেছ ?

সাকিনা মাথা সরিয়ে নিল আরো খানিকটা দূরে, ভালো করে দেখল কাশেমকে। নিজেকে ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হলো সাকিনার। গলার ভেতরে মুঠোর মতো কী একটা দলা পাকিয়ে রইল। সে বলল, সত্যি তুমি মেয়ের কাছে ছিলে ?

উত্তর দিল না কাশেম।

তখন হেসে ফেলল সাকিনা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলছ। আমি জানি তুমি সে রকম মানুষই না।

কী রকম ?

যারা বৌয়ের ওপর রাগ করে অন্য কারো কাছে যায়। কল্পনায় কী ঠিক করেছ ? মেয়েটি ইংরেজ না বাঙালি ? উঁহু, বাঙালি হবে না। বাঙালি আলাদা জাতের মেয়ে। তাহলে, বলো যে ইংরেজ মেয়ের কাছে ছিলে। কী গো ? ইংরেজ ?

জার্মান।

খিলখিল করে হেসে উঠল সাকিনা। চোখ গোল করে বলল, জার্মান ? ওরে, বাপরে। কোন ভাষায় কথা বললে ? তুমি তো জার্মান জানো না।

সে ইংরেজি জানে।

ইংরেজিতে ভালোবাসার কথা বলতে তাকে পারলে ? শোনাও না, কী রকম করে বললে ? বলো না ? ইউ আর বিউটিফুল, আই লাভ ইউ— বললে তো ? আমাকে একটু ইংরেজিতে বলো না, তুমি আমাকে ভালোবাসো।

আর প্রশ্রয় দিতে পারল না কাশেম। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সাকিনা, আমি মিথ্যে বলছি না। অন্তত এটুকু কৃতিত্ব আমায় দেবে যে, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলছি। আমি এক জার্মান মেয়ের কাছে ছিলাম।

বিশ্বাস করি না। তুমি পারো না।

পারি, আমি পারি।

সাকিনা বসেই রইল বিছানায়। তার আরো শীত করতে লাগল। কাশেম একটা চাদর বা সোয়েটার এগিয়ে দিলে হয়ত গায়ে জড়িয়ে নিত, নিজে উঠে গিয়ে নেবার ইচ্ছে হলো না। কাশেমের চোখের দিকে তাকিয়ে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করল সে খানিক, আর অসহায়ের মতো উচ্চারণ করল, পারো ?

হ্যাঁ, পারি।

জার্মান ?

হ্যাঁ, জার্মান।

কী নাম ?

কৌতূহল হচ্ছে ? এখন বিশ্বাস হচ্ছে ? এখন জানতে ইচ্ছে করছে, তোমার স্বামী কার কাছে গিয়েছিল ? কে সেই মেয়ে যার কাছে অন্তত একটা রাতের মতো শান্তি পেয়েছিল ?

উঠে দাঁড়াল সাকিনা। মৃতের মতো দেখালো তার মুখ।

তুমি সত্যি বলছ ?

তোমার জন্যে কিছুমাত্র কিছু আমার থাকলে হয়ত মিথ্যে বলতাম। না, আমি সত্যি কথাই বলছি। তোমার নামের সঙ্গে তার নামের শেষ অক্ষরে মিল আছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সে আমাকে বোঝে, আমি তাকে বুঝি।

কবে থেকে আলাপ ? যেন কারো কাহিনী শুনছে সাকিনা, প্রশ্ন করছে।

আজ সন্ধেবেলায়।

আজ ?

আজ। তাকে আমি বলেছি— ভালো লাগে, ভালোবাসি।

ঘণ্টাখানেক আগে বেলালের কথাগুলো চকিতে মনে পড়ে যায় সাকিনার। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরে সাহস ফিরে আসে, চৈতন্য ফিরে পায় সে।

প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা ?

নিজের গলায় বিদ্রূপের সুর দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সাকিনা।

কেন, তুমিও তো আমাকে প্রথম দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলে ? মনে নেই ? ঠাট্টা করছ কেন ?

সাকিনার মনে হলো তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। তবু জোর করে সে উচ্চারণ করল, আমারও মনে পড়ছে, তুমি বলেছিলে, আমাকে দেখেই তুমি ভালোবেসে ফেলেছিলে। আমি ভুলি নি।

ভুলতে চেষ্টা কোরো।

আমি জানতাম না, প্রথম দেখায় ভালোবাসা হয় না।

আমিও জানতাম না, প্রথম দেখায় প্রথম যা মনে হয়, তা ভুল।

জার্মান মেয়েটির জন্যে তো ভুল মনে হচ্ছে না তোমার ?

তার সঙ্গে প্রথম দেখা আর তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, দুটোয় তফাত আছে আকাশ-পাতাল। তুমি তা বুঝবে না। সাকিনা, আমি আর পড়ব না, ব্যবসা করব। বাবুলের সঙ্গে সব ঠিক করে এসেছি। এই বাড়ি থেকে টাকা তুলতে হবে, দরকার হলে বাড়ি বিক্রি করে দেব। তুমি এ বাড়িতে থাকো বলেই জানিয়ে রাখলাম। নইলে দরকার হতো না।

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সাকিনা। অচেনা মনে হলো মানুষটিকে। এখনো যেন একবার মনে হলো, সব মিথ্যে বলছে। কিন্তু কাশেম যখন সিগারেট ধরালো, তখন মনে আর সন্দেহ রইল না যে সব সত্যি। শোবার ঘরে সিগারেট ধরানো বারণ, আজ সেটাও কাশেম উপেক্ষা করল। ছোট্ট এই ঘটনায় সাকিনার মন হঠাৎ বরফ হয়ে গেল।

ধীর পায়ে সাকিনা নেমে এলো নিচে। তার মনে হতে লাগল, আর কখনো ওপরে ফিরে যেতে পারবে না সে।

এসে রান্নাঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। জানালার তাকে টবে কয়েকটা গাছ, সেখানে পানি দিল ; খুলে দিল জানালার পাট। মুহূর্তে শীতের তীব্র হাওয়া এসে অবশ করে দিল তার মুখ। পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বেলাল।

ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, সচকিত চোখে, আমাদের কিছু টের পেয়েছে ?

ধীরে মাথা নাড়ল সাকিনা।

মনে হলো, তোমাকে হাসতে শুনলাম।

উত্তর দিল না সাকিনা।

কোথায় ছিল ?

জানি না।

শুয়ে পড়েছে ?

ধীর গলায় সাকিনা বলল, আজ তোমার কোথায় কাজ আছে না ? আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি ? আমি যেতে চাই।

সাকিনার কাঁধে বেলাল হাত রাখলে, সাকিনা আস্তে করে হাতটা নামিয়ে দিল।

বেলাল বলল, তাহলে ন'টার দিকে বেরুবো।

১২

সাকিনা নিজের গাড়ি নিয়েই বেরুলো। ব্রিক লেনে বেলালের কাজ ছিল বাবর মিয়ার সঙ্গে। লোকটি কাজ করত এক ইহুদির কারখানায়, জ্যাকেটের জন্যে সাইজ মতো চামড়া কাটার কাজ। সেখানে কাজে গাফিলতির জন্যে কাজ গেছে বাবর মিয়ার। বাঙালিরা বলছে, বর্ণবিদ্বেষের জন্যে কাজ গেছে। মালিক বলছে, বাবর মিয়ার কাজে মনোযোগ ছিল না, তার ঐ এক ভাবনা বৌকে এদেশে আনতে পারছে না। আপোষের কোনো সম্ভাবনা আছে কী-না, সেটাই প্রাথমিকভাবে দেখার কথা বেলালের। তার মনে হয়েছিল, মালিকের কথাই ঠিক। কারণ, বাবরের মতো আরো অনেক বাঙালি ও বাইরের অনেক লোক কম মাইনেয় বেশি কাজ করতে রাজি, সপ্তাহের সাতদিনই কাজ করতে রাজি, এরজন্যে শ্রম-বিভাগে কোনো ঝামেলা বা মামলা হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব, মালিক যে বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বাবরকে ছাঁটাই করবেন, তা মনে হয় না। এছাড়া, ঐ কারখানায় আরো বাঙালি আছে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান আছে, বর্ণবিদ্বেষ থাকলে সবাইকে ছাঁটাই করবার কথা। তারচেয়ে, সমস্যাটার উৎস ব্যক্তিগত পর্যায়ে হওয়াটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। বাবর মিয়াকে নিয়ে এর আগেও ঝামেলা হয়েছিল। বেলাল জানে, তখন সমস্যা ছিল— বৌ আনতে না পারাটা। আজ তার সঙ্গে দেখা করে সে ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে চেয়েছিল বেলাল।

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সাকিনাকে নিয়ে বেরুতে হলো।

সাকিনা ভোরবেলায় বলেছিল তার সঙ্গে বেরুবে, তখন মনের মধ্যে লাফিয়ে উঠেছিল যে উত্তেজনা, তার হাত থেকে এখনো নিস্তার পায় নি বেলাল। তাহলে কি সে পেয়ে গেছে সাকিনাকে ? কাশেমের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কী হলো তার ? বেলালের এমনও মনে হলো, এই যে বেরুনো, দু'জনে একসঙ্গে এই হয়ত এ বাড়ি থেকে শেষ বেরুনো।

সাকিনাকে সে বুকের ভেতরে রেখে দেবে, যদি সাকিনাকে আর ফিরতে না হয়।

বেরুনোর মুখে সাকিনা গলা তুলে বলেছিল, যেন ওপরে কাশেম তা শুনতে পায়, বেলাল, তুমি বেরুচ্ছ ? আমিও বেরুচ্ছি। চলো, তোমাকে নামিয়ে দেই।

একবার নিজের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল বেলাল। কিন্তু সাকিনা বলেছিল, চলে এসো।

বড় রাস্তায় উঠে সাকিনা জানতে চাইল, কোথায় তোমার কাজ ?

ব্রিকলেনে।

কোনদিক থেকে যেতে হয় জানি না।

ভাবছি, যাবো না।

কেন ? কাল গেলেও চলবে।

ও।

সাকিনাকে খুব ভাবিত মনে হলো বেলালের। জিগ্যেস করল, মন খারাপ ?

না। না, তো।

একমনে গাড়ি চালাচ্ছে সাকিনা। বেলাল জানতে চাইল, কোথায় যাচ্ছ ?

জানি না। যে রাস্তা ভালো লাগছে, সেই রাস্তা নিচ্ছি। তুমি তো কাজে যাবে না বললে ?

হ্যাঁ, যাবো না।

ক্ষতি হবে না ?

হাসল বেলাল। সাকিনার সিটের কাঁধে রাখল সে। বলল, জীবনে এমন দিন ক'টা আসে বলো, যখন ক্ষতি ক্ষতি মনে হয় না ?

কেন বলছ ?

রোববারের ভোরবেলায় পথে তেমন ভিড় নেই, না গাড়ির না পথচারীর। তরতর করে এগিয়ে চলেছে তাদের গাড়ি। সাকিনা ওয়েস্টএন্ডের দিকে মোড় নিল।

বেলাল বলল, অবশ্য, এর পেছনের কারণটা সুখেরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে।

কিছুই বুঝতে পারছি না কী বলছ।

আমার যার কাছে যাবার কথা ছিল আজ সকালে। বাবর মিয়া। তারও কাছে কিন্তু কাজের ক্ষতি, ক্ষতি বলে মনে হচ্ছে না। আমি জানি, ফ্যাক্টরিতে গিয়ে সে চুপ করে বসে থেকেছে, কাজ ফেলে রেখেছে। কেন জানো ? বৌ আনতে পারছে না বলে।

অসুবিধে কী ?

বিয়েটা হার মেজেস্টিজ সরকারের কাছে প্রমাণ করতে পারছে না বলে। একা বাবর মিয়া নয়, অনেকেরই এই দুর্গতি। তবে সবাই যে বৌয়ের জন্যে পাগল হচ্ছে তা নয়। অনেকে দিব্যি মানিয়ে আছে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, বাবর মিয়ার ভালোবাসা কি সেই ভালোবাসা যা আমার ভেতরটা ভরে রেখেছে ? নিছক সান্নিধ্যের জন্যে ? না, তার বেশি কিছু ? শ্রেণী, সমাজ, বিদ্যা, অর্থ কোনোদিক থেকেই বাবরের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই। অথচ আমারও তো তারই মতো মনে হচ্ছে, ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে না পেলে সব আমার অর্থহীন।

সমুখেই আসছে ওয়াটারলু ব্রীজ। গাড়ির গতি কমিয়ে সাকিনা বলল, কোনদিকে যেতে চাও ?

চট করে কিছু বলতে পারল না বেলাল।

গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে, সমুখের দিকে তাকিয়ে সাকিনা বলল, কই বলো।

তার উচ্চারণে অসহিষ্ণুতা লক্ষ করে একটু অবাক হলো বেলাল। কেন এই অস্থিরতা ? খুব জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল কাশেমের কথা, কিন্তু প্রকাশ করল না। জিগ্যেস করল, তোমার কী ইচ্ছে ?

আমি তো তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি। কোথাও যাবার না থাকলে, চলো ফিরে যাই।

না, না, দাঁড়াও।

এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি দাঁড় করাতে পারব না। নিয়ম নেই।

জানি, আমিও গাড়ি চালাই।

তাহলে চটপট করো।

আচ্ছা, আগে ব্রীজ পার হও, তারপর বলছি।

গাড়ি ওয়াটারলু ব্রীজের দিকে ছুটিয়ে দিল সাকিনা। ব্রীজের কাছে এসে বলল, এরপর ?

ইউস্টনের দিকে চলো তো, তারপর দেখা যাবে।

বেলাল ভাবতে লাগল, কোথায় যাওয়া যায়। সাকিনা যে কতক্ষণের জন্যে বেরিয়েছে তাও জানা নেই। সারাদিনের জন্যে হলে অনেক দূরে যাওয়া যেত। সারাদিন আজ তার ইচ্ছে করছে সাকিনার সঙ্গে থাকতে। আর সেই সম্ভাবনায় এই প্রথম তার মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভেতরেও তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বেলাল বলল, গাড়িটা আমার হাতে দাও।

আমি চালাতে পারি না ?

আমি চালাতে চাই।

তার মানে বলবে না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

আমি নিজেই এখনো জানি না, শুধু জানি, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ সারাটা দিন। আজ, আজীবন। তোমাকে যদি তোমার বাড়ি ফিরতে না হতো।

সাকিনা হঠাৎ হেসে উঠল।

হাসলে যে ?

কিছু না। কিছু না। তুমি চালাবে ? আচ্ছা।

সাকিনা গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে ঘুরে এলো বাঁদিকে, বেলাল গাড়ির ভেতরেই আসন বদল করে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি যখন চলতে শুরু করল, সাকিনা জিগ্যেস করল, গান শুনবে ?

নিজেকে রাজার মতো মনে হলো তখন বেলালের। মনে হলো, সাকিনার সঙ্গে তার সংসার শুরু হয়ে গেছে। কৃতজ্ঞ গলায় সে বলল, শোনাও।

আমি ? আমি শোনাবো না। শুনতে চাইলে ক্যাসেট চালিয়ে দিতে পারি।

না, শুনব না।

কিছুক্ষণ পরে সাকিনা বলল, তুমি না শোনো, আমি শুনব। এই বলে সে নিচু হয়ে একটা ক্যাসেট খুঁজে চাপিয়ে দিল। অচিরে ছড়িয়ে পড়ল নাচের সুর।

বেলাল বলল, এটা গান নয়।

তোমার কথাও রাখলাম, আমার কথাও থাকল। তাই অর্কেস্ট্রা দিয়েছি।

সুরের তালেতালে খুব আবছা করে হাঁটু দোলাতে লাগলে সাকিনা।

নাচতে ইচ্ছে করছে ?

না।

নাচ জানো ?

এখানে এসে শিখেছিলাম। কেন, তুমি তো আমাকে নাচতে দেখেছ। বাবুলের ওখানে একবার নতুন বছরের রাতে জমেছিল সবাই। মনে নেই ?

না, মনে নেই। বেলাল একটু পরেই যোগ করল, আর এতেই বুঝবে তোমাকে কখনো আলাদা করে, বিশেষ করে, দেখি নি, প্রথম দেখাতে প্রেমে পড়ি নি।

এই, এই, কোনদিকে যাচ্ছো ?

বলব কেন ?

তাহলে আমি নেমে যাচ্ছি।

নামতে দিলে তো ?

বলো না কোথায় যাচ্ছো ?

বেলালের ভালো লাগল সাকিনার গলায় মিষ্টি অনুনয়টুকু। আরো আপন মনে হলো তাকে; স্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতটা সরিয়ে সাকিনার হাঁটুর ওপর রেখে বলল, আমাকে যে ভরসা করতে পারো তার প্রমাণ কাল রাতে পেয়েছ। পাও নি ? এখন দিনের বেলায় ভয় করছ ?

মোটেই ভয় করছি না। আমার কোনো ভয় নেই।

তাহলে চলো আমার সঙ্গে। আমরা এখন মোটরওয়ে নেব। অনেকদূর যাবার পর যে জংশন ভালো লাগবে— নেমে ছোট সড়ক নেব। তারপর চোখে যে হোটেল ভালো লাগবে সেখানে থামব। সেখানে আমরা দুপুরে খাবো। তারপর ঘরে গিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করব, আবার যখন বলবে, তোমাকে ফিরিয়ে দেব তোমার বাড়িতে।

১৩

দরোজায় কেউ এসেছে। টুংটাং করে বেল বাজছে। কাশেম একবার ভাবল, সাকিনা ফিরে এসেছে, কিংবা বেলাল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ওদের কাছে তো চাবি আছে। বেল বাজাবে কেন ?

দরোজা খুলে দেখে, বাবুল।

কির শালা, তরকারি খেয়ে মুখ মুছে না বলে না কয়ে হাওয়া ?

বাবুল কাশেমকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকলো। পেছন ফিরে চট করে চোখ টিপে জানতে চাইল, বৌ কই ?

চোখ টেপার কারণ ক্রিস্টিনা, না সাকিনা, কাশেম একবার দ্বিধায় দুলে উঠল।

বাইরে গেছে।

দুস শালা।

তুই হঠাৎ ? রেস্তোরাঁ নেই ?

আছে। ভাবলাম, কাল রাতে কী করলি শুনেও আসি, ব্যবসার কথাটা পাকাও করে আসি।

বসবার ঘরে টেলিভিশনের ওপর রাখা সাকিনার ছবি। তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে বাবুল বলল, বল, এবার কী হলো কাল রাতে। ন্যাকা সাজছিস যে ?

না, তুই বোস। ভাবতেই পারি নি, ব্যবসার কথাটা তুই সিরিয়াসলি নিবি।

তাহলে কাল ঠাট্টা করছিলি

না, আমি তো সিরিয়াস। সেই জন্যেই তোর কাছে গেলাম। তুইও দেখলাম পুরনো বন্ধুকে ভুলে যাস নি। ব্যবসা আমাকে করতেই হবে। লেখাপড়া আর হবে না। বয়সও হয়ে গেছে, এখন গুছিয়ে না বসলে, বসব কবে

তোর মতো গাধা বলেই বিয়ে করেছিস আর বই নিয়ে গুঁতোচ্ছিস। তা ব্যবসা করবি, সাকিনা কী বলে ?

ও আবার কী বলবে ?

তবু, ওর কোনো মতামত নেই ?

কাশেমের একটু সন্দেহ হয়। হঠাৎ করে সাকিনার মতামতের কথা তুলছে কেন ? সাকিনা টের পায় নি তো যে, সে বাবুলের সঙ্গে ব্যবসা করতে যাচ্ছে, আর তাই আজ সকালে বেরিয়ে বাবুলকে সাবধান করে এসেছে ?

সাকিনার কথা রেখে দে। ও আছে ওর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে। কী খাবি বল ? হুইস্কি আছে। তোর তো চলে।

এই দুপুর বেলায় আবার হুইস্কি ? দে। বসি একটু। সাকিনা থাকলে ভালো হতো।

সাকিনার কথা বারবার তুলছে কেন বাবুল ?

হুইস্কি ঢালতে ঢালতে আড়াচোখে তাকিয়ে কাশেম বলল, ব্যবসার কথা পাকা করবি বলছিলি।

সব হবে। আগে তুই বোস এসে। কাছে বোস, শালা। শুনি সব। ক্রিস্টিনাকে নিতে পারলি ?

কাশেম একটু হাসল খুব সংক্ষিপ্ত করে।

ভেরী গুড। কেমন লাগল ?

কাশেম আবার নিঃশব্দে হাসল।

কংগ্র্যাচুলেশন। জানতাম শালা, তোরই সঙ্গে শোবে। ঘরে ঢুকেই তোকে দেখে আমাকে বলে, ইয়োর ফ্রেন্ড লুকস রড স্টাইগার। শালা তখনি জানি।

কাশেম বলল, বাদাম-টাদাম কিচ্ছু নেই ঘরে। রোববারে এদিকে একটা ইন্ডিয়ান দোকান খোলা থাকে। নিয়ে আসি ?

বোস, বোস। বৌ সংসার দেখে না বুঝি ?

দেখবে না কেন ?— দেখে। কাশেম আবারো চিন্তিত হয়। বাবুল কেন ঘুরে ফিরেই সাকিনার প্রসঙ্গ তুলছে ? আরো একটা ভুল করল সে। গান শুনবে কিনা জিগ্যেস করতেই বাবুল বলে উঠল, তোর বৌও তো গান গায়। আজকাল গায়-টায় না ? না, তোরই জন্যে শুধু ? শালা, আমাদেরও ভাগ দিস।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কাশেম। লম্বা এক চুমুক হুইস্কি নিয়ে সে বলল, কাল বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম, বুঝলি।

আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল। বাবুল সোফার ওপর এগিয়ে বসলো। দু'হাঁটুর মাঝখানে

গেলাশ রেখে দোলাতে দোলাতে বলল, আমরা না হয় বদমাশ অ্যান্ড ব্যাচেলর ; আমরা করি, তার একটা অর্থ হয়। তোরা ম্যারেড, বৌ সুন্দরী, জীবনে মেয়েমানুষের উরু দেখিস নি, মানে বৌয়ের ছাড়া, তোর হঠাৎ শখ চাগিয়ে উঠল কেন ?

কাশেম নিঃশব্দে আরো একবার হাসল।

বুঝেছি শালা, এই হাসি দেখিয়েই বৌ পটিয়েছিলি। আমি ছাড়ছিনে, জবাব চাই। কাল রাত থেকে শালা আমি এই কথাটাই ভাবছি, যে কাশেমটার হলো কী ? ব্যবসা করবে, মেয়েবাজি করবে। নিশ্চয়ই সামথিং রং।

কীসের রং ? সব শাদা। বলে, নিজের রসিকতায়, নিজেই হেসে উঠল কাশেম।

বাবুল সিলকের রুমাল বের করে নাক ঝেড়ে বলল, তুই বললেই বিশ্বাস করব ? না হয় বিয়ে নাই করেছি, আল্লা দুটো চোখ দিয়েছেন তো ? এদেশে এই যে আজকাল ওয়াইফ-সোয়াপিং চলছে, বলে কয়ে জানিয়ে শুনিয়ে এক রাতের জন্যে এর বৌ ওর কাছে যাচ্ছে, ওর বৌ এর কাছে আসছে, এ কেন ? ম্যারেড লাইফে যদি রং কিছু না থাকবে তো এত ভেলকি কেন, বাবা ?

এক ঢোঁকে গেলাশের সবটুকু শেষ করে বাবুল ইঙ্গিতে আরো কিছুটা চাইল।

কাশেম বলল, গেলাশে হুইস্কি ঢেলে দিয়ে, ব্যবসার কথা বল। কালতো ভালো করে কথাই হলো না। আশা ভরসা দিচ্ছিস তো, নাকি পানিতে গিয়ে পড়ব ?

তোর সঙ্গে ব্যবসার কথা আর কী বলব ? ব্যবসা করবি, পেছনে আমি আছি। আমারও ব্যবসা বাড়াতে হবে, তোরও দাঁড়াতে হবে।

কী যে বললি, পাকা কথা আছে ?

ওটা কথার কথা। অনেকদিন তোর এখানে আসি না। সেই শেষ কবে এসেছিলাম মনেও পড়ে না। তোর সঙ্গে তবু দু'একবার দেখা হয়, সাকিনার সঙ্গে দেখাই নেই।

যাক সাকিনার সঙ্গে তাহলে আজ সকালে বাবুলের দেখা হয় নি। নিশ্চিত হলো কাশেম। ক্রিস্টিনার কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু প্রথমে কেমন লজ্জা করল। ইতস্তত করে বলল, সকালে বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম, তোরা সব বসবার ঘরে শুয়ে আছিস।

উপায় কী ? তুমি গিয়ে আমার ঘর দখল করলে। ক্রিস্টিনাকে শোয়ালে। আমরা কোথায় যাই!

ক্রিস্টিনাও বসবার ঘরে শুয়ে ছিল।

ন্যাকা বোঝাচ্ছ, শালা। সকালে উঠে দেখি, আমার বিছানায় ক্রিস্টিনা আর তুমি শালা হাওয়া। চালাকি পেয়েছ ?

তাহলে ক্রিস্টিনা তার চলে আসবার পর বাবুলের বিছানাতেই শুয়ে পড়েছিল। এখনো শরীরের ভেতরে সেই আনন্দ, সেই প্রবাহিত হবার সুখ থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে কাশেমের।

বাবুল বলল, ক্রিস্টিনাকে চাস তো লাগিয়ে দি। কিন্তু বৌ বোঝাবি কী করে ?

বৌকে ভয় পাই নাকি ?

ও, এই ব্যাপার ? তাই বলি, কাশেম মিয়ার হঠাৎ বাইরে পা কেন ? তুই যদি ম্যানেজ করতে পারিস, পাবি ক্রিস্টিনাকে। ওর এখানে থাকা নিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল, হোম আপিস ভিসা নিয়ে গণ্ডগোল করছিল, দিইছি ম্যানেজ করে। আমার কাছে গ্রেটফুল আছে। আর আমারও ওর দিকে চোখ নেই। তুই এগিয়ে যেতে পারিস।

কিছু খাবি ?

খাবো মানে ?

দুপুরে নিশ্চয়ই কিছু খাস নি।

আমি কোনোদিনই দুপুরে কিছু খাই না। সাকিনা আসছে না কেন ? দেরি হবে ?

বলতে পারছি না।

ও, সেই বাংলাদেশ সেন্টারে গেছে বুঝি ?

কাশেমের মনে পড়ল, কাল মিথ্যে করে বলেছিল, সাকিনা বাংলাদেশ সেন্টারে বাচ্চাদের বাংলা পড়াতে যায়। এখন বলল, হ্যাঁ, সেখানেই গেছে। বোধহয় দেরি হবে।

সুন্দরী বৌ একা ছাড়তে ভয় করে না ? ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোর আবার মুখ বদলাবার দরকার হয়ে পড়েছে। বৌ আর তোর চোখে পড়বে কেন ?

বাবুল এমন করে চোখ টিপল হঠাৎ যে ভীষণ অশ্লীল মনে হলো কাশেমের। বাবুল কি সাকিনার জন্যে আজ এসেছে ? কাশেমকে অন্য মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে তার এত আগ্রহ কি সাকিনাকে বিছানায় নেবার জন্যে ?

দপ করে মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল কাশেমের। যে সাকিনাকে সে নির্মমভাবে আঘাত করেছে আজ ভোরে, যে সাকিনার উপস্থিতিকে অস্বীকার করবার জন্যে সে গতকাল ফেরারি থেকেছে, সেই সাকিনার জন্যে তার এতখানি লাফিয়ে ওঠার ভেতরে যে একটা পরস্পর বিরোধিতা আছে, আদৌ তা এখন চোখে পড়ল না কাশেমের। বাবুলের অস্তিত্বটাকেই মুছে ফেলতে পারলে সে এখন যেন শান্ত হতো।

কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না কাশেম। তখন আরো অসহায় মনে হলো নিজেকে। সাকিনার মুখখানা বারবার দুলে উঠতে লাগল চোখের সমুখে। কোথায় গেল সাকিনা ? কোথায় এখন কী করছে সে ?

বাবুল উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করল খানিক। আবার এসে বসল। বলল, নাঃ, তোর বাড়িটা বড্ড খালি খালি। বেলাল আছে এখনো তোর এখানে ?

আছে।

বেরিয়ে গ্যাছে বুঝি ?

হ্যাঁ, বাড়িতে আর থাকে কখন।

ঐ আর এক বুদ্ধিমান ছেলে। তোর মতো নয়। দিব্যি হাত পা ঝাড়া। একবার আম র ওখানে আসতে বলিস তো। অনেকদিন দেখি না। তোর টয়লেট কোথায় ? ওপরে ?

তরতর করে ওপরে উঠে গেল বাবুল। দরোজা খোলা রেখেই প্রস্রাব করতে শুরু করল। নিচে বসবার ঘর পর্যন্ত ভিজে গেল শব্দে।

দুপদাপ করে নেমে এলো বাবুল।

বেশি আর দেরি করে কী হবে ? ও বেলায় রেস্তোরাঁয় হাজিরা আছে। ব্যবসা করতে যাচ্ছিস, মনে রাখবি, নিজে চোখ না রাখলেই ফাঁক। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা ?

বাবুল চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল খানিক কাশেমের দিকে।

সাকিনাকে নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে আয় আমার ওখানে। একসঙ্গে বসে সব ফয়সালা করা

যাবে। ব্যবসার কথা আর কী। সাকিনাকেও কাজে লাগাতে হবে। ও যদি আমার রেস্তোরাঁয় বসে, তাহলে তুই আর আমি নিশ্চিন্তে টেকঅ্যাওয়ে কারবারটা গুছিয়ে ফেলতে পারতাম। কী বলিস? এতক্ষণে কাশেমের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সাকিনার দিকে চোখ পড়েছে বাবুলের। সে ইতস্তত করতে লাগল।

কী ভাবছিস? ক্রিস্টিনা? সাকিনা টেরও পাবে না।

না, সে কথা নয়।

তাহলে? ইয়োরোপীয়ান মেয়েদের নিয়ে এই এক সুবিধে। জগের পানি গেলাশে ঢালে না। যার যার জায়গায় সে সে থাকো।

নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত মনে হয় কাশেমের।

ভালো কথা। ক্রিস্টিনা যাবার সময় তোর ফোন নম্বর চাইছিল। বাবুল মিথ্যে কথা বলল।

তুই দিলি?

ঘাবড়াসনে। বিয়ে করেছিস তো কী হয়েছে। এ মাগিরা দেবার জন্যে তৈরি। বাদামি চামড়া চায়। নে, ক্রিস্টিনার হস্টেলের ফোন নম্বর রাখ। আজই ফোন করিস। নইলে আবার অন্য কেউ ভাগিয়ে নেবে। যখন দরকার আমার ঘরে চলে যাস। আবার চোখ টিপল বাবুল। দরোজার কাছে যাবার সময় কাশেমের চোখে পড়ল, বাবুলের পা টলছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাবুল বলল, সাকিনাকে নিয়ে কবে আসবি জানাস।

দুপুরের হুইস্কি কাশেমেকেও চট করে ধরেছিল। সে শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা।

১৪

লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড তারপরে উডস্টক। ছোট্ট এই গ্রামটায় বহু বছর আগে বেলাল এসেছিল ব্লেইনহাম প্রাসাদ দেখতে, যেখানে চার্চিলের জন্ম হয়েছিল। রোববারের ফাঁকা রাস্তায় ঘণ্টা আড়াই লেগেছিল উডস্টকে পৌঁছুতে।

উডস্টকে 'বেয়ার হোটেলে' দোতলায় একটা ঘরে বেলাল আর সাকিনা পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। একটু আগে নিচে থেকে দুপুরের খাবার খেয়েছে ওরা। বেলাল একটা শ্যাম্পেন আনিয়েছিল। কোমল জ্যোছনার মতো শ্যাম্পেন এখন তাদের শরীরের ভেতরে আনাগোনা করছে।

সাকিনার খোলা স্তনের ওপর শান্ত একটি হাত রেখে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে বেলাল ও সাকিনা। ছাদে কাঠের কালো রঙ করা বরগা, ঘরের খুঁটিগুলো কাঠের। বাঁকা, অসমান, রুক্ষ। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখলেও ক্লান্তি আসে না। ঘরের মেঝেয় লাল টকটকে কার্পেট। কয়েকশ বছরের পুরনো হোটেল। এক সময় ছিল সরাইখানা, এখনো সেই পুরনো দিনের গড়ন আর সাজসজ্জা যত্নের সঙ্গে ধরে রাখা হয়েছে।

অনেকক্ষণ তাদের কোনো কথা হচ্ছিল না। সারা পথ চলছিল বেশ, তারপর উডস্টকে এসে নানা দেশে টুরিস্টের ভিড়েও চপলতা ছিল অক্ষত, এমনকি খাবার টেবিলেও কথার ছিল ভরা বর্ষা। কিন্তু এখন?— না, বৃষ্টিহীন মরুভূমি নয়, অঝোর ধারে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর জল থই-থই স্তব্ধতা।

বেলাল ধীরে ধীরে খুলে দিল সাকিনার ডান স্তনের আবরণ। তারপর দুই স্তনের মাঝখানে

মাথা ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ।

এর আগে কখনো বেলাল স্পর্শ করে নি কোনো মেয়ের শরীর। একটা সময় ছিল, বয়স তখন অনেক কম, তখন বিশেষ কোনো মেয়ে নয়, মেয়ে মাত্রই শরীর ছিল পৃথিবীর শেষ গন্তব্য। ছিল তলোয়ারের মতো উত্তেজনা, ছিল নক্ষত্রের মতো কৌতূহল। এখন আর নেই। অনেকদিন থেকে নেই। অনেকদিন থেকে অনবরত একটি প্রতীক্ষা, এমন কারো জন্যে যার জন্যে আছে ভালোবাসা ; আর ভালোবেসেই যার শরীরের সীমা তাকে অতিক্রম করতে হবে।

সেই শরীর এখন তার বৃত্তের ভেতরে। শায়িতা এবং পাশে এবং তার স্তনের ওপর তার হাত, তার নিঃশ্বাসের চেয়ে নিকটে সেই ভালোবাসা।

বেলাল আবার ফিরে এলো বালিশে, মাথা রাখলো, সাকিনার হাত এনে রাখলো ঠোঁটের ওপরে, চুমো দিল, তারপর বলল, লন্ডন থেকে এখন আমরা অনেক দূরে।

হ্যাঁ। প্রায় শোনা গেল না সাকিনার কণ্ঠস্বর।

সবকিছু থেকে দূরে।

হ্যাঁ।

সমস্ত কিছু থেকে। পৃথিবী থেকে।

হ্যাঁ।

এখন শুধু তুমি আর আমি।

সাকিনা এবার কিছু বলল না। তখন বেলাল তার মুখ নামিয়ে আনল সাকিনার মুখের ওপর। এখন সাকিনা ফিরিয়ে নিল না ঠোঁট। ঠোঁটের ওপর ছোট্ট একটা দ্রুত চুমো দিল বেলাল। এই প্রথম তার ঠোঁটে। মনে পড়ল, সাকিনা তাকে বলেছিল, ঠোঁট তার জন্যে নয়। বলতে চেয়েছিল, ঠোঁট তার স্বামীর জন্যে। এখন ঠোঁটের অধিকার দিয়ে বেলালকে সে কি বোঝাতে চাইল— তুমি আমার স্বামী অথবা তুমিও আমার স্বামী।

তুমিও ? কাশেম ; এবং বেলালও ?

না, সে ভাগ করে নিতে পারবে না সাকিনাকে। যে সাকিনাকে সে আবিষ্কার করেছে, সে সাকিনা তারই, সেখানে কারো অংশ নেই। পরমুহূর্তে মনের মধ্যে তর্ক উঠল তার। এ কি স্বার্থপরের মতো ভাবনা নয় ? এই ভাবনা যে, সাকিনা আমার ? আমি কি তার নই ? কিংবা এমনও তো সে ভাবতে পারত, আমরা আমাদের ? বেলালের মনে হলো, এখনো সে তাহলে সেই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসতে পারে নি সাকিনাকে, যখন যে-কোনো 'আমার' তুচ্ছ হয়ে যায়। এখনো তাকে তৈরি হতে হবে, এখনো তাকে আরো নিবেদিত হতে হবে।

তুমি আমাকে কেন ভালোবাসো ?

সাকিনা হঠাৎ পাশ ফিরে বেলালের চুলে হাত দিয়ে জিগ্যেস করল। এক গোছা চুল নিয়ে অন্যমনস্ক খেলা করতে লাগল। তখন বেলাল তার পিঠে হাত রাখল, আলতো করে টেনে আনল নিজের আরো কাছে। সাকিনা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল বেলালের দিকে।

এর কী উত্তর দেবে বেলাল ? কেন একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ভালোবাসে ? কেন দরকার হয় দ্বিতীয় একটি অস্তিত্বের এই পৃথিবীতে ?

কী আছে আমার ? সাকিনা আবার প্রশ্ন করল।

তোমার সব আছে। আমি কল্পনায় যাকে দেখতাম, এতকাল দেখে এসেছি, সে তুমি।

তোমার ভুল হতে পারে তো ?

কীসের ভুল হতে পারে ?

আমাকে চিনতে।

ভুল হলেও ভুল আমার সত্যি।

কেন তা সত্যি হতে যাবে ?

জীবনের সব ভুল সংশোধন করা যায় না বলে। হয়ত উচিতও নয়। একেকজনের একেক রকম করে হয়। কারো ভুলের ভেতরে কারো বা সত্যির ভেতরে। তবে, এই মুহূর্তে যদি আমাকে জিগ্যেস করো, ভুল আমার হয় নি। আজ আমার সমুখে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকে এনে দাও, আমি বলব তোমাকেই চাই— তুমি, সাকিনা ; সবচেয়ে বিদুষী, সবচেয়ে গুণান্বিতাকে এনে বলো একে ভালোবাসো, আমি বাসতে পারব না। তোমার দোষগুণ, ব্যর্থতা সফলতা সব মিলিয়ে তুমিই আমার একমাত্র। ভুল যদি কারো হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের ভুল হয়েছে যিনি এমন করে আমাকে পাইয়ে দিলেন, যখন তুমি অন্য কারো।

সাকিনা আকর্ষণ করল বেলালকে। বেলালের জন্যে তার বুকের ভেতরে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। সাকিনা তার হাত দিয়ে আদর করতে লাগল, নিজের শরীরের ভেতরে ঝড়ের নদীতে নৌকোর অসহায় বিক্ষোভ দেখতে লাগল।

সাকিনা বেলালের বুকের ওপরে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

কাঁদছ কেন ?

উত্তর দিল না সাকিনা। বেলালের বুকের ওপর কয়েক ফোঁটা অশ্রু এসে পড়ল।

তুমি কাঁদছ কেন ?

তখন নিজেকে সামলে নিয়ে, উঠে বসে একটা রুমাল খুঁজল সাকিনা। ব্যাগের ভেতরে পেল না। বেলাল হাত বাড়িয়ে পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখা হোটেলের দেয়া টিসু-বকসের ভেতর থেকে একটা টিসু বার করে দিল। চোখ মুছে আরেকটা টিসু চাইল সাকিনা। নাক মুছে নাক ঘষে লাল করল সাকিনা।

বেলাল বলল, আজ সকালে তুমি জিগ্যেস করছিলে কাঁদলে তোমাকে সুন্দর দেখায় কিনা। এখন বলতে পারি, হ্যাঁ দেখায়।

তাই বলে আমাকে কাঁদাবে ?

তুমি কাঁদতে পারো তবু। আমি তো তাও পারি না। নইলে আমার কি কান্না পায় না ? রোজ তোমাকে দেখেছি রাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে উঠে যেতে, আমার কি কান্না পায় নি ? তোমাকে দেখেছি কাঁধে মাথা রেখে টেলিভিশন দেখতে, আমার কি তখন একা মনে হয় নি ? আমার কি মনে হয় নি, তুমি আমারও হতে পারতে ? আমরা আমাদের হতে পারতাম ? সাকিনা, তুমি কাঁদতে পারো। আমি যদি পারতাম।

তুমি তো জেনেশুনেই আমাকে ভালোবেসেছ। তাহলে কষ্ট পাও কেন ?

হ্যাঁ, জেনেশুনেই ভালোবেসেছি। তুমি অন্য কারো জেনেও তোমাকে ভালোবেসেছি।

আমি জানি না তুমি কী করে ভালোবাসতে পারো।

সাকিনা আবার শুয়ে পড়ল বেলালের পাশে। তার খোলা বুকের ওপর মাথা রেখে বেলাল বলল, তোমার মতো কেউ আছে বলেই পারি। কাশেমকে আমি ঈর্ষা করি।

কোরো না। ওর তো কোনো দোষ নেই।

তবু ঈর্ষা করি।

বেলালের মাথাটাকে দু'হাতে বেষ্টন করে সাকিনা বলল, আমার ওপর ওর অধিকার আছে বলে ?

হ্যাঁ, তাই। কিন্তু তাও নয়। আমি শুধু পেতে চাই না, দিতে চাই। আমি চাই আমার ওপর তোমার অধিকার তুমি নাও, যেমন কাশেমের ওপর তুমি নিয়ে থাকো।

কে বললে নিই ?

নাও না ?

বেলাল মাথা তুলতে যাচ্ছিল, সাকিনা তাকে মুক্ত করল না।

আরো দৃঢ় হাতে জড়িয়ে চেপে ধরে রাখল নিজের বুকের ওপর।

বেলাল বলল, তোমার যখন একা লাগে, তুমি খোঁজো না কাশেমকে ? তোমার যখন ইচ্ছে করে, ডাকো না তুমি কাশেমকে ?

কাশেমের নাম উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে বেলালের মনের ভেতরে প্রবল একটা ইচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিশ্চিহ্ন করে দিতে ইচ্ছে করল কাশেমের অস্তিত্ব এবং তুলে ধরতে নিজের পতাকা। এই প্রথম সে দুই ঠোঁটের ভেতর তুলে নিল স্তনের বোঁটা। জীবনের প্রথম এই অভিজ্ঞতায় মনে হলো একটা কড়ে আঙ্গুল সে তুলে নিয়েছে যার ভেতরে কোনো হাড় নেই। তারপর, এটা ছেড়ে আরেকটা তুলে নিল সে। তার শুকনো ঠোঁটের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মৃদু তাপ।

সাকিনা কাতর ধ্বনি করে উঠল। তার ভালো লাগল, অথচ মনের ভেতরে তারই অবিকল একজন অত্যন্ত দূরে এবং খুব ছোট দেখাচ্ছে তাকে, তার ভালো লাগছে না ; তার ইচ্ছে করছে সরিয়ে দিতে, দৌড়ে কোথাও চলে যেতে, চিৎকার করে উঠতে যে, সাকিনা, এ দুঃস্বপ্ন।

সাকিনা ?

বলো।

সাকিনা।

বলো, তুমি।

সাকিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই ব্যবহারে-ব্যবহারে মলিন অথচ প্রতিটি মানুষের কাছে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ শেষে উজ্জ্বল আলোর মতো কুমারী এই কয়েকটি কথা কতকাল সাকিনা শোনে নি। এমনকি, এমন করে এর আগে কখনো শোনে নি। তার মনে পড়ে না, কাশেম তাকে শেষ কবে বলেছে, ভালোবাসে।

সাকিনার হাত শিথিল হয়ে এলো, ছড়িয়ে পড়ল দেহের দু'পাশে, স্তনমুখ দিয়ে মনে হলো ক্ষীণ অতিক্ষীণ ধারায় কিন্তু অতি তীব্র গতিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে তার অস্তিত্বের নির্যাস।

আবার কাতর ধ্বনি করে উঠল সাকিনা।

ব্যাকুল কণ্ঠে বেলাল বলল, তুমিও কি ভালোবাসো ?

জানি না।

আমাকে বলো, সাকিনা। একবার বলো। তোমার কাছে দুঃখ পেলেও মনে করব তবু তোমার কাছে কিছু পেয়েছি।

মুখ তুলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল বেলাল, তবু কোনো উত্তর দিল না সাকিনা অনেকক্ষণ।

তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না ? তাহলে কিছুই আমি তোমার কাছে পেতে পারি না ?

পেয়েছো তো।

পেয়েছি ?

তুমি বোঝো না, আমি কেন এখানে ?

এই সহজ কথাটা আদৌ তার মনে পড়ে নি বলে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল বেলাল। আর তার মুখের সেই অভিভাব দেখে খুব মায়া করে উঠল সাকিনার ভেতরটা। কাল যখন সে বারবার জিগ্যেস করছিল বেলালকে, যে কাশেমের কোনো মেয়ে বন্ধু ছিল কী-না, আসলে সে জানতে চেয়ে ছিল বেলালের কথা। সে ঠিকই বুঝতে পেরেছিল বেলাল তাকে ভালোবাসার কথা বলছে। বহুদিন ধরে তার চোখে পড়েছিল বেলালের বিশেষ ব্যবহারগুলো তাকে লক্ষ করে। আর বহুদিন থেকেই তার, সাকিনার, মন একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল বেলালের দিকে। সেই এগিয়ে আসবার ওপর নিজের চেয়ে নিয়তির হাত বেশি করে টের পেয়েছিল সাকিনা ; যুক্তি দিয়ে, বাস্তব সত্য দিয়ে নিজেকে ফেরানো তার সম্ভব হয় নি। তবু মানুষ হয়ত যুক্তির আশ্রয় খোঁজে। তাই এতকাল যা সম্ভব হয় নি, আজ সকালে তাই-ই হয়েছে, সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বেলালের সঙ্গে, কয়েকটা ঘণ্টার জন্যে হলেও নিজেকে ছেড়ে দিতে পেরেছে এই মানুষটার হাতে যার সঙ্গে তার সম্পর্কের কোনো অনুমোদন সে আশা করতে পারে না কোথাও। আর ঐটুকুর জন্যেই ছিল দ্বিধা, কিন্তু এই দ্বিধাও খণ্ডিত হয়েছে তার নিজেরই তরবারিতে।

সাকিনা দু'হাতে বেলালের মুখ নিয়ে চুমো দিল।

চুমো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেলালের মুখ খুব নতুন চোখে দেখল সে। তারপর বলল, কী চাও তুমি আমার কাছে ?

তোমাকে। তোমার সবকিছু আমি চাই।

সব কিছু ?

হ্যাঁ, সবকিছু। তোমার মন, তোমার শরীর ; তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ; সবকিছু আমি পেতে চাই। আর দিতে চাই আমার সব, আমার দুঃখ, ব্যর্থতা ; আনন্দ, স্মৃতি ; আগামী— সব তোমাকে দিতে চাই।

বলতে বলতে বেলাল উঠে এলো সাকিনার শরীরের ওপরে। সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে সে শুয়ে রইল।

সাকিনা অবাক হয়ে গেল। ঠিক এমনি করে শরীরে যখন কেউ শরীর রাখে তখন যে কঠিনতার সঙ্গে তার চেনা, বেলালের তা নেই। শিথিল এবং নিশ্চিন্ত তার শিশ্ন। শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম কী ভুলে গেছে বেলালের শরীর ? কতদিন তো এমনও হয়েছে কাশেম ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, তবু সেই কাশেম কেবল সাকিনার শরীরের সান্নিধ্যেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জেগে উঠেছে। আর, বেলাল তো এখন স্পষ্টই বলেছে, সাকিনার শরীরও সে চায়, তবু কেন সে স্নিগ্ধ এবং স্বাভাবিক ?

নিজের অজান্তেই নিজেকে একবার, এক মুহূর্তের জন্যে উত্তল করল সাকিনা।

স্বভাবত শান্ত, কিন্তু একটু অবাধ্য এক শিশুর মতো মনে হচ্ছে তার বেলালকে।

একটা খেলা করতে ইচ্ছে করল সাকিনার। বলল, তুমি তো জানো আমি অন্য কারো। তবু আমাকে ভালোবেসেছ তো ?

হ্যাঁ, তাই ?

আমাকে সবদিক থেকে পাবে না জেনেও ?

হ্যাঁ, তা জেনেই।

তাহলে শরীর চাও কেন ? দিতে যদি না পারি ?

দেবে না। আমি শুধু তোমার ভালোবাসা চাই।

তাহলে শুধু ভালোবাসাই থাক।

থাক। তবে, ভালোই যদি বেসে থাকো শরীর নিয়ে বাধা কেন ?

শরীর তো ভালোবাসার অনেক নিচে। তুমি বড়টাই তো পেয়ে গেছ।

তবু আমি তোমার সব চাই। তোমার মন, তোমার শরীর।

কেন ?

বড়টাই যদি দিয়ে থাকো, ছোটটা কেন হাতে রেখে দেবে ?

সাকিনা এখনো, তার মনের একপ্রান্ত থেকে অবাক হয়ে ভাবছে, শরীরের উল্লেখেও বেলাল এত শান্ত আছে কী করে ? কিছুতেই এ ভাবনাকে ঠেলে ফেলতে পারছে না, কিছুতেই এর চারদিকে কথার জাল না বুনে পারছে না।

বেলাল সাকিনার পিঠের নিচে নিজের দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো দিয়ে বলল, ভাবছ, তোমাকে পাবার জন্যে খেপে উঠেছি ? এখন আমি তোমার শরীর ছাড়া আর কিছু চাই না ?

চাও নাকি ?

ভালো করেই জানো।

আচ্ছা, কেউ যদি কাউকে হোটেলে এনে তোলে, বিছানায় নিয়ে শুতে চায়, জামা খুলে দেয়, তাহলে সেই মেয়ে যদি ভাবে তো তাকে তুমি দোষ দেবে ?

না, দেব না। কিন্তু আমি তো যে-কেউ নই, সাকিনা। আমি, যে তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যতটুকু দেবে, তাইই আমার প্রাপ্য। যখন দেবে তখন নেব, তার আগে নয়। তাই বলে যখন ইচ্ছে করবে, তখন আশা করব, তুমি আমাকে বলবে, যে তুমি তৈরি।

বলব।

তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কখনো কাউকে ভালো তো বাসিই নি, কারো সঙ্গে ঘুমোই নিও। অথচ আমার কত বন্ধু আছে, তাদের দেখেছি মেয়ে তুলতে, মেয়ের কাছে পয়সা দিয়ে যেতে, এই লন্ডনে। একজনের সঙ্গে সোহো স্কোয়ারে গিয়ে সে যতক্ষণ মেয়ের কাছে ছিল, বসবার ঘরে টেলিভিশন দেখেছি ; সে বেরিয়ে এসে আমাকে ভেতরে যাবার জন্যে কত হাত ধরে টেনেছে, তবু যাই নি। আমি কল্পনাই করতে পারি না। হয়ত খুব গোঁড়া পরিবারের ছেলে বলে। এই আমার প্রথম, এই এতো কাছে আসা। এক সময়ে মনে হতো, কারো এত কাছে এলে, তার ওপরে ঠিক এইভাবে শুয়ে থাকলে তার খোলাবুকের স্পর্শ পেলে, পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এখন, এই এতক্ষণ আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সাকিনা, আমি অবাক হয়ে নিজেকে দেখছিলাম ; তুমি যতক্ষণ নিজে থেকে আমাকে চাইবে না, আমি একটা জীবন এভাবে তোমার সঙ্গে শুয়ে থাকতে পারব, আমার কিচ্ছু হবে না। আমার শরীর আমার থেকে আলাদা হয়ে নিজেই একটা কাণ্ড করে বসবে না।

সাকিনার তখন কোমল একটা ইচ্ছে হলো, এই যে লোকটি, যে তাকে ভালোবাসে, যে এখন তার শরীরের ওপর শুয়ে আছে সমস্ত প্রশান্তি নিয়ে, প্রতীক্ষা নিয়ে, তাকে প্রথম অভিজ্ঞতা দিতে। আর নিজেকে তার মনে হলো, বেলালের মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে, পুরুষের অভিজ্ঞতা তার হয় নি ; যদিও তার বিয়ে হয়েছে, সে এখনো কুমারী।

বেলালের মুখ আবার দু'হাতে ভেতরে নিয়ে চোখের সমুখে তুলে চোখের ভেতরে ত্রস্তে কী একটা খোঁজার মতো করে চেয়ে থেকে সাকিনা বলল, ওঠো, পর্দা টেনে দাও।

এতক্ষণ পর্দা খোলা ছিল। রোদ এসে পড়েছিল বাইরের। এখন পর্দা টেনে দিতেই ছায়া-অন্ধকার সমস্ত কিছু আলিঙ্গন করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ করে রইল সাকিনা। আর বেলাল যখন তার পাশে শুয়ে জড়িয়ে ধরল, সাকিনা তখন অস্ফুটস্বরে বলল, উঃ, তোমার বেলট।

বেলটের মুখে পেতলের ঈগল, তার বিস্তৃত দুই ডানায় ধাতব-তীক্ষ্ণতা।

তোমার লাগল ?

একটু।

ট্রাউজার খুলে বেলাল শুয়ে পড়ল সাকিনার পাশে। আবার তাকে আলিঙ্গন করল। কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আদর করল তাকে, চুলের ভেতরে আবছা সুগন্ধকে ভালো করে বোঝার জন্যে মুখ ঘষতে লাগল, তারপর তাকে ফিরিয়ে আনল নিজের দিকে।

সাকিনা অবাক হয়ে লক্ষ করল, বেলালের শরীর কী প্রস্তুত এবং অশ্বের মতো স্তম্ভিত কিন্তু অস্থির।

সাকিনা সেখানে হাত রাখল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেল বেলাল। এত দ্রুত এলো এই পরিবর্তন যে বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল সাকিনা। আর বেলাল পিঠের ওপর পাশ ফিরে শুলো, মুখ ফিরিয়ে নিল সাকিনার দিক থেকে।

সাকিনা তখন তাকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। সমস্ত মমতা দিয়ে নিল সে তাকে তার নিজের ওপর। হাত বাড়িয়ে আদর করতে লাগল বেলালের শিথিলতাকে। তারপর যখন মনে হলো, আবার সে প্রস্তুত, তখন আর তার হাতে ছেড়ে দিল না যাত্রার ভার। এই তো প্রথম বেলালের ; সে কী করে জানবে যাত্রার রীতি ?

সাকিনা তাকে নিজের হাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উঠল তীব্র শিস, পাখি উড়ে গেল, ফুল ঝরে গেল, বিদ্যুৎ চমকের মতো অস্তিত্বের নীলিমা চিরে গড়িয়ে পড়ল শরীরের কষ।

তবু তাকে অভয় দেবার জন্যে, গৌরব দেবার জন্যে সাকিনা আরো অনেকক্ষণ বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে রইল তাকে।

তার নিজের কিছু নেবার ছিল না। ছিল শুধু এই লোকটি যে তাকে এমন করে ভালোবাসে সেই তাকে ভালোবাসার অন্তর্গত সবকিছু দেবার ব্যাকুলতা, তার প্রথম অভিজ্ঞতার দিশারী হবার হয়ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

তাই সাকিনার পক্ষে এখন সম্ভব হলো, নিজেকেই দূর থেকে দেখা।

সে দেখল শরীর সেই এক এবং অদ্বিতীয়। এমন কিছু সে দেখতে পেল না, যা আগে দেখে নি ; এমন কিছু ঘটল না, যা আগে ঘটে নি।

সেই প্রতিদিনের একটি দিন।

সাকিনা এখন নির্মমভাবে অনুভব করল, ভালোবাসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভালোবাসা এর উর্ধ্বেও নয় ; নিচেও নয়। ভালোবাসা এর বাইরে এবং বিযুক্ত।

তাই এই পিচ্ছিলতায় সে গ্লানিতে ডুবে গেল।

নিঃশব্দে দ্রুত সে উঠে গেল বিছানা থেকে।

১৫

সাকিনা ঘরের দরোজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল কাশেমকে। কাশেম নিজেই আসছিল দরোজা খুলে দিতে। সাকিনা জানে না, কাশেম সারা বিকেল আর সন্ধে উৎকর্ণ হয়েছিল সাকিনার গাড়ির শব্দের জন্যে। কতবার আজ সে অন্যের গাড়ির শব্দ শুনে দরোজার কাছে এসেছে তা শুনলে যে কেউ মনে করত পারত অভিসারে আসবার কথা আছে কারো।

বাইরে থেকে ফিরে অন্য যে কোনোদিন সাকিনা যেমন মাথা একটু নিচু করে হেসে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়, আজো তার ব্যতিক্রম হলো না। বরং অন্যান্য দিন, সোজা আপিস থেকে ফেরার দরুন ঠোঁটের হাসিতে যে করুণ ক্লান্তি ফুটে ওঠে, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই।

সেটা লক্ষ করে বড় নিশ্চিন্ত হলো কাশেম।

তোমার জন্যে ভাত রান্না করে রেখেছি। আমারও বড্ড খিদে পেয়েছে। সারাদিন কিচ্ছু খাই নি।

খিদে তো পাবেই। রাত এখন আটটা।

সাকিনা বলল, সারাদিন খাও নি, সে কী ?

সাকিনার একটু অনুতাপ হলো, আজ দুপুরে সে 'বেয়ার হোটেলে' কী সুন্দর ফরাসি লাঞ্চ খেয়েছে— কমলা দিয়ে হাঁসের রোস্ট।

কাশেমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী মায়া হলো সাকিনার। যেন কতকাল দেখে নি তাকে। যেন কতকাল পরে সে আবার তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে।

কাশেম যদি জিগ্যেস করে সে কোথায় ছিল সারাদিন— যেমন সে নিজে আজ ভোররাতে জিগ্যেস করেছিল কাশেমকে ?

তোমাকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে। কাশেম বলল। দেখি, মুখখানা দেখি। ইস, তোমারও নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নি। রাগ করে খাও নি তো ?

না, না।

একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে কাশেমকে। কতকাল সে কাশেমকে এ রকম দেখে নি। কতকাল সে তার মুখ ধরে বলে নি, খুব খাটুনি গেছে বুঝি ?

চটপট হাত মুখ ধুয়ে নাওতো। আমি ভাত বাড়ছি।

সাকিনার পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে, এটাও বহুদিন পরে, তাকে পাঠিয়ে দিল বাথরুমে। ফিরে এসে দেখে কাশেম সব সাজিয়ে হাসিমুখে বসে আছে। ভাত রেঁধেছে, ডাল করেছে, মুরগির মাংস রান্না করেছে, সবজি করেছে।

এত কখন করলে গো ? সাকিনা চোখ গোল করে বলল।

শুধু কি এই ? খাবার পরে মিষ্টিও পাবে।

মিষ্টি ?

সে মিষ্টি নয়, সেটা পরে।

যাঃ।

ছানার পায়েস করেছি।

তুমি করেছ ?

কেন মনে নেই, আমার কাছেই রান্না শিখেছিলে এদেশে এসে ? এখন আমার রান্নার কথা শুনেই অবাক হচ্ছো ? নাও, খেতে শুরু করো।

বিয়ের পরপর ঠিক এই রকম ছিল দিনগুলো। সময় যেন একটা যাদুবলে পেছনের দিকে মুখ করেছে। যে কাশেমকে সে রেখে আজ সকালে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই কাশেম এভাবে বদলে যাবে, তার না-বলে বাইরে থাকায় মুখ আঁধার করবে না, ফোঁস ফোঁস করবে না, এ যে কল্পনার অতীত। এখন আরো বেশি বিহ্বল মনে হলো তার নিজের বর্তমান আর নিকট-অতীত। প্রায় দুঃসহ মনে হলো শরীরের ভেতরকার গ্লানি, এখনো পিচ্ছিল মনে হলো।

বেলালটা কই ?

খুব স্বাভাবিক গলায় কাশেম প্রশ্নটা করলেও চমকে উঠল সাকিনা। আর একটু হলেই বিষম খেতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে পারল সে।

আর এই প্রথম, যেন আরেক অভিজ্ঞতা তার প্রথম, আজ যেমন আরেক আবিষ্কার তার প্রথম, উপলব্ধি প্রথম, তিনটি প্রথমের পর, এবারো প্রথম সে মিথ্যে কথা বলল।

আমি কি জানি ? সকালে টিউব স্টেশনে নামিয়ে দিয়েছি।

বেলালের গাড়ি আছে, সে কেন রেলগাড়ি ব্যবহার করবে ; এ প্রশ্ন কাশেম করলে কী উত্তর দেবে সে ? একটা মিথ্যে বললে যে তার পেছনে আরো দশটা মিথ্যে বলতে হয়, এই কথাটা করুণভাবে টের পেল এখন সাকিনা। কিন্তু কাশেম তাকে রেহাই দিল। বেলালের প্রসঙ্গ আর সে তুলল না। সাকিনা জানে না, কাশেমের মাথায় এখন সে ছাড়া, তাকে তুষ্ট করা ছাড়া, তার সঙ্গে ভাব করে নেয়া ছাড়া আর কোনো ভাবনা নেই।

উডস্টক থেকে ফেরার পথে সময় লেগেছিলো ; যাবার তুলনায় কম। মাত্র দেড় ঘণ্টাতেই লন্ডনের ভেতরে এসে গিয়েছিল তারা।

আর তখন সাকিনা তাকে বলেছিল, তুমি কোথাও নেমে যাও। আমার সঙ্গে ফিরছ, আমি চাই না।

বেলাল একে সতর্ক ব্যবস্থা বলেই ধরে নিয়েছিল বলেছিল, ছেলেমানুষ তো নই ? তোমার সঙ্গে ফিরতে দেখলে কাশেম বলবে কী ?

তখন, সারাপথ যে কথাটা বলবে বলে মনকে তৈরি করছিল সাকিনা, সেই কথাগুলো উত্তেজনায় থরথর করে বলে ফেলেছিল। আর কখনো তুমি আমাদের বাসায় ফিরবে না। তোমাকে আর আমি আমাদের বাসায় দেখতে চাই না। তোমাকে ভালোবেসেই বলছি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি খারাপ মেয়ে নই, বেলাল। একটা দিনের সুখের জন্যে আমি পথে নামি নি। তুমি বুঝবে ? তুমি বুঝতে পারছ আমাকে ? তোমাকে ভালোবাসি বলেই এভাবে তোমাকে চলে যাবার কথা বলতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ ?

আর তুমি ফিরে যাবে তোমার স্বামীর কাছে ?

তুমি তো সব জেনেই আমাকে ভালোবেসেছ ?

আমিও তোমার স্বামী হতে পারতাম।

তুমি তারো ওপরে বেলাল। একটা মেয়ে এরচেয়ে বড় আর কী বলতে পারে, তুমি বোঝো না ?

বুঝি, আবার বুঝি না।

তুমি জানো, তোমার কাছেই আমি আজ বুঝেছি ভালোবাসা কী ? অন্তর থেকে কথাগুলো বলেছিল সাকিনা আর ভাবছিল বেলাল কি তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে ? আমাকে এভাবে কেউ কখনো ডাকে নি, কাশেমও না। তবু সেই কাশেমের কাছেই আমি ফিরে যাব, আর তোমাকে আমি আজ থেকে ফিরিয়ে দেব। তোমার ভালোবাসা আছে, কাশেমের তাও নেই। ও আমাকে ভালো না বাসুক, আমি তো বেসেছি। না, ওর জন্যে আমার যা তাকে আর ভালোবাসা বলব না, সেটা সম্পূর্ণ অন্য। সেই সম্পূর্ণ অন্য কিছুর সঙ্গে বাস করা যায়, ভালোবাসার সঙ্গে হয়ত যায় না। ভালোবাসা হয়ত এই একটি দিনের মতো আসে আর সেই একটি দিন জীবনের অন্য সবকটা দিনকে মলিন করে দিয়ে যায়। আমি তোমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছি না হয়ত, ভরসা আছে তুমি তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে। আর যদি আমাকে ভালোই বেসে থাকো তো অন্তরে অন্তরে জানবে আমার যা তুমি পেয়েছ আর কেউ তা পায় নি, কখনো পাবে না।

পাগলের মতো মনে হচ্ছিল নিজেকে। মাথাটা যেন ফেটে যাবে। শরীরে যেন এক্ষুণি বড় বড় ফোসকা পড়বে। ইচ্ছে করছিল বেলালের মুখ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়, কিন্তু জোর করে পাথর করে রেখেছিল সে নিজেকে। দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল সময়। সময় কী দ্রুত এবং নিষ্ঠুর ফুরিয়ে যায়, সাকিনা অসহায় হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, মানুষের জীবন কেন একাধিক নয় ?

তুমি কিছু বলছ না ; তুমি কিছুই বলবে না ? তুমি একটুও বুঝবে না ?

তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার কথা আমি রাখব। আমি আর তোমার বাড়িতে ফিরব না।

কষ্ট পেও না।

কষ্ট আমি পাচ্ছি না। কে বলল আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমি কী ভাবছিলাম জানো, সাকিনা ? জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে পৃথিবী, গাঢ় সুগন্ধ ফুল ফুটেছে বাগানে, ঘরের ভেতরে সোনার পাত্রে জ্বলছে ঘিয়ের বাতি, বিছানায় অনিন্দ্য সুন্দর যুবতী স্ত্রী, পাশে পুত্র, ঘুমন্ত, স্বপ্নে প্রশান্ত— নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফেলে সংসার ত্যাগ করে চলেছেন গৌতমবুদ্ধ। ছবিটা তুমি কল্পনা করতে পারো, সাকিনা ? যার আছে, সে-ই ত্যাগ করতে পারে। যার নেই সে ত্যাগ করবে কী ? না, আমার কোনো কষ্ট নেই, সাকিনা।

কাশেম সবসময় তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠে ; শেষদিকে চিরকাল একা খেতে হয় সাকিনাকে। আজ কাশেম সাকিনার জন্যে বসে রইল। সাকিনার খাওয়া হয়ে গেলে নিজেই থালা কেড়ে নিয়ে রান্নাঘরে রেখে দিল

থাক. আজ আর ধুতে হবে না। কাল সকালে আমি ধুয়ে দেব।

সাকিনার তখন কান্না পাচ্ছিল ভীষণ, তার নিজের জন্যে নয়, বেলালের জন্যে নয়, কাশেমের জন্যে নয়, কেবল কান্না পাচ্ছিল। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন 'সপ্রাণতা'— নির্মম এই অবস্থাটির জন্যেই মানুষের কান্না পায়।

সাকিনাকে কাশেম সোফার ওপর বসিয়ে নিজে কার্পেটের ওপর জোড়াসন হয়ে বসে। উৎফুল্ল

মুখে বলে, আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলে নাকি ? সব মিথ্যে কথা, সব আমি মিথ্যে বলেছি, বানিয়ে বলেছি। জার্মান মেয়ে-টেয়ে সব বাজে কথা। ব্যবসা করব বাজে কথা। রাগ করে বলেছি। তুমি ছাড়া আর কার কাছে যাব ? এখন থেকে আমি মন দিয়ে পড়ব। তুমি দেখে দিও। সকালে রাগ করে বেরিয়ে গেলে। মেয়ের কথা, সব মিথ্যে কথা।

কাশেম সাগ্রহে হাত রাখল সাকিনার হাঁটুতে।

সাকিনার মন একবার জোনাকির মতো খুশি হয়ে উঠল, আবার ম্লান হয়ে গেল। সত্যি বা মিথ্যে, সে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখল, কিছুই আর তাকে স্পর্শ করছে না।

কাশেম উঠে দাঁড়িয়ে সাকিনার হাত ধরে টেনে তুলল সোফা থেকে।

চলো ঘরে যাই। কাল তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। আজ আমাকে আদর করতে দেবে তো ?

বিছানায় শুয়ে কাশেম যখন চুমো দিতে গেল তাকে, ঠোঁট ফিরিয়ে নিল সাকিনা।

একটু চুপ করে থেকে কাশেম যখন হাত রাখল সাকিনার নাভির নিচে তখন তার, সাকিনার, মনে হলো বর্ধিষ্ণু ক্ষতের ওপর হাত পড়েছে। অস্তিত্বের মর্মমূল পর্যন্ত নিঃশব্দ যন্ত্রণায় সে শিউরে উঠলো। মিনতি করে কেবল বলতে পারল, থাক, আজ না।

১৬

বেলালকে দরোজায় দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মি. চাণক্য সেন। প্রবলবেগে হ্যান্ডশেক করে চললেন তো করেই চললেন।

আরে, আসুন আসুন, বেলাল বাবু। মরে ভূত হয়ে দেখা দিতে আসেন নি তো মশাই ? পাড়াগাঁর ছেলে, আমি আবার ওসব বিশ্বাস করি। কতকাল দেখা নেই। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য।

মি. সেনের ঐ এক দোষ, পারতপক্ষে কাউকে কথা বলতে দেন না। তারই ভেতরে বেলাল কোনরকমে এটুকু বলতে পারল যে, 'এদিকে দিয়ে যাচ্ছিলাম।' আসলে সে হোবর্নের চৌরাস্তায় সাকিনার গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। ফুটপাতের ওপরেই হোবর্নটিউব স্টেশন। সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। হঠাৎ দেয়ালে সাঁটা টিউব ম্যাপে শেফার্ডস বুশ স্টেশনটা চোখে পড়তেই চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে দ্বিতীয়বার তার মনে পড়ে গিয়েছিল মি. সেনের কথা। সঙ্গে টেলিফোনের বইটা নেই, আগে থেকে ফোন করা আর হয় নি, সোজা টিকিট কেটে উঠে পড়েছে গাড়িতে।

আপনি মশাই লাকি লোক। রোববারে আমার ঘরে থাকবার কথাই না। কোনো রোববারেই থাকি না, শুঁড়িখানায় বসি, হেঁটে বেড়াই, নটিং হিল গেটে লেটনাইট মুভি দেখি, রাত দুটো তিনটের সময় এসে বিছানায় দেহ ফেলে দেই, ব্যাস। জীবন থেকে একটা দিন ডিসমিস। এখন মশাই লাইফে স্টেক না থাকলেও লাইফটা বেমক্কা বেমক্কা চলে যাক, সেটাও তো কিছু কাজের কথা নয়। বিয়ে করি নি, সংসার করি নি বলেই কি নিজের দেহের ওপর মায়া নেই ? শরৎচন্দ্র পড়ে দেখবেন। অত যে বাউণ্ডুলে শ্রীকান্ত, তিনিও কিন্তু ঘিয়ে ভাজা লুচি ছাড়া খান না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, বেলাল বাবু। আজকাল ইংরেজরা খেপে গেছে মশাই। ইন্ডিয়ান দেখলেই পেটাচ্ছে, বোতল মেরে মাথা ফাটাচ্ছে, চাকু মারছে। বিশেষ করে শনি-রোববার তো ওদের পেটাবার পরব। দেখলেন না, এইতো লাস্ট উইকে আটজনা বাঙালি, আপনাদের

সিলেটের মশাই, ইংরেজ ছোকরাগুলো তাদের মেরে পোম্বা উড়িয়ে দিল। তাই আজ রোববার আর বেরোই নি। বসে বসে বাখ-এর ভায়োলিন সোনাটা শুনছি। জানেন তো বাখ আবার ভায়োলিন নিয়ে বিশেষ কাজ করেন নি। তবে, যা দিয়ে গেলেন, অমৃত ; মশাই, জীবনমৃত্যু এক হয়ে যায়। তা বলুন, দেব কি ? কী চলে আপনার আজকাল ? অনেককাল তো দেখা নেই, খবরও রাখি না।

একটু জিরোন দিলেন মি. সেন।

ঘরে আবার সাম্রাজ্য বিস্তার করল ইহুদি মেনুহিনের বাজানো বাখ-এর ভায়োলিন সোনাটা। বরফ পড়ছে। পাহাড়ের প্রশস্ত কোল ভরে গেছে বরফে, যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে ধবল সমুদ্র। সেই বরফের ওপর একাকী এক নারী। স্বর্গের পাখির মতো অবিরাম নেচে চলেছে।

আজ বারবার জ্যোৎস্নায় প্লাবিত পৃথিবী কেন তার চোখের ভেতরে ভেসে উঠছে ?

সন্ধে থেকে জিন অ্যান্ড টনিক খাচ্ছি। দিই আপনাকে ?

না, আজ কিচ্ছু খাবো না।

হা হা করে হেসে উঠলেন মি. সেন। বলবেন না যে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েমানুষের চেয়েও বড় ঝোঁক মশাই এই মদ। ওটা ছাড়া যায়, কিন্তু এটা ছাড়াতে চাইলেও ছাড়ানো যায় না। আপনি অবশ্য একসেপশনাল লোক, বেলাল বাবু। হয়ত সত্যি সত্যি ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে এখন কী দিয়ে আপনাকে আপ্যায়িত করি বলুন তো। বড় বিপদে ফেললেন।

একসেপশনাল বলছেন কেন ?

একসেপশনাল নন ? রেকর্ডটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে সযত্নে তুলে রেখে, প্লেয়ার বন্ধ করে মি. সেন বললেন, মনে আছে আপনার, সেই যে আপনাকে আর অমিতকে বলেছিলাম, বিলেতে বাঙালি যে ছেলে পড়তে এসে গাফিলতি করে, তার জীবনে তিনটে ফেজ ?

হ্যাঁ, মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে।

আপনি কিন্তু তার একটাতেও রইলেন না, বেলাল বাবু। আমার থিয়োরি আপনাতে এসে ফেল হয়ে গেল।

তার মানে ?

পড়াশোনা করলেন না, পড়াশোনার জন্যে দেশে গিয়ে বৌ করে আনলেন না, কোনো অনুতাপ হলো না। দিব্যি পড়া ছেড়ে কাজে ঢুকে গেলেন। এখন পর্যন্ত ব্যাচেলার রইলেন। আমার সব কটা ফেজ ফাঁকি দিয়ে বুক চিতিয়ে খাড়া রইলেন। আপনি একসেপশনাল। সে জন্যেই মাঝে মাঝে আপনার কথা বড্ড মনে হয়। আসবেন, নইলে ডাকবেন। যোগাযোগ রাখবেন। আপনার মতো দেখি নি মশাই বেলাল বাবু।

বেলাল বলল, দিন একটু জিন অ্যান্ড টনিক।

খাবেন ? ছেড়ে দেন নি তাহলে ? তাই বলুন। বড় ভাবনা হচ্ছিল, আজকাল বিলেতে ইন্ডিয়ান সব গুরুমশাইদের ভিড়, দীক্ষাটিক্ষা নিলেন না তো ? দিই তাহলে জিন অ্যান্ড টনিক। হাত পা ছড়িয়ে বসুন মশাই। কাছেই টেক-অ্যাওয়ে চাইনিজ আছে, আনিয়ে খাবোখন। আপনার তাড়া নেই তো ?

না। কোনো তাড়া নেই। আমি এসেছি আপনার কাহিনী শুনতে। দুম করে বলে ফেলল বেলাল।

হাঁ হয়ে গেলেন মি. সেন।

আমার কাহিনী মানে ?

কেন আপনি বিয়ে করেন নি ?

আপনি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, বেলালবাবু ? কোন পত্রিকায় ঢুকেছেন বলুন তো ? লন্ডনে তো ব্যাঙয়ের ছাতার মতো বাঙালিদের কাগজ।

বেলাল স্পষ্ট বুঝতে পারল এক মুহূর্ত অপ্রতিভ হয়ে যাবার পর মি. সেন তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চাইছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

আজ আমি সত্যি শুনব কিন্তু আপনার কাহিনী। সেই জন্যেই এসেছি।

কেন বলুন তো ?

মি. সেনের গলা হঠাৎ বড় অসহায় শোনালো। বেলালের হাতে জিনের গেলাশ তুলে দিয়ে বড় উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে আসনে বসলেন।

বাঃ, এতকাল ধরে আপনাকে চিনি, অথচ আজ হঠাৎ খেয়াল হলো যে আপনার বিষয়ে কিছুই জানি না।

সায়েব হলে কিন্তু খুব খেপে উঠত আপনার ওপর। পার্সোনাল কোশ্চেন করছেন বলে।

আপনি যে সায়েব নন তা আমি জানি।

ভুল জানেন। হানড্রেড পার্সেন্ট আমি সায়েব মশাই। সাধে শেফার্ডস বুশে বাড়ি নিয়েছি ? মাইকেল মধুসূদন দত্ত থাকতেন এখানে— যার রঙটাই ছিল ময়লা, চামড়ার নিচে পাক্কা সায়েব।

তাহলে আমাকে স্নেহ করেন, সেই ভেবেই না হয় বললেন ?

এই তো মুশকিলে ফেলে দিলেন। স্নেহটাই বুঝি না। ওসব সর্দি আমার থাকলে দেশ ফেলে বিদেশে পড়ে থাকতাম না।

কাউকে ভালোবেসেছেন ? বেলাল গেলাশে চুমুক দিতে দিতে সরু চোখে লক্ষ করল মি. সেনকে।

নাহ।

কিন্তু যেভাবে তিনি 'নাহ' বললেন তাতে বেলালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, মি. সেন একদিন কাউকে ভালোবাসতেন। আজ হোবর্ন স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে এই সন্দেহটাই বেলালের মনে উঁকি দিচ্ছিল। তার জেনে নিতে ইচ্ছে করছিল, ভালোবেসে কাউকে না পেলে কি সে মি. সেন হয়ে যায় ? বেলালও কি আজ থেকে দশ বছর পরে চাণক্য সেনের মতো শুঁড়িখানায় শুঁড়িখানায় চষে বেড়াবে আর লোক ধরে ধরে খাওয়াবে, তাদের উপদেশ দেবে, রেকর্ড শুনবে আর কবিতা লিখবে ?

বেলাল জেদ করে বলল, নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবাসতেন। আপনার কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। কবিতার পেছনে কেউ আছে ?

এই তো মুশকিলে ফেললেন, মশাই। কবিতা, কবিতা লেখার জন্যে রক্তমাংসের একটা মেয়েমানুষ দরকার হয় না। আসলে কি জানেন, বেলাল বাবু, বেঁচে থাকার জন্যেও আরেকটা রক্তমাংসের মানুষের দরকার নেই। লোকের ওটা মহাভুল।

কেন বলছেন ?

কেন শুনবেন ? মানুষ আসলে ভালোবাসে নিজেকে। নিজের মতো কাউকে সে খোঁজে। হয় নিজের মতো, আর নইলে নিজে সে যা হতে চেয়ে ছিল ঠিক সেই রকম কাউকে। এই কথাটা আমি সার বুঝেছি। তাই যদি হয়, তাহলে নিজেকে ভালোবাসলেই হলো, ল্যাটা চুকে গেল। তাহলেই আর না পাবার কষ্ট নেই, আঘাত পাবার সম্ভাবনা নেই, বিট্রেড হবার ভয় নেই। বলুন, মানেন কিনা ? আপনি এখনো ছেলেমানুষ। বুঝবেন, একদিন বুঝবেন। আর তখন মনে করবেন চাণক্য সেনের কথা। আমার কথা শুনতে চাচ্ছিলেন। শুনুন তাহলে। এক চুমুকে গেলাশ শেষ করে ঠক নামিয়ে রেখে মি. সেন বলতে লাগলেন, এমন কিছু অসাধারণ কাহিনী নয়। এক মেয়ে মশাই। তাকে যা ভালোবাসতাম সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তার ভেতরে বিশ্ব দেখতাম।

কোথায় তখন আপনি ? দেশে ?

দেশে কোথায় ? এখানে। দেশে কি প্রেম হয় মশাই ? দেশে হয় বিয়ে। আপনি বলবেন, কেন অমুকে প্রেম করে বিয়ে করল। আমি বলব খোঁজ নিয়ে দেখবেন, পয়লা যে মেয়েকে দেখেছে সেই মেয়েকেই ভালোবাসি ভালোবাসি বলে গান শুনিয়েছে, তাকেই বিয়ে করেছে। এদেশে মশাই হাজারটা মেয়ের সঙ্গে অহরহ আলাপ, তার ভেতরে সজ্ঞানে একটিকে পছন্দ করলেন, মনে ধরল— সে আলাদা মশাই। তা যাকগে। সেই মেয়ে তার ভেতরে জীবন দিয়ে বসে আছি, সেও আমাকে বলে যাচ্ছে— চাণক্য, তোমায় ভালোবাসি ; আমিও গাছের গোড়ায় মহা উৎসাহে জল ঢেলে চলেছি।

তারপর, একদিন সেই মেয়ে দুম করে বিয়ে করে বসল। না, না, আমাকে নয়। আমার চেয়েও এক হতভাগাকে। তাও শুনে রাখুন বেলাল বাবু, মেয়ের জন্মদিনে তাকে দামি প্রেজেন্ট দিয়ে এসেছি, মেয়ে আমার গালে চুমো দিয়ে বলেছে, চাণক্য, বাড়ি কেনো, তোমায় বিয়ে করব, তার সাতদিন পরেই শুনি মেয়ে ছাঁদনাতলায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, লন্ডনেও বাঙালির বিয়েতে ছাঁদনাতলা দেখা যায়। কলাগাছের নয়, টবে পোঁতা রবার গাছের। হাঃ হাঃ হাঃ।

বেলাল বলল, সেই থেকে আপনি ভালোবাসা শেষ করে দিলেন ?

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। সারা বিকেলের জিন অ্যান্ড টনিকে রক্তচক্ষু হয়ে উঠেছেন মি. সেন। বিয়ের পরও তাকে আমি ভালোবাসতাম। এখনো যদি জিগ্যেস করুন, তো এখনো বাসি। তবে এখন একটা সাটল ডিফারেন্স আছে। গুলিয়ে দিলেন তো মাঝখানে কথা বলে ? এই দেখুন, কী যেন বলছিলাম ?

তার বিয়ে হয়ে গেল।

হ্যাঁ, তার বিয়ে হলে গেল। আমি মনে করলাম, বিয়ের ঊর্ধ্বে আমার প্রেম। বিয়ে হয়েছে বলে কি ভালোবাসার দেবী গঙ্গায় বিসর্জন দেব ? ভালোবেসে চললাম। সেই মেয়েও আমাকে বিয়ে করেছে বলে দূরে ঠেলে দিল না। আমাকেও ধরে রাখল, স্বামীটিকেও রাখল। একদিন টের পেলাম, কেবল আমি নই, আমার মতো গুচ্ছের আরো কিছু প্রেমিক আছে তার। কিন্তু প্রেমের চশমা তখন আমার চোখে, দেখেও কিছু দেখি না। চোখের সমুখে দেখতে পাচ্ছি আমাকে ডিসিভ করছে, আমি স্বীকার করছি না। তার শতেক দোষ লোকে আমায় এসে এসে বলে যাচ্ছে— লোকের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই মশাই, এসব তাদের পবিত্র দায়িত্ব— আমি হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েও বিশ্বাস করছি না। সামনে তাকে পূজো করে যাচ্ছি। তারপরে, একদিন, সে এক কাণ্ড বেলাল বাবু।

এইখানে মি. সেন থামলেন। শূন্য গেলাশের দিকে সরোষে তাকিয়ে রইলেন খানিক, কিন্তু কী ভেবে গেলাশে আর ঢেলে নিলেন না।

কৌতূহল এখন এতটাই বেলালের যে নিজের ভালোবাসার কথাটা পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

সে এক কাণ্ড ; ভরা ডিসেম্বর মাস। গিয়েছি স্কটল্যান্ডে, হাই কমিশনেরই একটা কাজে, তখনো আমি হাই কমিশনেই কাজ করি। সেই স্কটল্যান্ডে মশাই বরফ। সে কী বরফ। শুধিয়ে দেখবেন, অমন বরফ পঞ্চাশ বছরে পড়ে নি। সেই বরফে সব শাদা হয়ে গেছে। বাড়িঘর, পথঘাট, গাছ, সাইনবোর্ড, সব শাদা। মহাদেবের হাসির মতো শুভ্র। সে দৃশ্য আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, বেলাল বাবু, আমার মনের ভাবটাও আপনাকে ঠিক কথায় ধরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু সেই আমার চোখ খুলে গেল। সেই আমি বুঝতে পারলাম যে আরে, আমি তো, আর কাউকে নয়, ভালোবাসি আমার নিজেকেই। একেবারে প্রাঞ্জল হয়ে গেল বুঝলেন মশাই বেলাল বাবু।

চাণক্য সেন সত্যিই কবি। বেলাল আশা করেছিল, স্কটল্যান্ডে নিশ্চয়ই মি. সেনের সঙ্গে গিয়েছিল মেয়েটি, সেখানে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু বললেন, তিনি বরফের কথা।

বেলাল বলল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে পারলেন না ? এরই মধ্যে নেশা হয়ে গেছে ? বোঝার ফ্যাকালটি ঘুমিয়ে পড়েছে ? আচ্ছা ভেবে দেখুন তো, বরফ যদি না থাকত কী দেখতেন ? রাস্তার কালো কুচকুচে পিচ, পথের নোংরা, টালি খসা ছাদ, ভাঙ্গা দেয়াল, গাছের মরা ডাল। দেখতেন কিনা বলুন ? কত কুৎসিত আপনার চোখে পড়ত। কিন্তু বরফ, বরফ এসে সব ঢেকে দিয়ে গেল, সব শাদা হয়ে গেল, আপনার মনে হলো স্বর্গ, আপনার মনে হলো পবিত্র। আমরা যে ভালোবাসি, সেই ভালোবাসাটা বরফের মতো পাত্রীটিকে ঢেকে দিয়ে যায়, তাকে পবিত্র করে তোলে, তার সব কুৎসিত লুকিয়ে রাখে। এবার বুঝতে পারলেন ? না, পারলেন না ? সেই ভালোবাসাটা তো আমারই মনের সৃষ্টি। তো আমিই যদি তার স্রষ্টা হই তো আরো উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ঈশ্বর হয়ে যাই না কেন ? ঈশ্বরের মতো একা আর সম্পূর্ণ। আপনার আপত্তি আছে ?

তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বেলাল। এখন শুধু এটুকু সে বলতে পারল, তাই বলে একা থাকা যায় ? সারাটা জীবন ? তার কণ্ঠ বড় ব্যাকুল শোনালো। এখন তো নিজেই সে দেখতে পাচ্ছে, শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সে নির্মমভাবে একা এবং বুকের ভেতরে অপ্রাপনীয়া একজনকে ভালোবাসার ভার।

কেন যাবে না শুনি ? দোকা হবার দরকারটা কোথায় ? বংশবৃদ্ধি তো ? শুনুন তাহলে। বংশবৃদ্ধির জন্যে মেয়েমানুষের সঙ্গে শোয়ার রীতিটাও ইউনিক কিছু নয়। নারী-পুরুষের কারবারটা বড় জোর একশো কোটি বছর ধরে চলছে। এরও দু'শো কোটি বছর আগে বংশবৃদ্ধি হতো নিজেকেই দু'ভাগ করে নিজের অবিকল আরেকটি তৈরি করে। আপনি বলবেন, প্রকৃতি সে পথ ছেড়ে দিল কেন ? নারী-পুরুষের মিলন দরকার হলো কেন ? সেও আরেক কাণ্ড। শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে, বেলালবাবু বুঝলেন, নারী-পুরুষের ব্যাপারটা একটা এমার্জেন্সি মেথড মাত্র। ঐ যে একক কোষ থেকে নতুন কোষের জন্ম, একদিন হয়ত দেখা গেল, একটি বিশেষ কোষ তার কিছু খুঁৎ আছে, ঠিক তেমনি খুঁৎ আছে আরেকটি

কোষের, তখন দুয়ে মিলে নতুন কোষ সৃষ্টি করালেন প্রকৃতি দেবী। অবশ্য একদিনে নয়, মাঝখানে একশো কোটি বছর গেছে। এই যেমন দুটো গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, একটির সামনের দিক গ্যাছে, একটির পেছনের দিক ; আপনি অনায়াসে দুটো গাড়ির ভালো পার্টস নিয়ে নতুন একটি গাড়ি তৈরি করতে পারেন। পারেন কি-না ? প্রকৃতি দেবীও তাই করেছিলেন। আবার একশো কোটি বছর পরে হয়ত দেখবেন এই আমরা, এই যে আমরা, প্রেম-প্রেম করে চ্যাঁচাচ্ছি, আমরাই হয়ত নিজেই নিজের দ্বিতীয় জন্ম দিতে পারব। শুধু নিজের একটা লাইফ নিজের পঞ্চাশ ষাট কি সবকটা বছর নিয়ে পৃথিবী মাপতে যাবেন না। সামনের দিকে তাকান, মশাই, সামনের দিকে তাকান। ওয়াইন খাবেন ? চমৎকার ওয়াইন আছে ঘরে। ব্ল্যাক টাওয়ার। রাইন এলাকার ওয়াইন। চিল্ড করাই আছে ফ্রিজে ? খান, কোথাও থেকে ঘা খেয়ে এসেছেন তো ? মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

বেলাল অবাক হয়ে গেল মি. সেনের শেষ কথাটিতে। একবার লুকোতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পর মুহূর্তেই হেসে ফেলল লজ্জিত হয়ে। তাকিয়ে দেখল, চাণক্য সেনের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি যেন এক্ষুনি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসবেন।

প্রশ্ন করলেন চাণক্য সেন।

কি, ওয়াইন দেব ? না, দেব না ?

বেলাল বলল, দিন। আর সেই সঙ্গে আজ রাতে শোবার মতো একটু জায়গাও যে চাই।



স্বপ্ন সংক্রান্ত

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। চিত্রনাট্য লিখতে লিখতে কোথাও একেবারে আটকে গেলে, কিছুতেই গিট না খুললে গোলাম মোস্তফার বহুদিনের অভ্যেস, ভালো করে গোসল-টোসল করে, ভালো কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভরপেট আহার করে, সমস্যাটি নিয়ে আর ভাবেই না, তারপর বহুবার সে দেখেছে, রেস্তোরাঁতে বসেই কিংবা বাড়ি ফেরার পথেই, পথ হঠাৎ ঝকঝক করছে সমুখে।

রাত এখন এগারোটা। গোলাম মোস্তফা বেরিয়ে দেখল, বৃষ্টি বড় বেপরোয়া। সুপার মার্কেটের বারান্দায় ভেজা মানুষের ভিড়। তার গাড়ির জন্যে একটু হলেও ভিজতে হবে তাকে। গাড়ি আছে মার্কেটের পেছনে।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতরে তরুণকে তার চোখে পড়ল। কী যেন নাম ? বছরখানেক হলো চিত্রালীতে কাজ করছে। নামটা মনে পড়ে যায়। আফজাল।

এখানে কী করছ ?

দাঁড়িয়ে আছি, রিকশা পাচ্ছি না।

বাড়ি যাবে তো ?

হ্যাঁ, গেণ্ডারিয়ায় কেউ যেতে চায় না।

গেণ্ডারিয়া ? গোলাম মোস্তফা হতাশায় শিস দিয়ে উঠল। কাছে-পিঠে কোথাও হলে না হয় লিফট দেয়া যেত।

অঝোর বর্ষণের দিকে তাকিয়ে গোলাম মোস্তফা বলল, বৃষ্টি থামবে বলে তো মনে হয় না।

তাই দেখছি।

কী করবে ?

দেখি না। মান্না তালুকদারের শ্যুটিংয়ে গেছিলাম।

মান্না তালুকদারের নতুন ছবি 'তুমি যে আমার' গোলাম মোস্তফার লেখা।

সে জানতে চাইল, ড্রয়িং রুমের সেট পড়েছে না ?

হ্যাঁ, নায়কের বাড়ির ড্রয়িং রুম। ডায়লগ বড় ভালো লাগল।

গোলাম মোস্তফা প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভ্রু তুলে রইল।

সেই যে আপনি যেখানে লিখেছেন, ডাক্তারকে নায়ক বলছে— ডাক্তার, ভালো আমাকে হয়ত করতে পারবেন কিন্তু ভালো আমি হবো না, ওষুধ আমাকে ভালো করতে পারবে না, যে আমাকে ভালো করতে পারত, আপনার প্রেসক্রিপশনে কোনো ওষুধের দোকানে তো তাকে পাওয়া যাবে না, ডাক্তার!

তোমার ভালো লেগেছে ?

লোকে খুব নেবে।

বলছ ?

আপনার কোনো ছবি লোকে নেয় নি ? আপনার লেখা সব ছবিই তো সুপার হিট, বাম্পার, কমপক্ষে হিট তো বটেই।

হু, কমপক্ষে হিট তো বটেই, কী বলো ?

গোলাম মোস্তফা কি ঠাট্টা করল ?

গোলাম মোস্তফা বলল, ছবি হিট করলে রাইটারের কোনো ক্রেডিট নেই, কেউ স্বীকার করে না। ছবি ফ্লপ করলে রাইটার, হ্যাঁ, রাইটারের তখন খোঁজ পড়ে— ঐ শালা ডুবিয়েছে। যে ছবি হিট করে সে ছবি আমার লেখা না।

বাক্যটা মনে ধরল আফজালের, চিত্রালীতে ছোট্ট একটা আইটেম হতে পারে।

চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। এ বিষ্টি থামবে না। ভিজেও গ্যাছো। জ্বরটর হবে।

আপনি আবার সেই অতদূর যাবেন ?

আধা ধমক দিয়ে উঠল গোলাম মোস্তফা, ভদ্রতা রাখো তো।

ড্রাইভার গাড়ির কাচ তুলে ঘুমোচ্ছিল, ক্যাসেটে গান চালিয়ে। গোলাম মোস্তফা একটু বিরক্তি বোধ করল। ঘুমোবে ক্যাসেট কেন ?

ব্যাটারি তুমি ডাউন করে ছাড়বে।

তিরস্কার হজম করে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। গন্তব্য গেণ্ডারিয়া শুনে সে খুব খুশি হলো না, তার মানে, গাড়ি গ্যারেজে তুলতে তুলতে আরো অন্তত এক ঘণ্টা।

আফজাল, আমার তো বয়স হয়ে গেছে!

কী যে বলেন ?

না, না, বয়স তো কম হলো না, ইউনিভার্সিটি ছেড়েছি সেই বাইশ বছর আগে।

বাইশ বছর ? আফজালের গলায় বিস্ময়ের শিস ফুটে বেরোল।

আচ্ছা বলো তো, আজকাল তোমরা হাসবে না ? যখন দেখবে, ধরো যদি এ-রকম একটা সিন আমি লিখি যে, গরীবের একটা ছেলে মাথা খুব ভালো, ব্রিলিয়ান্ট, ভদ্র, ছাত্র মানুষ, খুব গরিব। বড় লোকের মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে এলো, তারপর প্রেম হলো— তোমরা হাসবে না ? অথচ এক সময় বহু বাংলা ছবিতে, কলকাতার ছবিতে, এই করে ছেলের সংগে মেয়ের প্রথম দেখা করানো হতো, লোকেও খুব নিতো।

এখন বোধহয় উঠে গেছে।

কী, প্রাইভেট পড়ানোর সিন ?

না, ঐ যে ছেলেমেয়ের প্রথম দেখা কী করে হলো, সেটা দেখানো। এখন তো দেখি নায়ক-নায়িকার দেখা-সাক্ষাৎ যে হয়েই গেছে সেটা আগে থেকেই এসটাবলিশ, আর নয় তো দেখা যায় নায়িকা নায়ককে প্রথমে একটা কিছু ঘটনায় অপমান করল, ব্যাস, তারপর থেকেই চলল কাহিনী।

আমাদের সময়ে আরেকটা প্রবলেম ছিল, বড় ভোগাতো, সেটা কি জানো ? প্রথমে দেখা হবার পর নায়ক নায়িকা দু'জন দু'জনকে 'আপনি-আপনি' বলে, তারপর 'তুমি' বলতে হবে, সেই 'তুমি' বলবার সিনটা লিখতে নাস্তানাবুদ হতে হতো।

আফজাল হেসে উঠলো, তারপর মনে পড়ল গোলাম মোস্তফার বয়স তার দ্বিগুণ, সে সামলে নিল নিজকে, বলল, মোস্তফা ভাই, এখন ওসব উঠে গেছে, স্টেট ফরোয়ার্ড 'তুমি' দিয়েই শুরু। তুই-তোকারিও ফার্স্ট সিনে এখন আকছার শুনবেন; এটাই এখন চল।

বিষণ্ন বোধ করল গোলাম মোস্তফা। বলল, নাহে না, চল-টল কিছু না, চারদিকে যে অসভ্যতা চলছে, তারই রিফ্রেলকশন। মানুষ কিন্তু কনজারভেটিভ মাইন্ড নিয়েই ছবি দেখতে

আসে, পুরনো জিনিসই বেশি টানে, আমি দেখেছি। তুমি কী বলবে? —মান্না তালুকদারের আগের ছবি 'নতুন সাথী' সেখানে ছবির বারো আনা পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা দু'জন দু'জনকে 'আপনা-আপনি' বলে যায় নি? সে ছবি চলে নি?

গুলশানে বাড়ি করলেন মান্নাভাই সে টাকায়।

তবে?

অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইল আফজাল।

গোলাম মোস্তফা বলল, সে জন্যে কথাটা তুললাম, তাহলে বলি তোমাকে এবার। মনে করো, কোনো অসভ্যতা নয় কিছু নয়, তোমার ঐ চল-টলও আমার চলবে না, মনে করো, নায়ক-নায়িকার দেখা করাতে হবে, প্রথম দেখা, কীভাবে সে দেখা করাবে তুমি?

শহরের নায়ক-নায়িকা?

হ্যাঁ শহরেরই ঘটনা। নায়িকা শহরের বড়লোকের মেয়ে। নায়ক সম্পর্কে, ধরো, আমি ওপেন আছি। সে গরিব হতে পারে, বড়লোকের ছেলেও হতে পারে, তবে গরিবই বোধহয় করব, নায়ক গ্রামের কি শহরের হবে এখনো ডিসাইড করা হয় নি, মনে করে নাও। দু'জনের দেখা করাতে হবে, একটা শুধু ফিকসড পয়েন্ট আছে। দেখাটা রাতের বেলায় হতে হবে, একটু বেশি রাত হলে ভালো হয়। কী করে দেখা তুমি করাবে?

আগে থেকে পরিচয় নেই।

না, এই প্রথম পরিচয় হবে।

কোথাও কখনো দেখা হয় নি? ইউনিভার্সিটিতে, কি রাস্তায়, কোথাও কোনো পাসিং শাট?

না, না, কিচ্ছু না, এই প্রথম দেখা। নায়ককে ধরে এগোচ্ছি, নায়িকার সংগে প্রথম দেখা হবে। তোমাদের কালে কীভাবে দেখা হতে পারে, বলো শুনি।

আফজাল চিন্তিত মুখে সড়ক দেখতে লাগল। বৃষ্টিতে চকচক করছে সড়ক। বৃষ্টির ভেতরে জ্বলজ্বল করছে বন্ধ দোকানপাটের নিয়ন সাইনগুলো।

ভীরু গলায় আফজাল বলল, ধরুন বৃষ্টি।

ধরলাম।

খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

হচ্ছে।

হঠাৎ বৃষ্টি এসেছে।

এলো। তারপর? অসহিষ্ণু গলায় গোলাম মোস্তফা উচ্চারণ করল।

নায়ক ছুটতে ছুটতে একটা বারান্দায় উঠে পড়ল। আরো অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, নায়িকাও ছিল, ধাক্কা, মাফ করবেন দেখতে পাই নি।

গোলাম মোস্তফা অবিলম্বে যোগ করে উঠল— নায়কের ধাক্কায় নায়িকার হাত থেকে বই পড়ে গেল, হাতে একটা বই ছিল। বই থেকে, ধরো, একটা শুকনো ফুল, দু'পাতার ভাজের ভেতরে ছিল, ছিটকে পড়ল, নায়ক নিচু হয়ে বইটা তুলতে গিয়েই ফুল দেখে থমকে গেল, মিউজিক, পিয়ানোর তিনটে নোট, টুং টাং টং।

উল্লসিত হয়ে উঠল আফজাল, অপূর্ব!

গোলাম মোস্তফা কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থেকে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, চলবে না।

কেন ? হাত থেকে গেলাশ হঠাৎ পড়ে গেল যেন তার, ঝনঝন করে সুন্দর গেলাশটা ভেংগে ছড়িয়ে পড়ল।

চলবে না। দুটো অসুবিধে। এক, ঐ ফুল, শুকনো ঐ ফুল, তার মানেই নায়িকাকে কেউ দিয়েছিল, কে দিয়েছিল ? নিশ্চয়ই কোনো ছেলে। অডিয়েন্স সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেবে মেয়েটার সঙ্গে কারো প্রেম আছে, কিংবা প্রেম ছিল, ধরে নেয়াটাই স্বাভাবিক। এখন প্রেম যদি থেকেই থাকে তাহলে প্রবলেম নয় ? নায়কের সঙ্গে আবার তুমি প্রেম করাবে তাকে ? দু'জনের সঙ্গে প্রেম ?

দু'জনের সঙ্গে হয়তো প্রেম।

দু'জন কেন, দশজনের সঙ্গে হতে পারে। ছবিতে হয় একটা প্রেম। একটার বেশি দেখালেই অডিয়েন্স তোমার গালে থাপ্পড় মারবে, মেয়েরা তোমার ছবি দেখতে আসবে না, ছবি ফ্লপ।

আগের ছেলেটা বিট্রে করতে পারে তো ?

পারে, তা দেখানো যায়, কিন্তু সে-রকম দেখাতে হলে তাকে দিয়ে ফুল দেওয়ানো চলবে না, প্রেমটা হাফ এদিক হাফ ওদিক রেখে দিতে হবে। দুই নম্বর অসুবিধে, বৃষ্টি। বৃষ্টির শট মানে একটা শটের জন্যে একদিন পার, প্রডিউসারের পয়সা নষ্ট।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গোলাম মোস্তফা বলল, বাংলাদেশ তো বৃষ্টির দেশ, ক'টা বাংলা ছবিতে বৃষ্টি দেখেছ ? এখন কী ঘন মেঘ করে এসেছে, খুব হাওয়া দিয়েছে, গাছের মাথায় মাথায় দোল, বৃষ্টি আসে নি কিন্তু এখুনি আসবে, মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে— দেখেছ কোনো ছবিতে ? এমনকি ডায়লগেও কোনো উল্লেখ শুনেছ ? ভুলে যাও, বিষ্টিফিস্টি চলবে না, প্রডিউসারকে ভেজানো যাবে না। নিজের পরিহাসে নিজেই হেসে উঠল গোলাম মোস্তফা।

এতক্ষণ ভাবছিল আফজাল, হঠাৎ বলে উঠল, পরিচয়টা আপনার রাতে করানো দরকার তো ?

হ্যাঁ, তোমার ঐ আগের সাজেশানে আরো একটা ঘাপলা ছিল। অত রাতে নায়িকা রাস্তায় একটা বারান্দায় কী করছিল ?

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

অত রাতে ওখানে গেল কী করে ? বড় লোকের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, গাড়ি আছে, রাতের বেলায় বিষ্টিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ? লজিক দেবে না ?

ওটা যেতে দিন, এইটে শুনুন।

গোলাম মোস্তফা আগের কথার জের টেনেই বলে চলল, লজিক তোমাকে দিতে হবে।

নতুন যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছে আফজালের সেটা বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে একটু অসহিষ্ণু গলায় সে বলে উঠল, লজিক আর কোথায় আমাদের ছবিতে ? বিয়ে করা বৌ স্বামীর বাড়িতে দাসীর চাকরি নেয়, কেউ তাকে চিনতে পারে না; চোখ উপড়ে আরেকজনের চোখে বসানো হয়; পৃথিবীতে এত লোক থাকতে হারানো ভাইয়ের রক্তই আরেক ভাইয়ের লাগে— এই তো লজিক ?

লেখো না কেন তোমরা ? রিভিউ যখন লেখো, তখন তো তোমাদের বলতে শুনি না। যাকগে, বলো শুনি।

বকা খেয়ে আফজালের উৎসাহ মরে গেছে, তাই মিনমিনে গলায় সে বলল, এসেছিল একটা আইডিয়া, বোধহয় আপনার ভালো লাগবে না।

বকা দেবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে গোলাম মোস্তফা তার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, আরে বলোই না।

রাতের বেলায় তো?

হ্যাঁ।

একটু বেশি রাত যদি হয়?

হোক, ক্ষতি নেই।

রাত প্রায় একটা। কারফিউর সময় হয়ে আসছে।

কারফিউ শুনেই গোলাম মোস্তফা ভ্রু গাঁথল।

আফজাল বলে চলল, ঢাকায় যে রোজ রাতে কারফিউ থাকে ধরুন সেইটে আমরা ইউজ করছি। নায়ক রাস্তা দিয়ে আসছে, একা, তার কাছে একটা এল.এম.জি?

এল-এম-জি?

হ্যাঁ, লুকোনো আছে, তার চাদরের নিচে। সে হনহন করে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ সে দেখতে পেল পুলিশ। নায়িকার বাড়ি গুলশানে, গুলশানে রাতে পুলিশ পাহারা দেয়, সে এখন কী করে, তাকে যদি ধরে ফেলে? একজন পুলিশ তাকে দেখতে পায়, নায়ক তখন—

এল.এম.জিটা গোলাম মোস্তফাকে তখন থেকে বিব্রত করে রাখছিল। সে বাধা না দিয়ে আর পারল না। বলল, নায়কের কাছে এল.এম.জি কেন?

নায়ক মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

মুক্তিযোদ্ধা?

সে তখন নায়িকার বাড়ির পাঁচিল টপকে গা ঢাকা দিল।

গোলাম মোস্তফাকে অবিরাম মাথা নাড়তে দেখে চুপসে গেল আফজাল।

চলবে না?

গাড়ি এখন ফরাশগঞ্জের ভেতর দিয়ে যেতে দেখে আফজাল খুশি হয়, আর বেশিক্ষণ নয়, নেমে যাবে সে। কিন্তু যতক্ষণ গাড়িতে আছে, কথা চালিয়ে যেতে হয়।

কেন চলবে না! মোস্তফা ভাই?

বোঝো না? মুক্তিযুদ্ধ। সেনসেটিভ ব্যাপার। রাজাকাব মুক্তিযোদ্ধা নানারকম ঘাপলা আছে না? সিনেমার কাগজে কাজ করো বলে পলিটিকসের খবর রাখবে না?

রাখব না কেন?

তাহলে? সেই গোড়ার দিকে দু'একটা ছবি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। আর হয়? এখন হয়? কেন হয় না? কার সাইড নেবে তুমি? এক সাইড নিলে আরেক সাইড ক্ষেপে যাবে। দু'টোই ডেনজারাস।

আফজাল ড্রাইভারকে বলল, এই সামনে ডান হাতের রাস্তা দিয়ে।

গোলাম মোস্তফা বিষণ্ন এক সংবাদ ঘোষণা করল, তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের ছবি এখন ফ্লপ করবে।

কেন ?

মুক্তিযুদ্ধই ফ্লপ করছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আফজাল বলল, মোস্তফা ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি বড় ভাইয়ের মতো, তবু আপনাকে পেসিমিস্ট মনে না করে পারছি না।

আমি পেসিমিস্ট ? গোলাম মোস্তফা স্মিতমুখে স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল, যেন জিহ্বার ওপর নেড়েবেড়ে স্বাদ পরীক্ষা করে দেখল কথাটার, আবারো বলল, পেসিমিস্ট ?

এখানে, এখানে রাখলেই হবে, ড্রাইভারের পিঠে হাত দিয়ে বলল আফজাল। গোলাম মোস্তফার দিকে ফিরে বলল, আপনাকে কষ্ট দিলাম, মোস্তফা ভাই।

শোনো, শোনো। আফজালের হাত টেনে ধরল সে। পেসিমিস্ট বলছ আমাকে ?

আপনি রাগ করেছেন।

না, তোমার ভুলটা শুধরে দিচ্ছি। পেসিমিস্ট হলে ঢাকার ফিল্মে লেগে থাকতাম না এখনো, কবে ছেড়ে দিয়ে ইনডেনটিংয়ের ব্যবসা করতাম।

কেউ যদি বলে, ইনডেনটিংয়ে পয়সা আছে, নাম নেই, আপনি ফিল্মে থেকে পয়সাও পাচ্ছেন, নামও পাচ্ছেন, তাই আছেন।

নো নেভার। আজকাল তোমরা মনের কথাটা ফস করে মুখে বলতে পারো, আমাদের কালে আমরা হয়ত পারতাম না, কিন্তু মনে যা আসে তাই যে সত্যি, তাই যে নির্ভুল, সেটা কিন্তু নয়। ঢাকার ফিল্মে আছি, ঢাকায় একদিন ভালো ছবি হবে বলে, ভালো ছবি একদিন করতে পারব বলে।

হঠাৎ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় আফজাল। বলল, করছেন না কেন ?

গোলাম মোস্তফা প্রশ্নের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

আফজাল আরো এগিয়ে গেল, আপনার ওপরেই তো সবচেয়ে বেশি ভরসা ছিল। আমরা সকলেই আশা করতাম, ভালো ছবি করলে আপনিই করতে পারবেন। এখনো অফিসে আমরা বলাবলি করি, আপনি কেন একটা ছবি করছেন না ?

গোলাম মোস্তফা হঠাৎ যেন তার নিজের কণ্ঠে অন্য কারো স্বর শুনতে পেল, যে এখন বলে উঠল, কে বলল, করছি না ?

এবার স্তব্ধ হয়ে যাবার পালা আফজালের। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গোলাম মোস্তফার দিকে। একবার তার সন্দেহ হলো, লোকটির এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে শস্তা চিত্রনাট্যগুলোকেই সে এখন মহৎ কীর্তি বলে বোধ করছে, আবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে অনুভব করল, না, তা তো নয়। সে চোখে ক্রোধ এবং প্রত্যয় জ্বলজ্বল করছে।

গোলাম মোস্তফা চাপা উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, আমি একটা ছবি করছি।

কই, শুনি নি তো!

গোলাম মোস্তফা রহস্যময়ভাবে হাসতে লাগল। নিজেরও যেন বিশ্বাস হতে থাকল যে সত্যি সত্যি তার ছবির কাজ শুরু হয়েছে।

অ্যানাউনস করবেন না ?

নাহ। এ কি আর পয়সার জন্যে ছবি বানাচ্ছি ? ভালো ছবি করব, চুপচাপ কাজ করব, খুব

কম বাজেটে ধরে ধরে। হৈ চৈ-এ আমার দরকার কী ? ছবি হলে দেখতেই পাবে, সকলেই দেখবে।

আফজালের বিস্ময় তবু কাটতে চায় না। এত বড় একটা খবর, কেউ রাখে না ? তার সাংবাদিক সত্তা সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

সে জিজ্ঞেস করল, স্ক্রিপট শেষ ?

হ্যাঁ, বছর খানেক আগে শেষ করেছি।

আর্টিস্ট ?

সব নতুন। নিউ ফেস।

রঙিন না শাদা-কালো ?

রঙিন করতে পারলে ভালো হতো। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে রঙিন ছবিই চাহিদা! ফেস্টিভালগুলোতেও। বিদেশের টেলিভিশন তো সব রঙিন, রঙিন ছবিই চায়। আমার উপায় নেই। প্রডিউসার অত পয়সা লাগাতে চায় না। এমনিতেই রিসকি।

তাহলে শাদা-কালো হচ্ছে ?

ইয়েস। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তাতে কিছু আসে যায় না। শাদা-কালোকে আমি ব্যবহার করব। কালো দেখলে কখনো মনে হবে, কুচকুচে সিল্ক, কখনো মনে হবে স্ক্রিন পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, শাদা দেখলে হাহাকার করে উঠবে, আবার কখনো শাদার ভেতর থেকে সুঘ্রাণ পাবে। রজনীগন্ধার শাদা দ্যাখো নি ? ছবি যখন দেখবে, তখন বুঝতে পারবে, সুপার হিট ছবি তৈরি করার একটা যন্ত্র আমি ছিলাম না, যন্ত্র আমি হয়ে যাই নি। তোমাকেই প্রথম বললাম। চলি।

বিমূঢ় আফজালের ওপর দিয়ে আলো ঘুরিয়ে গোলাম মোস্তফার গাড়ি উল্টো দিকে মুখ করল।

বাড়ির পথে তার গাড়ি তীব্র বেগে ধাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দরোজা যেন নিঃশব্দে খুলে গেল কোথায়। আরে, এই তো ? এই তো পাওয়া গেছে। গোলাম মোস্তফা পরম স্বস্তিতে চোখ বুজে দৈবের আরো একটি দয়া গ্রহণ করল। কল্পনায় সে দেখতে পেল, নায়ক কারখানায় রাতের শিফটে কাজ করে হেঁটে হেঁটে বস্তিতে ফিরছে, রাতে সে কাজ করে আর দিনে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। নিঝুম রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে আসছে, হঠাৎ এক পাগলা কুকুর তাড়া করল তাকে; সে দিশা না পেয়ে দৌড়ে এক বাড়ির দরোজায় গিয়ে ধাক্কাতে শুরু করল। কুকুর তোড়ে আসছে, সে ভয় পাচ্ছে, কুকুর আরো কাছে আসছে, নায়কের চোখে আতংক, বিগ ক্লোজ, দরোজা দড়াম করে খুলে যায়, ভেতরে সে টাল হারিয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়, চোখ তুলে দ্যাখে— একটি মেয়ে, দ্রুত হাতে দরোজা বন্ধ করে দিল নায়ক, নায়িকা চিৎকার করে উঠল এ-কী করছেন ? কে আপনি ?—গোলাম মোস্তফা আপন মনেই হাসতে থাকল। সে কল্পনায় শুনতে পেল পরিচালক তাকে প্যাঁচে ফেলবার জন্যে বলছে, কিন্তু নায়িকা কুকুরের ডাক শুনতে পাবে না ? বুঝতে পারবে না যে লোকটা কেন ঘরের ভেতর ছুটে এসেছে ? গোলাম মোস্তফা তখন হেসে উত্তর দেবে, পাগলা কুকুর শব্দ করে না।

২

পরের সপ্তাহে চিত্রালী হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে গেল গোলাম মোস্তফা! প্রথম পাতায় তার দু'কলাম জোড়া ছবি, আর রঙিন কালিতে হেডিং— 'যন্ত্র এবার মানুষ হবে।'

আফজাল সে রাতের কথা ভোলে নি, স্কুপ খবর হিসেবে পরিবেশন করেছে।

প্রথমে, খুব অল্পক্ষণের জন্যে তার রাগ হলো আফজালের ওপর, ছাপার আগে একবার তাকে জানালো না কেন? উচিত ছিল না? তারপর নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে গেল মনটা। অনেকদিন কাগজে তার ছবি বেরোয় নি। তাও প্রথম পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে। নিজেকে তার খুব বিশিষ্ট আর প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে লাগল।

না, এমন আর কী অন্যায় করেছে আফজাল? একটা কেন, এতদিনে তার দশটা ছবি করে ফেলবার কথা ছিল।

লেখার টেবিলে কুমকুম চায়ের কাপ রেখে বলল, দেখি চিত্রালীটা।

দাঁড়াও দেখে নিই।

তুমি পরে দেখো। এখন তো লিখবে।

মাথা কাজ করছে না, পরে লিখব।

যা লিখছ তা লেখার জন্যে মাথা লাগে না। দাও চিত্রালীটা।

হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিল কুমকুম। মিটমিট করে হাসতে লাগল গোলাম মোস্তফা। চোখ বুলিয়ে স্থির হয়ে গেল কুমকুমের চোখ, দ্রুত খবরটার ওপর চোখ বোলাতে লাগল সে।

কই, ছবি করছ, আমাকে বলো নি তো?

গোলাম মোস্তফা মিটমিট করে হেসেই চলল।

আবার হাসছ? এতদূর এগিয়ে গেছ, আমাকে কিচ্ছু বলো নি?

সব বানিয়ে লিখেছে।

বানিয়ে?

বাড়িয়ে লিখেছে।

বাড়িয়ে?

তুমি তো জানোই, এইটুকু একটা ইন্ডাস্ট্রি, রোজ রোজ খবর কোত্থেকে হয়। তিলকে তাল করে না লিখলে পাতা ভরাবে কী দিয়ে?

কুমকুম হঠাৎ আদরভরা গলায় বলে উঠল, করো না একটা ছবি। ভালোই তো হয়।

কুমকুমকে নিরাশ করতে কুণ্ঠা হলো তার। কুমকুমের গলায় অনুনয়টুকু বড় উপভোগ করল সে। একটা ভালো ছবি করলে তার চেয়ে গৌরব বোধ করবে কুমকুম, মনের মধ্যে অস্পষ্ট বেদনার সঙ্গে অনুভব করে উঠল গোলাম মোস্তফা।

কোনটা করবে?

অনেক অনেক ছবির পরিকল্পনা সে করেছে দীর্ঘ এই পনেরোটি বছর, তার প্রত্যেকটি কুমকুমকে সে শুনিয়েছে, কত রাতে খাবার পর লম্বা বারান্দায় বসে এককেটা ছবির গল্প করেছে সে। বারান্দার নিচে উঁকি দেয়া নারকেল গাছের পাতায় পাতায় রাস্তার আলো নাচ করেছে কত রাত, সেই দিকে তাকিয়ে শটের পর শট সে কল্পনায় দেখেছে আর উচ্চারণ

করে গেছে।

বলো না, কোন গল্পটা ?

এখন থাক, এখন আমি লিখব।

এই তো বললে, মাথা কাজ করছে না ?

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যে আসলের চেয়ে অনেক বেশি বিরক্ত এনে গোলাম মোস্তফা বলল, মাথা কাজ করবে কী ? এত সুন্দর একটা সিচুয়েশন চিন্তা করেছিলাম, কোনো ছবিতে এ রকম নেই, মান্না তালুকদার শুনেই রিজেকট করে দিল। বলল, এমন একটা রোমান্টিক ছবি— তুমি তো জানোই, মান্না দু'হাত নাচিয়ে নাচিয়ে সুর করে ফিসফিস করে কীরকমভাবে কথা বলে। হাত নাচিয়ে নাচিয়ে সে বলল, লোকে ক্ষীরের ওপর ভাসবে, ভাসবে ডুববে, ক্ষীর খাবে, আবার উঠবে, আবার ভাসবে, শুধু রোমান্স আর রোমান্স, আর আপনি তার মধ্যে এক পাগলা কুত্তা নিয়ে এলেন ?

হো হো করে নিজেই হেসে উঠল গোলাম মোস্তফা। কুমকুমও হেসে কুটিপাটি।

কুমকুম বলল, যাই বলো, লোকটার ছবি কিন্তু চলে। লোকে খুব দেখে।

আমি তো অস্বীকার করছি না। কমার্শিয়াল ছবি বানাক আর যাই বানাক, যে যত্ন নিয়ে বানায়, স্ক্রিপটের ভেতর যে-রকম ডুবে যায় লোকটা সেটা শুধু টাকা বানাবার জন্যে নয়, লোকটার যেন একটা নেশা ধরে যায়, একটা জেদ চেপে যায়, মানুষকে টেনে-হিঁচড়ে সিনেমা হলে আনবেই, তাদের আসতেই হবে, এক ছবি দশবার দেখতে আসে। নিশ্চয়ই প্রতিভা আছে, নইলে মানুষ তার ছবি পাগলের মতো দেখে কেন ?

তোমাকে কিন্তু পয়সা কম দেয়।

তা দেয়, তা দিক মনটাও খিঁচরে থাকে, প্রত্যেকবার ভাবি আর তার কাজ করব না, আবার কী করে যেন জড়িয়ে যাই। আমারও কেমন একটা মজা লাগে।

তোমার লাগতে পারে, সংসার চালাতে হয় আমাকে।

আহা, জানি। মজা লাগে না ? স্ক্রিপট লিখেছি, পর্দায় সব আছ, যেখানে যা লেখা তার একটা শব্দ বাদ নেই, অথচ আমার কাছেই মনে হয় নতুন একটা ছবি দেখছি, যেন আমার লেখাই না।

অনেক হয়েছে, এবার মান্না তালুকদারকে ছাড়ো, সব ছেড়েছুড়ে নিজের ছবিটা করো।

সব ছেড়ে দিলে খাবো কী ? একটু আগেই না নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললে— সংসার চালাতে হয় তোমাকে ?

তুমি আর আমিই তো ? কী এমন লাগে ?

গোলাম মোস্তফা শংকিত হয়ে উঠল। দশ বছরেও ছেলে না হবার ব্যর্থতা এখন হঠাৎ দুমদাম দাপাদাপি চেঁচামেচি হয়ে ফেটে পড়বে নাকি ?

হঠাৎ গোলাম মোস্তফার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে ভাবনা করা এক চিত্রনাট্যের কথা। স্মৃতির দিকে ধাবিত হয়ে সে আশু-আশংকা বেমালুম ভুলে গেল।

কুমকুম বলল, কই, কোন গল্পটা করছ ?

গোলাম মোস্তফা এক্ষুণি বলতে পারত এক্ষুণি তার মনে পড়ে গেছে, কিন্তু সে ইতস্তত করতে লাগল।

বলল, দেখি।

নিশ্চয়ই একটা তুমি ঠিক করেইছ, আমাকে শুধু বলছ না। সেই গল্পটা নয় তো ?

কোনটা ?

সেই যে, সেই লোকটার গল্প, রিকশায় একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছিল।

তোমার মনে আছে ?

তোমার সব গল্প আমার মনে আছে। কুমকুমকে বড় গর্বিত দেখাল। সে আরো বলল, অনেক গল্প তো তুমি নিজেই ভুলে যাও, আবার আমি মনে করিয়ে দিই। বলো, ঠিক ধরেছি কিনা ? তুমি ঠিক সেই লোকটার গল্প ছবি করছ।

গোলাম মোস্তফা মাথা দোলালো।

না ? ভালো গল্প ছিল তো। খুব ভালো ছবি হতো।

উদ্বিগ্ন, বঞ্চিত চোখে কুমকুম স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গোলাম মোস্তফা বলল, জানি, থিমটা খুব সুন্দর, পলিটিক্যাল ক্রাইসিস পার্সোনাল ক্রাইসিস কমিটমেন্টের ক্রাইসিস, সব একসঙ্গে ছিল।

করো না এই গল্পটা।

গোলাম মোস্তফাকে তখন স্মৃতি পেয়ে বসেছে। কুমকুমের অনুনয় ভালো করে তার কানে গেল না, সে নিজেকে আবার দেখতে পেল ইউনিভার্সিটি যাবার পথে রোজ সকাল বেলায়।

সে বলে চলল, রিকশার পয়সা দেবার ক্ষমতা ছিল না বাবার, আর আমার উঠতে ইচ্ছে করতো না বাসে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসতাম সদরঘাটে, যেখান থেকে শেয়ারে রিকশা নিতাম, ফুলবাড়ি ইস্টিশান পর্যন্ত দু'আনায় হয়ে যেত, তারপর রেললাইন ধরে হেঁটে ইউনিভার্সিটির পেছনে নালা টপকে ঢুকতাম। ফেরার পথে অবশ্য পুরো রাস্তাটাই হেঁটে মেরে দিতাম।

কুমকুমের ছেলে হয় নি বলে বন্ধুরা বলে গোলাম মোস্তফাই এখন তার ছেলের জায়গা নিয়েছে। কতবার এ কাহিনী শুনেছে কুমকুম, এখন আবার শুনছে, তবু যেন এই প্রথম শুনছে এমন মমতা নিয়ে সে তাকিয়ে রইল।

এমনকি বেদনা নিয়ে কুমকুম বলল, খুব কষ্ট হতো নিশ্চয়ই, তুমি আর ভুলতে পারো না।

কষ্ট তো হতোই। তখন কি আর কষ্ট মনে হতো ? বয়সটা কী ছিল ? একবার তো পায়ে হেঁটে পৃথিবী ঘুরে আসব প্ল্যান করেছিলাম।

থাক, তোমার ছবির প্ল্যান বলো।

ছবি ? হঠাৎ খেই খুঁজে পেল না গোলাম মোস্তফা।

সেই লোকটাকে নিয়ে যে ছবি।

হ্যাঁ, হয় ছবি, ভালো ছবি হয়। সেই ছাত্রবয়স থেকে গল্পটা মাথায় ঘুরছে। একটা লোক, সাধারণ লোক, ছোট চাকরি করে, ছোট্ট একটা সংসার আছে, নিজের সংসার ছাড়া কিছু বোঝে না, লোকটা ভীতু, ভিড় দেখলে দাঁড়ায় না, পল্টনের মাঠে বক্তৃতা শুনতে যায় না, ধর্মঘটের দিন সারা আপিস ফাঁকা, একমাত্র সে এসেছে কাজে, পাছে চাকরি চলে যায়, পাছে ছেলেমেয়ে না খেয়ে থাকে, সেই ভয়, সেই লোককে একদিন স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক এসে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

কুমকুমকে গল্পের উত্তেজনা পেয়ে বসে, সে যোগ না করে থাকতে পারল না, সে তো বুঝতেই পারে না, কেন তাকে গ্রেফতার করা হলো।

এমনকি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি আছে কিনা, তাই সে ভালো করে জানে না, তাকে জেরার পর জেরা মণি সিং কোথায় পালিয়ে আছে ? অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো, কুমু, তুমি নিজেকে এবার কল্পনা করে দেখো, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আর তার চেলা মোনেম খান তখন আমাদের মাথার ওপরে, লোকটার মনের অবস্থা কী হতে পারে ? আর অপরাধের ভেতর এই যে, আই.বি-র লোক তাকে একদিন রাজনৈতিক অর্থে দাগী একটা লোকের সঙ্গে এক রিকশায় যাচ্ছিল, এ-রকম শেয়ারে যে লোকেরা যায়, সে-কথা পুলিশের মাথায় আসে নি। এক রিকশায় যখন, তখন এ ব্যাটাও এক কমরেড। আর রিকশায় দেখতে পাবার কথাটাও যদি পুলিশ একবার মেনশন করত, সে তখন শেয়ারের কথা বলতে পারত, তাকে তো কিছুই বলা হয় নি।

আচ্ছা, লোকটাকে তুমি শেষ পর্যন্ত কী করবে, আমাকে কখনোই কিন্তু বলো নি।

কত কিছু করতে পারি। নির্যাতনে তাকে মেরে ফেরতে পারি।

সে তো হতেই পারে। লোকে তোমাকে ডিফিটিস্ট বলবে না ?

তাকে বিনা বিচারে জেলে রাখতে পারি, বছরের পর বছর।

সেখানেই থাকবে সে, ছবির শেষ পর্যন্ত ?

দেখাতে পারি, জেলে অন্য বন্দিদের কাছে সে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পাঠ নিচ্ছে, সচেতন হয়ে উঠছে, তার ভেতরে ক্রোধ গড়ে উঠছে, সে এই প্রথম কেবল তার নিজের সংসার নয়, সবার সংসারের ভালোর জন্যে আকুল হয়ে উঠছে। ধরো, সে যখন বেরিয়ে আসছে তাকে আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে পাচ্ছি।

কাঁচা প্রপাগান্ডা মনে হবে না ?

সে পসিবিলিটি তো সেন্ট পারসেন্ট। আবার এমনও করা যায়, পুলিশের নির্যাতন থেকে বাঁচবার জন্যে নিজের বৌ ছেলেমেয়ের জন্যে, সে পুলিশের ইনফরমার হতে রাজি হলো, বেরিয়ে এলো, তারপর পার্টিতে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল, সে একটা ঘৃণিত জীবে পরিণত হলো।

কিন্তু তার জন্যে তো তখন আমাদের মায়া হবে। লোকটা তার ছেলেমেয়ের জন্যে খারাপ হচ্ছে, আসলে তো খারাপ সে নয়।

কুম, এ ছবি আমি এখন করব না। আমাকে আরো ভাবতে হবে। অনেক ভাবতে হবে। দুটো চিত্রনাট্য, অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছি। নৃপেন চক্রবর্তী দু'দিন পরেই বাড়িতে এসে চড়াও হয়ে বসে থাকবে, তার ছবি আগামী মাসে রিলিজ, তারপর তাকে শুটিং করতে হবে, সে ছাড়বে ? আবার হারুন ইসলামের স্ক্রিপট না দিয়ে যদি নৃপেনের স্ক্রিপট আগে দিই তো একটা ফাটাফাটি হয়ে যাবে। দুটোর একটারও একটা শব্দ এ পর্যন্ত ভাবি নি।

তাহলে সেই গল্পটা করো না কেন ? ওটা তো তোমার করাই আছে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর কেরায়া গল্পটা।

গোলাম মোস্তফা ভ্রু কুচকে চিন্তা করল খানিক। তুড়ি বাজিয়ে বলল, ওটার শুটিং স্ক্রিপট অবশ্য করাই আছে। কিন্তু সে কোন কালে করেছি, কতদিন আগের কথা, এখন কি পছন্দ হবে নিজেরই ? দেখি। তুমি কলেজে যাবে না ?

আজ একটাই ক্লাশ, তাও সাড়ে এগারোটায়। তুমি কেরায়া করতে পারলে কিন্তু বাংলাদেশ দেখাতে পারতে। নদী, গ্রাম, হাট, বর্ষা— সব ছিল। আবার, অভাব-অনাহার আছে, মৃত্যু আছে, সেই মৃত্যু নিয়ে মানুষের রিঅ্যাকশন আছে। খুব হিউম্যান ছবি হতো।

আরো একটা সুবিধে ছিলো। সংলাপ একেবারে নেইই, টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট মাত্র, সাব টাইটেল না থাকলেও বিদেশীদের বুঝতে কষ্ট হবে না। মিউজিকও পুরোপুরি ট্র্যাডিশনাল ফোক থেকে নেয়া।

তুমি এখন কলেজে যাও তো, এগারোটা বাজে। একটাই যখন ক্লাশ, গাড়ি আর পাঠিও না, একেবারেই ফিরে এসো।

কুমকুম উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি জানি, তুমি শেষ পর্যন্ত কেরায়াই করবে। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ মরে গেলেন। তুমি তাঁকে চিঠিপত্র লিখেছিলে পর্যন্ত। বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। তোমার মনে আছে ?—তুমি যখন তাঁকে লিখলে, তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন, এ গল্প কারো ছবির জন্যে পছন্দ হতে পারে, ভাবতেই পারেন নি ?

গোলাম মোস্তফা বৌকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল, এ ছবিরও ঝামেলা, কুমু, শুটিংয়ের ঝামেলা, ধরে ধরে শট নিতে হবে, একেকটা শটের জন্যে একটা দিন পর্যন্ত চলে যাবে। অনেক খরচ। অত টাকা কেউ দিবে না। এমনিতেই দেয় না। আরে বাপ, ভালো ছবি ? হা হা করে হেসে উঠল গোলাম মোস্তফা।

কুমকুমের একবার যেন সন্দেহ হলো, কান্নার শব্দ শুনল সে, একবার চমকে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে।

কী দেখছ ? আমি ভালো থাকব, বেশি সিগারেট খাবো না, তুমি নিশ্চিত হয়ে কলেজে যাও।

যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে কুমকুম নেমে গেল।

ঘরে আসতেই টেলিফোন বেজে উঠল। 'আহ, টেলিফোন' বলে কানে রিসিভার লাগাতেই মান্না তালুকদারের গলা শোনা গেল।

না হ্যালো, না কেমন আছেন, একেবারে প্রথম কথাই লেখা শেষ ?

অর্থাৎ মান্না তালুকদার জানতে চাইছে, নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচয় দৃশ্যটা নতুন করে লেখা হয়েছে কিনা। তবু ভালো, চিত্রালীতে গোলাম মোস্তফার ছবি করবার খবর দেখে কিছু বলে নি। বলা অসম্ভব ছিল না— নিজের ছবি করছেন দেখলাম, আমার কাজটা শেষ পর্যন্ত হবে তো ? মান্না তালুকদার আবার তার নিজের কাজের ভেতর অন্য কাজ করা একেবারেই পছন্দ করে না। তার কাজ করবার সময় কতবার মিথ্যে বলতে হয়েছে গোলাম মোস্তফাকে, না, না, এই আপনার স্ক্রিপট, আর কারো কাজ হাতে নেই।

লেখা শেষ তো বহুদূরের কথা. নতুন কিছু ভাবেই নি গোলাম মোস্তফা। ভেবেছিল, আজ দিনমানে ভেবে রাখবে, তার ভেতরে চিত্রালীতে খবরটা বেরিয়ে মাথাই গোলমাল করে দিয়েছে। অন্য সব তলিয়ে গেছে কোথায়, ছবি করতে পারুক আর না পারুক— ছবির ভাবনা, তার নিজের প্রতিভা দিয়ে তৈরি একটা ছবির ভাবনায় সে বাস্তব থেকে স্বপ্নের ভেতরে প্রবেশ করেছিল, কোথা থেকে মান্না তালুকদার তাকে আছাড় মেরে নামাল।

লেখা শেষ তো ?

গোলাম মোস্তফা সরাসরি উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে বলল, সে-কী ? কোথা আপনি ? আপনার শুটিং নেই ?

নাহ। বড় বিরক্ত শোনায় মান্না তালুকদারের গলা।

কেন, কী হলো ?

হিরোইন হঠাৎ বমি-টমি করে এক কাণ্ড।

তারপর ?

প্যাক আপ করতে হলো। সব রেডি ছিল, লাইট-ফাইট করা শেষ, হিরো রেডি, হিরোর মা রেডি, মনিটার খতম, মুভমেন্ট ফাসক্লাশ, ডায়লোগ ফাসক্লাশ— কোন ডায়লোগ ? —সেই যে, হিরোর মা হিরোইনকে বলছে, তোমার এতদূর স্পর্ধা, এতখানি সাহস, এতবড় তেজ যে এ বাড়ির দাসী হয়ে এ বাড়িরই ভাবী পুত্রবধুর দেয়া উপহার তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও ? তখন হিরো বলছে মা, অপমানের দান তো কখনো উপহার হতে পারে না। তখন মা ছেলের দিকে ফিরে বলবে, তাহলে জেনে রাখ হাসান, দাসীও কখনো এ বাড়ির বধু হতে পারে না। হিরোইন চাপা কান্নায় থরথর করে কেঁপে উঠে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে, পরে আমি হিরোইনের তিনটে ক্লোজ আপ নেবো— এতদূর স্পর্ধা এতখানি সাহস এত বড় তেজ-এর রিয়াকশন হিসেবে, ক্যামেরাম্যান লাইটস বলে অর্ডার করেছে কী হিরোইন দিলেন আমার মুডের লাইট অফ করে, সেটের মধ্যেই হড় হড় করে বমি। এই তো এর মধ্যে আছি। দেখি আবার কাল।

আপনার প্রডাকশনের খাওয়া বদলান। বাবুর্চি বদলান।

কেন ?

কী গোবর খাওয়াচ্ছে, দেখুন। নইলে টামি আপসেট হবে কেন ? বমি হবে কেন ?

শুনে অনেকক্ষণ ধরে খি-খি-খি করে হাসল মান্না তালুকদার। তারপর দম টেনে বলল, নিজের বৌয়ের তো অভিজ্ঞতা নেই; আপনার জানার কথা না। আমার হিরোইনের পেটে বাচ্চা।

বলেন কী!

এমন লাফ দিলেন যে, মনে হয় আনম্যারেড হিরোইন। সে তো বিবাহিত, পেটে বাচ্চা আসতে পারে, একটা কেন একশোটা বাচ্চা আসতে পারে, আসুক না কেন ?—কিন্তু আমার শুটিংয়ের মধ্যে কেন ? আগে জানলে কি এই হিরোইন আমি নিই ? গাভীন হিরোইন নিয়ে আমি ছবি বানাব, না, মেটারনিটি হোম ওপেন করব, বলুন ? আমার ওপরে এই গজব কেন ? এ কোন কুফায় আমি পড়লাম ?

লোকটার বিলাপ শুনে গোলাম মোস্তফা সত্যি সত্যি বড় বিচলিত হয়ে পড়ল। বলল, কয় মাস চলছে ?

মাস-টাস আমি জানি না, আমার সর্বনাশ।

হিরোইনের কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় না ?

না, না, না, তাড়াতাড়ির ছবিই আমি করি না। দরকার হলে এক বচ্ছর আমি ওয়েট করব, বাচ্চার আকিকার পর আমি শুটিং করব, কিন্তু গোঁজামিল আর ঠোকাই ? সেলামালেকুম।

আপনি আপনার স্ক্রিপট শেষ করুন, আমি তার শুটিং শুরু করব, আমি তো বসে থাকব না, সেই জন্যেই আপনাকে ফোন করা। লেখা শেষ ?

ফেরা-ফিরতি আবার সেই কথায়। এ ভারী মুশকিল হলো তো। গোলাম মোস্তফা ভেবেছিল মান্না তালুকদারের শুটিং আরো দিন দশেক চলবে, ব্যস্ত থাকবে লোকটা, সেও আস্তে ধীরে কাজ করবে, দশ দিনের মাথায় স্ক্রিপট একটা কিছু দাঁড়িয়ে যাবে।

গোলাম মোস্তফা বলেই ফেলল, না, হয় নি।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে নিস্তব্ধতা ভেসে আসতে লাগল কেবল।

তখন সে পারীক্ষামূলকভাবে উচ্চারণ করল, হ্যালো।

হ্যাঁ, আছি, আপনার অপেক্ষাতেই আছি, আপনার কথা তো শেষ হয় নি।

মান্না তালুকদারের চাপা বিদ্রূপ তাকে ক্ষুব্ধ করল।

গোলাম মোস্তফা বলল, একটা সিচুয়েশন দিলাম, আপনার পছন্দ হলো না, নতুন আর কীভাবে দেখা করানো যায়, আমার মাথায় আসছে না।

তাহলে মন দিয়ে শুনুন।

বলুন।

হিরো রাতে রাতে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তো ?

হ্যাঁ, করে।

কার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে ?

হতভম্ব গোলাম মোস্তফা বলল, কেন, মালিকের ফ্যাক্টরি, কোনো এক মালিক, যে-কোনো মালিক।

সে মালিকের পরিবার নেই ?

থাকবে না কেন ?

তার একটা মেয়ে থাকতে পারে না ?

এতক্ষণে গোলাম মোস্তফার কাছে প্রাঞ্জল হয় প্রসঙ্গটা। সে জানতে চাইল, আপনি বলছেন সেই ফ্যাক্টরির মালিকের মেয়ে আমাদের হিরোইন ?

ইয়েস মোস্তফা সাহেব, ইয়েস। আপনার প্রবলেম সলভ। কতভাবে এখন আপনি হিরোর সঙ্গে হিরোইনের দেখা করাতে পারেন। মনে করুন না, ঈদের দিন সন্ধ্যাবেলায় ফ্যাক্টরির লেবারদের দাওয়াত মালিকের বাড়িতে, হিরো বসেছে সবার সঙ্গে খেতে, হটাৎ তার মনে পড়ে গেল বাড়ির কথা, তার ভাই-বোন কীভাবে ঈদ করছে কে জানে ? গরিব, এমনিতেই তারা অনাহারে থাকে। সেই কথা চিন্তা করে হিরোর হাতের গ্লাস আর মুখে উঠে না, হিরোইন তা লক্ষ করে; হয়ত জিজ্ঞেস করে, রান্না ভালো হয় নি ?— আরে সাহেব, রাইটার আপনি, আপনি দেবেন আমাকে মাল, টুকটুক করে আমি শুটিং করব, তা না আমারই মাল আপনি এখন আমাকে দিচ্ছেন ?

মাল শব্দটা হঠাৎ বড় অশ্লীল মনে হয় গোলাম মোস্তফার।

পাল্টা ব্যবহার করে সে বলল, মাল তো আপনিই আমাকে দিচ্ছেন, আমি দিলাম কোথায় ?

ও। দিন তাহলে।

আপনি তো নতুন মাল চেয়েছিলেন। ফ্যাক্টরির মালিকের মেয়ে হিরোইন, আর হিরো সেই ফ্যাক্টরির শ্রমিক, এটা নতুন মাল হলো ?

সঙ্গে সঙ্গে নির্মেঘ চিত্তে আত্মসমর্পণ করল মান্না তালুকদার, অথবা এও এক বিদ্রুপ, সে বলল, আমি তো রাইটার না, রাইটার আপনি। আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত আপনার রাজত্ব, আনেন না সিচুয়েশন! দেখুন আমি পিকচারাইজ করে দিই। সেখানে যদি ফেল করি, গালে চড় দিয়ে ভিউ-ফাইন্ডার কেড়ে নেবেন। আমি বিকেলে ফোন করব।

মান্না তালুকদার গোলাম মোস্তফার উত্তরের অপেক্ষা না করে ফোন ছেড়ে দিল।

৩

দিন পনেরো পর, কুমকুম রোজের মতো কলেজে। বেলা বারোটার দিকে টেলিফোন এলো চিত্রালী থেকে। অপারেটরের গলা, সম্পাদক কথা বলবেন, স্যার।

কিছুক্ষণ পর পারভেজের গলা ভেসে এলো, হ্যালো, কে ?

গোলাম মোস্তফা হেসে বলল, বারে, পারভেজ ভাই, আপনি নাকি কথা বলবেন ? এখন আপনি বলেন, কে ?

নির্মল হেসে ফেলল পারভেজ, সেই হাসির শব্দে যেন তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারল গোলাম মোস্তফা। আবার একটু দুশ্চিন্তা হলো তার, পারভেজকে সে ইউনিভার্সিটি থেকে দেখে আসছে। তিন ক্লাশ ওপরে পড়ত। মানুষটা আজকাল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। নরম মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে বুকের ভেতরে কোথায় যেন হঠাৎ টান পড়ে।

গোলাম মোস্তফা বলল, ভালো আছেন, পারভেজ ভাই ? অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।

আর ভালো। গভর্মেন্টের হাতে কাগজ যাওয়ার পর এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখতে হয়, মাথার ঠিক থাকে না। অপারেটরকে বলেছিলাম তোর নাম্বার লাগাতে, ভুলেই গেছি। ছবির খবর কী ?

ছবি চলছে।

খবর দিলে রিপোর্টার পাঠাতে পারতাম না ? তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে এখন আমাকে খবর জোগাড় করতে হবে ?

পারভেজের রুষ্ট গলা গোলাম মোস্তফাকে বিস্মিত করে। তুমিও অস্বাভাবিক, পারভেজ সব সময় তাকে তুই বলেই সম্বোধন করে।

গোলাম মোস্তফা কাতরস্বরে বলল, পারভেজ ভাই, আপনি আমার পেছনে ঘোরার কথা বলছেন কেন ?

পারভেজ আবার এক অনুযোগ করল এরপর। বলল, লোক পাঠালেও তো তুই ফিরিয়ে দিস।

কবে, কখন ?

আফজালকে তুই বকাবকি করেছিস, আফজাল আমার সামনে বসে আছে।

পারভেজ ভাই, আফজালকে তো আমি বকি নি! তাই বলেছে বুঝি ? আমি বলেছি, না

জিগ্যেস করে খবর ছাপলে কেন ? ও বলল, আপনি তো ছবি করছেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ করছি। ও তখন বলল, প্রগ্রেস জানতে এসেছি। আমি বললাম, যখন হবে তখন জানতে পারবে। ব্যাস, এই কথা।

পারভেজ তখন নিচু গলায় বলল, বাদ দে, বাদ দে, ও কিছু নালিশ করে নি। আমিই বলছিলাম। ওরা ছেলেমানুষ, তোদের ওরা শ্রদ্ধা করে, আবার তোদের কাছ থেকে আদরও চায়। বল, এখন ছবির কথা বল, ছবি চলছে বলছিলি।

হ্যাঁ, মান্না তালুকদার একটার তো শুটিং করছে, আরেকটা...

ধুৎ, তোর ছবির কথা।

আমার ছবি ? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গোলাম মোস্তফা আলো দেখতে পেল, বলল, আপনি আমার ছবির কথা জিগ্যেস করছেন ? আর আমি মনে করেছি, আপনি আমার লেখা ছবির কথা জিগ্যেস করছেন। তাই তো বলি, কেনো আমার পেছনে পেছনে ঘোরার কথা বলবেন পারভেজ ভাই ?

হচ্ছে না ছবি ?

প্রডিউসার কোথায় যে হবে ?

প্রডিউসার ঠিক না করেই নিউজ দিয়েছিস ?

গোলাম মোস্তফা একটু আগের কথা মনে করে আফজালের ঘাড়ে আর দোষ দিল না। বলল, ভুল হয়ে গেছে, পারভেজ ভাই। ঝোঁকের মাথায় নিউজ দিয়ে ফেলেছি।

তাহলে চেপে যা।

হঠাৎ গোলাম মোস্তফা ধরে বসল, আপনি একটা প্রডিউসার দিন না, পারভেজ ভাই।

আমি ?

আপনি একটু চেষ্টা করলেই আমি প্রডিউসার পেয়ে যাবো।

তুই তো ছবি করবি না।

করব, করব।

আমি চিনি না তোকে ?

আপনি প্রডিউসার দিন, করি কিনা দেখুন।

প্রডিউসার দিলে তো তুই তাকে ভোগাবি।

আপনার যে কী ধারণা !

কাজে ঢিলে দিবে।

পারভেজ ভাই, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনি একটা প্রডিউসার...

আচ্ছা, তুই আয়।

কখন ?

যখন সুবিধে।

এখন আসি ?

এখন ? আয়।

লাঞ্চ খাওয়াবেন ?

তুই আয় না ? কত লাঞ্চ খাবি।

আমি এক্ষুণি আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে।

চিত্রালীতে এসে পারভেজের ঘরে ঢুকতেই পারভেজ হাতের কলম তুলে ছেলেমানুষের মত হাসতে হাসতে বলে উঠল, দেখছ, দেখছ, লাঞ্চের লোভে এসেছে।

না, পারভেজ ভাই, প্রডিউসারের লোভে। লাঞ্চ তো আপনি খাওয়াবেনই, প্রডিউসারও দেবেন। এই আমি বসলাম।

প্রায় আধ ঘন্টা পর কাজ থেকে মুক্ত হয়ে পারভেজ বলল, দূর, কী ছবি করবি!

অবাক হয়ে গেল গোলাম মোস্তফা। এতদূর ডেকে এনে, শেষে এই বাণী ?

কেন, আমি ছবি করতে পারি না, পারভেজ ভাই!

পারিস, অনেকের চেয়ে ভালো পারবি। করিস না।

কেন ? মানা করছেন কেন ?

কী হবে ভালো ছবি করে ? কার জন্যে করবি ? ক'টা লোক তোর ছবি বুঝবে ? বিদেশের জন্যে বানাবি তো ? দেশের লোক যদি তোর ছবি না দেখে, বিদেশীরা দেখলে কী লাভ ? প্রাইজ পাবি, অ্যাওয়ার্ড পাবি, তোর নিজের নাম হবে। দেশে তো সেই যা হচ্ছে সেই ছবিই হবে।

যা হচ্ছে সেই ছবিই হবে, আর আমরা সকলে মিলে তাই হতে দেব ?

হতে দিচ্ছিস না ? তুই নিজে সেসব ছবি লিখছিস না ? বড় বড় কথা বলছিস ?

আর আপনিও তো সেসব ছবির খবর ছাপছেন, ছবি ছাপছেন, বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপছেন।

বাদ দে। এ কাগজ এখন আমার না। আমি চাকরি করি। আমার নিজের কাগজ থাকত চিত্রালী, দেখতি।

আমিও দুটো পয়সার জন্যেই যা নয় তাই করছি, পারভেজ ভাই।

না। তোর বৌ চাকরি করে, কলেজে পড়ায়, এত পয়সার তোর দরকার কী ? গাড়ি না চড়লে হয় না ? মদ না খেলে চলে না ?

মদ আমি খাই না।

চুপ।

ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে গোলাম মোস্তফা বলল, ঠিক পারভেজ ভাই, পয়সার লোভ। বাংলাদেশের মুসলমান ঘরের ছেলে তো, দু'এক পুরুষের শিক্ষিত, গরিব ছিলাম, মধ্যবিত্ত হয়েছি, এখন আরো ওপরে উঠতে চাই, গাড়ি চাই, ফ্রিজ চাই, গুলশানে বাড়ি চাই, ব্যাংকক, হংকং, আযমীর যেতে চাই। আপনি দিন একটা সুযোগ, একটা প্রডিউসার দিন, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে-না খেয়ে মনের মতো ছবি বানাবো।

তোর গল্প শোনা।

আচমকা গল্প শোনানোর হুকুম শুনে হতভম্ব হয়ে যায় গোলাম মোস্তফা।

আপনি দেবেন প্রডিউসার ?

চেষ্টা তো করব। দেখি না, তোর গল্প কেমন, তুই কী চিন্তা করেছিস।

তাহলে এতক্ষণ বকছিলেন যে ?

নির্মল হেসে উঠল আবার পারভেজ। বলল, বাদ দে, গল্প শোনা। তোর গল্পই রেডি নাই।

আছে, পারভেজ ভাই, আছে। আমি এক্ষুণি শোনাতে পারি।

কোথায় লাঞ্চ খাবি ?

যেখানে নিয়ে যাবেন। আপনি ইচ্ছে করলে কিনা পারেন ?

ভ্রু কুচকে পারভেজ বলল, পূর্বাণীর ওপরে যেতে পারব না।

তবে ?

না, সে কথা বলছি না।

আপনি তো কতজনকে কত কিছু করে দিয়েছেন। শামসুল হক ছিল একটা বাচ্চা ছেলে, তাকে ধরে চিত্রনাট্যকার বানিয়ে দিলেন মাটির পাহাড়ের।

ওর কথা বলিস না। লন্ডনে গিয়ে বসে আছে। দেশে ভাত নেই ? কাজ নেই ?

ভালোই করেছে। দেশে এলে কী করত ?

আবার চিত্রনাট্য লিখত আগের মতো, আর আমার কাগজে সিনেমার ওপর আর্টিকেল লিখত, ফিল্ম সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতো।

তা বোধহয় করত না।

বাদ দে, আবার দেশে আসবে, আবার ঐ করবে। চল, তুই আমাকে তোর গল্প শোনাবি।

পূর্বাণীতে বসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলাম মোস্তফা শুরু করল, পারভেজ ভাই, আমি একটা বন্ধ্যা মেয়ের ওপর ছবি করব। গোলাম মোস্তফা লক্ষ করতে চেষ্টা করল একবার, কুমকুমের কথা মনে করে বসল কিনা পারভেজ, নিশ্চিত হতে পারল না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, গ্রামের একটি বন্ধ্যা মেয়ে।

কতদিন বিয়ে হয়েছে ?

বেশিদিন না, দু'বছর, তিন বছর। জানেন তো, গ্রামে কোনো বৌয়ের দু'বছর বাচ্চা না হলেই আত্মীয়স্বজন কথা বলতে শুরু করে ?

তুই বলে যা।

তারপর তো আত্মীয়স্বজন কথা বলতে শুরু করে। প্রথমে একটু আধটু। তারপর মাত্রা বাড়তে থাকে। গঞ্জনা শুরু হয়ে যায়। শাশুড়ি কথায় দোষ ধরে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায় মেয়েটির।

ছেলের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাববে না বুড়ি ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। আভাসে ইংগিতে সে-কথাটা তো একদিন উঠবেই।

আচ্ছা, ছবির শুরুতেই তুই বিবাহিত দেখাচ্ছিস ? না, বিয়ে দেখিয়ে তারপর।

আপনার কী মনে হয় ?

বাহ, তোর ছবি, তোর গল্প, আমি কী বলব ?

আমি তো দু'জনের বিয়ের একটু আগে ধরে, বিয়েটা দেখিয়ে, তারপরে এগোতে চাই।

হু, ভালো হয়। বিয়ের ওপর ডিটেল ওয়ার্ক করতে পারিস, বিয়ের প্রায় ডকুমেন্টারি একটা পুরো সিকোয়েন্স করতে পারিস।

আমারও তাই ইচ্ছে।

আমাদের ছবিতে বিয়ের দিন মানে তো একটা সখীদের গান, না হয় বাসর ঘর, অথচ বিয়ের ভেতরের ছোট ছোট অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে, কেউ ধরে রাখল না, ব্যবহারও করল না। আমার সেই উর্দু ছবিটাতে একবার চেষ্টা করেছিলাম, এডিটরের হাতে বাদ পড়ে গেল।

বাদ দে, তারপর ?

মা ভাবছে ছেলেকে আবার বিয়ে দেবে, নাতির মুখ দেখবে, ছেলে কিন্তু বৌকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, ছেলে গোপনে গোপনে চেষ্টা করে, জড় শিকড়-বড়ি আনে, বৌকে খাওয়ায়, কিছুতে কিছু হয় না।

জমবে।

তারপর শুনুন, পারভেজ ভাই। তারপরে একদিন তারা শোনে যে অমুক গ্রামে অমুক এক পীরের আস্তানা আছে, সেখানে গিয়ে ধন্না দিলে বাচ্চা হয়। বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে, কোনো এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে নাম করে, স্বামী-স্ত্রী একদিন সেই গ্রামের দিকে রওয়ানা দেয়। ছোট্ট একটা খাল, লাল ঘোলা পানি, তার পাড়ে বিরাট এক বটগাছ, নিচে একটা ভাঙ্গা বেদি মতো, তার পাশে টিনের দু'তিনটে ঘর, এই হচ্ছে আস্তানা। বট গাছের ডালে ডালে বাঁধা অসংখ্য লাল কাপড়ের টুকরো, মানতের চিহ্ন, দূরদূরান্ত থেকে কত বন্ধ্যা বৌ এসে ধন্না দিয়ে কাপড় বেঁধে গেছে, এখনো কত বৌ ধন্না দিয়ে পড়ে আছে, স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস হয়, তাদের মনে হয়, এখানে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ডিটেল ছেড়ে যা, তুই আমাকে মোট কথাটা বল।

সারাদিন বসে থাকবার পর পীরের কাছে বৌটির ডাক পড়ে। স্বামী তাকে সঙ্গে নিয়ে এগোয়, বাধা পায়, কেবল বৌটিকেই ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। বৌটি ভেতরে গিয়ে দেখে সমস্ত ঘর ধোঁয়ায় ভরা, একটা বাতি জ্বলছে কি জ্বলছে না, ভালো করে চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ পরে সে ঠাহর করতে পারে— কোমরের কাছে লাল কাপড় জড়ানো, গায়ের রঙ ঘোর কালো, চটা ধরা দাড়ি, চোখ লাল মিটমিট করছে, এক লোক বসে আছে। লোকটি তাকে ইশারায় কাছে ডাকে, বৌটি কাছে যায়, বৌটির মাথায় সে হাত রাখে, বৌটির মাথা ঝিমঝিম করে, লোকটি এবার তাকে ইশারা করে শুয়ে পড়তে, সম্মোহিতের মতো শুয়ে পড়ে বৌটি, চোখ বোঁজে। হঠাৎ সে চোখ খুলে দ্যাখে, লোকটি তার কোমরের কাছে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, পরনে লাল কাপড়টা নেই। এক মুহূর্তের জন্যে একটা শট— লোকটির কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একাট ক্লোজ শট। তারপরই সব ডার্ক হয়ে যায়। সেই ডার্কনেসের ওপর অনন্ত একটা স্তব্ধতার পর চিৎকার। দড়াম করে দরোজা খুলে যায়, টলতে টলতে বেরিয়ে আসে বৌটি। ঘরের ভেতরে লোকটির মাথা মুখ কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। স্বামী হতভম্ব বিহ্বল, বৌটি তাকে নিয়ে দৌড়োয়, তারা দৌড়োয়, পাগলের মত দৌড়োয়, খাল-বিল-মাঠ পেরিয়ে দৌড়োয়, এক জায়গায় এসে থামে, বৌটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমি ওকে খুন করেছি। এখানেই আমার ইন্টারভ্যাল।

পারভেজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

গোলাম মোস্তফা ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে রইল পারভেজের দিকে।

পারভেজ বলল, ঠাণ্ডা হচ্ছে, খা।

হ্যাঁ, খাচ্ছি।

পারভেজ বলল, আমার অসুখের ঐ ধাক্কাটার পর, খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন ?

অনেক সাবধানে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়।

গোলাম মোস্তফার মনে পড়ে গেল, পারভেজের একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। বিষণ্ন হয়ে বসে রইল সে।

পারভেজ হঠাৎ তাড়া দিয়ে উঠল, স্টোরি শেষ কর, স্টোরি শেষ কর, আমার আবার অফিস আছে, ওভারটাইমের বিল নিয়ে আজ লম্বা সেশন আছে। তারপর কী হলো ?

তারপর, পারভেজ ভাই, আপনারও তাড়া আছে, ডিটেল আর বলব না। খুব সংক্ষেপে বলি— ইন্টারভ্যালের পর থেকেই ছবি একটা নতুন মোড় নিচ্ছে, সব কিছু যেন আনরিয়াল হয়ে যাচ্ছে, এমনকি পর্দায় ইজেমের ডেনসিটিও এমন যে মনে হবে— সব রক্তশূন্য হয়ে গেছে, আমরা আর বাস্তবের ভেতরে বাস করছি না, বাস্তবের ভেতর বাস করলেও, সে এক ম্যাড রিয়ালিটি। বৌটি মানুষের সংস্কারে আঘাত করেছে, ইন্সটিটিউশনকে আঘাত করেছে, ডিফাই করেছে, বেরিয়ে এসেছে এবং ভুলে যাবেন না, সে বেরিয়ে আসা মানেই আগে যে শত শত বৌ, বন্ধ্যা বৌ সেই আস্তানায় গিয়ে ধন্না দিয়ে গর্ভবতী হয়েছে, তাদেরও ভেতরের কথা প্রকাশ পেয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে, আমাদের বৌটি একটা ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে তো সমাজ ছেড়ে দিতে পারে না, ইন্সটিটিউশন ক্ষমা করতে পারে না। তাই তার বিচার হয়, বিচারে তার শাস্তি ঘোষণা করা হয়, প্রান্তরে দুপুর খর রোদের ভেতরে, মানুষ তাকে পাথরের ঢিল মারতে মারতে মেরে ফেলে, তাকে মারতে শুরু করলেই স্বামীটি চিৎকার করে উঠবে, সে ছুটে যাবে বৌকে রক্ষা করতে, সেও ঢিল খাবে, দু'জনের ওপর ঢিলের পর ঢিল পড়তে থাকবে, তারা পড়ে যাবে, আবার উঠে দাঁড়াবে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবে, শত শত হাজার হাজার ঢিলে তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে যাবে, বীভৎস উল্লাস করে উঠবে মানুষেরা, আমার ছবি শেষ হবে। সমস্ত এই শেষ দৃশ্যটা আমি চূড়ান্ত স্লো মোশনে টেক করব, অত্যন্ত ডিটেলে কাজ করব, এত ডিটেলে আর এত স্লো মোশনে যে, বৌটির ভয়ার্ত ক্লোজ আপও মনে হবে যেন তার বিজয়ের আনন্দ মুখে স্পষ্ট, আর যারা ঢিল ছুড়ছে তাদের বীভৎস উল্লসিত ক্লোজ আপ দেখে মনে হবে তারা ভয়াবহ আতংকে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পারভেজ ভাই, বিগ ক্লোজ স্লো মোশনে মানুষের এক্সপ্রেশন শুট করে দেখবেন, কী কনফিউজিং, রিয়ালিটি যে কী বুঝতে পারবেন না।

সব বুঝলাম, মোস্তফা, তোর ছবির শেষ দেখে মনে হবে না, তুই ডিফিট মেনে নিচ্ছিস ?

না! প্রায় চিৎকার করে উঠল গোলাম মোস্তফা, না, পারভেজ ভাই, না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমি যেভাবে আমার মাথার ভেতর শটগুলো দেখতে পাচ্ছি, লোকে যখন দেখবে বুকের ভেতর একটা বিস্ফোরণ তারা টের পাবে, তারা ক্রোধে ফেটে পড়বে। সেটাই আমি চাই। যা আমি কল্পনায় দেখছি, তার চারআনাও যদি পর্দায় আমি আনতে পারি, আমি শান্তিতে মরতে পারব।

থাক, মরে তোমার কাজ নেই।

বিষণ্ন হয়ে পারভেজ বসে রইল কিছুক্ষণ।

গোলাম মোস্তফা আকুলস্বরে বলল, কেউ টাকা ঢালতে রাজি হবে না, না ? আমি বুঝতেই পেরেছি। আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

পারভেজ সচকিত হয়ে বলল, না, সে-জন্যে নয়। কিন্তু কি জন্যে, পারভেজ রহস্যময়ভাবে তাও স্পষ্ট করল না, নিজের বুকের বাম দিকে একটা হাত রেখে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

হঠাৎ পারভেজ বর্তমানের ভেতর উৎফুল্ল হয়ে ফিরে এলো, যেন বলল, তোর প্রডিউসারের চিন্তা কী? তুই মান্না তালুকদারকে বল না?

গোলাম মোস্তফা বিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করে উঠল, মান্না তালুকদার! আপনার মাথা খারাপ, পারভেজ ভাই, সে টাকা দেবে এই ছবিতে? তা ছাড়া সে তো নিজের পরিচালনা ছাড়া ছবি প্রডিউস করে না।

কে বলল, করে না?

কোথায় করেছে?

কেন, হোসেন আব্বাসের একটা ছবিতে সে ফিনানস করছে।

হোসেন আব্বাস ছবি করছে নাকি? কোন ছবি?

গোলাম মোস্তফা অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করে। কারণ, হোসেন আব্বাস অনেকদিন তার কাছে এসেছে, এই গত মাসেও ঘুরে গেছে। একটা চিত্রনাট্য চেয়েছে, বলেছে— এবার আমি সত্যিকার অর্থে একটা মুভি বানাতে চাই, মোস্তফা। গোলাম মোস্তফা কোথায় যেন হোসেন আব্বাসের সঙ্গে মৃদু একটা প্রতিযোগিতা অনুভব করত, মনে হতো, সে গোলাম মোস্তফা কোনোদিনই ভালো ছবি করতে পারবে না, পারবে ঐ হোসেন আব্বাস। ইংরেজি সাহিত্যের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল হোসেন আব্বাস, পাশ করে আবার সোসিওলজিতে এম. এ করেছিল, প্রগতিশীল ছাত্র সংস্থাগুলোর সঙ্গে তার নিবিড় যোগ ছিল, গোলাম মোস্তফাকে যদি কেউ পেছনে ফেলতে পারে তো হোসেন আব্বাসই পারবে বলে সে অগ্রিম ঈর্ষা বোধ করত।

পারভেজ একটি শব্দযুগল উচ্চারণ করল, সাচ্চা খচ্চর।

কী বললেন?

সাচ্চা খচ্চর, আব্বাসের ছবির নাম, নিউজ দেখিস নি?

না।

অবশ্য নিজের নামে পরিচালনা করছে না, কী একটা ছদ্মনাম নিয়েছে।

হো হো করে হেসে উঠল গোলাম মোস্তফা— আপনি ঠাট্টা করছেন, পারভেজ ভাই। আপনিই পারেন। সাচ্চা খচ্চর একটা ছবির নাম হতে পারে? এ আপনার বানানো। যাঃ।

তুই বিশ্বাস কর, আমি বানিয়ে বলছি না। হঠাৎ পারভেজ ধমকে উঠল, তার ঐ রকম কৃত্রিম ধমকের সঙ্গে গোলাম মোস্তফার বহুদিনের পরিচয় আছে বলে ভেতরের পরিহাসটা অগোচর হয়ে রইল না। পারভেজ বলল, কেন সাচ্চা খচ্চর নাম হতে পারে না? আমি তো খুব ভালো নাম মনে করি। গোলাম মোস্তফাও তখন পরিহাসটিতে আকর্ষণ করে যোগ করল, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে, পারভেজ ভাই। নিজের নামে পরিচালনা করছে না কেন? লেফটিস্ট নাম আছে বলে?

বাদ দে, লেফটিস্ট। দুনিয়াটা গোল, বুঝলি, তাই সকলেই সকলের লেফটে, সকলেই লেফটিস্ট। চল, ওঠ।

আমার প্রডিউসার?

পারভেজ দ্রুত হাতে বিল শোধ করল, উত্তর না দিয়ে দরোজার দিকে এগোলো। গোলাম

মোস্তফা ব্যাকুল হয়ে তার হাত ধরে বলল, গল্প আপনার পছন্দ হয় নি ?

আমি তো আর প্রডিউস করছি না।

রাস্তায় বেরিয়ে গোলাম মোস্তফা বলল, কিন্তু আপনি খুঁজে দেবেন বললেন।

মানা করেছি ? তোমাদের সব কাজেই তো পারভেজ ভাই।

হেসে ফেলল গোলাম মোস্তফা।

পারভেজ বলল, হাসির কথা না। যেভাবে গল্প বললি, কোনো প্রডিউসার পাবি না।

পাবো না ? আমি তো জানিই, পাবো না। সে-জন্যেই তো আপনাকে ধরলাম।

আমার টাকা থাকলে আমি প্রডিউস করতাম।

অফিসের কাছে এসে গোলাম মোস্তফা ব্যর্থতা তীব্র করে বোধ করতে লাগল, সেটা চোখ এড়াল না পারভেজের। পারভেজ চঞ্চল চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, যা দেখি। বলে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

গোলাম মোস্তফার হঠাৎ মনে পড়ল, কুমকুমকে কলেজ থেকে আনবার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সে গাড়িতে গিয়ে বসল।

৪

মান্না তালুকদারের টেলিফোন পেয়ে বেরুতে হলো গোলাম মোস্তফাকে। বাড়িতেই অফিস তার। ছোট একটা কাজের ঘর আছে, সেখানে গিয়ে ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে দিলে বাড়ির কেউ আর তাকে বিরক্ত করে না, টেলিফোন এলেও বলে দেয়া হয় বাসায় নেই। এ না করে উপায়ও নেই। মান্না তালুকদারের বাড়িতে তার বুড়ো বাবা-মা, পাঁচ ছেলে-মেয়ে, সে এক হৈহৈ লেগেই আছে। কতবার গোলাম মোস্তফা বলছে— আর একটা বড় বাসায় উঠে যান, নয়তো কোথাও একটা নিরিবিলি অফিস নিন! রহস্যময়ভাবে মান্না তালুকদার মিটমিট করে হেসেছে কেবল, দেখি, হবে, হবে বলে এড়িয়ে গেছে। ফিল্ম লাইনের লোকেরা বলে— কঞ্জুস। গোলাম মোস্তফার বিশ্বাস হয় না। লোকটাকে সে খুব কাছে থেকে দেখেছে। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে, বাপ দাদাকে দেখে এসেছে লোক-লস্কর নিয়ে অবিরাম কোলাহল আর সাত ভেজালের ভেতর বাস করতে। ব্যক্তিগত, একান্ত নিভৃত কোনো কিছুতেই লোকটা তাই স্বস্তি বোধ করে না। এই ভিড়, এই চিৎকার, এই অপরিসর বাস তাকে বরং সুস্থ রাখে।

ছোট ঘরের দরোজা বন্ধ করে মান্না তালুকদার চৌকির ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, মোস্তফা সাহেব, সেট ভেঙ্গে দিতে হলো।

জানি।

গোলাম মোস্তফা এও জানে, সেই জন্যেই তাকে এখন ডেকে আনা, মান্না তালুকদারের এখন অবসর, অবসর মানে শুটিং নেই, স্ক্রিপট তৈরির সময়। হয়ত আজ থেকে এখানেই গোলাম মোস্তফাকে নতুন স্ক্রিপট নিয়ে বসে যেতে হবে।

বসে যেতে হবে কী, এক্ষুণি শুরু হয়ে যায়।

মান্না তালুকদার বামবাহু দিয়ে চোখ ঢেকে দৈববাণীর মতো উচ্চারণ করল, যা হয় ভালোর

জন্যে হয়, মোস্তফা সাহেব।

কোনটার কথা বলছেন ?

সেট ভেঙ্গে ভালোই হয়েছে। ড্রয়িং রুমের তিনটে সিন নতুন করে লিখতে হবে আপনাকে।

খিন্ন হয়ে পড়ল গোলাম মোস্তফা। হাতের স্ক্রিপট নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, পুরনো স্ক্রিপট এখন বসে বসে বদলাতে হবে!

কেন, নতুন করে লিখতে হবে কেন ?

জমছে না।

মান্না তালুকদারকে নিরস্ত করবার জন্যে গোলাম মোস্তফা তার গর্বে আঘাত করে বলল, আপনি তো একবার স্ক্রিপট হয়ে গেলে একটা শব্দও বদলান না ? আপনি বলেন, শুটিং একবার শুরু হলো কী স্ক্রিপট নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শেষ।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কোলের ওপর বালিশ নিয়ে বসল মান্না তালুকদার। বলল, উঁহুঁ এবার শেষ নয়। তার কারণও আমি খুঁজে পেয়েছি।

কী কারণ ?

আপনি।

আমি ?

আপনি ইনসিস্ট করলেন, ড্রয়িং রুমেই কনফ্রনটেশন হয়ে যাক, হিরোর মা হিরোইনকে চার্জ করুক, হিরো ডিফেন্ড করুক হিরোইনকে, সে বেরিয়ে যাক, তারপর হিরোর সঙ্গে মায়ের কথা কাটাকাটি— আপনার মনে আছে তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে, আপনি বলে যান।

তারপর আপনি দেখিয়েছেন, হিরো মাকে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হ্যাঁ, সে হিরোইনের কাছে যায় না, বাইরে যায়।

নীরবে হাত তুলে অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি করে মান্না তালুকদার সিগারেটে তীব্র টান দিল। সিগারেটের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে টিপে তা নেভাল সে, তারপর বিপরীতে বিস্ময়কর কোমল কণ্ঠে বলে যেতে লাগল চোখ বুজে, হিরো বাইরে যায়, তীরবেগে ছুটে যায় তার গাড়ি। কত জায়গায় সে যায়, কোথাও সে শান্তি পায় না, তার ওপরে মায়ের কথা ওভারল্যাপ হতে থাকে— তাহলে জেনে রাখ, হাসান, দাসী কখনো এ বাড়ির বধূ হতে পারে না, ওভারল্যাপ হয়, ওভারল্যাপ হয়, সে পাগল হয়ে যায়, সে ব্রেক করে, চমকে উঠে সে লক্ষ করে আরেকটু হলেই চাপা দিয়েছিল গ্রামের একটা বৌকে, মিষ্টি একটা বৌ স্বামীর সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছিল বাস ধরতে, চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। হাসান— আমাদের হিরো অবাক হয়ে দেখল— সেই স্বামী তার বৌকে পথের পাশে টেনে আদর করছে আর বলছে, বৌ, তুমি ডরাও নাই তো। সেই বৌ ডাকটা হাসানের ওপর রিয়াকশান ক্রিয়েট করে। সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে, বৌ। কেটে আমরা দেখতে পাই, আমাদের হিরোইন বুকের সমস্ত কান্না চেপে একগুচ্ছ ফুল ড্রয়িং রুমে ফুলদানিতে সাজাচ্ছে, ঠিক হাসান যে সোফায় সব সময় বসে, তার পাশে। এমন সময় হাসান ঘরে ঢোকে, দু'জনে তাকায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হিরোইন ফুল ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে যেতে চায়, হাসান তাকে ধরে ফ্যালে, মুখ ফিরিয়ে নেয় হিরোইন, খোঁপা এখন ক্যামেরা ফেসিং, হাসান একটা ফুল সে খোঁপায় গুঁজে দেয়। এই তো ?

লোকটার স্মরণশক্তি দেখে নতুন করে আরো একবার মৃদু বিস্ময় বোধ করল গোলাম মোস্তফা। প্রায় কৃতজ্ঞ কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল, হ্যাঁ, এইতো ছিল।

গোলাম মোস্তফার মনে হলো, এ-রকম একটা নিখুঁত সিনে দোষ নিশ্চয়ই নেই, নিশ্চয়ই এটা ভূমিকা, তার স্মৃতিকে সাহায্য করবার জন্যে বলা, এরপর আসবে আপত্তির সিনগুলো। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

মান্না তালুকদার চোখ খুলে বলল, রং, দিস ইজ রং। মায়ের সঙ্গে ক্ল্যাশও ড্রয়িং রুমে হবে না, ফুলও ড্রয়িং রুমে দেবে না, টোটালি রং।

হতবাক হয়ে বসে রইল গোলাম মোস্তফা।

কোল থেকে বালিশ ছুঁড়ে ফেলে মান্না তালুকদার চেয়ার টেনে একেবারে গোলাম মোস্তফার হাঁটু ঘেঁষে বসলো, তার উরুতে এমনকি হাত ঠেসে বলল, আপনি ফিল করতে পারছেন না, রং ?

বলুন আপনি।

গলায় ঠিক জোর পেল না গোলাম মোস্তফা, ভুলটা কোথায় অনুমানও করতে পারল না সে।

তার উরু আরো ঠেসে ধরে প্রায় ব্যথা দিয়ে, মান্না তালুকদার বলল, ড্রয়িং রুমে ফুল দেবে কী করে ? হিরোইনকে চার্জ করেছে হিরোর মা, তারপরে সে ড্রয়িং রুমে আসবার অধিকার হারাবে না, মোস্তফা সাহেব ? তাকে বুড়ি আসতে দেবে আর ঘরে ? কাজ করতে দেবে ? হিরোর সোফার পাশের ফুলদানিতে ফুল সাজাতে দেবে ?

গোলাম মোস্তফা ঘোরের ভেতরে বলে উঠল, ইয়েস, তাহলে তো সে বাড়ি-ছাড়া হতে পারে। হিরোর অ্যাবসেনসে মা তাকে বের করে দিতে পারে। ইয়েস, হিরো এসে দেখবে, হিরোইন নেই।

নো, নো, নো।

হতাশ হয়ে গোলাম মোস্তফা বলল, তাহলে ?

তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেই স্টোরি অন্য ট্র্যাকে চলে যাবে, সে আরেক কাহিনী ফাঁদতে হবে। তাকে বাড়িতেই রাখতে হবে। সে বাড়িতেই থাকবে। আপনি বলতে পারেন, সে কেন বাড়ি ছেড়ে যাবে ? হিরো তো তাকে ডিফেন্ড করেছে, করে নি ? তার কাছে সে মরাল অবলিগেশন ফিল করবে না ? যেতে যদি হয়ও, যাবে তো না-ই, যাবার আগে সে হিরোকে কিছু বলে যাবে না ? কী বলছেন আপনি ?

মান্না তালুকদার উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল। বলে চলল, ফুল আসবে আরো পরে, অন্য কোথাও, ধাপে ধাপে আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে সিচুয়েশন, তিনটে পার্ট হবে এই এক ফুল দেবার। তারপরে আপনি বললেন, ড্রয়িং রুমে হিরোর মা চার্জ করবে হিরোইনকে। টাইম কোথায় ?

উপহার ভ্যাম্প দেবার পর, সেটা তো দিয়েছে রান্নাঘরে গিয়ে হিরোইনকে, না ?

হ্যাঁ।

সেই রান্নাঘর থেকে হিরোইন এলো কখন ড্রয়িং রুমে ? কেন এলো ? হিরোর মা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখেও কেন এত টাইম নিল ? হিরো কোথায় ছিল তখন ? এসব কিছুই আপনি ভাবনে না ?

আমরা তো ডাইরেক্টর কাট করে আসছি এই সিনে, ক্ল্যাশ দিয়ে শুরু করছি, লোকে তখন ঘটনা চায়, লজিক নিয়ে চিন্তা করবে না, ফুরসৎও পাবে না।

এখানেই তো আপনার ভুল, মোস্তফা সাহেব। প্রথমবারে পার পেয়ে যাবেন, সেকেন্ড টাইমে ফেঁসে যাবেন। সেকেন্ড টাইম যারা ছবি দেখতে আসবে, তাদের কাছে পানসে লাগবে। আর আমি তো ছবি বানাই একবার দর্শকের জন্যে না, মোস্তফা সাহেব। না, ড্রয়িং রুমে ক্ল্যাশ হবে না, হবে ঐ রান্নাঘরেই ভ্যাম্প উপহার দিয়ে চলে যাবার পর। হিরোইন উপহারের সেই শাড়িটা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবে, কখন চুলোর আগুন সেই শাড়িতে লাগবে, টের পাবে, তারপর নিজেই সে শাড়িটা গুঁজে দেবে চুলোয়, আর তখন চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকবে হিরোর মা।

বেশ তো। ভালোই তো। চেঞ্জ করে দিলেই হয়।

আবার শুয়ে পড়ল মান্না তালুকদার চৌকিতে, বলল, নাহ, আমিও ঠিক ক্লিয়ার না মোস্তফা সাহেব। সময় লাগবে। সময় তো পাওয়াই গেল। হিরোইনের পেটে বাচ্চা। খালাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি শুটিং করব না। নতুনটা এখন তাড়াতাড়ি করুন, শেষ করুন, সামনের মাসেই আমি গান রেকর্ড করব।

সামনের মাসেই ?

মান্না তালুকদার অসহিষ্ণু গলায় জানতে চাইল, তারপর সেখানে কী করলেন ? সেই যে আপনি বললেন, হিরোইনের বাবার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে হিরো, তারপর ?

গোলাম মোস্তফা আজ আর প্রতিবাদ করল না যে সম্পূর্ণ জিনিসটা মান্না তালুকদারের মাথা থেকে এসেছে, খামোকা তার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। বরং মেনে নেয়াই সহজ মনে হলো তার। হিরোইনকে যদি ফ্যাক্টরির মালিকের মেয়ে করতে চায়, গোলাম মোস্তফার কী আসে যায় ? কারই বা কী এসে যায়, সিনেমার পর্দায় কে কার মেয়ে, কে কার ছেলে ? ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ মিলিয়ে তো সিনেমার কাহিনী আছে মোট সাড়ে তেরোখানা। সেই সাড়ে তেরোখানা কাহিনীই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখন পর্যন্ত চলছে।

তবুও চিত্রনাট্যকারকে অভিনয় করে যেতে হয় যে নতুন কিছু সৃষ্টি করছি, মৌলিক কিছু রচনা করছি, মান্না তালুকদারের ভাষায় নতুন মাল দিচ্ছি। তবু পরিচালকেরা কাহিনীর জন্যে প্রতিভার সন্ধান করবেন; আর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর জন্যে রাষ্ট্র পুরস্কার দেবে। আসলে, প্রতিভা যদি দরকার হয় তো, সে ঐ অভিনয় করে যাবার প্রতিভা যে আমার মাথা থেকে বেরুচ্ছে— মাল বেরুচ্ছে। বিরল দু'একজন যারা সচেতনভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, তারা মৌলিক— বিজ্ঞাপন তরঙ্গে তাদের নামের আগেই বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়া হয়, আ-ন-প্যা-রা-লা-ল-ড রা-ই-টা-র।

চুপ করে আছেন যে ?

ভাবছি।

লেখক যখন ভাবে, মান্না তালুকদার আন্তরিকভাবেই তখন তাকে শ্রদ্ধা করে। অনেকক্ষণ সে সম্ভ্রম রেখে অপেক্ষা করল। তারপর মৃদু গলায় প্রায় অনুনয় করল, বলুন।

যেন অন্য কারো কণ্ঠ থেকে স্বর বেরুচ্ছে। গোলাম মোস্তফা কেবল লিপসিং করে যাচ্ছে— সে এক আশ্চর্য তথ্য পরিবেশন করবার সুরে উচ্চারণ করল, হিরোইন ফ্যাক্টরির মালিকের মেয়ে।

উঠে বসল মান্না তালুকদার। ধীরে। যেন সৃষ্টি ব্যাহত না হয় তার সামান্যতম শব্দে। বলল, গ্রেট।

সেই ফ্যাক্টরিতে রাতের শিফটে হিরো কাজ করে।

সুন্দর।

হিরো কাজ করে।

দিনে লেখাপড়া করে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

বস্তিতে সে ভোর রাতে ল্যাম্পোস্টের আলোয় পড়াশোনা করে।

গোলাম মোস্তফা আর মান্না তালুকদারের একের পিঠে আর বাক্যগুলোর যেন একটি দীর্ঘ বেণি রচনা করে চলল একতালে।

গোলাম মোস্তফা অতঃপর বলল, ইউনিভার্সিটিতে হিরোইনও পড়ে।

মান্না তালুকদার যোগ করল, অথচ হিরোইন তাকে কখনোই লক্ষ করে নি এবং হিরোও কখনো তাকে লক্ষ করে নি।

হিরো বড় গরিব।

হ্যাঁ, লেখাপড়া করে তাকে বড় হতে হবে। মান্না তালুকদার মনে করিয়ে দিল, গ্রামে তার ভাই-বোন না-খেয়ে দিন কাটায়।

ফ্যাক্টরি থেকে সে যা পায়, পড়া চালিয়ে বাড়িতে পাঠায়।

গ্রামের বাড়িতে বোনের পেছনে দুষ্ট একটা লোক লেগেছে।

এদিকে, বস্তির একটা সাইড মেয়ে, সে আমাদের হিরোকে বোনের মতো যত্ন করে।

বোনের মতো ? মান্না তালুকদারের ভ্রু কুঁচকে এলো। বলল, আহ্, এটাকে আবার কোত্থেকে আনলেন ?

বাহ, বস্তিতে একটা মেয়ে থাকতে পারে না ?

একশো থাকতে পারে, এ স্টোরিতে আমি তাদের চেহারা দেখতে চাই না। স্টোরিতে বেশি এলিমেন্ট ঢোকাবেন না, ওসব বাজে পরিচালকের কাজ।

তাহলে থাক মেয়েটা।

না, দাঁড়ান।

মান্না তালুকদার ফস করে একটা সিগারেট ধরালো।

আবারো বলল, এই জন্যে বলে রাইটারের মাথা, রাইটারের ইনসপিরেশন।

গোলাম মোস্তফার দিকে এই সুখ্যাতিটা ছুড়ে দিয়ে নির্মিলিত চোখে মান্না তালুকদার ভাবতে লাগল।

তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বলল, মেয়েটি থাকবে। মেয়েটি আছে। বস্তির মেয়েটি আমার চাই। আপনি ওকে বাদ দেবেন না। কী করে একটা ইন্টারেস্টিং মাল আপনি ছেড়ে দিচ্ছিলেন ?

গোলাম মোস্তফা ক্ষণকাল লুব্ধ হয়ে সুযোগটা ছেড়েই দিল। সে বলতে চেয়েছিল, বস্তির

মেয়েটি আমিই রাখতে চেয়েছিলাম, আপনি তো বললেন— ওসব বাজে পরিচালকের কাজ।

গোলাম মোস্তফা স্মিতমুখে বসে রইল।

মান্না তালুকদার হঠাৎ হুংকার দিয়ে চ্যালেঞ্জ করল, আপনি জানেন, আমি এই মেয়েটিকে কীভাবে ব্যবহার করব ?

সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে রইল গোলাম মোস্তফা।

আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

গোলাম মোস্তফার আদৌ তাতে দ্বিমত নেই।

মান্না তালুকদার ঘোষণা করল, আমি তাকে হাফ গেরস্ত বানাবো।

এক ধরনের সম্মোহন আছে— মান্না তালুকদার যখন একটা কল্পনার খপ্পরে পড়ে যায়, আর অনবরত পায়চারি করতে থাকে, অনবরত ঘরের চেয়ার টেয়ার ঠেলে সরাতে থাকে, আর জ্বলন্ত চোখে উপস্থিত মানুষের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

মান্না তালুকদার অভিভূতের মতো বলে যেতে লাগল, বস্তির মেয়েটি তার দেহ বিক্রি করে পংগু বাপের চিকিৎসা চালায়, বাপ রিকশা চালাতো, একদিন ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে— আমি শুধু আইডিয়াটা বলছি, এখন আসল কথাটা টের পাচ্ছেন তো ? মেয়েটি দেহ বিক্রি করে, কিন্তু আমাদের হিরো তা জানে না। সে তাকে বোনের মতো জানে। মেয়েটি তার কাজ করে দেয়, কখনো রান্না করে দেয়, ঘর গুছিয়ে রাখে, ল্যাম্পোস্টের তলায় বসে হিরো হয়ত পড়ছে, তার শীত করছে, মেয়েটি তার নিজের কাঁথা এনে হিরোর গায়ে সাইলেন্টলি চাপিয়ে দেয়।

রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছে না। গোলাম মোস্তফা একেবারে হাতছাড়া হতে দিল না।

কেন, রোমান্টিক হয়ে যাবে কেন ? ক্যামেরার পেছনে আমি আছি না ? হে হে মোস্তফা সাহেব, মান্না তালুকদার জানে কোনটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়।

কিন্তু মেয়েটাকে বেশ্যা বানাচ্ছেন কেন ? কী লাভ হবে ?

লাভ ? ফোঁস করে উঠেই হেসে ফেলল মান্না তালুকদার। লাভ আছে। যখন খুচরো পয়সা কুড়িয়ে কুড়িয়ে হাতে তুলে দেবো, দেখবেন নয়া করকরা দশ টাকার নোট। আপনার হিরো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে না ? হেঁটে হেঁটে শিশু পার্কের পাশ দিয়ে ফেরে, একদিন সেখানে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বস্তির মেয়েটিকে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে সে দ্যাখে। অবাক হয় তার ঠোঁটে লিপস্টিক, পরণে পাট সিল্কের ঝলমলে শাড়ি দেখে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে যখন দ্যাখে, কিংবা মেয়েটিকে ডাকতে যাবে এমন সময় দ্যাখে, একটা গাড়ি এসে থামল আর মেয়েটি তার ভেতরে ঢুকে পড়ল। আপনি আগেও অবশ্য দু'একবার দেখাবেন, হিরো ফ্যাক্টরি থেকে কাজ করে শেষ রাতে ফিরছে, হঠাৎ মেয়েটির সঙ্গে দেখা, মেয়েটি একটা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে যাবে। আজ মোটরে উঠতে দেখে মুহূর্তের ভেতরে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সে একটা প্রস। সে পরে মেয়েটিকে চার্জ করবে তাকে বেশ্যা বলে গালাগাল করবে, তাকে আছড়াবে, মারবে, থাপ্পড় দেবে, আর এক সময়ে সে দেখবে—

কে দেখবে ?

হিরো, হিরো, হিরো। হিরো দেখবে সে আর কাউকে নয় তার বোনকে থাপ্পড় মেরে চলেছে পাগলের মতো। হাত ফিরিয়ে নেবে সে। মান্না তালুকদার নিজেই এখন হিরো হয়ে গেল,

হাত চড় মারার ভঙ্গিতে তুলেই অস্ফুট আর্তনাদ করে সামলে নিল নিজেকে, চোখ বিস্ফোরিত করে মেঝের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল তার, ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনতে লাগল সে হাত, নিজের ঠোঁটের কাছে সন্তর্পনে রাখল, থরথর করে কাঁপছে তার ঠোঁট, মান্না তালুকদার কেঁদে ফেলবার একটা ভঙ্গি করল এখন, তারপর হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে বলল, সে আমি হিরোকে দিয়ে পাছায় লাথি মেরে করিয়ে নেবো। আসলে দৃশ্যের উত্তেজনা এখনো তার ভেতরে বলে গালাগালটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। গোলাম মোস্তফার সম্মুখে ধপ করে বসে পড়ে বলল, বোনের কথা মনে পড়ে গেছে তার। তার বোনও কি তবে অনাহারে, ক্ষুধায়, অভাবে, এরই মতো বেশ্যাবৃত্তি করছে ? বোনের নাম ধরে সে চিৎকার করে ওঠে। বস্তির মেয়েটিকে খপ করে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। আপনার হাততালি।

গোলাম মোস্তফা ঠাহর করে উঠতে পারল না, তাকেই হাততালি দিতে বলা হচ্ছে, না, আপনার শব্দটা মুদ্রাদোষ, পাবলিকের হাততালি যে পড়বেই তা জানানো হচ্ছে ?

পাছে আবার এক্ষুণি মান্না তালুকদার মন পরিবর্তন করে ফ্যালে, সিনটা বাতিল করে দেয়, গোলাম মোস্তফার কাজ বেড়ে যায়, সে আর তিলমাত্র দেরি না করে বলল, বিউটিফুল, ওয়ান্ডারফুল, হাততালি ঠেকায় কে ?

ফস করে হাত নাড়াতে থাকে মান্না তালুকদার।

না, না, না। মান্না তালুকদারের এক বিশেষত্ব কোনো কিছু জোর দিয়ে বলতে হলেই একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার বলে, আর প্রায়ই একই কথা তিন রকমে বলে, তার সারা ছবিতে এ রকম তিন ধাপের সংলাপ, তিন ধাপের বিল্ড আপ, গোলাম মোস্তফাকে আকসার বানিয়ে দিতে হয়েছে।

হাততালির সম্ভাবনা নেই শুনে গোলাম মোস্তফা ভীত হয়ে পড়ে। তাহলে কি আবার নতুন করে ভাবতে হবে ?

মান্না তালুকদারের কথায় শেষ পর্যন্ত ভয়টা গেল। সেই ফিসফিস করে, সুরে সুরে, দু'হাত নাচিয়ে নাচিয়ে মান্না তালুকদার বলে গেল, যা বললাম, এ কিছু না, এ ধুলা, এ মাটি, এ খাপরা। চাই সোনা, সোনার টুকরা, সোনার খনি— জ্বলজ্বল করবে, চোখ টলটল করবে, বুক থরথর করবে, তবে না সিন ? ডায়লোগ লিখবেন মুক্তার মতো, আর্টিস্টের ঠোঁট থেকে শিশিরের মতো টুপটুপ করে পড়বে, তবে না ডায়লোগ ? যখন সেই রকম সিন, সেই রকম ডায়লোগ আমার হাতে তুলে দেবেন, বলবেন— মান্না সাহেব, এইবার আমার কাজ শেষ, আপনার শুরু, তারপর দেখবেন, তারপর পাবলিক দেখবে, তারপর আপনার ইন্টেলেকচুয়ালরা দেখবে।

শেষ অংশটা সুর ছেড়ে, হাতের ভঙ্গি ছেড়ে, ঠোঁটে হাসির ঢেউ তুলে মান্না তালুকদার উচ্চারণ করল। উচ্চারণ করবার পর হাসিটা মিলিয়ে গেল মুহূর্তে, কঠিন হয়ে গেল মুখ। গোলাম মোস্তফা দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

গোলাম মোস্তফার যেন সন্দেহ হতে লাগল যে ইংগিতটা তার এবং তার ছবির প্রতি। প্রতি মুহূর্তে তার শংকা হতে লাগল যে এক্ষুণি তার ছবির কথা তুলে বসবে মান্না তালুকদার। পারভেজ কি তাকে সত্যি সত্যি প্রডিউসার হবার জন্যে টাকা দিয়ে দেখেছে ?

মান্না তালুকদার গোলাম মোস্তফার ছবির ধারে কাছ দিয়েও গেল না। এমনকি

ইন্টেলেকচুয়ালদের কথাও সে শেষ করে দিল এক কথায়, গুলি মারেন। আমার সাফ কথা, পাবলিক আমাকে ভালোবাসে, আমি পাবলিককে ভালোবাসি।

এই ঘোষণার রেশ মিলিয়ে যাবার একটা সময় দিয়ে গোলাম মোস্তফা বলল, বুকের ভেতর থেকে লম্বা একটা শ্বাস ঠেলে বের করে দিয়ে, তাহলে এখন আমরা নতুন স্ক্রিপটের ওপর কাজ করছি ?

এতক্ষণ কী করলাম ?

কথাটা বিদ্রুপ বলে নেবে কিনা, সিদ্ধান্ত করতে পালল না গোলাম মোস্তফা। কেন তাকে বারবার এদের কাজ করতে হয় ? কেন সে একটা ছবি করবার প্রযোজক খুঁজে পায় না ? কেন সে একবার চিৎকার করে বলে উঠতে পারে না, আমাকে দিয়ে হয় না।

তার বদলে গোলাম মোস্তফা বলল, না, তাই বলছিলাম। এবং সে তার নিজের কণ্ঠেই অপরাধীর একটা সুর শুনে গ্লানি বোধ করতে লাগল।

মান্না তালুকদার বলল, হিরোইন তাহলে ফ্যাক্টরি মালিকের মেয়ে ? ঈদের দাওয়াত ? মালিকের বাড়িতে কাঙ্গালী ভোজ ? হিরোর হাতের গ্লাস হাতেই আছে ?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে মোস্তফা নীরবে সায় দিয়ে গেল।

তারপর ?

কাল আমি লিখে আনব।

কাল কখন ?

দুপুর বা বিকেলে ?

সকালেই আসুন না ?

সকালে ?

গোলাম মোস্তফা ইতস্তত করতে লাগল।

কেন, সকালে অসুবিধে কী ? না, নিজের ছবি নিয়ে ব্যস্ত আছেন ?

চমকে তার দিকে দৃষ্টিপাত করল গোলাম মোস্তফা। মুখ নামিয়ে মাথা নাড়লো নিঃশব্দে, তারপর বলল, আমি সকালেই আসব না হয়।

৫

লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে গোলাম মোস্তফাকে গুম হয়ে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে কুমকুম অবাক হলো। সন্ধের সময় কুমকুম বাসায় না থাকলে সে বড় অস্থির হয়ে পড়ে। ফিরে এলেই কাছে এসে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়, বাইরে থেকে খুচরো খাবার কিছু এনেছে কিনা খোঁজ করে।

আজ কিছুই করে না গোলাম মোস্তফা। যেমন ছিল তেমনি বসে থাকে।

কুমকুম কাছে এসে বসল। স্বামীকে আড় চোখে একবার দেখে নিয়ে বলল, ক্লাব স্যান্ডুইচ এনেছি। চায়ের সঙ্গে আসছে।

হু।

কখন ফিরেছ ?

হু।

হু কী, হু বললে কি বুঝব ক'টা ?

হু।

মান্না সাহেবের কাছে যাও নি ?

হু।

একটু অসন্তুষ্ট হয়েই কুমকুম উঠে গেল।

একটু পরেই পেছন পেছন এলো গোলাম মোস্তফা। বলল, কই, স্যান্ডুইচ কই ? বড় অন্যমনস্কভাবে স্যান্ডুইচ খেলো সে। একবার তার ইচ্ছে করল, কুমকুমের কাছে ফেটে পড়ে, আবার ভাবল, এসব কথা তুলে কুমকুমকে শুধু শুধু উদ্বিগ্ন করা। সে চুপ করে রইল।

দু'জনে বসে টেলিভিশন দেখল খানিক। ভালো লাগল না। কুমকুম উঠে রান্নাঘরে গেল। গোলাম মোস্তফা রেকর্ড খুঁজতে বসলো গান শোনার জন্যে। একটা রেকর্ড ও তার পছন্দ হলো না। বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার এসে টেলিভিশন খুলল সে।

খাবার টেবিলে কুমকুম জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ?

কই, কিছু না। কী আর হবে ?

আবার মেজাজ খারাপ হয়েছে তো ?

মান্না তালুকদারের ওপর ?

না।

তাহলে ?

গোলাম মোস্তফা চুপচাপ খেয়ে চলল।

ফিরতে আমার দেরি হয়েছে বলে ?

দূর।

হেসে ফেলল গোলাম মোস্তফা। কিন্তু মনটা নির্মল হলো না। অস্বীকার করলেও মান্না তালুকদার তার মাথা থেকে নামল না কিছুতেই।

বিছানায় শুয়ে, অন্ধকারের ভেতর দু'পা প্রসারিত করে দিয়ে, কুমকুমের বুকের ওপর খুব আলতো করে একটা হাত রাখতেই গোলাম মোস্তফা অনুভব করল— একটা পরাজয়ের কথা এই অন্ধকারেই কেবল বলা যায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা ঝলক দিয়ে গলে তার মাথার ভেতরে। মুহূর্তের ভেতরে সে অনুভব করতে পারল, মান্না তালুকদারের অবিশ্বাস্য একটা শক্তি— যে শক্তি কোনো দিনই সে অর্জন করতে পারবে না। তার মনে পড়ে গেল, মান্না তালুকদার সব সময়ই বলে, যে-কোনো বুকচাপা ফিলিংস একটা সিনে খপ করে প্রকাশ করে দেবেন না, তিনটে করবেন, প্রথম ধাপে মুড এসটাবলিস করবেন, দ্বিতীয় ধাপে ব্যাপারটা পাশ থেকে ছুঁয়ে যাবেন, তারপর লাস্ট ধাপে ঢল নামিয়ে দেবেন। কথাটা সে কখনোই গুরুত্ব দিয়ে দেখে নি, যন্ত্রের মতো সিনগুলো তিন ভাগ করে লিখে গেছে, অন্তর থেকে অনুভব করে নি। এখন সে অবাক হয়ে লক্ষ করল, সে তার নিজের ক্ষেত্রেই এটা করেছে। মান্না তালুকদারের কথা কুমকুমকে

বলতে গিয়ে সে দু'বার সুযোগ ঠেলে দিয়েছে এবং বলবার জন্যে, এই তৃতীয় পর্যায়ে সে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছে। হয় মান্না তালুকদারের থিয়োরি সত্যি, আর না হয় তো গোলাম মোস্তফার নিজের অস্তিত্ব আর নেই— সে অজান্তে কখন মান্না তালুকদারের অনুকরণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

এর যে-কোনো একটাই তার জন্যে মর্মান্তিক।

গোলাম মোস্তফা বলল, কুমকুম, আমি পারছি না।

উদ্বেগে কুমকুম আধো উঠে বসলো।

উঠো না, কিছু হয় নি, এই জন্যেই তোমাকে কিছু বলতে চাই না।

কুমকুম সেই আধো ঠেস দিয়েই উৎকর্ণ হয়ে রইল। গোলাম মোস্তফা যখন অনেকক্ষণ চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল, সে না বলে পারল না, মনের মধ্যে রেখে কষ্ট পাচ্ছ, বলেই ফেলো, আমি কিচ্ছু মনে করব না।

তোমাকে নিয়ে কিছু নয়।

আমাকে নিয়ে হলেও বলতে পারো। তুমি জানো, তুমি বলতে পারো। পারো না ?

পারি।

তবু গোলাম মোস্তফাকে নীরব দেখে কুমকুম বলল, বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে দিতে, মাথার নিচে বালিশ ভালো করে গুঁজে নিয়ে, 'আমি জানি, তুমি পারছ না। যদি চাও তুমি আবার বিয়ে করতে পারো।

হঠাৎ অসাড় হয়ে গেলে মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে না, গোলাম মোস্তফাও পারল না, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল সে, কুমকুমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল অনেকক্ষণ, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমকুমকে দু'হাতে ঝাঁপিয়ে মথিত করে সে বলে উঠল, এ তুমি কী বলছ কুমকুম ? কী বলছ ? কী বলছ তুমি ? এবং বলতে বলতে মান্না তালুকদারের মতো তিন ধাপে সংলাপ নিজেকে উচ্চারণ করতে শুনে সে আর্তনাদ করে উঠল, আর ভেতরটা ক্ষুব্ধ হতাশায় ছিঁড়ে খুঁড়ে যেতে থাকল।

কুমকুম বলল, আমি তো জানি, সব ডাক্তারই বলেছে দোষ আমার, তুমি ঠিক আছো। তুমি বিয়ে করতে চাইলে, ছেলে চাইলে, আমি কীসের জোরে তোমাকে ফেরাব ?

তখন দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল গোলাম মোস্তফা। তার ভেতর থেকে বাষ্প ঠেলে উঠতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

এবং কেঁদে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অনুভব করল মান্না তালুকদারকে। মান্না তালুকদারের নায়কেরা মেয়েদের মতো কথায় কথায় কেঁদে ফেলে বলে গোলাম মোস্তফা নিজেই তো কতবার সমালোচনা করেছে। বলেছে, পুরুষ কেন কাঁদবে ?

উত্তরে, মান্না তালুকদার শুধু নিঃশব্দে হেসেছে।

গোলাম মোস্তফা কি এখন কাঁদছে না ?

গোলাম মোস্তফা দ্রুত নিজের চোখ মুছে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। আবার কুমকুমের গায়ে হাত রেখে সে চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর স্বগোতোক্তির মতো উচ্চারণ করতে লাগল, তুমি জানো, তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো করে জানে না, এর চেয়ে অনেক বেশি করে আমি চাই একটা ছবি করতে। কত ছবির কথা তো ভেবেছি,

কত ছবির কথা তুমি জানো, তার ভেতরে যে-কোনো একটা আমি করতে পারতাম তাহলে জীবনের কাছে আমার আর কিচ্ছু চাইবার থাকত না।

গোলাম মোস্তফা একই সঙ্গে এক টানে বলতে চেয়েছিল, আমার আর কিছু চাইবার নেই, হঠাৎ সন্দেহ হলো, এই সংলাপ মান্না তালুকদারের জন্যে সে লিখেছে না ? মান্না তালুকদারকে সংলাপ বাজিয়ে নেবার সময় অভিনয় করে বলতে শুনেছে না ?

কিছুতেই একটা বাঁধন যেন গোলাম মোস্তফা ছিঁড়ে ফেলতে পারছে না।

সে এবার খাড়া হয়ে উঠে বসে নিজের দু'হাঁটু জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর উচ্চারণ করল, কুমু, মান্না তালুকদারের কাজ আমি আর করব না। কারো কোনো চিত্রনাট্য আমি লিখব না।

কুমকুম উঠে বসল ধীরে ধীরে। গোলাম মোস্তফার পিঠে হাত রাখল। হাত রেখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে করে মাথাটা পেতে দিল তার পিঠে। বলল, আমাদের তো দরকার নেই।

সেদিন পারভেজ ভাই বলছিল।

আমি তো কাজ করছিই।

তাই বলছিল পারভেজ।

তোমার যা করতে ইচ্ছে করে না, করবে না। তোমার ভাবনা কী ?

জানো কুমু, আমি এখনো বুঝি মান্না বা আর যেসব পরিচালকের কাজ আমি করি আমাকে তাদের দরকার কী ? তারা নিজেরাই তো পারে, নিজেরাই কাহিনী বাছে, ভিসিআর দ্যাখে, শরৎচন্দ্র, নীহার রঞ্জনের বই মুখস্ত তাদের, লোকে কী চায় নখদর্পণে তাদের— আমাকে কেন ডাকে ? আমার চেয়ে অনেক অ-নে-ক ভালো পারে তারা। মান্না তালুকদার, চৌধুরী হামিদ, নৃপেন চক্রবর্তী, যাদেরই কাজ আমি করি, আমি দেখি, আমার না করলেও চলে। ওরা যা বোঝে, আমি তা বুঝি না, আমি যা বুঝি, ওরা তা বুঝতে চায় না। আমি যখন লজিক দিই ওরা বলে এ লজিকের দরকার নেই, আবার ওদের লজিক যখন শুনি তখন মনে হয়— চাঁদ গোল, পিঠাও গোল, অতএব চাঁদ হচ্ছে পিঠা, দাও আমাকে খেতে— সেই লজিক অবাক হয়ে দেখি পাবলিকেরও সেই পিঠা দেখেই জিভের পানি পড়ছে, হাত বাড়াচ্ছে। সিনেমার পর্দায় যে পৃথিবী, পৃথিবীতে পুতুল বাস করে, মানুষের নিঃশ্বাস সেখানে পড়ে না। আর বড় ছোট সে পৃথিবী— ছেলেবেলায় দুই ভাই আলাদা হয়ে যায়, বড় হয়ে একই বৃত্তে তারা এসে পড়ে অ্যাকসিডেন্টে মানুষ স্মৃতি হারায় আবার একদিন আরেক আঘাতে স্মৃতি ফিরে পায় ; রক্তের যখন দরকার হয়, যার সঙ্গে কাহিনী মেলাতে হবে তারই রক্ত ছাড়া আর কারো রক্ত মেলে না, ঘুরে ফিরে সব চরিত্রই চেনা অচেনার একই জায়গায় পাক খায় এবং একদিন সব অঙ্ক মিলে যায়। এ পৃথিবী আমার অচেনা। আমি সেখানে বাস করি না। যারা এ ছবি দ্যাখে, তাদেরও আমি বুঝতে পারি না। কী নিষ্ঠুরতা, তুমি ভাবতে পারো ? বাচ্চার গালে চড় পড়লে পাবলিক পয়সা দিয়ে আবার তা দেখতে আসে, যুবতি মেয়েকে রাস্তায় গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে জুৎ করে চেয়ারে পা তোলে জমিয়ে দেখবার জন্যে।

গোলাম মোস্তফার পিঠ থেকে মাথা তুলে কুমকুম তার গলা জড়িয়ে ধরল।

এসো এখন ঘুমোবো।

ঘুম আসে না, কুমু।

কেন, তুমি তো ডিসিশ্যান নিয়েই ফেলেছ।

তবু।

অনুতাপ ? এতগুলো বছরের জন্যে।

গোলাম মোস্তফা পাশ ফিরে কুমকুমকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সকালে উঠেই গোলাম মোস্তফার মনে পড়ল, মান্না তালুকদারের কাছে সকালে যাবার কথা আছে, স্ক্রিপট নিয়ে বসতে হবে। শরীরের ভেতরে একবার ঝিমঝিম, করে উঠল তার। মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল একটা অনুভূতি শিরশির করে বয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে দাড়ি কামাতে বাথরুমে ঢুকল।

একটু পরেই দরোজায় টোকা।

কুমুর গলা, তোমার কাছে তোমার তিনটে ছেলে এসেছে।

গালে সাবান নিয়ে গোলাম মোস্তফা দরোজা একটু ফাঁক করে হেসে বলল, আমার তো কোনো ছেলে নেই।

রেডিমেড ছেলে।

কারা ?

চট করে গোসল সেরে বেরিয়ে এসে দ্যাখে বারান্দায় আফজাল বসে আছে। তার সঙ্গে আর যে দু'জন তাদের নাম মনে পড়ল না— কিন্তু চেনা, ফিল্ম সোসাইটি করে।

আরে, তোমরা যে। খবর কী আফজাল ?

আপনার কাছে এলাম।

নাশতা করেছ ?

তিনজনই হেসে নীরব রইল।

তার মানে আপত্তি নেই। কুম্, কুমু।

বারান্দাতেই নাশতা এনে দিল কুমকুম। অবিলম্বে আফজাল বলল, আসলে মোস্তফা ভাই, এদের একটা কথা ছিল।

গোলাম মোস্তফা ভ্রু তুলে অপেক্ষা করল।

আপনি তো এদের চেনেন, মামুন, শাজাহান, এরা আপনার সঙ্গে কাজ করতে চায় আপনার ছবিতে ?

ধীরে ভ্রু নেমে এলো গোলাম মোস্তফার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, বেশ তো।

সঙ্গে সঙ্গে বড় খুশি দেখাল মামুন আর শাজাহানকে। পনেরো বছর আগে নিজের মুখখানা যেন দেখতে পেল গোলাম মোস্তফা।

শাজাহান বলল, আমরা যে কী খুশি হয়েছি, মোস্তফা ভাই, আপনি ছবি করছেন।

মামুন বলল, আরো অনেক আগেই আপনার আসা উচিত ছিল।

শাজাহান বলল, একেকটা ছবিতে আপনার নাম দেখতাম, আর আমরা ভাবতাম— আপনার হাত দিয়ে এইসব বেরুচ্ছে ?

মামুন বলল, আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারি না, নতুন সাথী আপনার লেখা ?

শাজাহান যোগ করল, কিংবা, খোঁপায় দেব ফুল, পথের কাঁটা, হাসানসখী।

হাসতে লাগল গোলাম মোস্তফা। বলল, ওর একটাও আমার লেখা না।

আপনার নাম আছে, আপনি স্ক্রিপট রাইটার।

আসলে আমি ঐ ছবিগুলোর কী জান? স্প্রিং বোর্ড।

আফজাল সাংবাদিক হয়ে উঠল বুঝি, কান খাড়া করল।

গোলাম মোস্তফা বলল, তুমি আবার ফস করে চিত্রালীতে ছাপিয়ে দিও না! স্প্রিং বোর্ড বললাম কেন? দেখেছ তো সুইমিং পুলে, পানিতে ঝাঁপ দেবার জন্যে একটা তক্তা আছে, আমি সেই তক্তা, পরিচালকেরা আমার ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ডাইভ দ্যান। আবার আমাকে দেয়ালও বলতে পারো। পরিচালক আমাকে রাখেন তার হাতের বলগুলো আমার গায়ে ছুড়ে ছুড়ে পরীক্ষা করার জন্যে যে-কোন্ বল কতটা খেলে। আমার কাজ ঐটুকুই, সটান বলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা।

কুমকুম হঠাৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, তোমার টেলিফোন। মান্না তালুকদার।

তরুণেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর সকলেই চোখ নামিয়ে নিল অনুজশোভন ভঙ্গিতে।

গোলাম মোস্তফা বলল, বলে দাও, বাসায় নেই।

বলেছি যে তুমি আছো।

কাটিয়ে দাও।

আকর্ণ নিঃশব্দে হাসল মামুন, শাজাহান ধীরে তার অনুকরণ করল।

গোলাম মোস্তফা আরো যোগ করল তখন, লাইনের যে কেউ ফোন করুক, আই অ্যাম নট অ্যাভেইলেবল, কুমু।

আফজাল জানতে চাইল, আপনি আর কাজ করছেন না?

না।

শুধু নিজের ছবিই করবেন?

সেই তো ইচ্ছে।

হাতে যে দু'তিনটে চিত্রনাট্য আছে? মান্না তালুকদারেরও তো একটা করছেন।

শুনলেই তো কী বলে দিলাম।

যন্ত্র তাহলে সত্যি এবার মানুষ হবে?

চিত্রালীতে তুমিই তো ছাপিয়েছ।

আপনার ছবির নাম কী হবে, মোস্তফা ভাই?

নাম? নাম, খুব ছোট্ট, পুরনো, একেবারেই পুরনো, একেবারেই পুরোনো, মা।

মা নামে একটা ছবি হয়ে গেছে না?

হলেই বা। মা নামে উপন্যাসও তো কত লেখা হয়েছে। হয় নি?

গোলাম মোস্তফা লক্ষ করে নি। কুমকুম তার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি সেই ছবিটা করছ?

তখন চৈতন্য হলো গোলাম মোস্তফার। একটু ইতস্তত করল। তারপর মমতাভরা গলায় কুমকুমকে বলল, হ্যাঁ, কুমু, আমি সেই ছবিটা করছি।

দু'জনের ভেতরে নিঃশব্দে একটা করুণ চাঁদ প্রকাশিত হয়ে পড়ল তখন।

৬

দিন চারেকের মাথায় পারভেজ খবর পাঠাল গোলাম মোস্তফাকে। খুব একটা দরকার আছে। দরকারটা কী আফজাল নিজেও জানে না। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে গোলাম মোস্তফা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুলো।

পারভেজের বিছানার পাশে বসে তার হাত ধরে গোলাম মোস্তফা বলল, কী পারভেজ ভাই, আপনার যে অসুখ, আপনি যে ছুটিতে, আমি তো কিচ্ছু জানি না।

আমার বেশি কথা বলা বারণ।

শুনলাম, পারভেজ ভাই।

তুই ওর কাজটা শেষ করে দে।

গোলাম মোস্তফা অবাক হয়ে যায়, পারভেজের এই অবস্থাতেও এসে মান্না তালুকদার ধরেছে তাকে ? ক্রোধ আর বিষণ্নতায় স্তব্ধ হয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে গোলাম মোস্তফা। পারভেজের বেশি কথা বলা বারণ না থাকলে সে এখন চিৎকার করে উঠত। পারভেজের একটা হাত শক্ত করে ধরল গোলাম মোস্তফা। যত ঝামেলা, যত ঝগড়া, যত গোলমাল ফিল্ম লাইনে, পারভেজ ছাড়া মিটিয়ে দেবার কে আছে ?—এমনকি অসুস্থ শয্যাতেও। টপ করে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল গোলাম মোস্তফার চোখ থেকে।

পারভেজ তার হাতের ওপর আলতো চোপড় দিয়ে বলল, তুই কাজটা শেষ করে দে, তোর ছবিও ফিনানস করবে।

মান্না তালুকদার ?

গোলাম মোস্তফা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সে ফ্যালফ্যাল করে পারভেজের দিকে তাকিয়ে রইল।

পারভেজ প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, হ্যাঁ আমাকে ও কথা দিয়েছে। ও কথা দিলে কথা রাখে।

বেশ। আমি তাহলে আসি, পারভেজ ভাই ?

খবর নিস। তোরা ছাড়া আমার আছে কে ?

আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

দোয়া করিস।

হাতটা ছেড়ে দিল গোলাম মোস্তফা। উঠে দাঁড়াল।

কাজটা করে দিস।

দেব।

বেরিয়ে এলো সে। বাসায় এসে চুপ করে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। বুকের ভেতরে হঠাৎ কেমন অস্থির লাগল তার। কেন, ভালো করে বোঝা গেল না। বিকেলের দিকে মনে হলো,

মান্না তালুকদারকে একবার টেলিফোন করবে ? পারভেজ কি তাই চেয়েছিল ? না, এটুকু ক্রোধ তার থাক। দরকার হয় মান্না তালুকদার নিজে আসবে। সে যদি আসে, চিত্রনাট্য শেষ করে দেবে। যদি তার ছবিতে টাকা দিতে চায়, দেবে। যদি না আসে না আসবে।

পুরো একটা মাস সে এলো না। অবশ্য, না আসবার কারণ হয়ত তার আবার শুটিং শুরু হয়েছে। গোলাম মোস্তফা একটু অবাকও হলো খবরটা শুনে। সেই দৃশ্যগুলো কি তাহলে মান্না তালুকদার নিজেই লিখে নিয়েছে ?কিন্তু সে তো কখনো কাগজে কলম ছোঁয়ায় না ? অন্য কেউ ? কে হতে পারে ? নাকি, আবার মত পালটেছে সে ? যেমন ছিল তেমনি শুট করছে ? কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, কোনটা থাকবে আর কোনটা বদলাতে হবে— এখন পর্যন্ত ঠাহর করতে পারে না গোলাম মোস্তফা, সে আশা ছেড়েও দিয়েছে। অতএব, সে আর ভাবল না।

তারপর চিকিৎসার জন্যে পারভেজ লন্ডন যাবে যেদিন, গোলাম মোস্তাফা দেখা করতে এসে মান্না তালুকদারকে দেখতে পেল।

পারভেজ বলল, চিত্রনাট্য করে দিয়েছিস তো ?

আপনি এখন এসব ভুলে যান তো, পারভেজ ভাই।

মান্না তালুকদার একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বলল না। কেবল যাবার সময় গোলাম মোস্তফাকে এক পাশে টেনে বলল, হিরোইন তো আবার সেরে উঠেছে, কাজটা শেষ করে ফেলছি। আমি এই দু'একদিনের মধ্যেই ফ্রি হয়ে যাবো।

গাড়িবারান্দা থেকে আবার ঘরের ভেতর যখন ফিরে এলো গোলাম মোস্তফা, পারভেজ তার দিকে চঞ্চল চোখ মেলে ছোট্ট করে শুধু বলল, তোর ছবিটা ভালো হবে রে। ফাঁকি দিস না।

৭

পরদিন ভর সন্ধেবেলায় মান্না তালুকদার এসে হাজির হলো গোলাম মোস্তফার বাসায়। খুব কম আসে সে। নিতান্ত পথ দিয়ে না গেলে উঁকি দেয় না, এলেও বেশিক্ষণ বসে না, আজ এসেই হাত-পা ছড়িয়ে বসলো সোফায়, কুমকুমকে হাঁক দিয়ে নিজেই আবদার করে বলল, ভাবী, আজ কফি খাবো। যেন রোজ এসে চা খাচ্ছে, আজ একটা নতুন শখ হয়েছে।

কুমকুম রান্নাঘরে উঠে যেতেই গোলাম মোস্তফা ফেটে পড়ল।

আপনি একটা মানুষ ? পারভেজের হার্টের অসুখ কথা বলা বারণ, একসাইটেড হওয়া ডেনজারাস, আর আপনি গিয়ে তাকে সালিশ মেনেছেন ? আপনার স্ক্রিপট, আপনার ফিল্ম এত বড় যে একটা মানুষের প্রাণের কোনো দাম নেই আপনার কাছে ? ছবি বানান, মানুষকে চোখের পানিতে ভাসান, সারা বাংলাদেশ আপনার ছবি দেখে কাঁদে, আর নিজে আপনি এই ? আপনার মন বলে কিছু আছে ? চুপ করে আছেন কেন ?

বলুন, বলে যান, বাধা আমি দেব না। আপনার সব কথা আমি মাথা পেতে নেবো। অন্যায় আমি করেছি। ভুল আমি করেছি। মূর্খের মতো কাজ করেছি— কারণ, তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না।

গোলাম মোস্তফা হতবাক হয়ে গেল লোকটার স্বচ্ছন্দ ভাষণ শুনে।

মান্না তালুকদার বলে চলল, আপনি ধারণা করতে পারেন ?—আমার হিরোইন অসুস্থ, আমার হিরোর নতুন ডেট আমি নভেম্বরের আগে পাবো না, আমার ষাট হাজার টাকার সেট আমাকে ভেংগে ফেলতে হচ্ছে, আমার স্ক্রিপটের ওপর আমি ফেথ হারিয়ে ফেলেছি, ঈদে ছবি দেব বলে একজিবিটরদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বসে আছি, সে অবস্থায় একটা মানুষও যদি খুন করতাম আপনি আমাকে পাঁচ বছরের বেশি জেল দিতে পারতেন না, আইনে নেই।

লোকটার যুক্তির ধারা যে শেষ পর্যন্ত জেলখানায় গিয়ে ঠেকবে, গোলাম মোস্তফার কল্পনার একেবারে বাইরে। তার মনের একটা দিক রীতিমতো সপ্রশংস হয়ে উঠল। এই জন্যেই মান্না তালুকদারদের ছবি চলে, সিনের পর সিন হাততালি পড়ে।

মান্না তালুকদার অতঃপর বলল, পারভেজের জন্যে আমার মন কাঁদে কিনা আপনি বুঝতে পারবেন যখন দেখবেন তার জন্যে আমি কিনা করতে পারি। তার কথাতেই, শুধু তার কথাতেই, তার একটা মুখের কথায় আমি আপনার ছবিতে ফিনানস করব, কথা দিয়েছি। এরপরে আপনি বলুন আমার মায়া নাই, মমতা নাই, গাছের পাতা আমার দুঃখে ঝরে যাবে, মোস্তফা সাহেব, আপনি আমাকে এ কথা বলেন ?

ঠিক এই সময়ে কফি নিয়ে ঢুকল কুমকুম।

মান্না তালুকদার বলে উঠল, ভাবী, আমাদের একটা আলাপ আছে, আমি কিছু বলব, সে কিছু শুনবে, সে কিছু বলবে, আমি কিছু শুনব, ভাবী আমি বেশি সময় নেবো না।

কুমকুম হেসে বলল, বেশ তো, আমি ও ঘর যাচ্ছি।

না, না, না, আপনাকে থাকতে হবে বলেই তো বললাম, আপনাকে আমার সাইড নিতে হবে, আমার ভুল হলে আপনি আমাকে ভুলটা দেখিয়ে দেবেন, বসুন আপনি।

না।

আপনিও আমাকে ত্যাগ করলেন, ভাবী ?

কুমকুম লোকটার কথায় হাসতে পারত, হাসল না। কফির কাপ মান্না তালুকদারের হাতে দিয়ে বলল, আপনাদের কথায় কবেই বা আমি থাকি ?

তাহলে একটা শুধু একটা কথা আপনি শুনুন, শুধু একটা কথা আপনি শুনে উঠে চলে যান। মান্না তালুকদার কাতর গলায় অতঃপর বলতে শুরু করল সেই সুর করে, ফিসফিস করে, দু'হাত অনবরত ব্যবহার করে, ভাবী, এটা কী রকম কথা ?— আমার রাইটার দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াবে, আমার রাইটার সে একটা শখ করবে, সেই শখ তার পূরণ হবে না, আমার রাইটার সে মলিন মুখে বসে থাকবে, আমার রাইটার তার চোখে পানির ধারা বয়ে যাবে, আর আমাকে সে একবার বলবে না ?

আমার, ভাই, সত্যি কাজ আছে একটু। বলে কুমকুম উঠে গেল।

তখন মান্না তালুকদার গোলাম মোস্তফাকে সরাসরি বলল, আপনি আমাকে একবার বলতে পারলেন না ? আপনি গিয়ে ধরলেন পারভেজকে ? মোস্তফা সাহেব, আপনিই তো পথ দেখালেন, এখন আমাকে দোষ দিচ্ছেন ?

গোলাম মোস্তফা চুপ করে বসে রইল। মান্না তালুকদার ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। কফিতে চুমুক দিল। তারপর গোলাম মোস্তফার কাঁধে ক্ষণকালের জন্যে হাত রেখে বলল, আপনি

আমার কাজ করতে চান না, কারবেন না। যখন আপনার ইচ্ছা হবে, করবেন ; যখন মন চাইবে না, করবেন না। কাজের পেছনে আপনি ঘুরবেন কেন ? কাজ আপনার পেছনে ঘুরবে।

অন্তত চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে যে মান্না তালুকদারের শেষ কথাটা খাটে না, গোলাম মোস্তফা একবার স্মরণ করিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার জানা আছে, মান্না তালুকদারের একেকটা মুহূর্ত আসে, যখন সে নিজের তোড়ে কথা বলে যায়।

মোস্তফা সাহেব, আপনার বাড়ির দরজায় লাইন পড়ে যাবে, প্রডিউসাররা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, নগদ টাকা দিয়ে তারা আপনাকে রিকোয়েস্ট করবে, আপনার যেটা ইচ্ছা হবে, যার কাজ করতে ইচ্ছা হবে, বেছে বেছে, একটা কী দুটো; বড়জোর বছরে তিনটে কাজ আপনি নেবেন, দিনে এক ঘণ্টা কী দু'ঘণ্টা কাজ করবেন, একটা কী দুটো সিন লিখবেন, বিকেলে ভাবীকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন, একটু কোথাও দু'জনে বসে বসে খাবেন, দু'টি পায়রার মতো বাসায় ফিরে আসবেন।

মান্না সাহেব।

জ্বি।

একটা কথা!

জানি আপনি কী বলবেন। আপনি লজ্জা করছেন কেন ? আমাকে বলতে আপনার লজ্জা করছে ? আমাকে ?— যে আপনাকে মাথায় করে রাখে ? পারভেজ বলেছে বলেই জোর করে আমার স্ক্রীপট করে দেবেন না। আমি তা চাই না। এই কথাটাই তো আপনি আমাকে বলতে পারছেন না ? আমি বলে দিচ্ছি, স্ক্রিপট আপনাকে করতে হবে না। গুলি মারেন স্ক্রিপট। স্ক্রিপট লেখার বহু লোক আছে।

ঈষৎ ভ্রূ তুলল গোলাম মোস্তফা।

মান্না তুলকাদার বলল, লন্ডন থেকে শামসুল হক আসছে।

গোলাম মোস্তফা জানত না।

আমি তাকে দিয়ে লেখাব। আপনার মতো মাল তার হাত দিয়ে বেরুবে না; আপনার মতো ডায়লোগ সে লিখতে পারবে না, সব আমি জানি, কিন্তু আপনার নিজের ছবির কাজের সময় তো আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করতে পারি না। বলুন, পারি ?

পারভেজের কথাটা মনে পড়ে গেল গোলাম মোস্তফার— শামসুল হক দেশে ফিরে আবার ঐ চিত্রনাট্য লিখবে।

মান্না তালুকদার একটু গলা নামিয়ে বলল, শামসুল হকের দোষ কী জানেন ?

গোলাম মোস্তফা সতর্কভাবে নীরব রইল। শামসুল হক তার কলেজের বন্ধু, কাজের ক্ষেত্র তাদের এক, কোনো কোনো সময়ে প্রতিদ্বন্দী— অতএব সমালোচনায় জড়িয়ে পড়তে সে কখনোই চায় না।

মান্না তালুকদার আর এক প্রশ্ন করলো, পিছলা বই বোঝেন ?

পিছলা বই ?

আরে ঐ যে, ইংরেজি পকেট বই। চকচক করে। সেই পিছলা বই পড়ে শামসুল হক ফিনিশ। এটা তো বিলেত না, মোস্তফা সাহেব। আমার দেশের লোক নিরক্ষর, তারা শ্রমিক,

তারা চাষী, তারা ছোটখাটো চাকরি করে, ব্যবসা, টুকটাক করে, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে দিন গুজরান করে। সারাদিন কাজের পরে তারা সিনেমা হলে আসে একটু শান্তির খোঁজে। পিছলা বইয়ের তারা কী বোঝে?

গোলাম মোস্তফাও যে পিছলা বই পড়ে এমনকি এখনি ঘরের চারিদিকে তাকালে সেলফের পর সেলফে পিছলা বই হাজার খানেক দেখা যেতে পারে, মান্না তালুকদারের পক্ষেই সম্ভব চোখ বুঁজে থাকা।

গোলাম মোস্তফা বলল, শামসুল হক তাহলে আসছে? আপনার কাজ করছে?

আপনি ছবি করবেন শুনে আমি তাকে লিখে দিয়েছি। সে আমার কাছেই আসবে, আপাতত আমার বাসাতেই উঠবে। আপনি চিন্তা করবেন না, ও স্ক্রিপটের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, শামসুল হককে দিয়ে আমি লিখিয়ে নেবো। আমার মনের মতো না হলে কি আমি ছেড়ে দেব? ঘাড়ে ধরে করিয়ে নেবো। মাল তাকে বের করতে হবে।

কিন্তু আমার যে টাকা নেয়া আছে আপনার কাছে?

কত টাকা নেয়া আছে? দশ হাজার? বারো হাজার? এই তো আপনি আমাকে এখনো আপনার বন্ধু মনে করেন না। পারভেজকে আমি কথা দিই নি, আপনার ছবি আমি করব? আমি ফিনানস করব? ভুলে গেছেন? আপনার ছবি করবেন না?

করব?

তাহলে?

তাহলে কী?

স্ক্রিপটের ঐ টাকাটা আপনার ডিরেকশন বাবদ অ্যাডভানস চলে যাবে।

মানে আমি পেইড ডিরেকটর আপনার?

আপত্তি আছে?

গোলাম মোস্তফা ভাবতে লাগল!

মান্না তালুকদার উদার ভংগিতে বলল, আপনি শিল্পী মানুষ, নিজের প্রডাকশন আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না, মোস্তফা সাহেব। আমি আপনাকে বলছি টাকাও যাবে, ছবিও যাবে। আপনার দরকার শান্তি। টাকা কোথা থেকে আসছে, কীভাবে আসছে— আপনি জানবেন না। শুটিংয়ের ডেট করবেন, শুটিং করবেন। রাগ বেরুবে, এডিটিংয়ে বসে যাবেন। মিউজিক চিন্তা করবেন। কাটিং চিন্তা করবেন। ছবি ফিনিশ করে আমার হাতে দেবেন। আমি রিলিজ করব। তাই আমি ইনসিস্ট করি ছবি আমার প্রডাকশন থেকেই করুন, প্রডিউসার হিসেবে নামও আমি চাই না, ইচ্ছা হয় আমার নাম দেবেন, না হয় দেবেন না, এই অ্যাডভানসের জন্যে আর ভাববেন না, আমি এডজাস্ট আগেই করে নিয়েছি, কাল আপনাকে আমি আরো দশ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দেবো। আপনার সাবজেকট আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

এতক্ষণ এই কথাটাই ভাবছিল গোলাম মোস্তফা। কিছুতেই সে ঠাহর করতে পারছিল না— পারভেজ মান্না তালুকদারকে গল্পটা কীভাবে শুনিয়েছে যে লোকটা এমন ক্ষেপে উঠেছে। গোলাম মোস্তফা যেভাবে বলেছিল গল্পটা সেভাবে বললে তো মান্না তুলকদারের বধির হয়ে থাকবার কথা।

আবার ভাবল, পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই তো ঘটে। আর তার নিজের যাত্রাও তো দীর্ঘকালের অস্তিত্ব থেকে রক্তের প্রপাতও তো ছিল অবিরল, নির্মম; এখন তার পরিষ্কার নেবার লগ্ন, সে যে হাল ছেড়ে দেয় নি, তারই এ পুরস্কার।

মান্না তালুকদার বলল, বেরিয়ে যেতে যেতে, 'যে ভাবেই আপনি ছবি করুন, বন্ধ্যা মেয়ের গল্প কখনো ফেল করবে না। কাল ভাবীর কাছে চেক পাঠিয়ে দেব। সংসারের ঝামেলাও আপনি ভুলে যান। ভাবীর হাতে ছেড়ে দিন। আসুন ছবি করুন।

মান্না তালুকদার চলে যাবার পরপরই কুমকুম এসে গোলাম মোস্তফার পাশে দাঁড়াল।

স্মিত মুখে তাকাল তার স্বামী।

কুমকুম বলল, বুঝতে পারলে কিছু ? আমি সব শুনছিলাম।

গোলাম মোস্তফা চেষ্টা করেও নিজের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে ফেলে কুমকুমের মত উদ্বিগ্ন হতে পারলো না।

কুমকুম বলল, মতলবটা বোঝো নি ?

না। না তো।

শামসুল হক আসছে, তাকে আটকাচ্ছে। তোমাকে ছবি করাবে বলে আটকাচ্ছে।

কী বলছ ?

সেনসর বোর্ড এখন কড়া হয়েছে। ভিসিআর দেখে বানোনো ছবি পাশ হচ্ছে না। নকল ছবি চলছে না। শরৎচন্দ্র নীহাররঞ্জন সমরেশ বসু পাতা পাতা ছিঁড়ে সব শুটিং হয়ে গেছে। এখন নতুন গল্প না হলে চলবে না। অরিজিনাল চিত্রনাট্য না হলে কেউ পার পাবে না। তাই সব প্রডিউসারকে এখন আসতে হবে তোমার কাছে, শামসুল হকের কাছে। সেই পথটাই বন্ধ করছে মান্না তালুকদার। তোমাদের দু'জনকেই আটকে রাখছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাম মোস্তফা বলল, রাখুক। আমার ছবি তো সে করছে ? আমার নিজের একটা ছবি তো আমি করতে পারছি ?

৮

মান্না তালুকদার বলল, একটা কথা আছে, মোস্তফা সাহেব। ছোট্ট একটা কথা।

বলুন।

আমার একটা ছোট্ট সাজেশান।

বলুন না ?

আপনার ছবির নামটা বদলান।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাম মোস্তফা বলল, কেন ? মা নামটা তো ভালো!

হাজারবার স্বীকার করি ভালো। আহা, মা, কী একটা শব্দ, এ-রকম একটা শব্দ সারা ডিকশনারীতে আর হয় ?

তাহলে ?

পয়েন্ট আছে। আমাকে তো বিজ্ঞাপন করতে হবে ? কী লিখব ? গোলাম মোস্তফার মা ?

আপনিই বলুন কেমন শোনাবে ? গোলাম মোস্তফার মা ? টোটাল মুডটাই মাটি হয়ে যাচ্ছে না ?

একেবারে অস্বীকার করতে পারল না গোলাম মোস্তফা, আবার ভেতরের দ্বিধাটা প্রকাশ করতেও তার অহংকারে বাধল। মান্না তালুকদার যেভাবে তাচ্ছিল্য করে 'গোলাম মোস্তফার মা' কথাটা উচ্চারণ করল, তাতে মুড কেটে যাবারই কথা।

গোলাম মোস্তফা তবু প্রতিবাদ করে উঠল, কেন, মান্না সাহেব ? ম্যাকসিম গোর্কির মা হতে পারে, অনুরূপা দেবীর মা হতে পারে— কানে একটুও কারো খারাপ লাগে না, আর আমারটা শুনলেই লোকে হেসে উঠবে ?

হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, ঐ হেসেই উঠবে, ফকিরের মা মনে করবে পাবলিক।

রীতিমত আহত হলো গোলাম মোস্তফা। বলল, গোলাম মোস্তফার মা মানে ফকিরের মা ?

আরে না, না, আপনি পার্সোনালি নেবেন না। আসলে কি জানেন, মুসলমানের নাম বাংলা শব্দের সংগে এখনো ঠিক ভালভাবে যায় না।

হতাশ হয়ে গোলাম মোস্তফা বলল, আর কবে যাবে ?

মান্না তালুকদার তাকে একটা সিগারেট দিয়ে বলল, নিন, ধরান, আমার সাজেশানটা শুনুন। মা বদলে অভাগিনী করুন।

অভাগিনী ?

কেন ? আপনার স্টোরি তো হ্যাম্পার করছে না। আপনার হিরোইন কি অভাগিনী নয় ? বিবাহিতা স্ত্রী, সন্তান তার হয় না, শ্বাশুড়ি তাকে গঞ্জনা দেয়, ছেলের আবার বিয়ে দিতে চায়, ছেলেও হয়ত বিয়ে আবার করতে চায়, সে অভাগিনী নয় ?

গোলাম মোস্তফা প্রতিবাদ করে উঠল, ছেলে কিন্তু আবার বিয়ে করতে মোটেই চায় না! আমি সে-রকম কল্পনাই করি নি, মান্না সাহেব। ছেলে বৌকে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

মান্না তালকুদার চোখ ক্ষণকালের জন্যে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা, ওটা মাইনর পয়েন্ট। ছেড়ে দিন। ওসব ডিটেল ওয়ার্কের সময় আসবে। নামটা কী মনে করেন ?

অভাগিনী ?

হ্যাঁ, অভাগিনী। আমার এই একটাই সাজেশান। আপনি রাখুন, আমার কথা শুনুন, আপনার ক্ষতি হবে না, আপনার ছবি ঝকঝক করবে। আহা, অভাগিনী।

গোলাম মোস্তফা মান্না তালুকদারের চৌকির ওপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

মান্না তালুকদার হেসে বলল, একেবারে ভেংগে পড়লেন যে ? এই আপনাদের এক দোষ। আমি শিল্পী তো, বুঝি না তা নয়। আবার এও জেনে রাখবেন আমি শিল্পী বলেই দু'একটা যে সাজেশান দেব, অন্তর থেকে কনভিকশন থেকে দেব। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি সে সাজেশান নেবেন, না হয় ফেলে দেবেন। আমি কিচ্ছু বলব না।

ঐ যে দু'একটা সাজেশানের কথা মান্না তালুকদার বলল, গোলাম মোস্তফা উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগল। একটা থেকে এখন দু'একটা ? ছবির চিত্রনাট্য তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। আজ দশটা দিন সে রিভাইজ করেছে রাত জেগে, প্রতিটি শট সে প্রত্যক্ষ করেছে কতবার, প্রতিটি শব্দ তার মাথার ভেতরে অবিরাম বয়ে চলেছে। একটা নাম আঁকড়ে ধরে এত কাছে এসেও সব আবার সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার ভেতরে সে ছুড়ে ফেলে দেবে ?

গোলাম মোস্তফা বলল, অভাগিনী ?

তখন মান্না তালুকদার উৎফুল্ল একজন অপরাধীর মত স্বীকার করল, আমি কিন্তু দু'একজনকে বলেই ফেলেছি, আমাদের ছবির নাম অভাগিনী।

গোলাম মোস্তফা চৌকি থেকে উঠে বসল। বলল, আমি এখন যাই।

নামটা ? নাকি, অন্য কোনো নাম ভাববেন ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, নাহ। অভাগিনীই থাক।

গোলাম মোস্তফা অতি ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সে মান্না তালুকদারকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে একটা ডেট ঠিক করতে হয়। শুটিংয়ের।

হ্যাঁ, বর্ষা এসে যাচ্ছে। তার আগেই আমি ঐ আস্তানা, বটগাছ, বেদী এই কাজগুলো করে ফেলতে চাই।

করতে পারলে তো ভালো খুব ভালো। কিন্তু আপনার আর্টিস্ট ? এত তাড়াতাড়ি আর্টিস্টের ডেট আপনি পাবেন ?

আমি তো অধিকাংশই নিউ ফেস নিয়ে কাজ করছি ?

তারা কে ?

এই গ্রুপ থিয়েটারে আছে, টেলিভিশনে টুকটাক করে, তারপর আমার পরিচিত কিছু আগে ঠিক অভিনয় করে নি। আমার সব ঠিক করাই আছে।

নতুন লোক নিয়ে আপনার কষ্ট হবে না ? তারপর, আপনি যা চাইছেন সেই পারফরমেন্স পাবেন ?

না পেলে ছাড়ব কেন ?

সে তো টাইমের ব্যাপার।

মোটেই না। শুটিংয়ের আগে আমি ওদের নিয়ে বসব। ডিটেল আলোচনা করব। পরিষ্কার সব বুঝিয়ে দেব। থিয়েটার টেলিভিশনের এক্সপেরিয়েন্স আছে, একেবারে বুঝবে না, তা তো নয়, মান্না সাহেব। আমি নিজে তাদের সঙ্গে খাটব। তাছাড়া শুটিংয়ের অ্যাটমসফেয়ারটাও সেই অর্থে টাইট কিছু রাখব না, যেন একটা অতি পরিচিত সিচুয়েশনে, অতি পরিচিত কিছু লোকের সঙ্গে, এক সঙ্গে আমরা সকলেই আছি।

মান্না তালুকদার ঠোঁট চেপে অনেকক্ষণ বসে রইল।

গোলাম মোস্তফা বলল, আমি তো আগেই বলেছি, পারভেজ সাহেবকেও বলেছি, আমি নতুন আর্টিস্ট নিয়ে কাজ করব।

কথাটার কোনো স্বীকার-সমর্থন পাওয়া গেল না মান্না তালুকদারের কাছ থেকে।

মান্না তালুকদার বলল, চা চলবে ?

চলতে পারে। আপনি যদি চান, আপনি আমার আর্টিস্টদের সঙ্গে মিট করতে পারেন।

কথাটা বলেই গোলাম মোস্তফা অনুতপ্ত হলো। বলা উচিত হয় নি। একেবারেই উচিত হয় নি।

নিজে ইচ্ছে করে সে মান্না তালুকদারের হাতে তুলে দিয়েছে, এখন ফেরাবে কী করে ?

নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারল না।

মান্না তালুকদার চকিতে একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। তারপর কাগজের ওপর কলম দিয়ে পাখি আঁকতে লাগল। পাখিটা ময়ূরের আকার নিচ্ছিল, হঠাৎ কেটে দিল মান্না তালুকদার। কাগজটাই ছিঁড়ে ফেলল সে কুটিকুটি করে।

মান্না তালুকদার বলল, একটা কথা বলি, মোস্তফা সাহেব।

গোলাম মোস্তফা অপেক্ষা করতে লাগল।

চিন্তার ভেতরে দীর্ঘ একটা ডুব দিয়ে মান্না তালুকদার ভেসে উঠল। বলল, আপনি তো এক্সপেরিমেন্টাল ছবি করছেন?

কথাটা স্বীকার করা ঠিক হবে কিনা, বুঝতে পারল না গোলাম মোস্তফা।

মান্না তালুকদারই উত্তরটা দিল, অফকোর্স আপনি এক্সপেরিমেন্টাল ছবি করছেন।

হানড্রেড পারসেন্ট আমি আপনার সঙ্গে। ভুলেও মনে করবেন না, আমি আপনার আইডিয়া, আপনার ভিশন, আপনার স্ট্রাকচার নিয়ে বিন্দুমাত্র সমালোচনা করব বা পিছিয়ে যাব। আমি তো জানি আপনি এক্সপেরিমেন্টাল ছবি করছেন। আপনিই তো করবেন? আপনি ছাড়া করবার মতো আছে কে? কিন্তু, আপনি তো ছবি আমার জন্যে বানাচ্ছেন না? আপনি চান লোকে আপনার ছবি দেখবে। চান না?

চাই।

যত বেশি দেখবে, আপনি খুশি হবেন না?

নিশ্চয়ই।

আপনি চান না বাংলাদেশের প্রতিটি দর্শক আপনার হলে আসুক?

কে না চায়?

তাহলে কেন রিস্ক নিচ্ছেন? এমনিতেই এক্সপেরিমেন্টাল ছবি, আবার কাস্টিংয়েও যদি এক্সপেরিমেন্ট করেন, সেটা বোকামি হয় না?

গোলাম মোস্তফা ভ্রু তুলল। বলল, বোকামি ঠিক বলতে পারেন না।

সুর করে বলে উঠল মান্না তালুকদার, আপনি তো নিজের পায়ে কুড়াল মারছেন, মোস্তফা সাহেব। এতবড় একটা সুযোগ, যা কেউ কখনো এ ইন্ডাস্ট্রিতে পায় না, আপনি সেই সুযোগ পেয়ে একটা জেদ ধরে, নষ্ট করছেন?

গোলাম মোস্তফা বিনষ্ট বোধ করতে লাগল।

মান্না তালুকদার তার কাঁধে হাত রেখে পরামর্শ দিল, অন্তত এই কথাটা আমার রাখুন। নতুন আর্টিস্টের কথা ভুলে যান।

গোলাম মোস্তফা বলতে পারত, এর আগে নাম বদলানোর কথা সে রেখেছে, কাজেই কাস্টিং বদলানোর প্রস্তাব অন্তত এই একটি কথা নয়, এটি দ্বিতীয় কথা— কিন্তু সে বলতে পারল না। এবং আরো খিন্ন বোধ করতে থাকল বুকের ভেতরে।

মোস্তফা সাহেব, শুনুন। আপনার কোন আর্টিস্ট দরকার, আমাকে বলুন। যত বড় আর্টিস্ট হোক, যত বিজি থাক, যার সেটেই কাজ করুক, আমি সেট থেকে তুলে এনে আপনার লোকেশনে পৌঁছে দেব। তুলেও আনতে হবে না আপনার দোয়ায়, আমার ছবি শুনলে অনেকেই সব ফেলে ছুটে আসবে।

কথাটা কি সংশোধন করে দেবে গোলাম মোস্তফা যে ছবিটা মান্না তালুকদারের, আমার ছবি নয়? আবার নিজেকেই সে প্রবোধ দিল, টাকা যখন মান্না তালুকদারের, তখন সে পারে বৈকি আমার ছবি বলতে। কথাটা টুকলে বরং ছেলেমানুষের ঝগড়ার মতো শোনাবে।

তার নীরবতাকে মান্না তালুকদার সম্মতির আভাস বলে ধরে নিল।

মোস্তফা সাহেব, আমার কথা হচ্ছে, এসটাবলিশড অ্যান্ড নোন আর্টিস্ট আপনি নিন, তাদের নাম দেখে পাবলিক আসবে, এটা একটা ট্রিক্স, একটা টোপ, আর কিছু না, আপনার ছবির কিছু ক্ষতি হবে না, একবার তারা হলে এসে বসলে, তারপর আপনি দেখান না আপনার যাদু। আপনার ছবি যদি একবারও লোকে দেখে, আমাদের কোনো রিস্ক নেই।

আপনি টাকার কথা ভাবছেন ।

মান্না তালুকদার হেসে বলল, এটা আপনি কী বলছেন? আমিই তো টাকার কথা ভাবব। সে ভাবনা তো আপনাকে আমি ভাবতে দেব না। আপনি ছবি করবেন, আপনার ছবি হবে, আপনার আবার ছবি হবে, এ ছবির পর নতুন ছবিতে হাত দেবেন। আপনি বলুন, কোন আর্টিস্ট আপনার দরকার, আজ বিকেলের মধ্যে কনট্রাক্ট সাইন করে, পয়সা দিয়ে, ডেট নিয়ে, আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করে দিচ্ছি, আপনি আপনার স্ক্রিপট নিয়ে বসে যান, ভাবুন, প্লান করুন। আর্টিস্ট নিয়ে আমি আর আপনাকে ভাবতে দেব না। আমার ওপরে ঝামেলা ছেড়ে দিন।

সন্ধেবেলায় গোলাম মোস্তফার বাসায় তার পছন্দ করা নতুন কিছু শিল্পীর আসবার কথা ছিল, সে নিজেই আসতে বলেছিল, সে নিজেই কুমকুমকে নিয়ে বাইরে চলে গেল সন্ধের আগে। মামুন আর শাজাহান তাদের নিয়ে অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় বসে রইল। গোলাম মোস্তফা ফিরল না।

মান্না তালুকদারের ছোট ঘরটায় এখন শামসুল হক। লন্ডন থেকে এসে উঠেছে। অতএব গোলাম মোস্তফা এখন মান্না তালুকদারের বেডরুমে। প্রথমে মৃদু আপত্তি করেছিল গোলাম মোস্তফা।

অন্য কোথাও একটা রুম নিলে হয় না?

গোলাম মোস্তফা নিজের বাসায় বসে কাজ করবার কথা বলতে পারত, বলে নি, কারণ মান্না তালুকদার বলে, বৌ কাছে থাকলেই আপনার ডিস্টার্ব হবে। এদিকে সে যে তার নিজের বৌ কেবল নয়, বাপ-মা, পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাড়িতে বসেই স্বচ্ছন্দে কাজ করে চিরকাল, সেটা উল্লেখ করলে হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে, আমার এগুলো তো ফার্নিচার।

চিত্রতারকাদের শিডিউল পাওয়া গেছে। মান্না তালুকদারের বেডরুমে চওড়া খাটের ওপর উপুড় হয়ে গোলাম মোস্তফা চিত্রনাট্য দেখে শুটিং শিডিউল করছে। মান্না তালুকদার দুপুরের খাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে এসে বসল।

অনেকক্ষণ তাকে এক উদাস দৃষ্টিতে দেখল মান্না তালুকদার। পুরো দুটো সিগারেট ওড়াল। তারপর উচ্চারণ করল, কাজ করছেন?

নিতান্তই অন্ধ না হলে এ প্রশ্ন কেউ করে না। অতএব, প্রশ্নটি প্রশ্ন নয়, এখনো অনুচ্চারিত কোনো বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র। কিন্তু কাজে এত ডুবে ছিল গোলাম মোস্তফা যে তা লক্ষ করতে পারল না। অন্যমনস্কভাবে সে শুধু বলল, হুঁ।

ডিস্টার্ব করছি না তো?

না, না।

ব্রেকডাউন সব করে ফেলেছেন ?

এই হয়ে এলো।

আচ্ছা মোস্তফা সাহেব। বলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল মান্না তালুকদার। ছাদের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, আমি একটা সিন ভাবছিলাম। আপনার ছবির সিন।

কোন সিন ?

গোলাম মোস্তফা কান খাড়া করে কাগজ থেকে মুখ তুলল। এর আগেও দু'তিন দিন আরো অনেক সিন নিয়ে কথা হয়ে গেছে। এবং প্রতিটি সিনই মান্না তালুকদারের মিষ্টি ছুরিতে ফালাফালা হয়ে গেছে।

আজ আবার কোন সিন ?

আবারো সে বলল, খুব সতর্ক গলায়, কোন সিনের কথা বলছেন ?

এ সিন আপনার স্ক্রিপটে নেই।

ক্ষণকালের জন্যে স্বস্তিবোধ করল গোলাম মোস্তফা। তাহলে হয়ত মান্না তালুকদার তার নিজের কোনো ছবির কোনো দৃশ্যের কথা বলছে। শামসুল হক তো এসে অবধি খাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। পর মুহূর্তেই সন্দেহ ঘনিয়ে এলো তার। কারণ, তার মনে পড়ে গেল, মান্না তালুকদার প্রফেশনাল লোক, একজনের কাজ নিয়ে আরেকজনের কাছে কথা বলে না।

মান্না তালুকদার বলল, এর আগে দু'তিনটি সিন আপনি আমার সঙ্গে, এই সামান্য একটু আলোচনা করে, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি যে কী হ্যাপি, আপনি বুঝতে পারছেন ? আপনার ছবি ভালো চললে আমার চেয়ে কেউ বেশি খুশি হবে না।

কোন দিকে যাচ্ছে কথাটা বুঝতে পারল না গোলাম মোস্তফা। মান্না তালুকদার দু'তিনটে সিন বললেও প্রায় গোটা দশেক নতুন সিন তাকে ঢোকাতে হয়েছে। এবং তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কুমকুমকে একথা বলে বকা খেয়েছে সে। কুমকুম বলেছে, তোমাকে তো বলেই ছিলাম।

গোলাম মোস্তফা আজ শক্ত হয়ে বসে রইল।

মান্না তালুকদার বলল, আপনি চোখ বুজে শুনে যান।

চোখ বুজল না সে। ওটা একটা কথার কথা।

মান্না তালুকদার বলে যেতে লাগল, আমাদের হিরোইন মুরগির খোপের কাছে বসে আছে।

এ রকম তো কোনো সিচুয়েশন নেই।

শুনে যান। শুনে যান। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, বলছি। মুরগির খোপের কাছে আমাদের হিরোইন। মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে। একুশ দিন হয়ে গেছে। একুশটা দিন আমাদের হিরোইন এসেছে আর অপেক্ষা করেছে কখন বাচ্চা ফুটে বেরুবে। আজ এসেছে। আজ সে তাকিয়ে আছে। তার চোখে মায়া। তার চোখে স্বপ্ন। সে যেন মুরগির বাচ্চার ডাক কানে শুনতে পাচ্ছে। সে শোনে। সে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ক্লোজআপ। ক্লোজআপ। তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার। ডিমগুলো আছড়ে পড়ে যায়। ভেঙ্গে যায়। মুরগি কঁক কঁক করে তার স্বরে দৌড়ে যায়। আমাদের হিরোইন উঠে দাঁড়ায়। শ্বাশুড়ী তাকে বলে, ভাইংগা দিলাম, ভাইংগা

দিলাম, তর সাধ আর পুরা হইব না। তুইও আর মা হইতে পারবি না। ছেলের আমি আবার বিয়া দিমু।

দৃশ্যটা সাজিয়ে দিতে পারলে মন্দ দাঁড়াবে না। দৃশ্যটার সম্ভাবনা আছে। দৃশ্যটা তার ছবির মুডের বাইরে নয়। তবুও গোলাম মোস্তফা নিজের ভেতরে তীব্র একটা চিৎকার শুনতে পেল, সে চিৎকার— এটা আমার চিত্রনাট্য, এটা আমার ছবি।

কিছুতেই গোলাম মোস্তফা দৃশ্যটাকে গ্রহণ করতে পারল না মনের ভেতরে।

মান্না তালুকদার চোখ বুজে বলে যেতে লাগল, তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের হিরোইনকে। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তার আশা চূর্ণ হয়ে গেছে। তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সে কি সত্যি তবে আর কোনো দিন মা হতে পারবে না? সত্যি তার স্বামী আবার বিয়ে করবে? সত্যি তার এঘর ভেঙ্গে যাবে? সে কাঁদে। সে আল্লার কাছে মোনাজাত করে। জায়নামাযের ওপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। ধীরে, খুব ধীরে, তার ক্লোজআপের ওপর শোনা যায়, বহুদূর থেকে আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু। সে উঠে বসে। সুপার ইম্পোজ করে, হিরোইনের মিডিয়াম শট থেকেই হিরোইনকে সেকেন্ড ইমেজে আমরা উঠে দাঁড়াতে দেখি। সে দরোজা খুলে বাইরে আসে। একদৃষ্টে একভাবে সে পথ চলতে থাকে। উঠান পেরিয়ে যায়, রাস্তা পেরিয়ে যায়, ক্ষেত পেরিয়ে যায়, গহিন একটা বনের ভেতরে গিয়ে ঢোকে আমাদের হিরোইন। সে যেন জানেই কোথায় সে যাচ্ছে। ক্রমে সেই আল্লাহু, আল্লাহু, বাড়তে থাকে। হলের ভেতরে মানুষের বুকের ভেতরে, আকাশে বাতাসে, আল্লাহু ছাড়া রব আর নাই এখন। হিরোইন হাঁটছে, এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ, হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে পবিত্র এক দৃশ্য। শাদা জোব্বা পরা, শাদা দাঁড়ি, মাথায় শাদা পাগড়ি এক দরবেশ দাঁড়িয়ে আছে। সে দু'হাত বাড়িয়ে আছে। সে অপেক্ষা করছে। আমাদের হিরোইনের জন্যে অপেক্ষা করছে। হিরোইন আসছে। দরবেশ হাত তুলে আছে। হিরোইন আসে। হিরোইন এসে লুটিয়ে পড়ে যায়। দরবেশ হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নেয়, বলে, বেটি এই নে, আমি তোরই জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। দরবেশ একটা শিকড় তার হাতে দেয়, বলে, এটা খেলেই তোর সন্তান হবে, তুই মা হবি।

না। চিৎকার করে উঠল গোলাম মোস্তফা।

মান্না তালুকদার চোখ খুলল।

না?

এ হয় না।

মান্না তালুকদার উঠে বসল। বলল, প্রশান্ত স্নিগ্ধ গলায়, হবে না কেন? খুব হয়।

খাট থেকে লাফ দিয়ে নামল গোলাম মোস্তফা। বলল, হ্যাঁ, হয়, আপনার ছবিতে হয়। এ আপনার আইডিয়া, এ আপনার সিন।

আপনার ছবি কি শুধু আপনারই? আমার নয়?

তাহলে, তাহলে মান্না সাহেব, আপনিই বানান। আপনিই এ ছবি করুন।

ঠিক তখন দরোজা ঠেলে উত্তেজিত শামসুল হক ঘরে ঢুকল। গোলাম মোস্তফা অপ্রতিভ হয়ে ভাবল, সে কি বেশি চিৎকার করে ফেলেছে?

শামসুল হক থরথর গলায় উচ্চারণ করল, শুনেছেন, পারভেজ ভাই মারা গেছেন?

স্তম্ভিত হয়ে গেল গোলাম মোস্তফা।

স্থানু হয়ে বসে রইল মান্না তালুকদার।

খোকা জামানকে ফোন করতে গিয়ে এইমাত্র শুনলাম।

শামসুল হক দু'হাতে মুখ ঠেসে ধরে বলতে লাগল, আর দেখা হলো না। লন্ডনে আমি থাকতেই তো পারভেজ ভাই গিয়েছিলেন। ফোনে আমার সঙ্গে দু'বার কথা হয়েছিল। কিচ্ছু বুঝতে পারি নি। একবারও মনে করি নি, ঢাকায় আর তাঁর আসা হবে না। আমি বললাম, আমি একবার আসি পারভেজ ভাই ? তিনি বললেন, এতদূর কষ্ট করে আসবি ? কত আর দূর ছিল ? আমি হ্যাংগার লেনে, পারভেজ ভাই বাউন্ডস গ্রিনে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শামসুল হক। বারবার বলতে লাগল, আর কে আমাকে বলবে, এতদূর কষ্ট করে আসবি ? মান্না তালুকদার গোলাম মোস্তফার কাঁধে হাত রেখে বলল, পারভেজের কথা মনে রেখেই এ ছবি আপনার করা দরকার।

গোলাম মোস্তফা কেবল বলতে পারল, পারভেজের কথা মনে রেখেই এ ছবি আমি করব না।'

গোলাম মোস্তফার চোখ দিয়ে অবিরল ধারে অশ্রু পড়তে লাগল। মান্না তালুকদারের সাধ্য কী বোঝে, একাধিক শোকে অশ্রুর একাধিক ধারা বহে না। এমনকি জানতে পারলে কবেই আত্মসাৎ করে সে তার কোনো একটা ছবিতে এটা সংলাপ হিসেবে ব্যবহার করে ফেলত।